নাট্যতত্ত্ব বিচার

ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

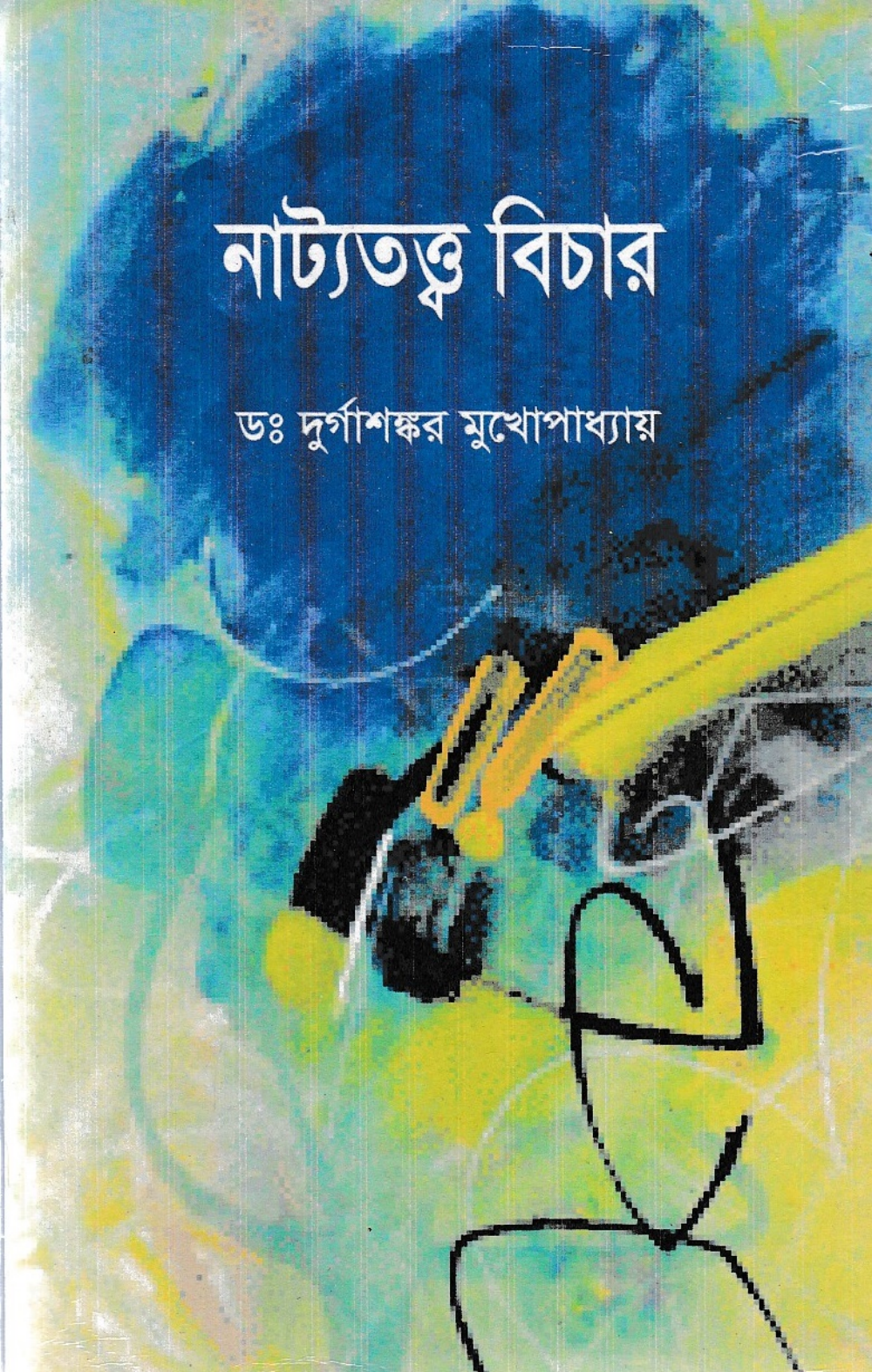

নাট্যতত্ত্ব-বিচার

ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বই সংগ্রহ ও বিতরণই আমাদের লক্ষ্য
কলেজ বুক সেন্টার
KOLLOL BOOK CENTER
01717877112

প্রকাশক
শ্রীসুনীত বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
রাখী পূর্ণিমা, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ : মাঘ, ১৪০০
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৪০১

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

[বাজার হইতে সংগৃহীত কাগজে মুদ্রিত।]

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীচিত্রকুমার রায়

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা

শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

Natya-Tattwa Bichar

By

Dr. Durgashankar Mukhopadhyay

Calcutta University

প্রথম অধ্যায় ১—৩২ পৃষ্ঠা

॥ নাট্যলক্ষণ, নাট্যসংজ্ঞা ও নাট্যবিচার ॥

সূচনা—১, নাটক ও উপন্যাস—১, নাটকের লক্ষণ—নাটকীয়তার সূচনা—৩, নাট্য-ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া—৪, নাট্যদ্বন্দ্ব—৭, নাট্যোৎকণ্ঠা, নাট্যমায়া ও প্রচ্ছন্নতা—১২, আকস্মিকতা ও নাট্যশ্লেষ—১৫, দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ—১৭, সঙ্গীতধর্মিতা ও আবেগধর্মিতা—১৯, আশ্চর্যজনকতা, অপ্রত্যাশা, আকস্মিকতা ও চমক—২০, ঘটনার ঘটমানতা—২১ ; সিদ্ধান্ত—২২।

নাটকের সংজ্ঞা—২৩, নাটক, নাট্য ও দৃশ্যকাব্য শব্দ-প্রয়োগের সমীচীনতা—২৪, নাট্যবিচার পদ্ধতি—২৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৩—৯০ পৃষ্ঠা

॥ নাট্য-উপাদান ॥

বৃত্ত—৩৩, বৃত্ত ও ভারতীয় আলংকারিক—৩৪, বৃত্ত-অবস্থা—৩৫, বৃত্তের অর্থপ্রকৃতি—৩৬, বৃত্ত-সন্ধি—৩৭, বৃত্ত ও পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিক—৩৯, আরিস্টটল—৩৯, জন ড্রাইডেন—৪১, এ. সি. ব্র্যাড্‌লি—৪১, জর্জ বার্ণার্ড শ—৪২ ; সিদ্ধান্ত—৪২।

জি. ফ্রেতাগ ও বৃত্ত—৪২, বৃত্ত-অঙ্ক ও দৃশ্য—৪৭, বৃত্ত-রূপ ও বৃত্ত-প্রকৃতি—অ্যারিস্টটল—৫০ ; সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত—৫২।

বৃত্ত ও উপবৃত্ত—ভারতীয় আদর্শ—৫৪, নাটকের ঐক্যনীতি—আরিস্টটল—৫৮, ভারতীয় ঐক্যনীতি—৫৯, আরিস্টটল-পরবর্তী চিন্তা—৬১ ; সিদ্ধান্ত—৬২।

ঘটনা-ঐক্যের বিশেষ আলোচনা—আরিস্টটল—৬৩ ; আমাদের কথা ও সিদ্ধান্ত—৬৪।

চরিত্র—৬৭, চরিত্র ও আরিস্টটল—৬৮, সমালোচনা—৬৯।

চরিত্র ও ভারতীয় আলঙ্কারিক—৭১ ; সিদ্ধান্ত—৭২ ; চরিত্র ও বাঙলা নাটক—৭৪।

সংলাপ : আরিস্টটল—৭৪, নাট্যসংলাপ ও ভারতীয় আলংকারিক—৭৫ ; সমালোচনা—৭৭ ; সিদ্ধান্ত—৭৮ ; সংলাপ ও বাঙলা নাটক—৮০।

সঙ্গীত ও আরিস্টটল—৮২, সঙ্গীত ও আচার্য ভরত—৮৩ ; সিদ্ধান্ত—৮৪।

দৃশ্য ও আরিস্টটল—৮৬, দৃশ্য ও ভারতীয় আলঙ্কারিক—৮৭ ; সিদ্ধান্ত—৮৮।

ভাবনা বা চিন্তা—৮৯।

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায় ৯১—১০৬ পৃষ্ঠা

॥ নাট্যশ্রেণী-বিভাজনের ইতিকথা ও তত্ত্ব ॥

পাশ্চাত্যের নাট্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকদের শ্রেণীবিভাগ—৯১, সংস্কৃত আলংকারিকদের বিভাগ—৯৬, অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক—৯৭, ব্যায়োগ—৯৭, সমবকার—৯৮, বীথী—৯৮, প্রহসন—৯৮, ডিম—৯৯, ঈহামৃগ—১০০, সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের শ্রেণীবিভাগ-তত্ত্ব—১০২, করুণরসাত্মক নাটকের সংখ্যা-বিরলতার কারণ—১০৩, নাট্যশ্রেণীর তালিকা—১০৫।

চতুর্থ অধ্যায় ১০৭—১৬০ পৃষ্ঠা

॥ কমেডি ও তার নানা রূপ ॥

কমেডির উদ্ভব—১০৭, বাঙলা কমেডি—১১৩, কমেডির সংজ্ঞা ও তার লক্ষণ —১১৩, ড্রেম ও বিশুদ্ধ কমেডি—১২০, কমেডি ও সমাজ—১২২, ট্রাজিডি ও কমেডি—১২৩, হাস্য, হাস্যের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ—১২৭, বাক্‌কেলি—১৩১, হিউমার—১৩১, কমেডির শ্রেণীর ভূমিকা—১৩৩, রোমান্টিক কমেডি—১৩৩, ব্যঙ্গাত্মক কমেডি—১৩৫, আচরণমূলক কমেডি—১৩৬, মার্জিত বা শোভন কমেডি —১৩৮, ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি—১৩৮, কমেডির বিবর্তন—১৩৯, কমেডি ও বাঙলা নাটক—১৪২।

ফার্স—১৪৪, বাঙলা ফার্স—১৪৯, ট্রাজি-কমেডি—১৫২, সিদ্ধান্ত—১৫৫।

ভাবপ্রবণতামুখ্য কমেডি বা নাটক—১৫৮।

পঞ্চম অধ্যায় ১৬১—২১৭ পৃষ্ঠা

॥ ট্রাজিডি ও তার নানা রূপ ॥

ট্রাজিডির উদ্ভব-কথা—১৬১, ট্রাজিডির স্বরূপ ও তার বিভিন্ন দিক—১৬২, ট্রাজিডির নায়ক—১৬৯, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নায়ক—১৭৩, নায়কবিহীন ট্রাজিডি—১৭৫; সিদ্ধান্ত—১৮০—৮১।

ক্যাথারসিস—১৮২; সিদ্ধান্ত—১৮৪।

ট্রাজিডির আনন্দ—১৮৫; সিদ্ধান্ত—১৮৯।

ট্রাজিডির সমাপ্তি—১৯০; সিদ্ধান্ত ও সুখ-পরিণাম ট্রাজিডি—১৯১, ট্রাজিডির শ্রেণী—১৯৩, ট্রাজিডির বিবর্তন: গ্রীক ট্রাজিডি—১৯৫, বাঙলা নাটক ও গ্রীক ট্রাজিডি—২০০, এলিজাবেথীয় যুগের ট্রাজিডি—২০১, মার্লো—২০২, শেক্সপীয়র —২০২, বীরত্বমূলক ট্রাজিডি—২০৩, ভয়ঙ্কর ট্রাজিডি—২০৪, পারিবারিক ট্রাজিডি

বিষয় — পৃষ্ঠা

—২০৪, নিওক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজিডি বা নব্য ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজিডি—২০৫, আধুনিক ট্রাজিডি—২০৭, ইবসেন—২০৮, ষ্টিণ্ডবার্গ ও হাউপ্টম্যান—২০৯, চেকভ—২০৯, সার্ত্রে—২১০, ও'নীল—২১১।

বাঙলা ট্রাজিডি—২১২, মেলোড্রামা—২১৩; সিদ্ধান্ত—২১৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৮—৩০২ পৃষ্ঠা

॥ বিভিন্ন নাট্যরূপ ॥

ক্লাসিক্যাল নাটক—২১৮, রোমান্টিক নাটক—২২০, সাংকেতিক নাটক, প্রতীকী নাটক বা সংকেত ব্যঞ্জক রূপক নাটক—২২৩, কাব্যনাট্য—২২৮, বাস্তবধর্মী নাটক ও অতি বাস্তবধর্মী নাটক—২৩৩, অভিব্যক্তিবাদী নাটক—২৩৬, পৌরাণিক নাটক—২৩৮, সামাজিক নাটক—২৪২, ঐতিহাসিক নাটক—২৪৫, একাঙ্ক নাটিকা—২৫০, চরিত নাটক বা জীবনী নাটক—২৫৬, লিট্যারজিকাল নাটক—২৫৮, মরালিটি প্লে—২৬০, ইণ্টারলুড—২৬০, অপেরা—২৬১।

যাত্রা-নাট্য—২৬২, লোকনাট্য—২৬৫।

এক্সট্রাভ্যাগ্যাঞ্জা—২৭০, মাস্ক বা মুখোস নাটক—২৭১, প্যাণ্টোমাইম বা মূকাভিনয় ও ব্যালে—২৭১।

বেরটোল্ট-ব্রেশ্‌ট—২৭২।

অ্যাবসার্ড বা কিমেডি নাটক—২৭৯।

গণনাট্য ও নবনাট্য—২৮৫—২৯৯।

গণনাট্য—২৮৯, নবনাট্য—২৯২।

গণনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায়—২৯৮।

থার্ড থিয়েটার—৩০০।

নির্ঘণ্ট—৩০৩—৩১৬।

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমান দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'নাট্যতত্ত্ব-বিচার' গ্রন্থটি বেশ একটু সময় নিয়ে পড়তে হল। কারণ তাঁর এ রচনা এত তথ্য ও তত্ত্বে ভরা, এবং রচনাভঙ্গী ও চিন্তাধারা এমন বিচিত্র শাখায়িত যে, এর জন্য বহু সময় ব্যয় করা সার্থক। তিনি আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং অধুনা সহকর্মী; তাঁর মানসিক বিকাশের ধারাটি আমি অনেক দিন ধরেই কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি। তিনি ভূরিপরিমাণ রচনা করে ভারবাহিত্বের সুলভ খ্যাতি অর্জন করতে চাননি। স্বতই তাঁর গ্রন্থসংখ্যা করাঙ্গুলি-গণনীয়; বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের দ্বারা সাময়িক পত্রে পত্রমর্মর সৃষ্টিও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। স্বল্প রচনাকর্মের দ্বারাও যে সুগভীর পরিশ্রম ও মননের পরিচয় দেওয়া যায়, তা তাঁর দু-চারটি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে। আজকাল পরীক্ষা-পাসের তাড়নায় এবং গবেষণাকর্মের চাহিদার ফলে বাংলা ভাষায় অনেক সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। তার কোনোটি, অন্তঃসারশূন্য স্ফীতকায় বাহুল্যের ফলে পাঠকের মনে যুগপৎ ভীতি ও সম্ভ্রম জাগাতে চায়, কোনোটি-বা টপ্পা-ঠুংরীর চালে বিতস্তি পরিমাণ আলোচনায় ধামারের বোল তুলতে সচেষ্ট। বলাই বাহুল্য এ-সব গ্রন্থ পাঠে রসিক পাঠকের প্রবল অনীহা। অবশ্য সেজন্য তাঁদের দোষ দেওয়াও যায় না। সাহিত্যের তত্ত্বগত আলোচনায় বাগবাহুল্য ও বাকসংহতির মধ্যে পরিমাণ-সামঞ্জস্য আনতে না পারলে সে রচনায় আশু প্রয়োজন মেটে, কিন্তু বিদগ্ধ পাঠকের তাতে তৃপ্তি পুরো হতে পারে না। ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বক্ষ্যমাণ আলোচনার কি সেই দুর্লভ গুণ আছে যাতে বাংলা নাট্যতত্ত্বালোচনায় নতুন অধ্যায় সংযোজিত হতে পারে? তিনি আমার ছাত্র। সুতরাং আমার পক্ষে তাঁর হয়ে 'ব্রিফ' নেওয়া শোভন হবে না। কিন্তু গ্রন্থটি আমার কেন ভালো লেগেছে, কেন এটি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের দিঙ্‌নির্দেশক গ্রন্থ বলে আমার ধারণা হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা পাঠক-পাঠিকার কাছে নিবেদন করতে চাই।

গ্রন্থটি প্রধানতঃ নাট্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, তার সঙ্গে আছে নাটকের সাহিত্যরস ও আঙ্গিকগত পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ। বস্তুতঃ নাটক হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যের আধুনিক বংশধর। প্রাগৈতিহাসিক, প্রত্নযুগ, প্রাচীন-মধ্যযুগ-আধুনিক কালের বিচিত্র কালক্রমের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাটকের রূপ-কলা ও আঙ্গিকের কত না অদল-বদল হয়েছে। তাই নাটক হচ্ছে একটি এমন মিশ্রকলা যার সঙ্গে 'সামাজিক'গণ, অভিনেতা ও প্রয়োগশিল্পীদের পারস্পরিক সংযোগ থাকা চাই। প্রত্নপৃথিবীর নাটক কেমন ছিল জানা যায় না, কারণ তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে আসেনি। তবে মনে হয়, আদিম যুগের মানুষ নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে যখন নিজেদের জীবনকেই প্রকাশ করত, তখন থেকেই নাটকের স্থূল ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত ফুটে উঠতে থাকে। তারপর

কত যুগ পরে, কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লোকাভিনয় ও রাখালিয়া নাটগীতি আদিকৌমের জনচিত্তের নান্দনিক আত্মপ্রকাশের বাহক হয়ে উঠেছিল, তার কোনো ইতিহাসসম্মত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কি গ্রীক-রোমান-মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয় নাটক, আর কি ভারতের সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটক—এগুলির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশেষ ধর্মীয় প্রেরণায়। ক্রমে এর থেকে ধর্মের অনুশাসন খসে পড়ল, মানুষের ইহচেতনাই নাটককে নব নব রূপের মধ্যে বিকশিত হতে সুযোগ দিল। লেখক নাট্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ বিবর্তন ও নৃতত্ত্বের পটভূমিকায় এই মিশ্র-শিল্পের রূপ ও রীতি বিশ্লেষণ করেছেন। য়ুরোপ-আমেরিকার প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যসাহিত্য, পুরাতন ও নবীনভারতের নাট্যধর্মী রচনা এবং তার তাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে ডঃ মুখোপাধ্যায় নাটকের প্রাণরহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী। এইজন্য তাঁকে এদেশীয় ও বিদেশী নাটক ও নাট্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ পড়তে হয়েছে, তন্ন তন্ন করে তার মূল্য বিচার করতে হয়েছে। য়ুরোপের নানা ভাষায় এবং আমেরিকাতেও ইদানীং নাটকের তত্ত্ব ও আঙ্গিক নিয়ে বহু গবেষণা হচ্ছে। সেই সমস্ত গ্রন্থে যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়, আমাদের দেশে এখনো সে-ধরনের বিশ্বকোষ জাতীয় রচনার বিশেষ অভাব আছে। কিন্তু পশ্চিমী গ্রন্থগুলির একটা মৌলিক ত্রুটি আছে। ও-দেশের পণ্ডিতগণ শ্বেতজাতির নাট্যরচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁরা সংস্কৃতে রচিত বহুবিচিত্র নাটক ও অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নাট্যতত্ত্বের কোনো সংবাদ রাখেন না। ফলে এ-সমস্ত গ্রন্থ একপার্শ্বিকতা দোষদুষ্ট। অ্যারিস্টটল থেকে নিকল পর্যন্ত পথপরিক্রমা করে তাঁরা মনে করেন, নাট্যতত্ত্বালোচনার এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সীমা। কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র এবং প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয় না থাকলে কোনো নাট্যতত্ত্বালোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ইদানীং তাঁরা সমাজতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে নাটকের সংযোগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অশ্বেতকায় মানব-ঐতিহ্যেরও তথ্য সন্ধান করছেন। আফ্রিকা, চীন-জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে নাটকের যে বিচিত্র বিকাশ হয়েছে, যার মূলে কোনোপ্রকার পাশ্চাত্ত্য প্রকরণের প্রভাব ছিল না, তার গঠনপ্রকৃতি ও শিল্পতত্ত্ব না জানলে নাট্যতত্ত্বের পুরো আলোচনা হতে পারে না। এই ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ভাষায় ও নানা অঞ্চলে দৃশ্যকাব্যের যে কতরকমের প্রকরণগত বৈচিত্র্য আছে, প্রয়োগশিল্পগত অভিনবত্ব আছে, পশ্চিমের নাট্যতাত্ত্বিকগণ অনেক সময়ে তার কোনো খোঁজখবর রাখেন না। ফলে তাঁদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা, যৌক্তিকতা ও তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা শুধু য়ুরোপীয় নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রাচ্যদেশের নাট্যসাহিত্যের যে সমস্ত কলাকৃতি নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে তার অনুল্লেখ পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রীদের একচক্ষু হরিণের মতো শুধু একই দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি করে রেখেছে। ট্র্যাজিডি-কমেডি বিচার প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ কেন শুধু একখানি আংশিক ট্রাজিডি ছাড়া (ভাসের 'উরুভঙ্গ') শোকাবহ পরিণতিযুক্ত আর কোনো নাটক রচনা করল না, এবং শোকাবহ নাটক রচনায় আলঙ্কারিকের নিষেধ থাকার ফলে 'উত্তর-রামচরিতে' ছায়াসীতার প্রসঙ্গ এনে

ভবভূতি নাটকের অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণাম লঘু করে ফেলেছেন কিনা—ইত্যাদি সমস্যার আলোচনা না হলে ভারতীয় মানসিকতায় দুঃখবেদনার যথার্থ স্বরূপ বোঝা যাবে না। প্রাচ্যাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রীরা প্রায়শই সংস্কৃত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছেন বলে বিশ্বনাট্যতত্ত্বের একটা দিক প্রায় অন্ধকারেই রয়ে গেছে। বর্তমান লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি ও তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এই আলোচনার দ্বারা বাংলা নাট্যতত্ত্ব অনেকটা সম্পূর্ণতা লাভ করল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের অষ্টম দশক, প্রায় একশ তিরিশ বছর ধরে বাংলা ভাষায় নানা ধরনের নাটক অথবা সংলাপধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছে, অভিনীতও হয়েছে—যার অনেকটাই নাটক নয়। জনচিত্তরঞ্জন ছাড়া অধিকাংশ নাটকের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তবু কোনো কোনো রচনাকারের লেখনী-মূলে সাহিত্যরস সৃষ্টির কিছু শক্তি ছিল বলে নিছক উক্তি-প্রত্যুক্তিও নাট্যরসাশ্রয়ী আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছে। সংস্কৃত নাটক, ইংরেজি নাটক, যাত্রা, রামায়ণী নাটগীতি, ঝুমুর প্রভৃতির সংমিশ্রণে যে বাংলা নাটকের কলেবর গড়ে উঠেছে, তার গুণগত উৎকর্ষ যেমনই হোক না কেন, বাঙালির মানসিক আকাশে যে ভার দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি হতে পেরেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি নাটক লিখেছে, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেছে, দর্শকের বাহবা-করতালি—'এনকোর' কুড়িয়েছে, য়ুরোপীয় নাট্যান্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। একালেও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে সমাজ-রাষ্ট্র-মনস্তত্ত্ব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এমন সমস্ত আধুনিক নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ হচ্ছে, যার মধ্যে অনেক সময়ে নাট্যরস খুঁজে পাওয়া যায় না। একালে গল্প-উপন্যাস থেকে যেমন গল্পত্ব উবে যাচ্ছে, তেমনি নাটক থেকেও নাটকত্ব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সেই সমস্ত বিচিত্র রচনাকর্ম বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় এই লেখক অসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছেন। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে এমন বুদ্ধিদীপ্ত, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও কঠোর পরিশ্রমসাপেক্ষ রচনা ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি। বিশ্বনাট্য মন্থন করে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাট্যতত্ত্বের একটি তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করেছেন, যার জন্য তাঁকে বহু দেশী ও বিদেশী নাটক অধ্যয়ন করতে হয়েছে। নাট্যতত্ত্ববিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ অনুশীলন করে, একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করে, লেখক নাট্যতত্ত্বকে একটি 'অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনে' তুলে ধরেছেন। নাটকের তত্ত্ব, তথ্য, শ্রেণী, উপাদান এই গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। নিজস্ব অভিমত ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁকে বহু নজির, দৃষ্টান্ত ও মতামত উল্লেখ করতে হয়েছে, অনেক চিরাচরিত সংস্কার পরিত্যাগ করতে হয়েছে; নতুন সংস্কারকেও তিনি বিনা প্রমাণে স্বীকার করেননি। ক্লাসিক, রোমান্টিক, আধুনিক, সাম্প্রতিক—যাবতীয় নাট্যান্দোলন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সর্ববিষয়ে তিনি একটি যৌক্তিক পারম্পর্য অনুসরণ করেছেন; নিজস্ব প্রবণতা দিয়ে

বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেননি—সাহিত্যালোচনায় নিঃস্পৃহতা ও ব্যক্তিকতার মধ্যে সেতু রচনা অনেক সময়ে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু এই গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে, লেখক এই দুই সীমান্তের মধ্যে সহজেই সংযোগসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

যাঁরা নাটকের তত্ত্ব ও রস জানতে চান তাঁরা এই গ্রন্থ থেকেই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, কাব্য ও কথাসাহিত্যের তত্ত্ববাদ সম্বন্ধে এমন একটি গ্রন্থের বিশেষ অভাব অনুভূত হচ্ছে। লেখক সেদিকে আকৃষ্ট হলে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের বলাধানই হবে। ইদানীং ভারী ভারী গবেষণা গ্রন্থ এবং হালকাচালের রম্যরচনায় সাহিত্যের প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছে। এই অবস্থায় ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'নাট্যতত্ত্ব-বিচার' গ্রন্থটি যথার্থ সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় রচনার মানদণ্ড হিসেবে চিন্তাশীল পাঠকসমাজে গৃহীত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
১৩৯১ ॥ ১৯৮৪

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

সার্থক নাট্যসৃষ্টির জন্যে নাট্য-শাস্ত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রতিভাবান নাট্যকারের পক্ষে নিশ্চয়ই অপরিহার্য নয়, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদন এবং তার সংশ্লেষণধর্মী বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নাট্যতত্ত্বের সম্যক বোধ বিশেষভাবে প্রয়োজন। নাট্যতত্ত্বের বোধে স্বচ্ছতা না থাকলে নাট্য-সমালোচনায় 'বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টি', 'অপক্ষপাত কৌতূহল' ও 'বস্তুকে যথাস্থিতরূপে' পর্যবেক্ষণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয় না। ফলে নাট্যবিচারে অস্পষ্টতা ও ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই মৌলিক নাট্য-গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি নাট্য-তত্ত্ব-গ্রন্থ রচনার ধারা প্রায় অব্যাহত আছে। আমাদের দেশে আচার্য ভরত ও গ্রীসের মহামনীষী অ্যারিস্টটল এ সম্বন্ধে অতিশয় সুচিন্তিত ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন দেশে এ সম্পর্কে নানা গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাতেও এ শ্রেণীর গ্রন্থ লেখার ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নাট্যতাত্ত্বিকদের বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ ও অতিশয় সূক্ষ্ম চিন্তা আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টির আলোচনার কথা চিন্তা করলে খুব বেশী আশ্বস্ত হতে পারি না। আমাদের মৌলিক বাঙলা নাটকের কিছুমাত্র অভাব নেই। অথচ এ শ্রেণীর গ্রন্থের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক বিভাস রায় চৌধুরী, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ ও ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্যের এ সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ থাকলেও ক্রম-বর্ধমান ও নিত্য নবরূপে জায়মান নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে উদ্ভূত নানা প্রশ্নের সমাধানের কথা মনে রাখলে এ জাতীয় আরো গ্রন্থ-লেখার আবশ্যকতা স্বীকার করতেই হয়। তাছাড়া বিষয়টি জটিল, দুরূহ ও বহুক্ষেত্রে বিতর্কিত বলে এমন বিষয়ের আলোচনা সব সময়েই কাম্য। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 'নাট্যতত্ত্ব' পাঠ্যরূপে বিশেষ-পত্রের অন্তর্গত হয়েছে এবং স্নাতক-শ্রেণীতেও সাম্মানিক বাঙলা-সাহিত্যের পাঠক্রমে 'সাহিত্যতত্ত্ব' পাঠ্যের বিষয়ীভূত। আরো বড় কথা নাট্যরস-রসিক মানুষের মধ্যেও নাট্যালোচনায় ইদানীংকালে বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সমস্ত কারণগুলির নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজনীয়তাকে ত্বরান্বিত করছে।

ঠিক এইরূপ পরিস্থিতিতে কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান লেখকের ওপর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিষয়টি পাঠনের গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেন। নীরস বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকাল নাড়াচাড়া করতে করতে ক্ষীণভাবে এ সম্বন্ধে বাঙলাভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনার সংকল্প জাগ্রত হয়। আর তারই ফল এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ।

গ্রন্থটি রচনায় দেশ-বিদেশের নাট্য-শাস্ত্রিগণের চিন্তার দুর্গম রাজ্যে পর্যটন করতে হয়েছে। পূর্বাচার্যদের অতিশয় সূক্ষ্ম-গভীর দার্শনিক চিন্তাকে যতদূর সাধ্য সহজভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। এর জন্যে বহু বিষয়েরই ঐতিহাসিক আলোচনা করতে হয়েছে। নাট্যতত্ত্বের একই বিষয় সম্বন্ধে নানা মনীষীর পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায় কিনা তা ভেবে দেখেছি।

প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথক আলোচনা করে শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছি। সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিচার করতে হয়েছে। এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে লঘু করা বা তার ওপর কোনো কটাক্ষ করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। বরং ঐ সমস্ত মতবাদ বিষয়টিকে নূতনভাবে ভাববার অবকাশ সৃষ্টি করেছে বলে সেগুলির ওপর শ্রদ্ধান্বিত হয়েই বিচার করেছি। সিদ্ধান্ত ও সমালোচনাকে যুক্তিভিত্তিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সহজভাবে বোঝাতে চেয়েছি। এ উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে, তা সুধীজনেরই বিচার্য।

গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ করে নাটকীয়তা, বৃত্ত ও উপবৃত্তের পরিচয়, ফার্স, কমেডির জগৎ, ট্রাজিডি ও কমেডির পার্থক্য, ট্রাজিডির রস, ট্রাজিডির আনন্দ, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, এপিক থিয়েটার, অ্যাবসার্ড নাটক—ইত্যাদি সম্পর্কে নূতন চিন্তা জাগ্রত করার প্রয়াস আছে। এ গ্রন্থের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো বাঙলা নাটকের সঙ্গে সংযোগ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নাট্যতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় এখানে থাকলেও ঐ সমস্ত তত্ত্ব বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে কতদূর গ্রহণযোগ্য, তা দেখাতে চেয়েছি।

গ্রন্থরচনায় ইংরেজি সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় লেখা বহু গ্রন্থের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। গ্রন্থমধ্যে এবং পাদটীকায় বিশেষভাবে তার উল্লেখ করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বাঙলা পুঁথিঘর, রামপুরহাট কলেজ লাইব্রেরী, হাওড়া-বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার—প্রভৃতি থেকে আমি বহু পুস্তক দেখবার সুযোগ পেয়েছি। যাঁদের চেষ্টায় ও আনুকূল্যে আমি এ সুযোগ পেয়েছি তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

নাট্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত বহু সমস্যা সম্বন্ধে যিনি আমাকে সচেতন করে দিয়েছেন এবং বহুস্থলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি হলেন আমার শিক্ষাগুরু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এ-গ্রন্থের একখানি পরিচায়িকা সানন্দে লিখে দিতে সম্মত হয়েছেন। এটি এ-গ্রন্থের এক মহার্ঘ সম্পদ। এই উপলক্ষে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছি।

রামপুরহাট কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হরিপদ দত্ত এম-এ. এবং কাঁকসা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কৃত-সাহিত্যের শিক্ষক সুশান্ত

পাধ্যায় এম-এ (ট্রিপল) বি, এড্ মহাশয়ের সঙ্গে ভারতীয় আলংকারিকদের নানা াদ নিয়ে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মশায়কে নমস্কার এবং ভাজন চট্টোপাধ্যায় মশায়কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান নাট্যসাহিত্য ও তত্ত্বের ষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যসাহিত্যের ন্যমা অধ্যাপক ডঃ সুরেশ মৈত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের রস-রসিক প্রথিতযশা অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ন উপাচার্য শ্রদ্ধাভাজন আচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধাস্পদ ত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, সহকর্মী অধ্যাপক শংকরী প্রসাদ বসু, বিশ্ববিদ্যালয়ের লা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছেও ম নানাভাবে ঋণী। এঁদের সকলকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। গ্রন্থ-রচনা ও প্রকাশের ারে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, ডঃ পরেশ মজুমদার, ডঃ অরুণ , স্নেহভাজন ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, রামপুরহাট কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ- াশ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্যবিভাগের সচিব ডঃ সুভাষ ্যোপাধ্যায়, স্নেহভাজন ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত ও বন্ধুবর ডঃ বীরেন কুমার চট্টোপাধ্যায়- আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত করেছে। এঁদের সঙ্গে লেখকের যা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই।

অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ শ্রীশিবশঙ্কর াপাধ্যায় ও স্নেহভাজন অনুজ ডঃ কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের প্রেস-কপি রির ব্যাপারে ও ভাষাগত প্রাঞ্জলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীমতী জবা াপাধ্যায়, সায়ন্তনী ও সুশোভন।

ইং ১৯৭৮ সালে এ গ্রন্থ যখন লেখা সমাপ্ত হয়, তখন আদ্যন্ত এর পাণ্ডুলিপি যাঁকে করে শোনানো হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থেকেও ইংরেজি, বাঙলা ংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত যিনি এ গ্রন্থের বহু অংশের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে াকে সচেতন করে দিয়েছিলেন, সেই পিতৃদেব শ্রীধ্বজাধারী মুখোপাধ্যায় আজ আর লোকে নেই। এ-গ্রন্থের প্রকাশে যাঁরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন, সেই পিতৃদেব ও অধ্যাপক শ্রীঅনিলভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াত আত্মার কাছে আশীর্বাদ ছি।

কর্মজীবনের সূচনা থেকে যাঁর অকৃত্রিম স্নেহ-দাক্ষিন্য ও শুভেচ্ছা লাভ করে আসছি ; যাঁর কাছে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার নিরন্তর প্রেরণা পাই, সেই স্নেহময়ী অধ্যাপিকা ীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে বড়ই তৃপ্তিবোধ করছি।

এ গ্রন্থের সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট তৈরী করে দিয়েছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র ান সর্বনাথ ভট্টাচার্য এম:এ, বি, এড। তাঁকে স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

মডার্ন বুক এজেন্সীর শ্রদ্ধেয় শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের এ জাতীয় গ্রন্থ-প্রকাশের যে আগ্রহ লক্ষ্য করেছি, তা আমার কাছে বিস্ময়কর। তাঁর আগ্রহ ও চেষ্টায় এবং শ্রদ্ধেয় প্রুফ্‌রীডারগণের আন্তরিক সহযোগিতায় এ-গ্রন্থ এত দ্রুত প্রকাশিত হতে পারল। সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ-প্রমাদের ত্রুটি যা রয়ে গেল তার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
১৩৯১ ॥ ১৯৮৪

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

নাট্যলক্ষণ, নাট্যসংজ্ঞা ও নাট্যবিচার

সূচনা :

নাটক জীবনের বহুবিচিত্র রূপের এক শক্তিশালী দর্পণ। এমন নিবিড়ভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ আর কোথাও লভ্য নয়। কিন্তু মনে রাখতে হয়, এই নাটক হল মিশ্র চারুকলা (Composite Arts)। নাট্যগ্রন্থ শুধুই পাঠ্য নয়, অভিনেয়ও বটে। এর অভিনয়-সাফল্য নির্ভর করে নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক ও দর্শকের আন্তরিক সহযোগিতার ওপর। এ-সমস্তের সহযোগিতায় উপস্থাপ্য নাট্যশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব তাই প্রশ্নাতীত। আচার্য ভরত বলেছেন, "এমন কোনো জ্ঞান, শিল্প, কলা, যোগ, বিদ্যা ও কর্ম নেই—যা নাটকে মেলে না।"[১]

নাটক সভ্যতার প্রথম প্রভাতে একদা জনচিত্তরঞ্জনের জন্যে উদ্ভূত হয়েছিল—গ্রীসে ও ভারতবর্ষে। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে তার অপ্রতিহত জয়যাত্রা। এখন নাটক শুধুমাত্র অবসর-বিনোদনের সঙ্গীই নয়, মানুষের জীবনের চারদিকে যে অজস্র সমস্যা —সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়—সকল কিছুর প্রকৃত রূপ দেখাতে সে আগ্রহী। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান এবং মানুষের বিবেক ও চৈতন্যকে সদাজাগ্রত করে রাখার গানও নাটক শুনিয়ে চলেছে। নাটকের শেষ লক্ষ্য আনন্দদান একথা ঠিক, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছতে গিয়ে নাটক যা কিছু আশ্রয় করে থাকে, তার মধ্য দিয়ে জনজাগরণ বা গণচেতনার উদ্বোধনও হচ্ছে। একথা সত্য যে, জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য অর্থহীন। জীবন ও তার নানা সমস্যার রূপ নাটকে প্রতিফলিত হয়। চরমতম উৎকণ্ঠা, সংকট ও সংঘাতের মুহূর্তগুলোতে মনুষ্যত্বের যে দীপ্তি, তার অন্তর্নিহিত রূপের যে পরিচয় আমরা নাটকে পাই তা বিস্ময়কর।[২]

নাটক ও উপন্যাস :

কাব্য ও উপন্যাসের মতো নাটকেরও মূল উপজীব্য মানবজীবন। শব্দ ও অর্থের সহযোগে কল্পনায় অনুভূত জীবন-অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ও জনচিত্তে তার সঞ্চারণ কাব্য-

---

১. ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা ॥
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।
সর্বশাস্ত্রাণি শিল্পানি কর্মাণি বিবিধানি চ ॥
আস্মিন্নাট্যে সমেতানি তস্মাদেতন্ময়া কৃতম্। (১ম অধ্যায় : নাট্যশাস্ত্র, ১১৩-১৪)

২. "It (drama) represents humanity in moments of maximum tension, conflict and crisis." Masters of Drama, John Gassner, Preface pp. XVII, (Dover Publication New York).

উপন্যাসের মতো নাটকেরও অন্বিষ্ট। তথাপি জীবনের রূপ বা জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ নাটকে বিশিষ্ট। নানা প্রবৃত্তির সংঘর্ষে, প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়ায়, দৃশ্য বা অদৃশ্য বহু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে, অনির্দেশ্য বা অস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনার সংকেতে, বহু-বিচিত্র সমস্যার আলোচনায় চলমান জীবনের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নাটকে দৃশ্য হয়ে ওঠে, কাব্য বা উপন্যাসে তা কখনোই লভ্য নয়। কাব্য বা উপন্যাসে কবি ও ঔপন্যাসিক স্বয়ং নিজ বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারেন। নাটকে প্রকাশ্যে নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নেই। পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়েই সাধারণত তাঁকে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়। নাট্যক্রিয়া ও উপন্যাস-ক্রিয়া এক নয়। নাট্যক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক। সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে একটি সচেতন ইচ্ছাশক্তি অতি দ্রুতবেগে প্রধাবিত; কিন্তু উপন্যাসের ক্রিয়ায় অনেকখানি শিথিল এলায়িত ভাব। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা নাটকের মতো গতিশীল নয়। আবার ঐ ইচ্ছাশক্তি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সচেতনভাবে যে উপায়গুলোকে আশ্রয় করে নাটকে, উপন্যাসে তা তেমন লক্ষণীয় নয়। উপন্যাসের গঠন তাই শিথিলবদ্ধ, কিন্তু নাটকের গঠন দৃঢ়বদ্ধ। নাটকের বিষয় অভিনেতৃগণের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপ্য। কিন্তু উপন্যাসের বিষয় ঘরে বসেই পাঠ্য, নাটক সমবেত বহুজনের একই সঙ্গে উপভোগ্য, উপন্যাস সাধারণতঃ একক পাঠকেরই আস্বাদ্য। অতীতের ঘটনা বর্তমানে বিবৃত করা ঔপন্যাসিকের কাজ; কিন্তু নাটকে সর্বদা বর্তমানই উপস্থিত। যা ঘটছে তাই দেখি রঙ্গমঞ্চে, আর যা ঘটেছিল তাই শুনি আরেকজনের কাছে উপন্যাসে।[১] সংঘাত, আকস্মিকতা, কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও প্রচ্ছন্নতায় ভরা, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রধাবিত, পরিণামমুখী, গতিবেগমুখর জীবনের যে রূপ নাটকে উপস্থাপিত হয়, তার একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। নাটকের মতো কাব্য-উপন্যাস যে দৃশ্যাত্মক নয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুজগতের রঙ্গমঞ্চ, প্রযোজক, নটনটী বা সমবেত দর্শকদেরও মুখাপেক্ষী নয় কাব্য ও উপন্যাস। নাটক রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য দর্শককে যেভাবে আবিষ্ট করে রাখে, বিভিন্ন দর্শককে যেভাবে একইস্থানে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি সামাজিক মনোভাবের অধীন করে রাখে এবং যেভাবে নাটক নিকট ও দূর দেশের নানা শ্রেণীর মানুষের কাছে তার সর্বজনীন আবেদন উপস্থিত করে, কাব্য ও উপন্যাসে অনুরূপ পন্থার অনুস্থিতি কখনোই সম্ভব নয়। জাতির গভীরতর রস-চৈতন্যের সঙ্গেই নাটকের যোগ। জীবনের লঘু-চপল অগভীর দিকটিই শুধুমাত্র নাটক উপস্থিত করে না, জীবনের গহন-গম্ভীর রূপও অপরূপ ভঙ্গীতে নাটকে ধরা পড়ে। হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আঘাত-সংঘাতময় চঞ্চল জীবনের এমন প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণ রূপ সাহিত্যের আর কোনো শাখাতেই মেলে না।

১. A play is what takes place. A novel is what one person tells us took place. (*Dramatic Theory and Criticism*: Bernard. F. Dukfore সম্পাদিত গ্রন্থের Thornton Wilde— এর *Some Thoughts on Play Writing*, p. 893.

তাই যুগে যুগে নাটকের এমন জনসমাদর।[১]

নাটকের লক্ষণ—নাটকীয়তা :

নাটক যে সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণী থেকে নিজস্ব প্রকৃতিতে ও লক্ষণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিসে তার স্বাতন্ত্র্য, নাটকের ধর্ম বা লক্ষণ বলতে কি বোঝায় এবং তার প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কী—এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এমন সর্বজনপ্রিয় মিশ্র চারুকলাটির সংজ্ঞা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ণয় করতে গেলে এবং তার স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ নিরূপণ করতে গেলে দেখা যাবে কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্যের অনেক নাট্যশাস্ত্রী, দার্শনিক ও নাট্যকার অতি প্রাচীনকাল থেকে নাটকের নানা লক্ষণ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। একই কালের বা বিভিন্ন যুগের পণ্ডিতদের বক্তব্যের মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায় না। এক এক যুগে কোনও বিশেষ মতবাদ যখন প্রবল হয়েছে, তখন তার প্রভাবে ও আলোকে নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণয়ের প্রয়াসপ্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। নাটকের নানা লক্ষণ—তা বাহ্যই হোক আর, আভ্যন্তরীণ হোক, তা সামান্যই হোক, আর বিশেষই হোক—যে সকলের জন্যে নাটক বিশিষ্টতা লাভ করে, কাব্য-উপন্যাস না বলে তাকে নাটক বলেই বুঝি, তাই নাটকের নাটকত্ব। নাটকীয় শব্দের নানা অর্থের মধ্যে নাট্যলক্ষণ সংক্রান্ত এই অর্থে ঐ নাটকত্বকে নাটকীয়তাও বলতে পারি। ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই নাটককে নাটকীয় করে। এই নাটকীয়তার কথা বা নাটকের নানা লক্ষণের কথা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

লক্ষণ শব্দের অর্থ হল চিহ্ন বা পরিচয়। যে যে চিহ্নে বা বৈশিষ্ট্যে নাটক নাটকত্ব লাভ করে তাই তার লক্ষণ। নাটকের এমন কিছু কিছু লক্ষণ আছে যেগুলি উপন্যাস বা কাহিনীকাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। এগুলিকে সাধারণ লক্ষণ বলা যেতে পারে। আর এমন এক বা একাধিক লক্ষণ থাকতে পারে, যা তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করে, সেটি বা সেগুলি হল বিশেষ লক্ষণ। সুপ্রাচীনকালে গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল ও ভারতীয় আলংকারিক আচার্য ভরত নাটকের লক্ষণ নির্ণয়ে যে চেষ্টা করেছিলেন, তা খুবই প্রশংসনীয় এবং আজিও তা অত্যন্ত মূল্যবান। অ্যারিস্টটল 'নাট্যক্রিয়া' (action) এবং তদনুষঙ্গী দৃশ্যধর্মিতাকে নাটকের মূল লক্ষণ বলে ধরেছিলেন। ভরত দৃশ্যত্ব, কাব্যত্ব এবং তদনুষঙ্গী শ্রব্যত্ব, কৌতূহলসৃষ্টি, বৈচিত্র্যসৃষ্টি ও জনসংযোগ-সামর্থ্যকে নাট্যের লক্ষণরূপে নির্দেশ করেছিলেন। এঁদের পরবর্তী কালে পাশ্চাত্যে দ্বন্দ্ব, সংকট,

---

১. The reason that dramatic poetry must be regarded as the highest phase of the art of poetry, and indeed, of every kind of art, is due to the fact that it is elaborated, both in form and substance, in a whole that is the most complete. —*Dramatic Poetry*. G. W. F. Hegel, p, 533, *Dramatic Theory and Criticism*. Bernard. F. Dukore, —Halt, Rinehart and Winston, Imp. 1974.

উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা, বিস্ময়, চমক, সঙ্গীতধর্মিতা, বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যকে নাটকের লক্ষণ বলার চেষ্টা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে, নাটক যখন এক বিশেষ ধরণের শিল্প, তখন তার গঠনপদ্ধতি ও মানবজীবনকে রূপ দেবার পন্থাও ভিন্ন। বিশেষ একটি আধারের আশ্রয়ে যখন নাট্যরসকে সহৃদয়-চিত্তে অভিব্যক্ত করতে হয়, তখন বিভাবাদি বা উপাদান-যোজনার কৌশলও সেখানে স্বতন্ত্র। নানাভাবে ঐ বিশেষ রসরূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় নাট্যকারকে। আর তখনই সার্থক রূপায়ণে নানা লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা দেয়। নাট্যরস-সৃষ্টির পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। নাটককে নাটক বলে চেনবার এগুলি উপায়। এখন এই লক্ষণগুলির আলোচনা।

নাট্যক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঃ

অ্যারিস্টটল যাকে action বলেছেন, আমরা তাকেই 'নাট্যক্রিয়া বলছি। কেউ কেউ[১] একে 'গতিবেগ' বলেছেন। নাটকের action বা ক্রিয়া সর্বদাই গতিশীল। ঘটনা ও চরিত্রের গতিশীলতার মধ্য দিয়েই নাট্যক্রিয়া ক্রমশ পরিণামমুখী হয়। আচার্য ভরত নাট্যকার্যকে যে কয়টি অবস্থা ও সন্ধিতে বিভক্ত করেছেন, সেখানেও কার্যের সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত গতিবেগ অস্বীকৃত হয়নি। নাট্যক্রিয়া বা নাট্যকার্য গতির মধ্য দিয়েই চলতে থাকে। এই 'নাট্যক্রিয়া'কে অ্যারিস্টটল নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে মনে করেছিলেন। তিনি সমস্ত রকম শিল্পকলাকেই অনুকরণ বলেছেন। এদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দেয়, তা শুধু মাধ্যম, বিষয় ও রীতির জন্যেই। ভাষার মাধ্যমে গদ্যে বা পদ্যে যিনি অনুকরণ করেন, তাকেই তিনি বলেছেন কবি। তাঁর মতে রীতির পার্থক্যের জন্যে কাব্যও দুরকম—বর্ণনাত্মক ও নাটকীয়। বর্ণনাত্মক রীতিতেও কবি মানবজীবনের ঘটনার অনুকরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজে বিষয়টি বলে যেতে পারেন অথবা অন্য কোনো চরিত্রের মুখেও বর্ণনাটি দিতে পারেন। আবার নাটকীয়-ভাবেও তিনি ঘটনার অনুকরণ করতে পারেন। অনুবাদক ইন্‌গ্রাম বাইওয়াটার যাকে নাটকীয়ভাবে (dramatically) উপস্থাপন বলেছেন, অনুবাদক বুচার তাকেই বলেছেন 'He may present all his characters as living and moving before us.'[২] অর্থাৎ নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন হল এমনই, যে তাতে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও চোখের সামনে চলাফেরা করছে বলে মনে হয়। মোট কথা চরিত্রগুলির ক্রিয়াশীলতা এবং তাদের একটা দৃশ্যরূপই হল নাটকের প্রধান লক্ষণ। *Poetics* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও

---

১. 'বাংলা নাটকের কথা'য় ডঃ অজিত কুমার ঘোষ (পৃঃ ৫) ও 'বাংলা নাটা-সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে অধ্যাপক বিভাস রায় চৌধুরী 'গতিবেগ' শব্দটি action-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৪৫, ২য় সং ১৩৫০)।

২. অ্যারিস্টটলের সমস্ত বক্তব্য Poetics-এর I-II অধ্যায় থেকে গৃহীত।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ট্র্যাজিডি হল 'imitation of an action' এবং তা 'in the form of action, not of narrative'. ট্র্যাজিডি ঘটনার অনুকরণ, কিন্তু তা বর্ণনাত্মক রীতিতে নয়, ক্রিয়াত্মক রীতিতে বা রূপে। নাটকের ঘটনা ও ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কি, তা না বুঝলে বিষয়টি অনুধাবন করা কঠিন। যে-কোনো নাটকের মধ্যেই একটি ক্রিয়া চলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। নাটকের চরিত্রাশ্রয়ী ঘটনাবলীই হল ঐ ক্রিয়া। নাটকের চরিত্রগুলির চিন্তা-ভাবনা থেকেই ঘটনার সৃষ্টি এবং ঘটনাবলীই ঐ ক্রিয়াকে ব্যক্ত করে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংলাপের মধ্য দিয়েই নাট্যঘটনা অগ্রসর হয়—নাট্যক্রিয়া চলতে থাকে। এই গতিশীল নাট্যক্রিয়াতেই নাট্যের পাত্রপাত্রী জীবন্ত ও চোখের সামনে দৃশ্য হয়ে ওঠে।

অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যকে পরবর্তী কালে নাট্যতাত্ত্বিক এ. ডবলিউ. শ্লেগেল, জর্জ এফ. ডবলিউ. হেগেল, হেনরি আর্থার জোন্‌স্ প্রভৃতি আরও বিশদ করে নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্লেগেল বলেছেন, "What is action ?···In the higher, proper signification, action is an activity dependent on the will of man."[১] অর্থাৎ ক্রিয়া কি ? উচ্চতর বা যথার্থ অর্থে ক্রিয়া হল এমনই এক কর্ম যা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি আরও বলেছেন, ক্রিয়ার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ-আস্বাদন—ক্রিয়াই জীবন। মানবিক ক্রিয়ার উচ্চতম লক্ষ্য হল মানুষ এবং নাটকের মধ্যে আমরা দেখি বুদ্ধিমান, নীতি-সচেতন মানুষ হিসেবে মানুষেরা একে অপরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করে চলেছে, এরা বন্ধু বা শত্রুভাবে তাদের মতাদর্শের দ্বারা, অনুভূতি ও ভাবাবেগের দ্বারা পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার করছে এবং নিশ্চিতভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থাকে স্থির করছে।[২] শ্লেগেলের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় নাটকের মধ্যে থাকে পারস্পরিক 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া', আর তাই হল নাটকের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। জর্জ উইলহেলম্ ফ্রেডারিক হেগেল দ্বন্দ্বকে নাটকের প্রাণ বললেও তিনি নাট্যক্রিয়া সম্পর্কে যা বলেছেন তাতেও বোঝা যায় যে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লক্ষণটি ঐ দ্বন্দ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। তিনি বলেছেন, কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে নাট্যক্রিয়া সরল ও বাধাহীন পথে চলে না। নাট্যক্রিয়া আন্তর সংঘর্ষ, মানবিক ভাবাবেগ ও চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল এবং "leads therefore, to actions

১. Lectures on Dramatic Art and Literature A. W. Schlegel. *Dramatic Theory and Criticism*, Edtd. by B. F. Dukore, p, 496

২. Action is the true enjoyment of life, nay life itself..... The highest object of human activity is man, and in the drama we see men, measuring their powers with each other, as intellectual and moral beings, either as friends or foes, influencing each other by their opinions, sentiments, and passions and decisively determining their reciprocal relations and circumstances. Chap. II, *Lectures on Dramatic Art and Literature* : by A. W. Schelegel

and reactions ; which in their turn call for some further resolution of conflict and disruption."[১] অর্থাৎ নাটকে 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' থাকবেই এবং তার মধ্য থেকে নূতন করে সংঘাত ও তার পরিণাম লক্ষণীয় হবে। হেনরি আর্থার জোন্‌সও বলেছেন, বিরুদ্ধ বাধা সম্পর্কে নাটকে আমরা যতক্ষণ সচেতন থাকব এবং চরিত্রগুলোর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রতিক্রিয়া দেখব—ততক্ষণই তা নাটক।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, 'নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'কে নাটকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য বলে অনেকেই স্বীকার করেছেন। অ্যারিস্টটল নাট্যবৃত্তে যে আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিশিষ্ট ঘটনা-সন্নিবেশের কথা বলেছেন এবং আচার্য ভরত নাট্যকর্মের যে 'পঞ্চ অবস্থা' ও 'পঞ্চ সন্ধি'র কথা বলেছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এঁরা কেউই একই ধরণের গতিশীল ও বৈচিত্র্যহীন নাট্যক্রিয়ার কথা বলেননি। অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে নাট্য কার্যের অগ্রগমনে নাট্যক্রিয়ার বৈচিত্র্য দেখা দেবেই। আর এইখানেই এর সার্থকতা।

আঙ্গিক ও বাচনিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণ প্রথমত এই নাট্য-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করেন। রঙ্গমঞ্চে যখন দুজনের মধ্যে কথোপকথন চলছে, তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একজনের আগমন ঘটলে কিংবা আকস্মিকভাবে একজনের নিষ্ক্রমণের দ্বারাও নাট্যক্রিয়াকে বেগবতী করে তোলা যায়। রঙ্গমঞ্চে কোনো অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত গমন, কণ্ঠস্বরের ক্রমোচ্চতা বা ক্রম-নিম্নমুখিতার সাহায্যেও নাট্যক্রিয়ায় বেগ আনা যায়। অভিনেয় নাটকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অভিনেতৃগণ তাঁদের পারস্পরিক আচরণ ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে দর্শকমনে তুলে ধরেন।

নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে নাট্যগতি অবিচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। তাই জন হাওয়ার্ড লসন নাটকের actionকে বলেছেন 'নাটকীয় গতি' (Dramatic movement)[২] প্রত্যেক নাটকেই এই নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তার সঙ্গে গতি থাকবেই—কোথাও এই গতি তীব্র ও স্পষ্ট, কোথাও তা মন্দীভূত ও প্রচ্ছন্ন। নাটকের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অব্যাহত গতিবেগ অনুভূত হবেই। মাঝে মাঝে দৃশ্য-পরিবর্তন বা অঙ্ক-বিরতির মধ্য দিয়ে তাতে ছেদ পড়লেও দর্শকমনে তার গতি চলতেই থাকে। ঐ ছেদ বা বিরতি নাট্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অগ্রগতিকে অনুসরণ করতে দর্শকদের সাহায্য করে। সকল নাটকের এটি তাই এক অপরিহার্য লক্ষণ। সাংকেতিক নাটকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বেগ নেই, এমন মনে করা ঠিক নয়। এ ধরণের নাটকের উপস্থাপনা-পদ্ধতিই সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ধীরে লয়ে চললেও ঘটনার চূড়ান্ত

---

১. *Dramatic Poetry* (1828-29). G. W. F. Hegel. P. 533. *Dramatic Theory and Criticism* Edited by B. F. Dukore.

২. Let us begin by distinguishing action (dramatic movement) from activity (by which we mean movement in general). *Theory and Technique of Play-Writing*, 1936 by John Howard Lawson. p. 882. *Ibid.*

পর্যায়ে তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে বাইরের দ্বারে আঘাত করে রাজদূতের প্রবেশের পর নাট্য-ক্রিয়ার বেগ কি রকম প্রবল হয়েছে, তা আমরা জানি। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা প্রভৃতি নাটকেও ঘটনার চূড়ান্ত পর্বে নাট্যক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বেগ আরও স্পষ্ট।

নাট্যদ্বন্দ্ব ঃ

নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যসংঘাত নাটকের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন আলংকারিক অ্যারিস্টটল বা ভরত এই দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেননি। উনিশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল এই দ্বন্দ্ববাদের স্রষ্টা। তাঁর পরে অনেক নাট্যতাত্ত্বিক যেমন আগস্ট উইলিয়াম শ্লেগেল (August William Schlegel), ফার্দিনান্দ ব্রুনেতিয়ের (Ferdinand Brunetiere), বিশ শতকের ইংরেজ নাট্যসমালোচক হেনরি আর্থার জোনস্ (Henry Arthur Jones), অধ্যাপক নিকল প্রভৃতি হেগেলের ঐ দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। নাটকের দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের গুরুত্বের দিকে এঁরা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। নাট্যক্রিয়া সংঘাতের মধ্য দিয়েই চরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অধিকাংশ নাটক তা সে ট্র্যাজিডিই হোক, আর কমেডিই হোক, এই দ্বন্দ্ব লক্ষণযুক্ত নয়। অবশ্য এমন নাটকও আছে যেখানে দ্বন্দ্ব খুব স্পষ্টগ্রাহ্য নয়। কিন্তু এ ধরণের নাটক যে বিরল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জার্মান দার্শনিক হেগেলের *Aesthetics* (1832) গ্রন্থেই নাটকের লক্ষণনির্ণয় ব্যাপারে এই দ্বন্দ্বের কথা প্রথম শোনা গেল। তাঁর মতে নাট্যক্রিয়া সরল ও নিশ্চিন্তভাবে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনের ব্যাপার নয়। আগাগোড়া মানবিক ভাবাবেগ ও চরিত্রের সংঘাতের ওপর তা নির্ভরশীল।[১] তাঁর মতে গতিশীল সমস্ত বস্তু ও গতিমান জীবন দ্বন্দ্বগর্ভ। চলমান জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব নিহিত থাকে, তা সব সময় বোঝা যায় না বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলবে না। এই দ্বন্দ্বেরই বাহ্যরূপ হল নাট্যক্রিয়া। অ্যারিস্টটল যে নাট্যক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, হেগেল তারই আন্তররূপের সন্ধান দিলেন নাট্যদ্বন্দ্বের কথা বলে।

শ্লেগেল তাঁর 'Lectures on Dramatic Art and Literature' গ্রন্থে যখন বলেন নাটক পারস্পরিক শক্তি যাচাই করার একটি উপযুক্ত স্থান ('Man measuring their power with each other as intellectual and moral beings') কিংবা নাটকে বন্ধু বা শত্রু হিসেবে একে অপরের ওপর মতবাদ ভাবাবেগ ও অনুভূতিগত প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই নাটকের মূল উপজীব্য,

---

১. "Dramatic action however is not confined to the simple and undisturbed execution of a definite purpose, but depends throughout on conditions of collisions, human passions and characters and leads therefore to actions and reactions," *Dramatic Poetry* (1818-29) by G. W. F. Hegel. P. 533. B. F. Dukore সম্পাদিত *Dramatic Theory and Criticism* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তখন হেগেলের চিন্তার দ্বারা তিনিও যে প্রভাবিত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। জার্মান নাট্যকার ও অধ্যাপক সমালোচক গুস্তাভ ফ্রেতাগ (Gustav Freytag) যখন বলেন, মানুষের আন্তরসত্তা বাইরের পরিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বা বাইরের চাপে মানুষ পীড়িত হয়, সেইজন্য নাটকের নায়ককে প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণের চাপ, উত্তেজনা ও পরিবর্তনের অধীন হয়ে থাকতে হয়—তাকে অন্য চরিত্রগুলির সঙ্গে নানা ধরণের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়—তখনও তিনি হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সুরেই কথা বলেন।[১] ফরাসী নাট্যতাত্ত্বিক ব্রুনেতিয়ের হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের একজন প্রধান সমর্থক। তিনিও যখন বলেন নাটক কিংবা ফার্সের অভিনয়কালে নায়কের ইচ্ছাশক্তি একটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সচেতনভাবে যে চেষ্টা করছে, তারই দৃশ্যরূপকেই দেখে থাকি,[২] তখনও হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সংস্কার তাঁর মনে থাকে। হেনরি আর্থার জোন্সের বক্তব্যও নাটকের দ্বন্দ্ব-লক্ষণ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তিনি বলেছেন, তখনই তাকে আমরা নাটক বলব, যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নাটকের কোনও বিরুদ্ধ ব্যক্তি, পরিবেশ বা ভাগ্যের বাধার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বাধা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে, এবং যতক্ষণ তাদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে, ততক্ষণই তা নাটক।[৩] দেখা যাচ্ছে, জোন্সের কথায় অ্যারিস্টটলের action-লক্ষণও কতকটা উঁকি দিচ্ছে।

অধ্যাপক নিকল Dramatic বা নাটকীয় শব্দের অর্থ নিয়ে অনেক চিন্তার শেষে নিজস্ব একটি স্বাধীন মত দিলেও নাটকের দ্বন্দ্বকে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তিনি জোরালো ভাষায় জানিয়েছেন, "All drama arises out of conflict. In tragedy there is ever a clash between forces physical or mental or both; in comedy there is ever a conflict, between personalities, between the sexes or between an individual and society"

---

১. *Technique of the Drama* গ্রন্থে ফ্রেতাগ আরও বলেছেন, "What the drama presents is always a struggle, which with strong perturbation of soul the hero wages against opposing forces. Ibid p. 809 Chap, II,

২. "In drama or farce, what we ask of the theatre, is the spectacle of a will striving towards a goal, and conscious of the means which it employs." কিংবা "The general law of the theatre is defined by the action of a will conscious of itself, and the dramatic species are distinguished by the nature of the obstacles encountered by this will." —*The Law of the Drama*, 1894. Page 725 and 725. B. F. Dukore সম্পাদিত *Dramatic Theory and Criticism* গ্রন্থের প্রবন্ধ।

৩. "Drama arises thus and continues when or till the persons are aware of the obstacle" কিংবা "Drama arises when any person or persons in a play are consciously or unconciously up against some antagonistic person or circumstances or fortune." —*Introduction to Brunetiere's Law of Drama* —by Henry Arthur Jones.

অর্থাৎ দ্বন্দ্ব থেকেই সমস্ত নাটকের উৎপত্তি ; শারীরিক অথবা মানসিক শক্তির সঙ্গে অথবা দুয়েরই সঙ্গে ট্র্যাজিডিতে সংঘাত ঘনিয়ে ওঠে ; আর কমেডিতে ব্যক্তিত্বের মধ্যে, নর-নারীর মধ্যে অথবা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব নিরন্তর লক্ষ্য করা যায়। ট্র্যাজিডির যে ভাব, তাও যেমন, কমেডির যে ভাব তাও তেমনি ঐ দ্বন্দ্ব থেকেই উদ্ভূত হয়।

এই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের নানা রূপ—বিভিন্ন নাটকে তার বিচিত্র প্রকাশ, এমনকি কোনও একটি বিশেষ নাটকেও তার নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অতি নিষ্ঠুর অদৃশ্য দৈবশক্তির সঙ্গে মানুষের সংঘাত দেখা দিতে পারে। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলিতে ও আমাদের বাঙলা পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্বের এই রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। ইডিপাস, অরিস্টিস, কর্ণ, জনা প্রভৃতি নাটকে দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের শক্তি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বই নাটকগুলিতে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এতো গেল দ্বন্দ্বের এক রূপ। দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় রূপও আছে, যেখানে মানুষ কোনও অদৃষ্ট দৈবশক্তির সঙ্গে নয়, প্রত্যক্ষ জগতের অপর কোনও মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছে। নাটকে সাধারণত নায়ক ও প্রতিনায়ককে ঘিরে এই দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে ক্রমপরিণতি লাভ করে। সব যুগের নাটকেই এই দ্বন্দ্বের পরিচয় মিলবে। অ্যাগামেমননের সঙ্গে ক্লাইটোমেনেস্ট্রার সংঘাত, ইউলিসিসের সঙ্গে অ্যাণ্ড্রোমেকির সংঘাত, সীজারের সঙ্গে ব্রুটাসের দ্বন্দ্ব, ওথেলোর সঙ্গে ইয়াগোর, প্রফুল্ল নাটকে যোগেশের সঙ্গে রমেশের, বিসর্জন নাটকে রঘুপতির সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের, রাজা ও রানীতে বিক্রমের সঙ্গে সুমিত্রার, সাজাহানে সাজাহানের সঙ্গে আরঙ্গজীবের দ্বন্দ্ব এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। দুইপক্ষ প্রায় সমান শক্তিশালী হলে, এই দ্বন্দ্বের রূপ নাটকে ভালভাবে ফুটে ওঠে। এ দ্বন্দ্ব তো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বাইরের দ্বন্দ্ব। কিন্তু দ্বন্দ্ব ব্যক্তির নিজের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে ; আর তখনই দ্বন্দ্বের তৃতীয় আর একটি রূপ। একই মানুষের অন্তরে এক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর এক প্রবৃত্তির সংঘাত, স্বতোৎসারিত কামনার সঙ্গে কর্তব্যবুদ্ধির, সীমাহীন উচ্চাশার সঙ্গে সীমিত শক্তির, বল্গাবিহীন লোভের সঙ্গে সংযমবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতেই নাট্যকারের দুরূহ অগ্নিপরীক্ষা। বহির্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা এলিজাবেথীয় যুগের নাটকেই প্রথম লক্ষ্য করা গেছে। এ দ্বন্দ্ব আর শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির নয়, এক মনের সঙ্গে অন্য মনের নয়, কিন্তু এ হল একই চিত্তে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতির, চিন্তার সঙ্গে চিন্তার সংঘাত। বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব মিলে মিশে গিয়ে এলিজাবেথীয় নাটকগুলির ট্র্যাজিক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। শেক্সপীয়রের বিখ্যাত রোমান্টিক ট্র্যাজিডিগুলিতে এই দ্বন্দ্ব নাটকগুলির পরমোৎকর্ষ সাধন করেছে। ওথেলো নাটকে বাইরের দিক থেকে ওথেলোর সঙ্গে ইয়াগোর সংঘাত অবশ্যই লক্ষণীয়, কিন্তু তারই সঙ্গে ওথেলোর মনের গভীরের দ্বন্দ্ব, তাকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। এইরূপ হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটের সঙ্গে প্রেতাত্মা এবং ক্লডিয়াসের বাইরের দ্বন্দ্ব তো আছে, কিন্তু তারই সঙ্গে তার নিজের মনের দ্বন্দ্বই বেশী উপভোগ্য। ম্যাকবেথ সম্পর্কেও এই একই কথা। শেক্সপীয়রের এই রীতির অনুসরণ-প্রচেষ্টা আমাদের বাঙলা নাটকেও

লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' নাটকে, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকে, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বহির্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি নায়কের মানসিক দ্বন্দ্বও আছে। শেক্সপীয়রের নৈপুণ্য ও গভীরতা না থাকলেও তাঁদের ঐ রীতির অনুবর্তনটুকু লক্ষ্য করার মতো। একেবারে অধুনিক কালের নাটকগুলিতেও, যেমন মেটারলিঙ্ক ও তাঁর গোষ্ঠী-নাট্যকারদের নাটকে বাইরের ও ভিতরের দ্বন্দ্ব দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এগুলিতে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব নয়, বা দুই চিন্তার ও ভাবের দ্বন্দ্ব নয়—কিন্তু চেতন ও অবচেতন মনের, মানবিক সীমিত বন্ধন ও আত্মিক বন্ধনের সংঘাত লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকেও বাইরের ও ভিতরের দ্বন্দ্ব আছে, তবে তার রূপ সূক্ষ্ম।

সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত অধুনিক কালের সমস্যামূলক নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে। যুগধর্মে মানুষের স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে। সমাজপ্রচলিত নীতি ও আদর্শকে মানুষ সব সময়ে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারে না। সব বিষয় নিয়েই সে ভাবে, প্রশ্ন করে, তার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাই সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্ব এখন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া নানা রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারাও মানুষের চিন্তাভাবনা প্রভাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন মতবাদ মানুষের মনে পরস্পরবিরোধী নানা আদর্শলোক রচনা করছে। মালিক-শ্রমিক, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, যন্ত্রশক্তি ও মানুষ—এদের নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে সমস্যামূলক নাটক লেখা হচ্ছে।

কিন্তু শুধু ট্র্যাজিডিতেই নয়, কমেডিতেও বাইরের ও ভিতরের দ্বন্দ্ব নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্ন বৈপরীত্য বা সংঘাতের ওপরই কমেডি দাঁড়িয়ে থাকে। স্বাভাবিক সুস্থ সমাজের পটভূমিকায় কমেডির ভণ্ড, বাতিকগ্রস্ত, অস্বাভাবিক চরিত্রগুলিকে এনে দুয়েরই সংঘাতে হাস্যরস-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। কমেডিতে উৎকেন্দ্রিক দুই-চরিত্রের সংঘাত থাকে প্রত্যক্ষভাবেই, কিন্তু গৌণভাবে সমাজশক্তির সঙ্গেও তাদের বিরোধ। আবার নর ও নারীর মেজাজ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকেও কমেডিতে হাস্যরস উৎসারিত হতে পারে। নারীর বুদ্ধির কাছে পুরুষের মধুর পরাজয়, মুখরা ও অবাধ্য মেয়ের স্বামীর কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ, পুরুষ-ধরা আদিম নারীর স্বভাবের পরিবর্তন ও মার্জিত রুচি-ভাবাপন্ন হওয়া—এ সকলের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঐ দ্বন্দ্ব না এসেই পারে না। কিন্তু এখানে দ্বন্দ্ব ভিতরের নয়, বাইরের। কিন্তু কমেডিতে যেখানে জটিলতা দেখা দেয় ও তাতে কারুণ্য বা ট্র্যাজিক সুরের স্পর্শ লাগে, সেখানে ভিতরের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠতে পারে। শেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র শাইলক যখন বলে ওঠে,- আমার কন্যা ও আমার স্বর্ণমুদ্রা, ও আমার কন্যা',[১] তখন দুই বস্তুর অসঙ্গতিতেও যেমন, তেমনি তার অন্তরের সংঘাতের জন্যও হাসি। শেক্সপীয়রের 'ফুল' চরিত্রের মধ্যেও এই ভিতরের সংঘাত উপেক্ষণীয় নয়। মধুসূদনের 'বুড় শালিখের

১. "My daughter ! O my ducats ! O my daughter." (*Merchant of Venice*).

ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদ, দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীবলোচন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু, রবীন্দ্রনাথের কেদার চরিত্র শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়েছে। এদের সঙ্গে কমেডির অন্য চরিত্র বা চরিত্রগুলির যে দ্বন্দ্ব হয়েছে, তা বাইরের। ট্র্যাজিডি ও কমেডি দুয়েতেই দ্বন্দ্ব থাকলেও কমেডির দ্বন্দ্ব অগভীর—ট্র্যাজিডির দ্বন্দ্বের গভীরতা তার নেই। হেগেল-কথিত নাটকের সর্বপ্রধান লক্ষণ নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে নাটকের যাঁরা অপরিহার্য লক্ষণ বলেন, তাঁদের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব না থাকলেও যে নাটক হতে পারে, এ মতের পক্ষেও কেউ কেউ ওকালতি করেছেন। বিশ শতকের ইংরেজ নাট্যসমালোচক উইলিয়াম আর্চার দ্বন্দ্বকে সব নাটকের প্রাণ বলতে দ্বিধাবোধ করেছেন। অ্যাগামেমনন, ওথেলো, ইডিপাস, ঘোস্ট প্রভৃতি নাটক যে দ্বন্দ্বহীন তা তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ট্রয়যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে অ্যাগামেমনন মহানন্দে রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্যে প্রাসাদে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পরেই নিহত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পত্নী ক্লাইটোমেনেস্ট্রা ও ভ্রাতা এগুইস্থাস যে চক্রান্ত করেছেন, তা তো তিনি জানেন না। সুতরাং অ্যাগামেমনন নাটকে দ্বন্দ্ব কোথায়? আবার ওথেলো বা ঘোস্ট নাটকেও নায়ক সচেতনভাবে বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে এ জিনিস দেখানো যায় না। চেকভের অনেক নাটকই দ্বন্দ্ববিহীন। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল যে দ্বন্দ্ব নাটককে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে খুবই সাহায্য করে। দ্বন্দ্বহীন নাটকও হতে পারে, কিন্তু সেখানে নাট্যকারকে অন্য নানা কৌশলে ঘটনা ও চরিত্রকে আকর্ষণীয় ও নাটকীয় করে তুলতে হবে। এ রকম নাটকের সংখ্যা খুবই কম। নাটকের এই দ্বন্দ্ব-লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ নাট্যকার মরিস মেতারলিঙ্ক (জন্ম বেলজিয়ামের ঘেণ্টে, কিন্তু পরে ফ্রান্সবাসী) বলেছেন যে, নাটকের প্রাণ স্থিতিশীলতা ও নায়কের শান্ত-স্থৈর্য আচরণের মধ্যেই তা প্রকাশমান—গতিশীলতা বা দ্বন্দ্বময়তাই সেখানে বড় কথা নয়। তিনি আরও বলেন যে, ভাল নাটক কখনও জীবনের স্থূল কামনা-বাসনাকে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে না—ভাল নাটকে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা থাকে—আত্মা যে তার সীমিত অপূর্ণতাকে কাটিয়ে বাধার বেড়া ডিঙিয়ে চলবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে, সেই সূক্ষ্ম দিকটি এখানে রূপায়িত হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, তাঁর নাটকে বা রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে অপূর্ণতা থেকে আত্মার পূর্ণতার পথে যাত্রার সময় যে সব বাধা অতিক্রমের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তারই মধ্যে দ্বন্দ্বের অতি সূক্ষ্মরূপ বর্তমান। সাধারণ দ্বন্দ্বাত্মক নাটকের দ্বন্দ্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বের এই অতি সূক্ষ্মরূপের অবশ্যই পার্থক্য আছে। তথাপি স্থিতিশীল নাটকের (Static Drama) কথা মেটারলিঙ্ক বললেও তাতে দ্বন্দ্বের অতি সূক্ষ্মরূপ অনুপস্থিত নয়। দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের প্রশ্নটিকে নাট্যলক্ষণের আলোচনায় অতি সহজে নস্যাৎ করা যায় না। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ যিনি 'Discussion'কে 'Test of the

playwright',[১] বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তিনিও *The Problem Play* (1895) প্রবন্ধে বলেছেন, "The material of the dramatist is always some conflict of human feeling with circumstances."

নাট্যোৎকণ্ঠা—নাট্যমায়া ও প্রচ্ছন্নতা ঃ

নাট্যমায়া সৃষ্টি করে নাট্যোৎকণ্ঠার (Suspense) মধ্য দিয়ে দর্শকদের কৌতূহল ধরে রাখা নাট্যকারের একটি প্রধান কাজ। উৎকণ্ঠাময় না হলে নাট্যঘটনা দেখে নাট্যরস উপলব্ধি করা শক্ত হয়। এইজন্য কেউ কেউ উৎকণ্ঠাকেও নাটকের একটি লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। অ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উনিশ শতকের ফরাসী অধ্যাপক-সমালোচক ফ্রান্সিস সার্সি (Francis Sarcey) নাট্যমায়া-র (Illusion of Reality) ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি বলেন, রঙ্গমঞ্চে জীবনকে উপস্থাপিত করে বারশত দর্শককে সত্যের এক 'মায়াঘোর-রাজ্যে' নিয়ে যাওয়া হয়।[২]

সত্যের বা বাস্তবের মায়ারাজ্য সৃষ্টির বিষয়টিকে সার্সি নাটকের অন্যতম লক্ষণ বলে ভেবেছিলেন। ইংরেজ কবি কোল্‌রীজ কবি-বিশ্বাসের প্রসঙ্গে যে, "Willing suspension of disbelief for the moment"-এর কথা বলেছিলেন তারই সূত্র ধরে পরবর্তী কালে Illusion তত্ত্ব বা মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আর্থার কোএস্‌লারের (Arthur Koestler) অভিমত খুবই মূল্যবান। ইনি বলেন রঙ্গমঞ্চে দর্শক যখন কোনও সার্থক অভিনয় দেখে, তখন সে মনে করে শিল্পের দিক থেকে সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কিছু সে দেখছে, যা খাঁটি বাস্তব নয়। আবার একথাও ঠিক যে তার নিজের পরিপার্শ্ব ও আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিনীয়মান চরিত্রগুলোর সঙ্গে সে একাত্মতাও অনুভব করে। দর্শকের মনের একটি কোঠায় এ চিন্তা থাকে যে, সে যাদের দেখছে, তারা অভিনেতা মাত্র ; কিন্তু মনের আর একটি অংশ চরিত্রগুলোর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। একই দর্শকের মনের এই দুই অবস্থা তার মধ্যে যে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে তারই নাম মায়া। বস্তুত দুটি জগতের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে দর্শক-চেতনার এখানে এক অনিশ্চিত রুদ্ধ অবস্থা। আর অভিনয় দেখার এই অবস্থাতেই দর্শক-মনে "এখন" (বাস্তব) ও "এখানের" (বাস্তব) রাজ্য থেকে উদ্ভূত ভাব দূরতর 'তখন' (অভিনীয়মান জগৎ) ও 'সেখানে'র (অভিনীয়মান জগৎ) রাজ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, 'এখান' ও 'এখানে'র রাজ্য বলতে বাস্তব চেতনার

১. *The Technical Novelty in Ibsen's Plays*, (1913) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন "Now you have exposition, situation, and discussion, and the discussion is the test of the playwright."

২. "We have defined dramatic art as the sum total by the aid of which, in the theatre, we represent life and give to the twelve hundred people assembled, the illusion of truth." *A Theory of the Theatre.* (Brander Matthews Dramatic Museum of Columbia University, New York, 1916, P. 31)

রাজ্য এবং 'তখন' ও 'সেখানে' বলতে অভিনেয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে সাযুজ্যের ফলে যে-লোকে দর্শকের উত্তরণ, সেই লোকের কথা বুঝতে হবে।

এই নাট্যমায়ার সূত্রেই সৃষ্টি হল উৎকণ্ঠাবাদ। চার্লস মরগ্যান (Chrles Morgan) এ সম্পর্কে যার আভাস দিয়েছিলেন, তাকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বে রূপদান করলেন সুসান ল্যাংগার (Susanne Langer)। মরগ্যান ও সুসান ল্যাংগার নাটকীয় ভ্রান্তি বা নাট্যমায়াকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তাকে আর মায়া বলা চলে না—মায়ার সূত্রেই তা হয়ে উঠেছে উৎকণ্ঠা। মরগ্যান বলেছেন, 'Illusion, as I conceive it is form in suspense.'[১] এঁর মতে নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার রূপের (Form) বিশেষ কোন মূল্য নেই। নাটক অভিনয়কালীন নাট্যমায়ার রূপ তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। এই অবস্থায় দর্শকের উৎকণ্ঠিত এক অনিশ্চিত অবস্থা। এরই যে রূপ তাই নাট্যমায়া। মরগ্যানের Form in suspense ল্যাংগারের মতে প্রকৃতপক্ষে Illusion of Destiny. রঙ্গমঞ্চে যে ঘটনা ঘটে চলেছে, সেই ঘটমান বর্তমান এবং যার পরিণাম এখনও অনিশ্চিত সেই ভবিষ্যতের (Destiny) মধ্যবর্তীকালীন দর্শকের যে মানসিক অবস্থা, যে উৎকণ্ঠাময় অনিশ্চয়তা—তাই হল নাট্যমায়া।

যাই হোক, নাট্যোৎকণ্ঠা যে নাট্যকারের একটি প্রধান বিশেষত্ব, এতে কোন সন্দেহ নেই। নাট্যকার নাটকের মধ্যে পরিস্থিতি (ঘটনাংশ) সৃষ্টি করে দর্শকের উৎকণ্ঠা জাগ্রত করেন—এই উৎকণ্ঠাই তাকে পরবর্তী পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ঘটনার অসম্পূর্ণ বর্তমান ও ভাবী পরিণামের মাঝখানে দর্শক এক মানস-চাপের অধীন হয়ে থাকে—অর্থাৎ এখানে ঘটনাধারা যে-কোনও দিকে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দর্শকের কাছে উপস্থিত। নাটক দেখবার আগ্রহ ও কৌতূহলকে যেমন বৃদ্ধি করে নাট্যোৎকণ্ঠা, তেমনি তা আগ্রহকে ধরেও রাখে। ঘনীভূত প্রত্যাশা নাটককে উপভোগ্য করে তোলে। নাট্যোৎকণ্ঠা প্রধানত দু' রকমের। ক. অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা ও খ. পূর্বাভাসের উৎকণ্ঠা। অনিশ্চিত উৎকণ্ঠায় নাট্যঘটনার পরিণাম সম্পর্কে দর্শক অজ্ঞ: কি হয়, কি হয়—এই উত্তেজনার মধ্য দিয়ে দর্শক-মন অগ্রসর। আর পূর্বভাসাত্মক উৎকণ্ঠায় দর্শক নাটকের পাত্র-পাত্রীর জীবনের বা নাট্যঘটনার সম্পর্কে কিছু জানে যা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জানা নেই। যেটুকু দর্শক জানে তা হয় তো ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা বা পরিণতি নাটকের পাত্র-পাত্রীদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় কখন এসে পড়বে—এই উৎকণ্ঠা তাকে অধীর করে রাখে। সেইজন্যেই বলা হয়, বিস্ময় ও নাট্য

১. "Illusion then, is the simultaneous presence and interactions in the mind of two universes, one real, one imaginery. It transports the spectator from the trivial present to a plane remote from self-interest and makes him forget his own preoccupations and anxieties." J. L. Calderwood ও H. E, Toliver সম্পাদিত 'Perspectives on Drama' গ্রন্থে Arthur Koestler এর Iliusion, p. 242

শ্লেষের মাঝখানে এই ধরণের উৎকণ্ঠার স্থান।[১] নাটকে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে তাকে পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত ধরে রাখার মধ্যেই নাট্যকারের কৃতিত্ব। কোনও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও উৎকণ্ঠার সূচনা হলে তাকে যতক্ষণ ধরে রাখতে পারা যাবে, দর্শকদের চিত্তে ততই উত্তেজনা জমে উঠবে। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের ৪র্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিচারালয়ে অ্যান্টোনিওর শাস্তি প্রসঙ্গে প্রথম দিকে পোরশিয়ার ভূমিকায় শাইলকের আনন্দ ও পরে ধীরে ধীরে তার প্যাঁচে শাইলকের দুর্গতি—এ ঘটনার সূচনা থেকে পরিণামের মধ্যে চমৎকার নাট্যোৎকণ্ঠা বজায় আছে। মধুসূদনের 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ' দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, ভক্তপ্রসাদকে জব্দ করার জন্যে ফতেমা, হানিফ ও বাচস্পতির একদিকে ষড়যন্ত্র ও অন্যদিকে ফতেমার শিবমন্দিরে যাত্রা ও তার সঙ্গে ভক্তপ্রসাদের সাক্ষাৎ—এ ঘটনা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দর্শককে এক অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার মুখোমুখি উপস্থিত করে। অধিকাংশ নাট্যকার কোনও একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে উৎকণ্ঠাময় করে তুলতে যতখানি সার্থক, সমগ্র নাটকটিতে সেই উৎকণ্ঠাকে রক্ষা করতে ততখানি সার্থক নন। চেকভ অসম্পূর্ণ উৎকণ্ঠার বা নাটকের অংশ বিশেষে সম্পূর্ণ উৎকণ্ঠার একজন কৃতী নাট্যকার। আধুনিক কালের নাট্যকারগণও উৎকণ্ঠা-সৃষ্টির দিকে বিশেষভাবে সচেতন। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিকে উৎকণ্ঠাময় করে তুলতে বাঙালী নাট্যকারের অনেকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র নাটক জুড়ে উৎকণ্ঠাকে ধরে রাখার নৈপুণ্যে অনেকেই অসমর্থ। বাংলা 'একাঙ্কিকা'য় এ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। নাট্যঘটনার চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত বাংলা নাটকে যে-সব দৃশ্য আছে, সেই পর্যন্ত উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে দর্শকদের মনে অনেকখানি। তারপর উৎকণ্ঠাকে ধরে রাখা কঠিন হয়। তবুও নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করে—উৎকণ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টাও আছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী', দ্বিজেন্দ্রালের 'চন্দ্রগুপ্ত', মন্মথ রায়ের 'কারাগার' এর দৃষ্টান্ত।

প্রচ্ছন্নতা ঃ নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির জন্যে কখনও কখনও নাট্যকার আর একটি কৌশল অবলম্বন করেন। কোনও চরিত্রের পরিচয় গোপন রেখে কিংবা পূর্বের কোনও চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে, এই রকম একটা সংবাদ আভাসিত করে—একেবারে নাট্যঘটনার শেষদিকে সেই চরিত্রের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় এবং দেখানো হয় যে যার মৃত্যু হয়েছিল, সে জীবিত। শেষের এই সত্যকে না জানা পর্যন্ত দর্শকচিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। নাট্যোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির এই কৌশলকেই বলা হয় প্রচ্ছন্নতা। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকে পদ্মাবতীর পরিচয় একেবারে নাট্যের পরিসমাপ্তিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকে অরবিন্দ, যোগজীবন, চাঁপা ও তারার পরিচয়কেও বহুদূর পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। 'কমলেকামিনী' নাটকে শিখণ্ডিবাহনের পরিচয়ও শেষে উদ্ঘাটিত। অমৃতলালের 'খাসদখল' এ লোকেনের মৃত্যু-সংবাদ যে সত্য নয়, পরে

১ Suspense or poised expectancy in which the receptor is held, lies between surprise and dramatic irony. (D. O. W. L. pp. 404).

। দেখানো হয়েছে। শেক্সপীয়ারের 'এ উইন্টার্স টেল' নাটকেও এ ব্যাপার লক্ষ্য রা যায়। 'প্রচ্ছন্নতা'কে তাই নাটকীয় লক্ষণ বলা চলে না। বরং বলা যায়, াট্যোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির একটা উপায়।

আকস্মিকতা (Surprise) ও নাট্যশ্লেষ : (Dramatic Irony)

আকস্মিকতা সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা চলে। নাট্যক্রিয়া ও নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি —দুয়েরই অনুকূল আকস্মিকতা। এই দুইয়েরই প্রয়োজনে নাট্যকারেরা নাটকে মাঝে াঝে আকস্মিকতার (Unexpectedness) সঞ্চার করেন। অ্যারিস্টটল প্রথম এর ইঙ্গিত করেন।[১] একটি পরিচিত পরিস্থিতির মধ্যে নূতন উপাদান এনে তাকে পরিবর্তিত করার নামই হল আকস্মিকতা (Surprise)। বহুপূর্বে অ্যারিস্টটল Unexpectedness কথাটির মধ্যে এরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সাধারণত মেলোড্রামায় এই আকস্মিকতা সৃষ্টির প্রয়াস বেশী থাকে। স্টেজের বাইরে গুলির শব্দ, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোনও একটি চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশ, বা নির্গমন প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। ইবসেনের হেড্ডা গ্যাবলারের আত্মহত্যা, জন গ্যাব্‌রিএলের (John Gabriel) *Borkman* নাটকে Mrs Borkman-এর হঠাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে উপস্থিতি, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে ভ্রাতা কুমারের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে বিক্রমের নিকট নাটকের শেষে সুমিত্রার উপস্থিতি, দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাজাহান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে জাহানারার দরবারে উপস্থিতি—প্রভৃতিও আকস্মিকতা সৃষ্টি করে। নাট্যক্রিয়া ও উৎকণ্ঠা-সৃষ্টির প্রয়োজনে আকস্মিকতার সৃষ্টি। আর উৎকণ্ঠা-সৃষ্টি হল নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ। আবার 'নাট্যশ্লেষ' (Dramatic Irony)-এর প্রয়োগ দ্বারাও কখনও কখনও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়—কখনও বা নাট্যশ্লেষ এমনই স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য লাভ করে যে মনে হয় নাট্যশ্লেষই বুঝি নাটকের একটি বিশেষ লক্ষণ। মোট কথা ক্ষেত্রবিশেষে অনেক নাটকে নাট্যশ্লেষ নাটকের নাটকীয়তা সৃষ্টির একটি বড় উপায়।

তাই এ প্রসঙ্গে নাট্যশ্লেষ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। 'ড্রামাটিক আইরণি'কে নাট্যশ্লেষ বা নাটকীয় বক্রোক্তি বলা যায়। অভিনয়ের সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণ নানা ধরণের কাজ ও কথা বলে চলেন। তাঁদের সেই সব কাজ বা কথার এক একটি বিশেষ অর্থও আছে। কিন্তু যদি দর্শকগণ তাঁদের কাজ ও কথার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন, অথবা তাঁদের বক্তব্য দু' রকম অর্থের সৃষ্টি করে, তখনই দেখা দেয় 'ড্রামাটিক আইরণি'। সাধারণত কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞানতাবশত নাটকের চরিত্র এমন একটি উক্তি করলেন, যার প্রকৃত অর্থ পূর্ব থেকেই দর্শকদের জানা আছে, বা একটু পরেই জেনেছেন, তখন চরিত্রটির

১. Such incidents have the very greatest effect on the mind when they occur unexpectedly. *The Art of Poetry* : tr, Ingram Bywater.

বক্তব্যের যে অর্থ তার সঙ্গে দর্শকদের উপলব্ধ অর্থের ব্যবধান দেখা দেয়—ফলে সৃষ্টি হয় 'নাট্যশ্লেষ'। সমালোচক বলেন, "The difference necessarily arises whenever the characters act or speak in ignorance of important facts of which meanwhile the spectators are in possession."[১] নাটকের চরিত্র বা অভিনেতার কাজে বা ঘটনায় এবং বচনে দু'ভাবেই দর্শকের সঙ্গে এই ব্যবধান দেখা দিতে পারে বলে ড্রামাটিক আইরণি বা নাট্যশ্লেষ দু রকম—ঘটনাগত ও বাচনিক বা শব্দগত। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা সফোক্লিসের 'ইলেক্ট্রা' নাটকের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। এ নাটকের শেষে দেখি, এইগিসথাস একটি আবৃত মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু দর্শকেরা পূর্ব থেকেই জানে এটি ক্লাইটোমেনেস্ট্রার মৃতদেহ—কিন্তু এইগিসথাস জানে তাকে অরিস্টিসের মৃতদেহরূপে। আবার দর্শক জানে অরিস্টিস তাঁর সামনেই—তিনি তাকে চিনতে পারেননি। এখানে এইগিসথাসের অজ্ঞতার ফলে মৃতদেহটির প্রকৃত পরিচয় নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান সৃষ্ট হওয়ায় এটি চমৎকার নাট্যশ্লেষের একটি দৃষ্টান্ত। গ্রীক নাটকে অদৃষ্টের পরিহাস বা Dramatic Irony of Fate খুবই দেখা যায়। দর্শকদের কাছে গ্রীক নাটকের অধিকাংশ কাহিনীই জানা অথচ নাটকের প্রধান চরিত্রের কাছে তার পরিণাম অজানা। এর ফলে সহজেই সেখানে দেখা দেয় নাট্যশ্লেষ। বাচনিক নাট্যশ্লেষ কোনও একটি শব্দ বা উক্তি বিশেষকে আশ্রয় করে যখন ঐ ব্যবধানের সৃষ্টি হয় তখনই দেখা দেয়। 'ওথেলো' নাটকের ওথেলো সরলতা বা অজ্ঞানতাবশত সর্বদা ইয়াগোকে 'honest' বলেছেন, অথচ দর্শক জানে সে কতো বড় দুর্জন। নাট্যশ্লেষের উপলব্ধি অভিনয় চলার সঙ্গে সঙ্গে, কিছুক্ষণ পরে বা একেবারে শেষেও হতে পারে। গ্রীক নাটকে প্রলোগ, ভবিষ্যৎ বক্তা বা কোরাসের সাহায্যেও অনেক সময় কোনও ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য দর্শকদের জানিয়ে দেওয়া হত। ট্র্যাজিডি ও কমেডি—উভয় শ্রেণীর নাটকেই নাট্যশ্লেষ থাকতে পারে। কমেডিতে নাট্যশ্লেষ হাস্যরসকেই ঘনীভূত করে এবং ট্র্যাজিডিতে তা ট্র্যাজিডি রসেরই পরিপোষক। মধুসূদনের 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ'তে ভক্তপ্রসাদ গদা ও পুঁটি জানে জমিদার ফতেমাকে ভোগ করতে চলেছে। কিন্তু দর্শকেরা জানে এই ভোগের পরিবর্তে তার কাপালে কী আছে। এখানেই নাট্যশ্লেষ। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভায়' পুরুষবেশী শৈলর সঙ্গে নির্মলার ঘনিষ্ঠতায় পূর্ণের বিদ্বেষও হাস্যময় নাট্যশ্লেষের দৃষ্টান্ত। দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে রাজীবকে জব্দ করার জন্যে রতা যে ফন্দী করেছে তা দর্শকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাজীব তা জানে না, রাসমণি ও গৌরমণিও

১. *An Introduction to the Study of Literature* p p. 223-24 : W. H. Hudson আরও একজন সমালোচক এর সংজ্ঞায় বলেছেন, "Dramatic irony, in brief is the sense of contradiction felt by spectators of a drama who see a character acting in ignorance of his condition. *Of Irony—Especially in Drama*—by G. G. Sedgewick, p. 49.

না। তাই এখানেও নাট্যশ্লেষ। রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী নাটকের ৫/১ দৃশ্যে রাজা বিক্রমদেবের চিত্ত-পরিবর্তনের ফলে যখন তিনি কুমারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে প্রস্তুত, কুমারের সঙ্গে ইলার বিবাহের জন্যে যখন আয়োজন করছেন—তখন কুমারের অদৃষ্ট-লিখন সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং দর্শকদের সে সম্পর্কে সত্য জ্ঞানের মধ্যে যে ব্যবধান সেখানেই নাট্যশ্লেষ। 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহের আত্মহত্যার ঘটনাটি সম্পর্কে দর্শক ও রঘুপতির ধারণার বৈপরীত্যও নাট্যশ্লেষের দৃষ্টান্ত।

দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ :

নাট্যের এই লক্ষণ দু'টি নির্দেশ করেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন আলংকারিক আচার্য ভরত। তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে নাট্যগ্রন্থের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা আছে। 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ১০৬—১২১ পর্যন্ত শ্লোকে নাটকের নানা লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সূত্রাকারে তাঁর বক্তব্য আমরা উল্লেখ করছি।

ক. নাটক দৃশ্য-শ্রব্য কাব্য।[১]

খ. নাট্য নানা ভাবসম্পন্ন, নানা অবস্থান্তরজ্ঞাপক লোকবৃত্তের (দেবতা, মুনি, রাজা ও গৃহস্থ লোকাদির আচরিত কর্মের) অনুকরণ।[২]

গ. নাট্য সংসারের হতভাগ্য, দুঃখী, শোকার্ত ও শ্রমক্লান্ত লোকেদের বিশ্রাম-স্থান।[৩]

ঘ. হীন বিষয় নিয়ে লেখা হলেও প্রয়োগে যদি দীপ্তি থাকে ও রচনা ও উপস্থাপনায় যদি বৈচিত্র্য থাকে, তাহলে নাট্য শোভাযুক্ত হয়। কিন্তু প্রয়োগের দীপ্তি বা বৈচিত্র্য না থাকলে তার সুর যতই উদাত্ত হোক, দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পারে না।[৪]

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের দেশে সকলের আগেই উচ্চারিত হয়েছে নাটক হবে শ্রব্য, দৃশ্য ও কাব্য। একদিকে তা শোনার ও দেখার, অন্যদিকে তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করার। সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের নানা অবস্থার নানা ভাব-সম্বলিত যে বৃত্ত বা কাহিনী তার অনুকরণ থাকবে নাট্যে। এই 'অনুকরণ' শব্দের ব্যাখ্যা নাট্যশাস্ত্রে

---

১. ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ সম্ভবেৎ।
তস্মাৎ সংজ্ঞাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্॥ (নাট্যশাস্ত্র ১।১১-১২)

২. নানা ভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥ (ঐ, ১০৮-৯)

৩. দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥ (ঐ ১১১-১২)

৪. কাব্যং যদ্যপি হীনার্থং সম্যগ্যোগৈঃ সমন্বিতম্।
দীপ্তত্বাৎ তু প্রয়োগস্য শোভামেতি ন সংশয়॥
উদাত্তমপি যৎ কাব্যং স্যাদ্যোগৈঃ পরিবর্জিতম্।
হীনত্বাৎ প্রয়োগস্য ন সতাং রঞ্জয়েৎ মনঃ॥ (ঐ)

নেই। কিন্তু গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে 'লোকধর্মী' ও 'নাট্যধর্মী' শব্দ দুটির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত গ্রন্থের আরও নানাস্থলে নাট্যবিধি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্টই মনে হয়, ভরত 'অনুকরণ' বলতে বাস্তবের প্রতিরূপ কখনই বুঝতেন না। অ্যারিস্টটল ও তাঁর পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকগণ অনুকরণের যে ব্যাপক অর্থ মনে রেখে-ছিলেন ভরতের অনুকরণ শব্দটিও সেই অর্থেই ব্যবহৃত। সংসারের দীনদুঃখী, শ্রমিক, শোকগ্রস্ত প্রভৃতি মানুষদের কথা ভরত যেভাবে চিন্তা করেছেন, তাতে ধারণা করা চলে যে নাটকের জনসংযোগের দিকটি সম্পর্কে তিনি কতখানি অবহিত ছিলেন। জনচিত্তরঞ্জন যে নাট্যের একটি আবশ্যিক শর্ত, তা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মনোরঞ্জন করতে হবে নাটককে প্রয়োগ-দীপ্তির দ্বারা। অর্থাৎ এখানেও তিনি প্রয়োগ-কলা বা অভিনয়-কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার তিনি এও স্মরণ রাখতে বলেছেন যে, দৃশ্যাত্মক তো হবেই কিন্তু নাট্য কবির সৃষ্ট রচনা। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে আমরা নাট্যের একাধিক লক্ষণের কথা জানতে পারছি। নাটকের দৃশ্যত্ব, শ্রব্যত্ব, কবিত্ব, জনচিত্তরঞ্জনকারিতা, জনসংযোগপ্রবণতা, অনুকরণ—এগুলির মধ্যে আবার দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ-প্রবণতা এ দুটি বিশেষ লক্ষণ, যা একান্তভাবে নাট্যেরই লক্ষণ।

ভরতের পরে ভারতীয় আলংকারিকদের মধ্যে ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে যা বলেছেন তা বিশেষত্বহীন। ধনঞ্জয় নাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্'—অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই নাট্য; একে 'রূপ' বলার কারণ, এ হল দৃশ্য এবং অভিনেতৃগণের দ্বারা এ অভিনেয় বলে এর নাম 'রূপক'। ভরতের সুরেই ধনঞ্জয় নাটককে অবস্থার অনুকরণ এবং দৃশ্যাত্মক বা অভিনেয় বলেছেন। চতুর্দশ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে যা বলেছেন তাতেও কোনও নূতনত্ব নেই। দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্ব ভেদে কাব্যকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করে তিনি দৃশ্যকাব্যকে অভিনয়ের যোগ্য বলেছেন। এতে নটের ওপর রাম প্রভৃতির স্বরূপের আরোপ হয় বলে এর নাম রূপক। মোট কথা, নাট্য-লক্ষণ সম্পর্কে ভরতের বক্তব্যই অধিকতর মূল্যবান। অ্যারিস্টটল 'নাট্যক্রিয়া' (action)-এর ওপর গুরুত্ব দিলেও 'দৃশ্যত্ব'কেও স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ভরত 'দৃশ্যত্ব'-এর ওপর গুরুত্ব দিলেও নাট্যকার্যের যে বিশ্লেষণ করেছেন, 'সন্ধি' 'অবস্থা' ও 'অর্থপ্রকৃতি'র যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনিও নাট্যক্রিয়াকে অস্বীকার করেননি। তবে অ্যারিস্টটলের নাট্যক্রিয়া যে ধরণের গতিবেগ-যুক্ত তা ভরতের লক্ষণে লক্ষণীয় নয়। এর কারণ দুই দেশের জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। পূর্ব থেকেই গ্রীসে ট্র্যাজিডির অস্তিত্ব থাকায় বেগবতী নাট্যক্রিয়াকে অ্যারিস্টটল যে ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন, ভরতের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নাটক যদি পাঠ্য হয় (যেমন আধুনিক কালে) এবং শ্রব্য হয় এবং তা যদি দৃশ্য না হয় (যেমন আধুনিক কালে বেতার নাট্য) তাহলে নাটক পাঠ বা শ্রবণকালে তার দৃশ্যরূপ অতি অবশ্যই শ্রোতার চিত্তে

চিত্রের মতো প্রতিভাত করে তুলতেই হবে। সুতরাং শ্রব্য ও পাঠ্য নাটকও দৃশ্যলক্ষণ-বর্জিত নয়।

সঙ্গীতধর্মিতা ও আবেগধর্মিতা :

সঙ্গীত ও আবেগকে কেউ কেউ নাটকের মূল লক্ষণ বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। দার্শনিক নীৎসে (Nietzsche) তাঁর 'Birth of Tragedy' গ্রন্থে সঙ্গীতের প্রেরণা থেকেই যে নাটকের উদ্ভব এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে নাটকের মূল প্রেরণাই সাঙ্গীতিক। প্রাচীন ভারতে নাট্যশালা বলতে বোঝাত সঙ্গীতশালা। প্রাচীনকালে আহার্য, আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় নৃত্যগীত ও বাদ্য সহযোগে হত। সঙ্গীতের একটি মূল্যবান স্থান ছিল নাটকে। গ্রীক নাটকেও কোরাসের স্থান কিরূপ গভীর ছিল তাও আমরা জানি। কিন্তু কালধর্মে দেখা গেছে ঐ কোরাসের প্রতি ঔদাসীন্য ইউরিপিডিসের হাতে। সঙ্গীত নাটকের আর অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য হয় না; তবে ঔচিত্য অনুযায়ী নাটকের আভ্যন্তর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকে সঙ্গীত-যোজনা দীর্ঘকাল চলেছে। অতি আধুনিক কালে দু একজন নাট্যকার ছাড়া গানের প্রতি অধিকাংশ নাট্যকারই উদাসীন। বেরটোল্ড ব্রেখটের এপিক থিয়েটারে বা রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে এবং আমাদের বাঙলা নাটকে ও যাত্রায় গান অবশ্য মূল্য পেয়েছে; কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক নাট্যকারগণ নাটকে সঙ্গীত যোজনায় তেমন আগ্রহী নন। তাই উদ্ভবকালে ও তৎপরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত সঙ্গীতধর্মিতা নাটকের লক্ষণরূপে গণ্য হলেও এখন আর একে নাট্যলক্ষণরূপে নির্দেশ করা যায় না। তথাপি নীৎসে ছাড়াও আরও কেউ কেউ সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উনিশ শতকের জার্মান নাট্যকার ও সুরকার রিচার্ড ভাগ্‌নার (Wagner) নাটকে সঙ্গীতের স্থান সম্পর্কে শুধু উচ্চ ধারণার কথাই ব্যক্ত করেননি, নিজে নাটক রচনা করে তার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন সঙ্গীতের মাধ্যমেই শুধু আবেগের খাঁটি রূপটি প্রকাশিত হয়—একমাত্র সুর কথাকে বিষয়ভার থেকে মুক্ত করে আবেগের খাঁটি আনন্দকে ব্যক্ত করে। সোভিয়েট নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক থিয়েডোর কোমিসারজেভস্কি মনে করেন, সঙ্গীত ও নৃত্যাভিনয়, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মতো সাধারণ নাটকেও অপরিহার্য।[১]

আমেরিকান নাট্যশাস্ত্রী জর্জ পিয়ার্স বেকার তাঁর *Dramatic Technique* গ্রন্থে আবেগবাদের কথা তুলে ধরেছেন। Dramatic বা নাটকীয় শব্দটির তিন রকম অর্থ সম্পর্কে সচেতন থেকে তিনি কোন্ অর্থে একে গ্রহণ করতে চান তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, শব্দটির একটি অর্থ নাট্যোপযোগী উপাদান (Material for drama), আর একটি অর্থ—অভিনয়যোগ্যতা (Fitted for production under the conditions

১. To train the students and actors of my Moscow Theatre ..... to understand the value of music and of rhythm in acting, I used to teach them music. —*The Theatre and a Changing Civilization*; Theadore Komisarjevsky.

of the theatre)। কিন্তু এ দুটি অর্থে তিনি শব্দটি প্রয়োগ করছেন না। ড্রামাটিক শব্দের আর একটি অর্থ আছে, তা হল ভাবোদ্রেককর (creative of emotional response) এই অর্থেই তিনি এর প্রয়োগ করতে চান। দর্শকের চিত্তে ভাবোদ্রেক করতে পারাই নাটকের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। স্থিতিশীল ক্রিয়া ও একেবারে নিষ্ক্রিয়তাও তাঁর মতে নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে যদি তা আবেগ উদ্রেক করতে পারে। নাট্যলক্ষণ নির্ণয়ে এই আবেগবাদকে স্বীকৃতি জানাতে আমরা কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। সাহিত্যের কাজই তো হল ভাব-বিভাব-অনুভাবের সাহায্যে রসনিষ্পন্ন করা। emotional response শুধুমাত্র নাটকের ক্ষেত্রেই তো সত্য নয়।

আশ্চর্যজনকতা, অপ্রত্যাশা, আকস্মিকতা ও চমক :

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যসমালোচক অধ্যাপক নিকল অনেক চিন্তা ও অনেক আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'নাটকীয়' শব্দটির মূল ব্যঞ্জনা তাঁর পূর্ববর্তী কোনও নাট্যতাত্ত্বিকই ঠিক ধরতে পারেননি। তাঁদের দেওয়া বিভিন্ন লক্ষণগুলি কিছু কিছু নাটকের পক্ষে সত্য কিন্তু কোনও লক্ষণই সব নাটকের পক্ষেই প্রযোজ্য নয়। সুতরাং কোনও নাট্যতাত্ত্বিকই নাটকের সেই বিশেষ লক্ষণটির সন্ধান দিতে পারেননি যে-লক্ষণে নাটক সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণী থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। তিনি মনে করেন, সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকগণ Dramatic শব্দটিকে যে অর্থে প্রয়োগ করেন, তারই মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নাটকের প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। আর 'ড্রামাটিক' শব্দের এদিক থেকে অর্থ হল, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। নাটকীয় বলতে নিকল যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে আকস্মিকতার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। অপ্রত্যাশার কথা যে অ্যারিস্টটল অনেক আগেই ইঙ্গিত করেছেন, সে কথাও বলেছি। অদ্ভুত ও চমকপ্রদ ব্যাপার নাটকে নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু নাটক ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও নিকল-কথিত চারটি বিষয়ই থাকতে পারে। সুতরাং এগুলিই একমাত্র নাট্যসাহিত্যের লক্ষণ, তা বলা যায় কি করে? তাই নিকলের বক্তব্যও আমাদের খুব আশ্বস্ত করে না।

নাটকীয়তার ব্যাখ্যায় এই জটিলতা লক্ষ্য করেই তাই কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট[১] মন্তব্য করেছিলেন যে, সহসা এ বিষয়ে কোনও মত দেওয়া নিরাপদ নয়। নাটকের রূপ এতই বিভিন্ন যে, খুব কম সংখ্যক সমালোচকই নাটকীয় অনাটকীয় বিচারের সময় একখানা কি দুখানা নাটকের বেশি মনে রাখতে পারেন। প্রত্যেক দেশেই একটি বিশেষ কালে নাটক সম্বন্ধে একটি রুচি বা সংস্কার গড়ে ওঠে—এর দ্বারাই নাট্যবিচার নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইজন্য এক যুগের বা দেশের 'নাটকীয়' অন্য যুগ ও দেশের কাছে নাটকীয় বলে গণ্য নাও হতে পারে।

১. Selected Essays : Seneca in Elizabethan Translations 1927, p. 75

তিনি নাটকীয় শব্দের অর্থকে আপেক্ষিক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং বলেছেন, তা দর্শকদের রুচি ও সংস্কারসাপেক্ষ।

ঘটনার ঘটমানতা :

নাটকীয়তা বা নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে খুবই মূল্যবান কথা বলেছেন থর্ণটন উইল্ডার (Thornton Wilder)। নাটক অন্যান্য শিল্প থেকে কিসে স্বতন্ত্র, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি নাটকের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে তার যে বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিপূর্বে কারো বক্তব্যে লক্ষ্য করিনি, সেই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'ঘটনার ঘটমানতা'কে সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় বলে মনে করি। তিনি বলেছেন,

ক. নাটক বহুজনের সহযোগিতায় উপস্থাপ্য এক দৃশ্যাত্মক শিল্প।[১]

খ. সমবেত দলবদ্ধ মানুষের মনের দিকে লক্ষ্য রেখেই নাটকের অভিনয়।[২]

গ. নাটক ছলনা বা মায়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ; এতে মায়ার ওপর মায়া-সৃষ্টি চলতে থাকে।[৩]

ঘ. নাটকের ঘটনা সব সময়েই বর্তমানকালে ঘটে থাকে।[৪]

নাটক যে দৃশ্যাত্মক শিল্প অ্যারিস্টটল, ভরত থেকে শুরু করে বহু নাট্যতাত্ত্বিক তা আমাদের শুনিয়েছেন। ভরতের আলোচনাতেই নাটকের জনসংযোগকামিতার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। তাই এখানে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে দলবদ্ধ মানুষের মনের দিকে লক্ষ্য রেখেই নাটকের অভিনয়। মনে রাখতে হবে যে এটিও নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বহুজনের সহযোগিতায় নাটক যে অভিনীত হয়, একথা Worsfold চমৎকার দেখিয়ে দিয়েছেন।[৫] নাট্যমায়ার ও নাট্যোৎকণ্ঠার আলোচনায় থর্ণটনের বক্তব্যের তৃতীয় সূত্রটিকে পেয়েছি। কিন্তু নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে ঘটনা উপস্থাপিত হয়, তা ঘটমান। তা অতীত সংঘটিত ঘটনার বিবরণ নয়—তা চোখের সামনেই ঘটছে। নিরন্তর বর্তমানকালেই নাট্যঘটনা ঘটে। তাই থর্ণটন বলেন, "The novel is a past reported in the Present, on the stage, it is always now."

---

১. "The theatre is an art which reposes.

২. It is addressed to the group mind.

৩. It is based upon a pretense and its very nature calls out a multiplications of pretenses.

৪. Its action takes place in a perpetual present time." 'Some thoughts on playwriting'—*Pespectives on Drama*, p. 5.

৫ "The drama is, therefore, a composite art, in which the author, the actor, and the stage manager all combine to produce the total effect." *Judgment in Literature* : W. B. Worosfold. Last Reprint 1957, p. 101

সিদ্ধান্ত :

নাট্যলক্ষণ-সম্পর্কিত আলোচনায় এখানেই শেষ। সুপ্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নামী পণ্ডিত নাটকের এক বা একাধিক লক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে রায় দিয়েছেন। সে সব লক্ষণের পরিচয় দৃষ্টান্তসহ আমরা বোঝাবার চেষ্টা করছি। এই আলোচনায় 'নাটকীয়' কথাটি মাঝে মাঝে এসেছে। 'নাটকীয়' শব্দের অর্থও কেউ কেউ দেবার চেষ্টা করেছেন। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'নাটক সম্বন্ধীয়' [নাটক + ঈয় (সম্বন্ধার্থে)] কিংবা 'নাটকে বর্ণিত'। এই ব্যাপক অর্থে যা অভিনয়ের উপযোগী, তাও 'নাটকীয়', নাটকের উপাদানগুলিও 'নাটকীয়'। কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে এই আলোচনায় গ্রহণ করা হয়নি। নাটকের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্য নাটক নাটক-পদবাচ্য, তা উপন্যাস বা কাব্য নয়, সেই 'ধর্ম' কে বোঝাতেই 'নাটকীয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর নাটকের ধর্ম বলতে নাটকের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য। তাই নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, তা নাটকে নাটকীয়তারই কথা। কিন্তু নাটকের মতো এমন এক যৌথ শিল্পকে (যার সাফল্যের জন্য বহু কিছুর সহযোগিতা আবশ্যক) একটি মাত্র লক্ষণে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে আমরা স্বতন্ত্র করতে চাই না। নাটকের লক্ষণ অনেক—তার মধ্যে কতকগুলি এমন লক্ষণ আছে যেগুলি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেই লক্ষ্য করা যাবে। এগুলিকে নাটকের 'সাধারণ লক্ষণ' বলা যায়। আর কতকগুলি এমন লক্ষণ দেখা যায়, যা সাহিত্যের অন্য শ্রেণীতে নেই। এগুলি তার বিশেষ লক্ষণ। আলোচনায় দেখেছি, বেগবতী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্ব, মায়া-উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা, প্রচ্ছন্নতা, শ্লেষ, সঙ্গীত, অনুকরণ, আবেগ, দৃশ্যত্ব, শ্রব্যত্ব, কাব্যত্ব, জনসংযোগ, আশ্চর্য-জনকতা, চমক, যৌথ-শিল্পত্ব, ঘটনার ঘটমানতা—এগুলি সমস্তই নাটকের লক্ষণ। তবে কোনও একটি নাটকে সব লক্ষণই যে উপস্থিত থাকবে তা নয়; এর মধ্যে কিছু কিছু লক্ষণ অপরিহার্য যে নয়, তা পূর্বেই বলেছি। আবার ঐ সব লক্ষণের অনেকগুলি সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণীতেও লক্ষণীয় হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দ্বন্দ্ব, মায়া, প্রচ্ছন্নতা, সঙ্গীত, অনুকরণ, আবেগ, শ্রব্যত্ব, কাব্যত্ব—এগুলি নাটকের একচেটিয়া লক্ষণ নয়। আর বেগবতী ক্রিয়া, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উৎকণ্ঠা, (আকস্মিকতা ও শ্লেষ, উৎকণ্ঠারই অন্তর্গত, আলোচনায় দেখানো হয়েছে) দৃশ্যধর্মিতা, জনসংযোগ, যৌথশিল্পত্ব ও ঘটনার ঘটমানতা—এগুলি নাটকের বিশেষ লক্ষণ। শেষের বৈশেষিক লক্ষণগুলি যে-কোনও নাটকেই মিলবে।

এখানে আরও একটি কথা বলার আছে। আমরা নাটকের যে-সব সাধারণ লক্ষণের কথা বলেছি, সেগুলি উপন্যাসে, আখ্যানকাব্যে, মহাকাব্যে, ছোটগল্পে দেখা যে দিতে পারে, তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু অভিনীয়মান একটি নাটকের দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থেকে ঐ সব সাধারণ লক্ষণগুলোকে যে ভাবে দেখতে পান, শোনেন বা অনুভব করেন, তাতে তাদের নূতন তাৎপর্যও ফুটে ওঠে। কিছুতেই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের

লক্ষণগুলির সঙ্গে নাম-সাদৃশ্য থাকলেও এদের এক করে দেখা চলে না। সুতরাং নাট্য-দর্শকের কাছে নাটকের সাধারণ লক্ষণগুলিও কম স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নয়। তাই নাটকের সব লক্ষণই এক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

নাটকের সংজ্ঞা :

এই আলোচনার শেষে নাটকের একটি সংজ্ঞা দেওয়ার সময় এসেছে। অ্যারিস্টটল 'অনুকরণ' শব্দটির ব্যাপক অর্থ স্মরণে রেখে ট্র্যাজিডির আলোচনায় যা বলেছিলেন, তাতে দেখি, তাঁর মতে নাট্যঘটনা বা নাট্যক্রিয়ার অনুকরণই হল নাটক। ভিক্টর হুগো বলেছিলেন, নাটক হল আলোক বিচ্ছুরণের এমন একটি দর্পণ যা রঙীন রশ্মিগুলিকে ম্লান করার পরিবর্তে গ্রহণ ও ঘনীভূত করে এবং সেগুলি মৃদুভাবে দীপ্ত হয়ে-জ্বলে ওঠে শিখারূপে।[১] অর্থাৎ সাধারণ দর্পণে যখন কোনও বস্তু প্রতিফলিত হয়, তখন তার রঙ ও দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু নাটকের দর্পণে তা হয় না। অনুকরণ নাট্যদর্পণে যখন এইভাবে তাৎপর্য লাভ করে, তখনই তা নাটক। আমাদের ভরতও বলেছেন, নাটক 'লোকবৃত্তের অনুকরণ'। অনুকরণ-তত্ত্বের দিক থেকে নাটকের সংজ্ঞা এগুলি। আবার দ্বন্দ্ববাদের দিক থেকে উৎকণ্ঠাবাদের দিক থেকেও নাটকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নাট্য-লক্ষণের আলোচনা অনুসরণ করলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে নাটকের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু এও বোঝা যায় যে নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যখন এত মতভেদ তখন সর্বজনগ্রাহ্য নাটকের একটি সংজ্ঞা একটি বাক্যে নির্দেশ করা কতো কঠিন। তথাপি অধ্যাপক নিকল সে চেষ্টা করেছেন এবং এর সংজ্ঞা দিয়েছেন. এইভাবে—"Drama is the art of expressing ideas about life in such a manner as to render that expression capable of interpretation by actors and likely to interest an audience assembled to hear the words and witness the actions." অর্থাৎ নাট্যকলা হচ্ছে অভিনেতৃবর্গের দ্বারা উপস্থাপ্য জীবন সম্পর্কিত ধারণার এমনভাবে প্রকাশ, যা শ্রবণ ও দর্শনের জন্য সমবেত দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

নিকলের সংজ্ঞাটিকে আরও একটু সংশোধন করে নিয়ে আমরা বলতে চাই, নাটক হল মানব-জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার এমনই এক কবিকৃত অভিনয়যোগ্য গতিমান বৃত্ত যা সমবেত দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল সৃষ্টি করে তাদেরই চিত্তে উদ্দিষ্ট রস পরিণাম লাভ করে বা চিত্তকে নাট্যকারের অভিপ্রেত পথে উদ্বোধিত করে।

---

১. "The drama therefore, must be a focussing mirror, which instead of making weaker, collects and condenses the coloured rays which will make of a gleam a light, of a light a flame. Then only is the drama worthy of being counted." Preface to *Cromwell*. Victor Hugo. নিকলের *The Theory of Drama* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

নাটক, নাট্য ও দৃশ্যকাব্য শব্দ-প্রয়োগের সমীচীনতা ঃ

ইংরেজি 'ড্রামা' (Drama) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দরূপে নাটক কথাটি এখন বহুল ব্যবহৃত। ইংরেজিতে 'ড্রামা' শব্দটির নানা অর্থ আছে। ব্যাপক অর্থে যে-কোনো রকমের অনুকরণাত্মক অভিনেয় অনুষ্ঠানই 'ড্রামা'—তা সে গুরুগম্ভীর কোনো ট্র্যাজিডি হোক, লঘুরসাত্মক কোনও কমেডি বা ফার্সই হোক কিংবা কোনো মূকাভিনয় বা আদিম কোনো ধর্মানুষ্ঠানই হোক। কিন্তু বিশেষ অর্থে ড্রামা হল এমন এক শ্রেণীর সুপরিকল্পিত রচনা যা অভিনেতৃবর্গের দ্বারা বিশেষভাবে উপস্থাপনযোগ্য। গ্রীসে 'ড্রামা' শব্দের অর্থ ছিল ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান।[১] এই 'ক্রিয়া'র লক্ষণটি ড্রামায় আজও বর্তমান। ইংরেজিতে 'ড্রামা' শব্দটি ছাড়া 'প্লে' (play) কথাটিও ব্যবহৃত হয়। Playর অর্থও খুব ব্যাপক। 'ড্রামা' শব্দের ব্যাপক অর্থের সঙ্গে 'প্লে'র ব্যাপক অর্থ প্রায় অভিন্ন।[২] ড্রামা শব্দের নানা অর্থের কথা মনে রেখে কিন্তু সব সময় সতর্কভাবে শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। বিশেষ অর্থে ড্রামা বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে আমাদের বাংলা 'নাটক' শব্দটির অনেকখানি অর্থ-সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য ও রূপক যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে ইংরেজি ড্রামা ও 'প্লে'র সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য ও রূপক ছাড়াও 'নাট্য' শব্দটিরও প্রয়োগ আছে। অভিনয়কালে রঙ্গমঞ্চে যে লোকবৃত্ত ও জীবনকাহিনী আমরা দর্শন করি ও শ্রবণ করি সংস্কৃতে তাই দৃশ্যকাব্য। তা একদিকে যেমন অভিনেতব্য ও দৃশ্য, তেমনি তা কবির সৃষ্টি বলে তা কাব্যও। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অপরের রূপ অনুকরণ করা হয় বলে এর নাম রূপক। নাট্য শব্দের মূল অর্থ ছিল ভরতমুনি প্রবর্তিত নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবায়। পরে এই তিনের সহযোগে অভিনয়কেই বোঝাত। আর অভিনয়ে দৃশ্যকাব্য-গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীদের হাবভাব ও অবস্থার অনুকরণ করা হত বলে দৃশ্যকাব্যও নাট্য নামে পরিচিত হয়েছে। যাই হোক, 'ড্রামা' ও 'প্লে' শব্দের সঙ্গে নাট্যও তাই অভিন্ন হয়ে উঠেছে বলা চলে। আমরা বাংলা ভাষায় দৃশ্যকাব্য ও নাট্য এ দুটি শব্দই প্রয়োগ করি, কিন্তু সব থেকে বেশী ব্যবহার করি 'নাটক' শব্দটি। সংস্কৃতে দশ রকম রূপক বা দৃশ্যকাব্যের মধ্যে একটির নাম হল নাটক। এর অঙ্কসংখ্যা, বিষয়বস্তু ও রস-পরিণাম কী হতে পারে, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে তা নির্দিষ্ট। কিন্তু সংস্কৃত 'নাটক' রূপকের বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রেখে আমরা বাংলায় 'নাটক' শব্দটির ব্যবহার করি না। শব্দটি নিয়েছি সংস্কৃত রূপকের একটি 'প্রকার'-এর নাম থেকে, কিন্তু ইংরেজি 'ড্রামা' ও 'প্লে'র অর্থসাদৃশ্যে আমরা এর প্রয়োগ করে থাকি। সংস্কৃত 'নাট্য' শব্দটিই সর্বাপেক্ষা সুনির্বাচিত। বাংলা ভাষায় এই শব্দটিই যদি শুধুমাত্র ব্যবহৃত হত,

---

১. "In Greek the term (Drama) meant simply to act or perform" —(*A Dctionary of Modern Critical Terms*. Page 51. Edtd. Roger Fowler, Publication 1973.)

২ "In the broadest sense drama is simply play." (D. O. W. L. Page 105, Edtd. J. T. Shipley. Edn. 1964.)

তাহলে সংস্কৃত 'নাটক' এর সঙ্গে এর কোনো গোলযোগ হত না। কিন্তু বহুল ব্যবহারের ফলে নাটক শব্দটি আমাদের বাংলা ভাষায় এমনই এক দৃঢ় আসন লাভ করেছে যে, তার স্থানচ্যুতি এখন আর সম্ভব নয়। তাই পাশ্চাত্যের 'ড্রামা' ও 'প্লে' বোঝাতে বাংলায় আমরা নাটক, নাট্য ও দৃশ্যকাব্য এই তিন শব্দই প্রয়োজন মতো ব্যবহার করব।

নাট্যবিচার পদ্ধতি :

সাহিত্যের বিচারই এক দুরূহ ব্যাপার। ভারতীয় আলংকারিকগণ সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে গেলে 'সহৃদয়' হওয়ার কথা বলেছেন—অরসিকের কাছে কাব্যের রস-নিবেদন হাস্যকর। প্রচুর কাব্য অনুশীলনের ফলে যাঁর চিত্ত দর্পণের মতো স্বচ্ছ হয়েছে, তিনিই সহৃদয়। প্রকৃতপক্ষে সহৃদয় না হলে কাব্যবিচার অসম্ভব। সাহিত্য যেহেতু জীবনেরই রসরূপ, সেইজন্য সাহিত্যের বিচারকের জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতাও থাকা দরকার।[১] তাঁর দৃষ্টি হবে স্বচ্ছ, চিত্ত হবে গ্রহিষ্ণু, রসবোধ হবে সূক্ষ্ম। রবীন্দ্রনাথের কথায় যাঁরা "সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।"[২] সাহিত্য-বিচারই যখন এত দুরূহ, তখন তারই অন্তর্গত নাট্যশাখার বিচার দুরূহতম। নাটক মিশ্র চারুকলার অন্তর্গত—এ এক যৌথ শিল্প। শুধুই নাট্যকার-রচিত নাটকই শ্রেষ্ঠত্ব বলে বিবেচিত হতে পারে না। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একে সাফল্য অর্জন করতে হয়। নটনটী, প্রযোজক, নাট্যকার ও দর্শক—এ সকলের সহযোগিতায় নাটক দৃশ্যরূপে যখন সফল হয়, তখনই তা সার্থক। নাটকও জীবনেরই রসরূপ—কিন্তু নাট্যকারের বিশেষ জীবন-অভিজ্ঞতার তা কৌতূহলময় আকর্ষণীয় দৃশ্যরূপ। সুতরাং নাট্যবিচারের দায়িত্ব অনেক বেশী। একখানি নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে বিচারকের চিত্ত-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করলেই চলে না। আলোচ্য নাট্যটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে—এইরূপ একটি কাল্পনিক চিত্র বিচারককে চোখের সামনে রাখতেই হবে। নাটকের দৃশ্যবিশেষ পাঠ করে নাট্য-সমালোচক যে ধারণা পোষণ করেন, আর ঐ দৃশ্য অভিনেতৃবর্গের দ্বারা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হলে তাঁর ধারণা কিরূপ হবে—এ দুয়ের পার্থক্য মনে রাখতে হবে তাঁকে, কারণ নাটকটি অভিনয়ের জন্যই লিখিত—একথা কোনও সময়েই ভুললে চলে না। সুতরাং নাট্যবিচারককে শুধুমাত্র কাব্যবিচারক হলেই হবে না—অভিনয় সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

---

১. "The critic must have some knowledge of that tract of life from which the creative writer starts. That is to say, he must have understanding of what we call life itself." *The Making of Literature*.—Reprinted 1970, R. A. Scott-James p.p. 377.

২. 'সাহিত্যের বিচারক'—রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৭৪৮

যুগে যুগে রঙ্গমঞ্চের আকৃতি, সজ্জা ও রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। নাট্যকারগণ অনেকেই নাটক লেখেন, একটি বিশেষ অভিনেতা বা একটি বিশেষ অভিনয়কারী দলের কথা মনে রেখে। সুতরাং কোনও নাটক বিচারকালে যে যুগে সেটি রচিত, সেই কালের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্পষ্ট হওয়া চাই। সেই কালের দর্শকদের রুচি ও চাহিদার দিকটিকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না।

তাছাড়া আরও একটি অসুবিধা হয় নাট্যবিচারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক নাটক নিয়ে। ইস্কাইলাস সফোক্লিস, রাসিন, ভলতেয়ার, আলফিয়েরি প্রভৃতি নাট্যকারদের ক্লাসিক নাটকের সঙ্গে এলিজাবেথীয় যুগের নাটক এবং স্পেন ও জার্মানের রোমান্টিক নাটকগুলির দুস্তর ব্যবধান। এই দুই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে কলাকৌশল, প্রকাশভঙ্গী ও ভাবের আবেদনের দিক থেকে পার্থক্য এমনই যে নাট্য সমালোচককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

সমস্যা আরও আছে। প্রত্যেক জাতির স্বভাবধর্ম তার সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। তাই বিভিন্ন দেশের নাটকের মধ্যেও কিছু জাতিগত লক্ষণ থাকে। যদিও এই লক্ষণগুলি থাকা সত্ত্বেও নাট্যসাহিত্য সর্বজনীন আবেদনে নির্বিশেষ রসরূপতাপ্রাপ্ত হয়, তথাপি নাট্যবিচারকালে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা সমীচীন নয়। কোনও নাটক সার্থক বা অসার্থক এ সম্পর্কে রায় দিতে গেলে যে-জাতির নাটক তার স্বভাবধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না।

বর্তমান কালে নাটকের এত বিভিন্ন রূপ দেখা যাচ্ছে, যে নাট্যসমালোচক বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। নাটকের অজস্র শ্রেণী, ট্র্যাজিডি ও কমেডিরও কতো সূক্ষ্ম প্রকার। ট্র্যাজিডিতে মেলোড্রামা, কমেডিতে ফার্সের লক্ষণ অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে, আবার ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারগণ, অ্যাবসার্ড নাট্য-রচয়িতৃগণ ট্র্যাজিডি-কমেডির ভেদকে মানতে চাইছেন না। নানারকম "ইজম্" দ্বারাও নাট্যসাহিত্য প্রভাবিত হচ্ছে। সিম্বলিক, এক্সপ্রেশেনিস্টিক, ইম্প্রেশেনিস্টিক, সুর-রিয়েলিস্ট, রিয়েলিস্টিক, আইডিয়েলিস্টিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নাটকে যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে উঠছে, তাতে নাট্যবিচারে কোনও একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করা মুশকিল। শুধু তাই নয়, নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যেও নাটকের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে মতভেদও নাট্যবিচারকে আরও জটিল করে তুলেছে। ট্র্যাজিডি, ট্র্যাজিকমেডি, মেলোড্রামা, ফার্স, কমেডি এগুলির সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্য হয়নি। এই সমস্ত কারণে নাট্যসমালোচনার পথ যে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া দুর্গম' হয়ে উঠেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তথাপি নাট্যসমালোচনা চলছে এবং তার ধারা রুদ্ধ হবার নয়। আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছি নাটক দৃশ্যকাব্য বলে তার অভিনেয় দিকটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। নাট্যবিচারক এ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে সব সময়েই কিন্তু মঞ্চ-সফল নাটককে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। রঙ্গমঞ্চে নাটক এখন অভিনীত হয় এবং সেখানে মঞ্চ-মালিকের অর্থাগমের প্রশ্নটিও তুচ্ছ নয়।

বহুদর্শককে আকর্ষণ করবার বাহ্য কলাকৌশলও অনেক আছে। অনেক নিম্নস্তরের নাটকও অভিনেতার ব্যক্তিগত অভিনয়-নৈপুণ্যে, আলোক-সম্পাতের বিশেষ পদ্ধতিতে এবং অধিকসংখ্যক অমার্জিতরুচির দর্শকদের খুশি করার উপাদান-যোজনার দক্ষতায় বহু রজনীব্যাপী অভিনীত হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, এইরূপ মঞ্চ-সফল নাটকের সাফল্য যে-সব কারণে তার অনেকগুলি মূল নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। সুতরাং সব সময়েই মঞ্চসাফল্যের মাপকাঠিতে নাটককে সার্থক বলা সঙ্গত নয়।

তাই আমাদের মনে হয়, শুধু অভিনেয় দিকটিই নাট্যবিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য বস্তু হতে পারে না। নাটকের অভিনেয় দিকটির কথা নাট্যপাঠের সময় নাট্যবিচারকদের সব সময় মনে রাখতে হবে এবং অভিনয়-তত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র মঞ্চে তা সফল হচ্ছে কিনা—এইটুকুর ওপর নির্ভর করেই শেষ রায় দেওয়া চলবে না। নাটক যেহেতু 'দৃশ্যকাব্য' সেইজন্য তার কাব্যত্বের দিকটিও উপেক্ষা করলে চলে না। নাটকের এই দিকটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্লেগেল অনেক পূর্বে যে কথা বলেছিলেন, তা উদ্ধারযোগ্য।

"A dramatic work must always be regarded from a double point of view, how far it is poetical and how far it is theatrical."[১]

অধ্যাপক শ্লেগেল নাটকের অভিনেয় ও কাব্যত্ব দুই দিকে লক্ষ্য রেখেই নাট্য-বিচারের পক্ষপাতী। কিন্তু এক্ষেত্রেও আর একটি অসুবিধে দেখা দেয়। অনেক কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ নাটক মঞ্চ সফল হয় না আবার মঞ্চ-সফল অনেক নাটক কাব্যগুণে নিকৃষ্ট। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। কাব্যগুণে অত্যুৎকৃষ্ট অথচ মঞ্চে-অসফল নাটক 'পাঠ্য-নাটক' রূপে মর্যাদা পেতে পারে, কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ নয়। অভিনয়ে নাটকটি যদি একেবারেই না জমে, তাহলে বুঝতে হবে অভিনেয় দিকটি একেবারেই উপেক্ষিত। আবার কোনও নাটক যদি খুবই মঞ্চ-সফল হয় এবং তার কাব্যমূল্য কিছুই না থাকে, তাহলেও বুঝতে হবে এক্ষেত্রে এই দিকটি উপেক্ষিত হওয়ায় তা সার্থক নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে নাটকে কাব্যমূল্য বলতে আমরা কি বুঝব? নাটক যেহেতু সাহিত্যের অন্তর্গত, সেইজন্য নাট্যকার তাঁর বিশেষ জীবন অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপদান করবেন! আর তাঁর ঐ অভিজ্ঞতা বা ভাব রূপের মধ্য দিয়েই রসে পরিণতি লাভ করে। ভাবের এই রস-রূপদান কাব্য নাটক উপন্যাস সকল ভাষা শিল্পের প্রধান কথা। ভাবের এই রস-পরিণতি যদি সার্থকতা লাভ করে, তাহলেই তার সাহিত্যিক ধর্ম পরিস্ফুট হল।

নাটককে ছন্দে গ্রথিত করলে এবং ভাষার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করলেই যে তাতে কাব্যগুণ দেখা দেবে একথা মোটেই সত্য নয়। অলংকার প্রয়োগের দীপ্তিতে, কল্পনার লীলা-বিলাসে, ছন্দের ঝংকারে ও ভাষার আভিজাত্যে নাটককে কাব্যগুণমণ্ডিত করার

১. *A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature*—tr. John Black (1840) pp. 24, 31.

উৎসাহে নাট্যকার যদি মেতে উঠেন, তাহলেও তা প্রশংসনীয় নয়। তাহলে অধ্যাপক শ্লেগেল যাকে Poetical বা 'কাব্যিক' বলেছেন নাটককে তা করতে গেলে কী করণীয়? আসলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যে গুণে কাব্য বা সাহিত্য হয়ে ওঠে, এখানেও সেই গুণ থাকা দরকার। অধ্যাপক শ্লেগেল এ বিষয়ে যা বলেছেন তা হল প্রথমত নাট্য-রচনাটিকে সুসংবদ্ধ সন্তোষজনক স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অখণ্ডতা দান করতে হবে। একে কাব্যিক করে তুলতে হলে "It is necessary that a composition should be a mirror of ideas, that is thoughts and feelings which in their character are necessary and eternally true, and sour above this earthly life and also that it should exhibit them embodied before us."[১] অর্থাৎ রচনাটিকে হতে হবে ভাবের দর্পন—তাতে যে সব ভাব ও চিন্তা থাকবে, তা হবে চিরন্তন সত্য এবং এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতা থেকে তা ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হবে ও আমাদের সামনে তা মূর্ত হয়ে উঠবে। বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকে ঐ ভাব হবে বিভিন্ন। মোট কথা, আমরা যাকে ভাবের রসরূপ বলেছি, অধ্যাপক শ্লেগেল তাকেই কাব্যলক্ষণ বলেছেন। চরিত্র উপযোগী প্রাণময় ভাষার আশ্রয়ে, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীদের মুখে স্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত ও গতিময় সংলাপ দিয়ে নাট্যকার যখন তাঁর বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে রসরূপ দান করেন, তখন অপৃথগ্‌যত্নে নাটক-বিশেষে অলংকার, চিত্রকল্প ও কল্পনার সমৃদ্ধি যাই আসুক না কেন, তা ঐ রূপেরই অঙ্গীভূত হয়ে কাব্য-মূল্য লাভ করে। নাটকের এই মূল্যকে অস্বীকার করলে চলবে না। ভারতীয় আলংকারিক ভরত নাট্যকে দৃশ্যকাব্য বলেছেন অর্থাৎ এ দৃশ্য হলেও কবিকৃত সৃষ্টি। সুতরাং তিনিও এর কাব্যমূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

কিন্তু একথাও ঠিক যে, নাট্যকার নাট্য-রচনার সময় তার অভিনয়ের কথাও সর্বদা মনে রাখবেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়েই যখন নাটক সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনার জন্যেই যখন তা রচিত, তখন তাকে উপেক্ষা করলে চলবে কেন? নাটকের চরিত্র ও বৃত্তকে এমনভাবে রচনা করতে হবে, তার সংলাপ এমন হওয়া দরকার, যাতে অভিনেতৃগণ তাকে স্বাভাবিকভাবে চমৎকার রূপ দিতে পারেন এবং যে-অভিনয় দেখতে দর্শকেরা আগ্রহী হন এবং দেখে আনন্দ পান; অভিনয়ের ব্যর্থতায় অনেক ভালো নাটক অসার্থক হয়ে যেতে পারে একথাও যেমন সত্য, তেমনি অনেক অসার্থক নাটকও অভিনয়ের গুণে সার্থকতা লাভ করে। তথাপি রচিত নাটকটিও অভিনয়োপযোগী হওয়া সকলের আগে দরকার।

তাই নাটক বিচারের সময় তার সাহিত্যের মূল্য ও অভিনয়-মূল্য দুদিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। সাহিত্যিক মূল্য বলতে শুধুই যে তার কবিত্বের দিকটি তুলে ধরতে হবে তাই নয়—সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি যে আদর্শে রচিত, যে যে উপাদানে তার কায়া

১. *Lectures on Dramatic Art and Literature* (1801-1811) —A. W. Schlegel p. 498. B. F. Dukore সম্পাদিত 'Dramatic Theory and Criticism' গ্রন্থ

কান্তিলাভ করেছে—সে সমস্তের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন যেমন করতে হবে, তেমনি তার বিষয় রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপ্য বলে সেখানে তার প্রয়োগ কতখানি সার্থকতা লাভ করতে পারে, দর্শকদের আগ্রহ বা কৌতূহলকে ধরে রাখবার সামর্থ্য তার কতখানি, দর্শকদের মনে রচিত নাটকের কুশলবেরা কতখানি জীবন্ত হয়ে ধরা দিতে পারে, সার্থক অভিনীয়মান করে তুলতে নাটকটির বিভিন্ন উপাদান কতখানি অপরিহার্য—নাটকটির প্রত্যেকটি দৃশ্য অভিনয়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিনা—সংলাপের দৈর্ঘ্য অভিনয়ের উপযোগী কিনা—এসব কথার বিচার করতে হবে।

কিন্তু যখনই আমরা কোনো নাটক বিচার করি, তখন রঙ্গমঞ্চে তার সাফল্য অসাফল্যের দিকটিকে তেমন বড় করে দেখি না। এই দিকটির ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে নাটক-বিচারের অসুবিধাও আছে অনেক। যাঁরা নাট্যবিচার করেন, তাঁরা অধিকাংশই রঙ্গমঞ্চের খবর বিশেষ রাখেন না। যে নাটকের তাঁরা বিচার করেন, সব সময় তার অভিনয়রূপ দেখার সুযোগ তাঁদের ঘটে না। প্রযোজক, নটনটী, দৃশ্যসজ্জা, আলোকক্ষেপণ প্রভৃতির সহযোগিতায় কোন্ কোন্ দৃশ্য কোন্ কোন্ চরিত্র কেমন করে আকর্ষণযোগ্য হয়, কী কী কারণেই বা তা উপভোগ্য হয় না—রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যেই বা নাটকটিকে অভিনেতব্য করে তোলার জন্যে কী আয়োজন চলে, তার পুরো ইতিহাস তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। তাছাড়া যে নাটক আমরা বিচার করি অভিনয়ের সময় প্রযোজক তার অনেকখানি কাট-ছাঁট ও অদল-বদল করে থাকেন। অভিনয়ের সুবিধে, দর্শক-মনোরঞ্জন ও দৃশ্যবিন্যাসের সৌকর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এমন করা হয়। তাই নাটকের সর্বশেষ রূপটি অনেক সময় রঙ্গালয়-প্রভাবিত হয়েই দেখা দেয়। এই সমস্ত অসুবিধের কথা মনে রেখেই একদা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "আমাদের সাধারণ নাট্য সমালোচক এই প্রেক্ষালয়-রহস্যের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যাঁহারা নাট্যশালার ভিতরের খবর রাখেন ও নাট্যকলা প্রয়োগ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহাদের সহায়তাগ্রহণ নাটক-মূল্যায়নে অপরিহার্য।...কোন কলেজে-পড়া সমালোচক এই সমস্ত প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে বা নাটকরচনার উপর ইহাদের প্রভাব নির্ণয় করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।"[১]

তাহলে উপায় কি? সাহিত্যের দিক থেকেই নাটকের বিচার করতে হবে। কিন্তু বিচারককে যতদূর সম্ভব অভিনয়-তত্ত্ব এবং রঙ্গালয়ের খবর রাখতে হবে। বহু নাটকের অভিনয়-দেখার অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে হবে। আর নাট্যবিচারকালে নাটকের ভাববস্তুর দৃশ্যরূপ যতদূর সম্ভব অনুমান করে নিয়েই দুইকে মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

প্রত্যেক নাটকেরই একটি মূলভাব বা নাট্যকারের একটি মূল প্রতিপাদ্য কিছু

১. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা (ডঃ বৈদ্যনাথ শীল) গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়'-ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৭, সং ১৩৬৪

থাকেই। জন হাওয়ার্ড লসন একেই বলেছেন 'root-idea' বা ভাববীজ।[১] নাট্যকার সব সময় এই ভাববীজ সম্পর্কে সচেতন নাও থাকতে পারেন। তিনি মনে করতে পারেন যে, তাঁর সৃষ্টির উৎস উদ্দেশ্যহীন অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল কোনো প্রেরণা। কিন্তু এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই জন হাওয়ার্ড লসন বলেছেন, "disorganized thought cannot lead to organized activity.[২] যত স্পষ্টভাবেই হোক-না-কেন এ ভাববীজ নাট্যকারের মনে নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্বে উদিত হবে এবং রচনার সময়ে তারই বিকাশকে লক্ষণীয় করে তুলে একটি বিশেষ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হয়। একে আশ্রয় করেই নাট্যকারের ঘটনা ও চরিত্রসৃজন। ভরতের কথায় একেই বলা যেতে পারে নাটকের স্থায়িভাব। একে কেউ কেউ Themeও বলে থাকেন। এই ভাববীজকেই বৃত্তে রূপ দান করা বা তাকে জীবনাশ্রয়ী, বেগবান, কৌতূহলময় ও পরিণামমুখী কাহিনীতে পরিণত করাই নাট্যকারের কাজ।

ইউরিপিডিসের 'মিডিয়া' নাটকে নারীর প্রতিহিংসার পরিণাম, 'ম্যাকবেথ' নাটকে ম্যাকবেথের অতিরিক্ত উচ্চাশার পরিণতি, ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস'-এ বেঁচে থাকার কী মর্মান্তিক যাতনা, রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'তে তাঁর নবধর্মের মহিমা, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানে' সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত রূপ প্রভৃতি প্রতিপাদ্য ভাববীজগুলিকে লক্ষ্য করা কঠিন নয়।

এই ভাববীজ বা প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্থিরীকৃত হলে নাট্য-সমালোচককে অগ্রসর হতে হবে যে-বৃত্তের আধারে ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপের আশ্রয়ে তা রূপলাভ করেছে, বিকশিত হয়েছে সেই বৃত্তটির বিচারে। এই বৃত্ত জটিল না সরল, বৃত্তে একটিমাত্র কাহিনী আছে না একাধিক কাহিনী আছে, নাট্যঘটনা সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত গতিশীল হয়ে নাট্যক্রিয়াকে পরিণামমুখী করতে কতখানি সমর্থ হয়েছে—এসব বিচার করতে হবে। বৃত্ত বিচারের সময় নাট্যঘটনার বীজবপন, ঘটনার অগ্রগতি ও জটিলতা, ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়, ঘটনার নিম্নমুখী গতি ও উপসংহার কিভাবে রক্ষিত হয়েছে, নাটকটি কতগুলি অঙ্কে ও দৃশ্যে বা গর্ভাঙ্কে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত বিভাগ সঙ্গত হয়েছে কি না, তা দেখতে হবে। নাট্যবৃত্ত সরল হলে ঘটনাধারা কীভাবে ঘটেছে এবং জটিল হলে তাতে নায়কের ভাগ্য পরিবর্তনের মূলে অপ্রত্যাশিত অবস্থা বা পরিস্থিতি বিপর্যয় কিংবা আবিষ্ক্রিয়া কিংবা দুয়েরই প্ররোচনা আছে কিনা দেখা দরকার। নাট্যঘটনায় ঐক্য আছে কিনা, ঘটনাবলী পারস্পরিক কার্যকারণসূত্রে কতখানি গ্রথিত, আবার যেখানে একাধিক কাহিনী সেখানে মূল কাহিনীর পরিপোষক কিনা উপকাহিনীগুলি, সেগুলির মূলের সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কোন্‌টি রচনা করেছে, তাও লক্ষ্য করতে

১. "The laws of thought which underlie the creative process require that the Playwright begin with a root idea." Theory and Technique of Playwriting (1936) p. 883, B. F. Dukore Edtd. *Dramatic Theory and Criticism.*

২. Ibid. p. 883

হবে। নাট্যঘটনার অগ্রগমন লক্ষ্য করার সময় ভরত-কথিত মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি বিমর্ষসন্ধি ও নির্বহনসন্ধি এই পাঁচটি স্তরের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এখানে প্রেমকে তার যথার্থ স্থান থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিগত কামনা পরিতৃপ্তির উপকরণ মনে করায় জীবনের কী শোচনীয় পরিণাম ঘনিয়ে আসে, তাই মূল প্রতিপাদ্য বা ভাববীজ। বিক্রম-সুমিত্রার জীবনের ঘটনা এখানে একটি বৃত্তের আধারে রূপায়িত। নাটকের প্রথম অঙ্কে মুখসন্ধিতে বা ঘটনার উপস্থাপনায় বিক্রম ও সুমিত্রার সম্বন্ধের মধ্যে যে একটি বিরোধ আছে এবং তার কারণই বা কি তার আভাস দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে ঐ বিরোধকে কেন্দ্র করে ঘটনাধারার অগ্রগতি ও সুমিত্রার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে পিত্রালয় কাশ্মীর পলায়নে ঘটনার জটিলতা। তৃতীয় অঙ্কে কুমার-ইলার উপকাহিনীর সহায়তায় এবং রেবতী ও চন্দ্রসেনের কুমারকে ভাবী সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্তে ঘটনাধারায় আরও বৈচিত্র্য ও জটিলতা। চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় কুমার ও সুমিত্রার সঙ্গে রাজা বিক্রমের সাক্ষাৎ না করায় নূতন এক সংকট ঘনিয়ে উঠেছে এবং নাট্যঘটনার অগ্রগতিকে স্তিমিত হতে দেয়নি—এ অঙ্ক জুড়েও চলেছে প্রতিমুখসন্ধির বা অগ্রগতির স্তর। গর্ভসন্ধি বা চূড়ান্ত পর্যায় এসেছে পঞ্চম অঙ্কের ঘটনাধারা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর যেখানে রেবতীর হৃদয়হীনতার বীভৎস রূপ দেখে বিক্রম আত্মচৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এবং যখন থেকে তাঁর প্রতিহিংসা-পরায়ণ মূর্তি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। তারপরই বিমর্ষসন্ধিতে বা ঘটনার অবরোহণ পর্বে ঘটনা ক্ষণিকের জন্যে স্তিমিত হয়ে আবার কুমারের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে সুমিত্রার আগমনে তা গতিলাভ করে নির্বহন সন্ধিতে বা উপহারে অতিদ্রুত পৌঁছেছে। বিক্রম সুমিত্রার কাহিনী সরল নয়। রেবতীর পৈশাচিক আচরণে ও ইলার একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমায় প্রতিহিংসাপরায়ণ, কামনায় চঞ্চল রাজা বিক্রমের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে কাহিনী হয়েছে জটিল। কুমার-ইলার কাহিনী ও রেবতী-চন্দ্রসেনের কাহিনীর অনুপ্রবেশের ফলে বৃত্ত যৌগিকও হয়েছে। রেবতী-চন্দ্রসেন ও কুমার-ইলা দুইই উপকাহিনীর মর্যাদা লাভ করেছে কারণ এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মূলের অধীন ও পরিপোষক। তবে কুমার-ইলার প্রেম-কাহিনীর অতিবিস্তারে ঘটনার অগ্রগতি যে অনেকখানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাই এই কাহিনীকে ঘিরে যে-সব দৃশ্য কল্পিত হয়েছে, তারা কিন্তু মূলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। সরল বৃত্তে ঘটনাগত ঐক্য যে রকম থাকে, এখানে তা অবশ্য নেই—তবুও ঘটনাগত ঐক্য রক্ষার দিকে নাট্যকার সচেতন ছিলেন। স্থানগত ও কালগত ঐক্য রক্ষা না হলেও ভাবগত ঐক্য বা Unity of impression এতে আছে। নাটকের অন্তিমে রানী সুমিত্রার ভ্রাতা কুমারের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এসে রাজাকে উপহারদানের বিষয়টি অতি-নাটকীয় হয়ে উঠেছে, মঞ্চে এ জিনিস দেখানো হলে বীভৎস রসেরই সৃষ্টি হবে।

নাট্যবিচারে বৃত্তটির অন্তর্গত যে ঘটনা, তা কোন্ উৎস থেকে গৃহীত তা ভেবে

দেখতে হয়। যদি তা পুরাণ, ইতিহাস, সমাজ বা পরিবার থেকে নেওয়া হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী তার নাম পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সামাজিক বা পারিবারিক দিতে হবে। অবশ্য শুধুমাত্র উৎসের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই নামকরণ হয় না—ঐ সমস্ত নামে আখ্যাত করতে গেলে ঐ সকলের আত্মা বা আদর্শ কতখানি রক্ষিত হয়েছে তা দেখতে হয়। গদ্যে বা পদ্যে বা দুয়ের মিশ্রণে নাটকটি লেখা কিনা, গঠনে ও আদর্শে তা দৃঢ়বদ্ধ ক্লাসিক রীতির না শিথিলবদ্ধ রোমান্টিক রীতির, ভাবের ভিত্তিতে তা ট্র্যাজিডি না কমেডি, না ফার্স, না প্রকৃতির ভিত্তিতে মেলোড্রামা—এ সবও বিচার করতে হয়। এদিক থেকে 'রাজা ও রানী' নাটকটিকে ছদ্ম ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। এর গঠনাদর্শ রোমান্টিক রীতির, এটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি এবং প্রধানত পদ্যে এবং কিছু অংশ গদ্যে লিখিত হওয়ায় একে চম্পূ নাটক বলা চলে।

এরপর নাটকের উপাদান বিশ্লেষণ। ঘটনা যে সমস্ত চরিত্র-জাত সেই সব চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে। চরিত্রগুলি বিকাশশীল না প্রকাশশীল; নায়ক চরিত্র কে, প্রতিনায়ক কে, নায়কের পক্ষে ও বিপক্ষে কারা, নাটকের ঘটনায় যে দ্বন্দ্ব তার স্বরূপ প্রকৃতি কি, গৌণচরিত্র কোন্‌গুলি, প্রত্যেকটি চরিত্রের নাটকে প্রয়োজনীয়তা কতখানি—এই সব প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে নাট্য-বিচারককে। ট্র্যাজিডি শ্রেণীর নাটকে নায়কের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সেইজন্য সে যে-বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করছে, নায়কের সক্রিয়তা—শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক কতখানি—তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। নাটকের নামকরণ কতখানি সঙ্গত হয়েছে, নায়ক চরিত্রকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কিনা—নাটকে যদি গান থাকে, তাহলে সেগুলি নাটকের পক্ষে কতখানি অপরিহার্য, ঔচিত্য অনুযায়ী নাটকে সেগুলি সন্নিবিষ্ট কিনা,—বিচার করা দরকার।

এরপরই সংলাপ। সংলাপ এক হিসেবে নাটকের প্রাণ। চরিত্রের মুখে সংলাপ নাটককে গতিশীল করে চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে। সেগুলি যে যে পরিস্থিতিতে এবং যাদের মুখে দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও সংক্ষিপ্ত কিনা, নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির অনুকূল কিনা—এ সমস্তও বিচার্য বিষয়।

যে দৃশ্যগুলি নাটকে রয়েছে, তাদের উপযোগিতা এবং অভিনয়ের দিক থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার কথা চিন্তা করতে হবে।

নাটকের অন্তর্গত অঙ্গীরস ও অন্যান্য রস কিভাবে অনুষঙ্গী ভাবের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

সবশেষে নাট্যকার যে যে পথে বা উপায়ে নাটকটির মধ্যে নাটকীয়তার সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন—সেই সব নাট্যলক্ষণগুলির মধ্যে নাটকে যেগুলি পাওয়া যাবে সেগুলির দোষ-গুণ বিচার করতে হবে। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব ও দৃশ্যাত্মকতা ছাড়াও আকস্মিকতা, নাট্যশ্লেষ, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কীভাবে সিচুয়েশন সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে—নাটকের নানা লক্ষণগুলি নাট্যমূল্য-বর্ধনেই বা কতখানি অনুকূল হয়েছে তা দেখতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাট্য-উপাদান

বর্তমান অধ্যায়ে নাট্য-রূপ-সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানগুলিই আমাদের আলোচ্য। অ্যারিস্টটল বৃত্ত, চরিত্র, চিন্তা, ভাষা (সংলাপ) গান ও দৃশ্যরূপ—এই ছয়টিকে নাটকের প্রধান উপকরণ বলেছিলেন। এগুলির পৃথক আলোচনায় তাঁর উক্তির সমীচীনতা অবশ্যই বিচার্য।

বৃত্ত :

ইংরেজিতে যাকে Plot বলে, তাকেই আমরা বৃত্ত বলছি। বৃত্ত নাটকের এক অতিশয় অপরিহার্য ও মূল্যবান উপাদান। কিন্তু বৃত্ত বলতে কি বোঝায়? অভিধানে এর যে সংজ্ঞা আছে, তা দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক্। বৃত্ত হল সরল অথবা জটিল ঘটনাবলীর এমনই একটি কাঠামো, যাকে আশ্রয় করে আখ্যান বা নাটক রচিত হয়।[১] কেউ কেউ বলেন প্লট হল একটি সুনির্দিষ্ট অর্থবহ সাহিত্যিক শব্দ। সাধারণের কাছে এর একটি প্রিয় অর্থও আছে। শুধু সাহিত্য সমালোচকের কাছেই নয়, সকলের কাছেই প্লট বা বৃত্তের অর্থ হল, "the chain of events in a story and the Principle which knits it together!"[২] জীবনের কাহিনী বা ঘটনাই নাটকে উপস্থাপিত হয়। কাহিনীর অন্তর্গত ঘটনা-পরম্পরাকে একটি সংযোজকসূত্রে গ্রথিত করার আদর্শই হল বৃত্ত। একটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কথা মনে রেখেই নাট্যকারকে বৃত্ত-পরিকল্পনা করতে হয়। সূচনা থেকে সেই স্থির লক্ষে পৌঁছবার সংকল্প, জীবনের ঘটনাগুলিকে একটি সংযোজক সূত্রে বেঁধে দেয়। জীবনাশ্রয়ী ঘটনামালার সঙ্গতি ও ঐক্যসূত্রে গ্রথিত যে রূপ তাই হল বৃত্ত। সমালোচক আর. জি. মোল্টন বলেছেন, মানবজীবনে আছে বহুবৈচিত্র্য, অসঙ্গতি আর বিশৃঙ্খলা। বহু পূর্বে গ্রীক নাট্যকারগণ অদৃষ্টতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে জীবনের সুষমাহীন নিরবয়ব ঘটনাকে চমৎকার একটি সুষম শৃঙ্খলা-ঐক্যের ডোরে বেঁধে দিয়েছিলেন। "This application of form to human life is plot."[৩]

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—জীবনের ঘটনাকে কোন্ পরিকল্পনায়, কোন্ আদর্শে সামঞ্জস্যের সুষমায় বৃত্তে পূর্ণ করে নাট্যকার তার দৃশ্যরূপে আমাদের আকৃষ্ট করেন? এর জবাব দিতে গেলেই দেহ-লাবণ্য নয়, দেহের কঙ্কালের দিকে চাইতে হবে। নাট্যবৃত্তের বাহ্য ও আন্তর-রূপের নীরস বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হবে।

---

১. Plot is the framework of incidents, however simple and complex upon which the narrative or drama is constructed. (*D. O. W. L.*—Edtd. J. T. Shipley pp. 310.

২. *Plot* : Elizabeth Dipple, pp. 25.

৩. *Shakespeare As a Dramatic Artist* : Chap. IV pp 310-11.

বৃত্ত ও ভারতীয় আলংকারিক :

আলোচনার সূচনায় বৃত্ত, তার রূপ ও স্বরূপ এবং তার গঠনপ্রণালী নিয়ে ভারতীয় আলংকারিকেরা কি বলেছেন, তা একটুখানি আলোচনা করা যেতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত প্লট বা বৃত্তকে বলেছেন ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্তই হচ্ছে নাট্যশরীর।[১]

বিশ্বনাথ[২] এবং ধনঞ্জয়[৩] ইতিবৃত্তকে বলেছেন 'বস্তু'। ভরত ইতিবৃত্তকে নাট্যশরীর বলে তার বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। এই নাট্যশরীরকে অবলম্বন করে থাকে নাট্য-আত্মা—এরই সাহায্যে নাট্যকার দর্শকচিত্তে উদ্দিষ্ট রসসঞ্চার করে থাকেন। 'সাহিত্য-দর্পণ' ও 'দশরূপক' এ ইতিবৃত্ত বা নাট্যবস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ক. আধিকারিক ও খ. প্রাসঙ্গিক। নাটকের সকল ক্রিয়াকর্মের ফল যিনি ভোগ করেন, তিনিই অধিকারী। অধিকারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নাট্যবস্তুর নাম আধিকারিক।[৪] অধিকারী ছাড়া অধিকারীর অন্যান্য সহায়ক চরিত্রগুলির কার্য বা চেষ্টাই হল নাট্যের প্রাসঙ্গিক বস্তু।[৫] পতাকা, প্রকরী ও পতাকাস্থান—এই তিন ভাগে আবার প্রাসঙ্গিক-বস্তু বিভক্ত। আধিকারিকের কার্যের সহায়ক ব্যক্তির কার্যসমূহই পতাকা। পতাকার নিজস্ব একটা কাহিনী-মূল্য থাকে এবং তার ক্রিয়া আধিকারিকের উপকারের জন্যে অর্থাৎ তার ক্রিয়ার পরিপোষক। গর্ভসন্ধি এমন কি বিমর্ষসন্ধি পর্যন্ত পতাকার কর্ম ব্যাপ্তিলাভ করতে পারে।[৬] এখন আমরা যাকে উপকাহিনী বলি, তার সঙ্গে পতাকার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ইতিবৃত্তের ঐক্য রক্ষার দিকেও ভারতীয় আলংকারিকদের দৃষ্টি ছিল। যে ঘটনা বা যে কথা অঙ্কের মধ্যে দেখানো বা বলা যাচ্ছে না অথচ যা নাটকের প্রয়োজনে বলা আবশ্যক, তাকে যে উপায়ে বা কৌশলে সূচিত করা হত, তাকে অর্থোপক্ষেপক বলে। এর পাঁচটি প্রকার। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ। যা একদিনের মধ্যে করা অসম্ভব তাকেও অর্থোপক্ষেপকের সাহায্যে করা হত। অঙ্কের প্রথমেই নীচ বা মধ্যম শ্রেণীর পাত্রের সাহায্যে ব্যক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা নির্দেশক সংক্ষিপ্ত কথার নাম বিষ্কম্ভক। নাট্যে-উপস্থাপিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এর দ্বারা দর্শক একটা যোগসূত্র দেখতে পান। হীনবাক্য এবং নীচপাত্রের সাহায্যে হলে দুই অঙ্কের মধ্যে ব্যক্ত সংক্ষেপক কথার নাম প্রবেশক। যবনিকার অন্তরাল থেকে পাত্র যদি বস্তু সূচনা করে, তাহলে তাকে চূলিকা বলে। কোনো অঙ্কের শেষে এবং সেই অঙ্কেরই অঙ্গ হিসেবে

---

১. ইতিবৃত্তং তু নাট্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্—নাট্যশাস্ত্র, ২১।১।
২. বিশ্বনাথ—সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩. দশরূপক ১।১৬ ৪. দশরূপক ১।১৯
৫. তদেব ১।২০ সাহিত্যদর্পণ : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৫১-৫৯।
৬. অর্থোপক্ষেপকাঃ পঞ্চ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ,
চূলিকাঙ্কাবতারৌহথ স্যাদঙ্কমুখমিত্যপি ॥ সাহিত্যদর্পণ ৫৪

পাত্রগণ যদি অন্য অঙ্কের সূচনা করেন, তখন হয় অঙ্কাবতার। যেখানে কোনো অঙ্কে পরবর্তী সমস্ত অঙ্কের ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং তা বীজার্থের জ্ঞাপক হয়, তাকে অঙ্কমুখ বলে। এগুলি নিশ্চয়ই ইতিবৃত্ত-ঐক্যের অনুকূল।

বৃত্ত-অবস্থা :

ভারতীয় আলংকারিকদের মতে প্রত্যেক দৃশ্যকাব্যের বা নাট্যেরই থাকে একটি মুখ্য ফল বা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের জন্যেই নাটকের 'কার্য'। 'সাহিত্যদর্পণ'-এ বলা হয়েছে যা কাঙ্ক্ষিত, যা সাধ্য, যার জন্যে উদ্যোগ এবং যার সাফল্যে নাটকের সমাপ্তি তাই হল 'কার্য'।[১] নায়কের ঈপ্সিত কোনো ব্যাপারের সফলতার (যেমন প্রেমাস্পদকে লাভ, প্রতিপক্ষের পরাজয়, কোনো কর্তব্যসাধন—প্রভৃতি) দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যের সূচনা থেকে চলে এই কার্য। মুখ্য ফল লাভের জন্যে নাটকের পাত্র-পাত্রীগণের উদ্যম, ক্রিয়া ও গতির দরকার। কখনো সরল বা কখনো বক্রপথে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলে এই নাটকীয় গতি। সুতরাং নাট্যকার্য হল নাট্যক্রিয়া বা গতি। এই ক্রিয়া বা গতিকে আলংকারিকগণ একটি সম্পূর্ণ বৃত্তে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এগুলিই হল নাট্যবৃত্তের পাঁচ অবস্থা। আচার্য ভরতের মতে[২] এগুলি—

ক. আরম্ভ
খ. প্রযত্ন
গ. প্রাপ্ত্যাশা
ঘ. নিয়তাপ্তি
ঙ. ফলাগম।

এই পাঁচটি অবস্থার ভিতর দিয়ে নাটকের সমগ্র ফলসাধন ব্যাপারটি ঘটে থাকে।[৩] বৃত্তের যে অংশে মুখ্য ফললাভের জন্যে আগ্রহ, তাই হল 'আরম্ভ'। এখান থেকেই নাট্যঘটনাটির উৎপত্তি। নাট্যগতির এটি প্রথম অবস্থা।

এরপর যে অংশে ফললাভের জন্যে নায়কের চেষ্টা ও অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পায়, তাই হল 'প্রযত্ন'। এখানে বিষয়ান্তরের সূচনা এবং প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা করা হয়। ফলপ্রাপ্তির পথে বাধার ফলেই এখানে ফললাভের জন্যে অধিকতর আগ্রহ।[৪]

---

১. অপেক্ষিতন্তু যৎ সাধ্যমারম্ভো যদ্নিবন্ধনঃ।
সমাপনন্তু যৎ সিদ্ধৈ তৎ কার্যমিতি সম্মতম্॥ (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিঃ)

২. প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্ত্যাশ্চ সম্ভবঃ।
নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।৯)

৩. সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ সাধকস্য যঃ।
তস্যান্ পূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৯ ৭)

৪. অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো ব্যাপারঃ ফলং প্রতি।
পরমোৎসুক্যগমনং প্রযত্নঃ পরিকীর্তিতঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১১)

এটি নাট্যক্রিয়া বা গতির দ্বিতীয় অবস্থা। প্রথম অবস্থার চেয়ে এ অবস্থায় নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং নাটকের পাত্রপাত্রীদের কর্মপ্রচেষ্টাও ত্বরান্বিত হয়।

বৃত্তের যে অংশে ফলপ্রাপ্তির ঈষৎ সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানে প্রাপ্ত্যাশা অবস্থা। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতে এই অবস্থাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। বারংবার আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে ঘটনার প্রবাহ এ অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় এবং শেষে ফলপ্রাপ্তিরও অনুকূল অবস্থা ও সম্ভাবনা জেগে ওঠে।

যেখানে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত সেখানে 'নিয়তাপ্তি' অবস্থা। 'প্রাপ্ত্যাশা'য় ফললাভের সম্ভাবনা দেখা দিলেও পুনরায় বাধা এসে উপস্থিত হয় এবং সংকট দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় এবং বাধা কেটে যাওয়ায় ফলাগম সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে এখানে। আর যেখানে নাট্যক্রিয়ার শেষে ঈপ্সিত ফললাভ—সে-অবস্থার নাম 'ফলাগম'।

ভারতীয় আলংকারিকদের উক্ত ঐ পাঁচ অবস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি খুব নিবিড়। আরম্ভের আগ্রহ বা ইচ্ছাই প্রযত্নে স্থিরীকৃত চেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আবার এই চেষ্টাই নায়ককে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে নিজ প্রয়াস ও বিরুদ্ধ বাধার মধ্যেও সে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আভাস পেতে থাকে। আর এর পরেই আসে সাফল্যের নিশ্চিত আশ্বাস—যার পর ফললাভে আর কোনো বাধাই থাকে না।

দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বৃত্তের প্রথমেই দেখা যায় নায়ক দুষ্মন্তের নায়িকা শকুন্তলাকে দেখার আগ্রহ। এখানে নাট্যক্রিয়ার 'আরম্ভ'-অবস্থা। তারপর দেখা যাচ্ছে, শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তাঁর কৌশল-অবলম্বনে অধিকতর আগ্রহ—এই অংশকে বলতে পারি 'প্রযত্ন'-অবস্থা। চতুর্থ অঙ্কে দেখি দুর্বাসার ক্রোধ কণ্ডকটা প্রশমিত হয়েছে এবং দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা এখনও বর্তমান—এই অংশটি হল প্রাপ্ত্যাশা। ষষ্ঠ অঙ্কে অঙ্গুরীয়কের আবিষ্কার নায়কের মনে এনেছে অভিজ্ঞান। আর সেই সঙ্গে শকুন্তলার সঙ্গে সম্মিলনের সুনিশ্চিত আশাও দেখা দিয়েছে। এখানেই নিয়তাপ্তি। আর পরবর্তী অঙ্কে বাঞ্ছিত 'ফলাগম' ঘটেছে।

বৃত্তের অর্থপ্রকৃতি ঃ

নাট্যক্রিয়া বা গতির পাঁচ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় আলংকারিকগণ পাঁচটি অর্থপ্রকৃতির কথাও চিন্তা করেছেন। এগুলি নায়কের প্রয়োজনসিদ্ধি বা ফললাভের কারণ। এরা গতিশীল নাট্য-কাহিনীর উপাদান। এগুলি ভরতের মতে পাঁচটি[১]।

---

১. বীজং বিন্দু পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ। নাট্যশাস্ত্র,

ক. বীজ
খ. বিন্দু
গ. পতাকা
ঘ. প্রকরী
ঙ. কার্য।

বীজ হচ্ছে সেই উপাদান, যাতে ফললাভের ইঙ্গিত আভাসিত। এ থেকেই নাট্য ঘটনার উৎপত্তি। যত ক্ষুদ্রাকারেই বীজরূপে তা থাক না কেন, তা প্রবল সম্ভাবনাময় এবং ঘটনাস্রোতে ঐ বীজই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। জলে যেমন তেলের বিন্দু পতিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি 'বিন্দু' উপাদানটি নাট্যঘটনাকে বাধার মধ্য দিয়েও গতিশীল রাখে। 'পতাকা' ও প্রকরী উপাদান হল মূল বৃত্তের পরিপোষক কোনো ছোট বা বড় ঘটনার সংযোজন। নাটকের কার্যসিদ্ধির পথকে সুগম করার জন্ত প্রাসঙ্গিক ঘটনা যুক্ত করার নাম পতাকা বা প্রকরী। সংযোজিত ঘটনাটি বহুদূর ব্যাপ্ত হলে তা পতাকা এবং তা একাংশে সীমিত থাকলে তাকে প্রকরী বলা হয়। আর নাটকের বীজটির পরিণতিই হল কার্য। 'রত্নাবলী' নাটক থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ নাটকে মন্ত্রী যৌগন্ধ-নারায়ণের নিজ রাজার সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ দেওয়ার অভিপ্রায় হচ্ছে 'বীজ'। মদনমহোৎসবের পরে এই নাটকের বাগ্‌দত্ত স্বামীকে চিনতে না পেরে রত্নাবলীর তাঁর প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে 'বিন্দু'। শকুন্তলা নাটকে মৎস্যজীবী ও রক্ষী পুরুষের দৃশ্যটি হল 'পতাকা'—এ নাটকেই মাতলী কর্তৃক বিদূষকের উৎপীড়ন অংশটি প্রকরী। আর মূল বৃত্তের উদ্দেশ্য সাধক পাত্রপাত্রীর সমস্ত চেষ্টাই কার্য, কিন্তু এখানে 'ফলাগম' অংশের কার্যই উদ্দিষ্ট। এই হিসেবে 'কার্য' উপাদন বলতে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের যথার্থ ও পরিপূর্ণ মিলনের অংশে যে সব চিন্তা ও চেষ্টা তাকেই বুঝতে হবে।

বৃত্ত-সন্ধি :

নাট্যের শরীর বা বিষয়বস্তুকে আচার্য ভরত বলেছেন 'ইতিবৃত্ত'। এই শরীর বা ইতিবৃত্তকে যেমন পাঁচটি 'অবস্থায়' ভাগ করা হয়, তেমনি ঐ অবস্থা বা পর্যায়গুলি থেকে পাঁচটি সন্ধির উদ্ভব হয়। তাই ভরতের মতে নাট্যশরীরের বা তার বস্তুরও আর একদিক থেকে পাঁচটি ভাগ। এই ভাগগুলির নাম 'সন্ধি'।[১] নাট্যের এক এক অবস্থার সঙ্গে এক একটি 'অর্থপ্রকৃতি'র মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি শব্দের অর্থ হল মিলন বা সংযোগ। নাটকের অবস্থাগুলির সঙ্গে অর্থপ্রকৃতি যুক্ত হয়ে কীভাবে এক একটি সন্ধির সৃষ্টি হয় তা এইভাবে বোঝানো যায়।

---

১. ইতিবৃত্তং তু নাট্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্।
পঞ্চাঙ্গঃ সন্ধিভিস্তস্য বিভাগঃ সংপ্রকল্পিতঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৯।১)

ক. আরম্ভ + বীজ = মুখসন্ধি
খ. প্রযত্ন + বিন্দু = প্রতিমুখ সন্ধি
গ. প্রাপ্ত্যাশা + পতাকা = গর্ভ সন্ধি
ঘ. নিয়তাপ্তি + প্রকরী = বিমর্ষ সন্ধি
ঙ. ফলাগম + কার্য = নির্বহণ-সন্ধি

একটি বিশেষ পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকের বিষয়বস্তু ক্রমবিকশিত হয়। এই ক্রমবিকাশের এক একটি স্তরই হল সন্ধি। প্রত্যেকটি সন্ধি এক একটি স্তরে পরিণতি লাভ করে, নাট্যের মুখ্য পরিণতির অঙ্গ হিসেবে। তাই এমনও বলা যায় যে নাটকে মুখ্য ফল লাভের জন্যে যে গতিশীল ক্রিয়া, তারই এক একটি স্তর হল সন্ধি। এ সন্ধি প্রত্যেকটি স্তরে এক সন্ধি-পরিণতির সঙ্গে অন্যসন্ধির এবং নাটকের সামগ্রিক মুখ্যফল বা পরিণতির মিলন।

'আরম্ভ' নামক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেখানে নানা সম্ভাবনাময় বীজের উৎপত্তি সেখানেই 'মুখসন্ধি'। মুখ শব্দ বলতে বোঝায় আরম্ভ। এখানেই নাট্যবৃত্তের সূচনা। মুখসন্ধির বীজ কতকটা লক্ষিত ও কতকটা অলক্ষিত হয়ে যেখানে প্রথম দৃষ্ট বা বিকশিত সেখানেই 'প্রতিমুখ সন্ধি'। এ সন্ধিতে প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা হয় বলে বীজ বারংবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। কখনো মনে হয় বীজটিও যেন নির্মূল হয়ে গেল, আবার কখনো বীজটি প্রকাশিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এই সন্ধিতে নায়ক-নায়িকারা ফললাভের জন্য উদ্‌গ্রীব ও সচেষ্ট থাকলেও সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান থাকে। তাদের এই মানসিক অবস্থা নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। এর অবস্থা হল 'প্রযত্ন' এবং অর্থ-প্রকৃতি 'বিন্দু'।

আর এই প্রতিমুখ সন্ধিতে বীজটির বিকাশ অর্থাৎ মুখ্য ফললাভের উপায় যেখানে বারংবার হ্রাসপ্রাপ্ত বা অন্বেষণযুক্ত সেখানেই 'গর্ভসন্ধি'। প্রতিমুখের চেয়ে এই গর্ভ-সন্ধিতে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংঘাত বেশি হয়, ঘন ঘন সংকটের সৃষ্টি হয় এবং এহেন অবস্থায় নায়ক-নায়িকারা সন্ত্রস্ত ও হতাশ হয়ে পড়ে। এই সন্ধিতে নাটকের গতিবেগও সবচেয়ে বেশি। বীজের হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ ও বিকাশের চমৎকার সন্ধিস্থল এটি।[১] গর্ভে ফলের সম্ভাবনা থাকে বলেই এর নাম গর্ভসন্ধি। এর অবস্থার নাম 'প্রাপ্ত্যাশা' ও অর্থপ্রকৃতির নাম পতাকা।

পরবর্তী 'বিমর্ষ' সন্ধিতে মুখ্য ফললাভের সম্ভাবনা দেখা দিলেও অভিশাপ, আকস্মিক উৎপাত প্রভৃতির ফলে এখানে বীজের বিকাশ আবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফললাভের পথে এখানেই শেষ বাধা। ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নায়ক-নায়িকারা এখানে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন বলে এর নাম 'বিমর্ষ' সন্ধি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধা অতিক্রম করে ফললাভ হয়। এর অবস্থা হল 'নিয়তাপ্তি' এবং অর্থপ্রকৃতি 'প্রকরী'। এরপর অবস্থা ও পরিবেশ

১. গর্ভস্তু ইতিবৃত্তস্য বীজস্যান্বেষণং মুহুঃ।
স্যাদপ্রাপ্তাংগঃ পতাকা স্যাদ্ব বা স্যাৎ প্রাপ্তিসম্ভবঃ॥ (দশরূপক)

অনুকূল হয়ে আসে। তখন সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ মুখ্য ফলের দিকে ধাবিত হয়। তাই বীজোদ্ভিন্ন বিষয়সমূহ একটি পরিণামী অর্থে যেখানে লীন হয় অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তি যেখানে হয়, তাই হল নির্বহণ-সন্ধি বা উপসংহৃতি। নাট্যক্রিয়া এখানেই শেষ হয় বলে এর নাম নির্বহণ বা উপসংহৃতি। এর অবস্থা হল 'ফলাগম' এবং অর্থ-প্রকৃতি হল 'কার্য'। কিন্তু এইখানেই আমাদের আলংকারিকদের বক্তব্যের শেষ নয়। এই পাঁচটি সন্ধিকে তাঁরা ৬৪টি উপবিভাগে বিন্যস্ত করেছেন। আপাতত আমাদের সে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত আলংকারিকদের এই পঞ্চ-সন্ধি বোঝানোর জন্যে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

কলিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কে সেনাপতির বিদায় পর্যন্ত অংশ মুখসন্ধি। ইংরেজীতে একে 'Opening' বলা চলে। বিদূষকের কাছে দুষ্মন্তের প্রণয়কথা ব্যক্ত করার পর থেকে তৃতীয় অঙ্কের শেষ পর্যন্ত প্রতিমুখ সন্ধি (Progression)। সমগ্র চতুর্থ অঙ্ক ও পঞ্চম অঙ্কে গৌতমী কর্তৃক শকুন্তলার মুখের আচ্ছাদন উন্মোচন পর্যন্ত অংশ হল গর্ভ সন্ধি (Development)। এখান থেকেই দুর্বাশার শাপ দুষ্মন্তের মনকে আচ্ছন্ন করে এবং শকুন্তলাকে পেয়েও তিনি আনন্দের পরিবর্তে চিন্তিত ও তাঁকে গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ষষ্ঠ অঙ্ক পর্যন্ত—এই অংশই হল বিমর্ষ সন্ধি (Pause)। আর সপ্তম অঙ্কে দুজনের মিলনে নির্বহণ-সন্ধি (Conclusion)।

আমাদের আলংকারিকদের এই সন্ধি বিভাগটি খুবই মূল্যবান। তাঁদের নাট্যবৃত্তকে 'অবস্থায়' বিভাগের মধ্যেও যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁদের 'অর্থপ্রকরী'গুলি এবং সন্ধির ৬৪টি উপবিভাগের চিন্তা অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ-অনুসন্ধানের মধ্যে প্রাচীন আলংকারিকদের মৌলিক নৈয়ায়িক চিন্তাশীলতার পরিচয় থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলির উপযোগিতা একালের নাট্যবিচারে আজ আর আছে বলে মনে হয় না—বিশেষত বাংলা নাটকের আলোচনায়। তাছাড়া পতাকা, প্রকরী ও কার্যের সঙ্গে প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম অবস্থার সম্পর্ক অনেক নাটকে অনুসন্ধান করা খুবই কঠিন।[১]

বৃত্ত ও পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল :

অ্যারিস্টটল 'The Art of Poetry' গ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদে নাটকের বৃত্ত ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নাটকের আত্মা এই বৃত্ত হবে 'সম্পূর্ণ' এবং 'এক'। সম্পূর্ণ বলতে বোঝায় আদি মধ্য ও অন্ত্য সমন্বিত বৃত্ত। অর্থাৎ তাঁর মতে বৃত্তের তিনটি অংশ :

---

১. "There are five elements of the plot (Arthaprakriti), which the theory not very accurately parallels with five stages of the action."

(*The Sanskrit Drama*—A. B. Keith, Reprint 1934. Oxford University Press).

ক. বৃত্তের আদিপর্ব

খ. বৃত্তের মধ্যপর্ব

গ. বৃত্তের অন্ত্যপর্ব।

তাঁর মতে আদি হল সেই পর্ব যা কোনো কিছুর পূর্ববর্তী নয় এবং স্বাভাবিকভাবেই যার পরে কিছু আছে। অন্ত্য হল সেই পর্ব যা কোনো কিছুর স্বাভাবিক পরিণাম এবং যার পরে আর কিছু নেই। আর মধ্য হচ্ছে সেই পর্ব যা স্বভাবতই কোনো কিছুর পরবর্তী এবং যার পরেও কিছু আছে। তাই অ্যারিস্টটলের মতে বৃত্তটি হবে ঘটনার কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত এবং তা তিন ভাগে বিভক্ত।[১]

এই বিভাগ ছাড়াও অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ট্রাজিডির আলোচনায় বিশেষ লক্ষ্যকেন্দ্রিক নাট্যঘটনাকে দু ভাগে ভাগ করেছেন।[২]

ক. গ্রন্থিবন্ধন-পর্ব বা জটিলতা সৃষ্টি (Complication)

খ. গ্রন্থি-উন্মোচন পর্ব (De'noument)

নাট্যবৃত্তেঘটনার সূচনা থেকে নায়কের ভাগ্য-পরিবর্তন-মুহূর্তের পূর্ববর্তী পর্যন্ত সমস্ত কিছু ঘটনাকে নিয়ে গ্রন্থি-বন্ধন পর্ব। আর ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অংশের ঘটনা গ্রন্থি-উন্মোচন পর্ব। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই দুই পর্ব যেখানে এসে মিশছে সেখানে একটি মুহূর্ত নিশ্চয়ই আছে—আর তাই হল ঘটনার চূড়ান্ত রূপ। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে সে-কথা বলার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, এখানেও অ্যারিস্টটল নাট্য ঘটনার তিনটি ভাগের কথাই ইঙ্গিত করেছেন।

Poetics-এর দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ট্রাজিডির পরিমাণগত অংশগুলির আলোচনায় তিনি একে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন।

ক. প্রলোগ (Prologue)

খ. প্যারোড (Parode)

গ. এপিসোড (Episode)

ঘ. স্ট্যাসিমন (Stasimon)

ঙ. একসোডাস (Exodus)

প্রথমেই 'প্রলোগ' এ থাকে গান—যা কোরাসের আবির্ভাবের সূচনা করে। এরপরই 'প্যারোড' বা কোরাসের প্রথম বিবৃতি ; তারপর 'এপিসোড'—যা হল নাট্য-কাহিনী, এরপর 'স্ট্যাসিমন'—কোরাস গান, আর একসোডাস হল শেষ কোরাস গানের

---

১. Poetics Chap. VII.

২. By complication, I mean all from the beginning of the story to the point just before the change in the heroe's fortunes : by de'noument, all from the beginning of the change to the end.—*The Art of Poetry chap.* 18.

পর যা ঘটে অর্থাৎ, 'Completion of the Performance.'[১] পূর্ণাঙ্গ ট্রাজিডির গঠন বোঝাতে অ্যারিস্টটল এই যে পাঁচ বিভাগের কথা বলেছেন, তা কখনই নাট্যবৃত্তের বিভাগ নয়। কারণ ঐ বিভাগে 'গ' অংশে তিনি নাট্যকাহিনীকে (Plot) আলাদা-ভাবে চিহ্নিত করেছেন। মঞ্চে যখন নাটকের অনুষ্ঠান হত, তখন এই পাঁচটি ক্রম অনুযায়ী তা সম্পন্ন হত, এই দিকটিই এখানে নির্দেশিত হয়েছে। তাই বৃত্তের গঠন পরিকল্পনায় অ্যারিস্টটলের বিভাগ তিন বলেই ধরতে হবে। তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত্য পর্বের বিভাগও যেমন, গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থি-উন্মোচনও তেমনি তিনটি বিভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জন ড্রাইডেন :—Poetics-এ কোথাও উল্লিখিত না থাকলেও জন ড্রাইডেন তাঁর An Essay of Dramatic Poesy (1668) তে Eugenius-এর মুখে জানিয়েছেন যে অ্যারিস্টটল নাট্যবৃত্তকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন।[২]

ক. প্রোটাসিস (Protasis)—প্রবেশ : এখানে চরিত্রগুলির উপর সামান্য আলোকপাত হয়।

খ. এপিটাসিস (Epitasis)—ক্রিয়া : এখানে নাট্যঘটনা উত্তপ্ত হতে থাকে।

গ. ক্যাটাসটাসিস (Catastasis)—পূর্ণ অগ্রগতি : এখানে আশাভঙ্গ ও নাট্য-ক্রিয়ায় বাধা।

ঘ. ক্যাটাসট্রফি (Catastrophe)—বৃত্তের সব কিছু শেষে পৌঁছয় এখানে। এবং "It ends with that resemblance of truth and nature, that the audience are satisfied with the conduct of it"[৩]

এ. সি. ব্র্যাড্‌লি :

অনেক পরে বিখ্যাত শেক্সপীয়ার সমালোচক এ. সি. ব্র্যাড্‌লি শেক্সপীয়ারের ট্রাজিডি আলোচনায় ট্রাজিডির প্লট বা বৃত্তকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছিলেন।[৪]

ক. ঘটনার আবরণ উন্মোচন : (Exposition) ঘটনাবস্তুর সেই অবস্থা যা থেকে দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হবে।

খ. সুনির্দিষ্ট সূচনা : (Definite beginning) ঘটনার বিকাশ ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ।

গ. পরিণাম : (Catastrophe) ঘটনার ফল।

---

১. *The Principles of Criticism.*—Chap. X Drama W. B. Worsfold pp. 187, Edn 1923.

২. Aristotle indeed divides the integral parts of the play into four.—Jhon Dryden.

৩. Ibid. pp. 321. *Damatic Theory and Criticism.* গ্রন্থে সংকলিত।

৪. *The Shakespearean Tragedy.* A. C. Bradley pp. 39.

জর্জ বার্নাড শ :

The Technical Novelty in Ibsen's plays (1913)-এ জর্জ বার্নার্ড শ নাট্যবৃত্তকে আধুনিক যুগে তিনটি ভাগে ভাগ করতে চেয়েছিলেন—[১]

ক. সূচনা (Exposition) পর্ব
খ. পরিস্থিতি (Situation) পর্ব
গ. আলোচনা (Discussion) পর্ব ;

সিদ্ধান্ত : এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে নাট্যবৃত্তের বিভাগ 'তিন' করলেও ভুল হয় না—এবং বেশ কিছু নাটক আছে যেগুলিকে তিনের অধিক ভাগে ভাগ করার অসুবিধে অনেক ; তাই অ্যারিস্টটল যে তিন ভাগ করেছেন কিংবা ব্র্যাড্‌লি যে তিন ভাগ করেছেন, তা গ্রহণ করা চলতে পারে। আয়তনে সংক্ষিপ্ত নাটকের পক্ষে এই বিভাগ খুবই কার্যকরী। কিন্তু যেখানে নাটক পাঁচ অঙ্কের কিংবা তারও বেশী যেমন আমাদের সংস্কৃত নাটক, সেখানে ভরতের মতো পঞ্চসন্ধির বিভাগ করাটাই অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। অবশ্য ভরত যে ভাবে এক একটি সন্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা দ্বন্দ্বমুখর নাটকগুলিতে প্রয়োগ করা সহজ নয়। তাই অনেকেই তাঁর উল্লিখিত সন্ধির নামগুলি গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার পরিচয় দিয়েছেন পাশ্চাত্য মতে।[২] পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ জার্মান নাট্যতাত্ত্বিক গুস্তাভ ফ্রেতাগ দ্বন্দ্বাত্মক নাট্যবৃত্তকে যেভাবে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করেছেন, তা খুবই মূল্যবান। নাট্যবৃত্ত বিচারে তাঁর সেই বিভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীতও হয়েছে। আমরাও বাংলা নাটকের বিচারে সেই বিভাগ গ্রহণের পক্ষপাতী।

জি. ফ্রেতাগ ও বৃত্ত :

গুস্তাফ ফ্রেতাভ (Gustav Freytag) তাঁর অতিশয় খ্যাত Technique of the Drama (1863) গ্রন্থে পিরামিডের ছকে নাট্যঘটনার সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত অংশকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি পর্বের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছকটি পর পৃষ্ঠায় প্রথম ছবিতে দেখানো হল।

---

১. Formerly you had in what was called a wellmade play an exposition in the first act, a situation in the second and unravelling in the third. Now you have exposition, situation and discussion, and the discussion is the test of the playwright. *Dramatic Theory and criticism* : Edtd. B. F. Dukore গ্রন্থে সংকলিত pp. 639.

২ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য

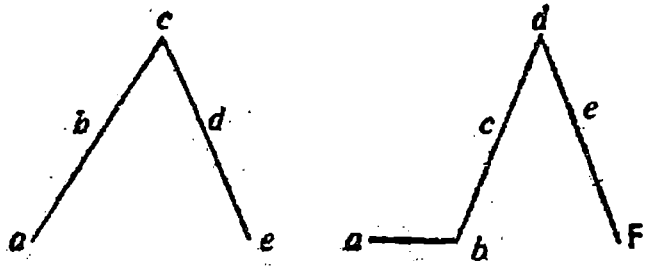

ছবিতে a=Introduction—প্রস্তাবনা পর্ব।

b=Rise—আরোহ পর্ব।

c=Climax—চূড়ান্ত পর্ব

d=Return or fall—অবরোহ পর্ব

e=Catastrophe—পরিণাম পর্ব।

পরবর্তীকালে ফ্রেতাগের ঐ নামগুলির বিকল্প নামও কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর Introduction-এর পরেই নাট্যঘটনার সূচনাকে নির্দেশ করেছেন। আর তার নাম দিয়েছেন 'Initial incident'. ফ্রেতাগের Rise-এর বদলে Rising action বলে পর্বটিকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। Climax ছাড়াও Crisis বা Turning Pointও বলা হয়েছে Climax পর্বকে। Catastrophe-কে Resolution বা Denoumentও বলা হয়েছে। ফ্রেতাগ বলেছেন ঐ পাঁচটি-পর্ব তো নাটকে থাকেই, তাছাড়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের প্রভাবও থাকে। এইগুলির দ্বারা পর্বগুলিকে যুক্ত বা বিযুক্ত করা যায়। এদের দ্বারা তিনটি নাট্যমুহূর্তের (Dramatic moment) সৃষ্টি হয়। এদের প্রথমটির অবস্থান a ও b এর মধ্যবর্তী স্থানে—এটি নাট্যঘটনা-সূচনার ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ এটি Introduction ও Rise-এর মাঝখানে। দ্বিতীয়টি c ও d অর্থাৎ Climax ও Rise-এর মধ্যবর্তী—এখানে Counteraction বা প্রতিক্রিয়ার সূচনা। তৃতীয়টি Catastrophe-র পূর্বে d ও e-এর মাঝখানে অর্থাৎ return ও Catastrophe-র মধ্যে আরও একবার দেখা দেয়—নাট্যমুহূর্ত। ফ্রেতাগ এই তিনটিকে Crisisও বলেছেন। সমালোচক হাডসন 'Initial incident'-কে আরও একটি পর্ব মনে করেন, তাঁর বিভাগে বৃত্তের সূক্ষ্ম ছয় ভাগ। ফ্রেতাগের চিত্রের পাশে তা দেখানো হয়েছে। আমরা এই ছয়টি ভাগের যাথার্থ স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত। আরও মনে রাখা দরকার যে ঘটনার Climax মাঝখানে হলে (পাঁচ অঙ্কের নাটকে) তবেই উপরিউক্ত ছক গ্রহণযোগ্য। নইলে পিরামিড-ছকটির আকৃতির একটু পরিবর্তন হবে। গুস্তাভ ফ্রেতাগের এই নাট্য-বৃত্ত বিভাগের পশ্চাতে দ্বন্দ্বাত্মক বৃত্তের কথা সব সময় মনে রাখা হয়েছে। তিনি যাকে Introduction বা প্রস্তাবনা বলেছেন, বৃত্তে তার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। হাডসন একে Expositionও বলেছেন। অভিনেতব্য

নাটকটিকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে যে সব তথ্য বা সংবাদ দর্শকের জানা প্রয়োজন, এই পর্বে তা জানানো হয়।[১] নাটকের যে সমস্ত প্রধান চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখের কাহিনীকে সে উপভোগ করতে চলেছে, তা এখনও তার পরিচিত নয়। তাই চরিত্রগুলির পরিচয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কি—এসব কথার একটু আভাস দেওয়া হয় ঐ প্রস্তাবনায়। নাট্যঘটনা-সূচনার পথ কেটে দেয় এই পর্ব। এই কারণেই অনেক নাটকের প্রথম দৃশ্যটি একটুখানি ব্যাখ্যামূলক হয়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে যেমন সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাটকে প্রলোগের (Prologue) সাহায্যে এই প্রস্তাবনার পর্বটি নিষ্পন্ন হত। নাট্যঘটনার সঙ্গে এর নিবিড় যোগ রক্ষা করা হত Prologueগুলিতে। কিন্তু ইউরিপিডিস ও সেনেকার বিচ্ছিন্ন Prologueগুলিকে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে হয় না। শেক্সপীয়রে এসে এই প্রস্তাবনা নাটকীয় গতিবেগ লাভ এবং নাট্যঘটনার সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অবশ্য প্রস্তাবনাপর্বকে সংক্ষিপ্ত, নাটকীয় ও নাট্যঘটনার অঙ্গীভূত হতে হবে। নাটকের প্রথম দৃশ্যটিতেই নাট্যকারকে প্রস্তাবনার কাজটি সেরে নিতে হয়। তাই এ দৃশ্য রচনা খুবই শক্ত—আর শেক্সপীয়ার এই দৃশ্য রচনায় অসামান্য কৃতী। ফ্রেতাগ এই প্রস্তাবনা সম্বন্ধে বলেছেন, "A clearly defining keynote, a finished scene, a short transition into the first moment of the excited action."[২] নাটকের প্রথম দৃশ্যেই নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনা সূচিত হয় এবং তা শেষ হতে না হতে নাট্যঘটনার ক্রিয়াও শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রস্তাবনার মধ্যেই Initial incident শুরু হতে পারে, আবার তা পরেও হতে পারে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকটির ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে আমরা এই প্রস্তাবনাকে সুন্দরভাবে পাই। সাধুচরণ ও গোলোক-বসুর কথায় জানা গেল নীলকরগণ কিরূপ অত্যাচার শুরু করেছে। ছোট বড় সকল গৃহস্থই এ অত্যাচারে জর্জরিত। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের দুর্গতির কথাও জানা গেল। নাট্যে যে সংঘর্ষ আসন্ন তার মূল কারণ জানা গেল। নবীনমাধবের চরিত্রের মনোবলের পরিচয় মিলল। কুঠিতে নবীনমাধবের যাত্রা ও বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তনে নাট্যঘটনাও সূচিত হয়েছে। প্রস্তাবনাটি নাতিদীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয় ও নাট্যঘটনার জৈবিক অঙ্গ। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এইরূপ প্রস্তাবনা ও প্রাথমিক নাট্যঘটনার সুন্দর সম্মেলন লক্ষ্য করি। দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব এদিক থেকে খুব বেশী। তাঁর 'সাজাহান' ও 'নূরজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্য এর দৃষ্টান্ত। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্য, বিল্বমঙ্গল নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্য, দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান, সাজাহান, প্রতাপসিংহ

---

১. *An Introduction to the study of Literature*, pp. 209, Edn. 1944.

২. *Technique of the Drama* : G. Freytag, Chap. II, p. 812, *Dramatic Theory and Criticism* : Edtd. B. F. Dukore-এর গ্রন্থে সংকলিত।

প্রভৃতি নাটকেরও ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে প্রস্তাবনা ও প্রাথমিক ঘটনাসংঘাতের সংকার সমন্বয় হয়েছে।

Rising action বা আরোহ পর্বে নাট্যঘটনা গতি এবং জটিলতা দুইই লাভ করে। সাধারণত পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে প্রায় তৃতীয় অঙ্কের দু'একটি দৃশ্য পর্যন্ত এই পর্ব। ঘটনাকে চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে গিয়েই এই পর্বের দায়িত্ব শেষ। চূড়ান্ত পর্বে যে সমস্ত উপাদানগুলি প্রাধান্যলাভ করবে সেইগুলিকে, আরোহপর্বে সাধারণত নির্দেশ করতে হবে। ফ্রেতাগ বলেন এই পর্বে মনে রাখতে হবে নাট্যক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, প্রধান পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের মর্জি, ভাবাবেগ বা জটপাকানো নাট্যঘটনা একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে এই পর্বে বেগ লাভ করে।[১] নীলদর্পণ নাটকের ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্ক থেকে ৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের হাত থেকে নবীনমাধবের উদ্ধারের পূর্ববর্তী অংশই আরোহ-পর্ব। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকে ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্য থেকে ষষ্ঠ দৃশ্য পর্যন্ত সামান্য অংশই আরোহপর্ব।

এর পরেই দেখা দেয় নাট্যঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়। পূর্ববর্তী ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে বা ঘটনার স্বাভাবিকতার পথ ধরে এই অবস্থাটি আসে। একে climax, crisis বা turning point বলে। এখানটি এমন একটি বিন্দু—যেখান থেকে নায়কের জীবনে ভাগ্য-পরিবর্তনের সূচনা। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার দোটানায় নায়ক আর থাকবে না—ভালো কিংবা মন্দ একটা দিকে তার ভাগ্য ঝুঁকবে। এখান থেকে ট্রাজিডি-নায়কের পরাভবের সূচনা ও কমেডি-নায়কের জয়ের সূচনা। আরোহ-পর্বের ফলাফল সুনিশ্চিতভাবে এই পর্বে দেখা দেয়। ফ্রেতাগ বলেন একটি উৎকৃষ্ট সম্প্রসারিত দৃশ্যের এটি এমন একটি অতি উজ্জ্বল বিন্দু যা আরোহ-পর্বের ও অবরোহ-পর্বের কতকগুলি ছোট ছোট দৃশ্যকে ধরে রাখে।[২] নাট্যকারকে তার কবিশক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিতে হয় এখানে। নায়কের জীবনে এই বিন্দুতেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংকট, তাই একে Crisis বলে। একে climax বলার কারণ চূড়ান্ত একটি বিন্দুতে ঘটনার ক্রমারোহণ এখানেই। কিন্তু এই নামটি বোধ হয় খুব সার্থক নয়।[৩] কারণ climax শব্দের মূল অর্থ সোপান। সুতরাং নায়কের ভাগ্য পরিবর্তন-সূচনার দিকে ঘটনার অগ্রগতিকে নিয়ে যাবে climax, বিন্দুটিতে নয়।[৩] তাই turning point বা গ্রীক

১. The action has been started, the chief persons have shown what they are, the interest has been awakened, Mood, Passion, involution have received an impulse in a given direction.—*Technique of the Drama*: Chap. II. P. 814

২. It is almost always the crowning point of a great, amplified scene, enclosed by the smaller connecting scenes of the rising and of the falling action. *Ibid.* P. 814

৩. The word climax—is really unsatisfactory. *An Introduction to the study of Literature.* Hudson p. 200.

peripeteia শব্দটি অধিকতর সার্থক। একে Crisis বা সংকট বলাও চলতে পারে। জন.দাওয়ার্ড লসনের কথায় সংকট হল নাটকীয় এক বিস্ফোরণ—লক্ষ্য ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান দেখা দিলেই এর উৎপত্তি।[১] শেক্সপীয়ারের নাটকে সাধারণত তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই ঘটনার চূড়ান্ত-বিন্দুটি লক্ষ্য করা যায়। তবে কোনো কোনো নাটকে তা চতুর্থ অঙ্কের গোড়ার দিকেও লক্ষণীয়। 'ম্যাকবেথ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই climax—যেখানে Fleance-এর পলায়নের পর Banquo-র প্রেতাত্মার আবির্ভাবে ম্যাকবেথের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সূচনা করছে, 'ওথেলো' নাটকে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানে ওথেলো তার স্ত্রীর আনুগত্যহীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে 'জুলিয়াস সীজারে' তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানে সীজারের মৃত্যু ঘটছে, 'কিংলীয়ারে' ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যেই যেখানে লীয়ার দুই কন্যার স্তাবকতায় খুশী হয়ে তাদের সাম্রাজ্য দান করছেন ও কনিষ্ঠা কর্ডেলিয়াকে ভুল বুঝছেন। বাংলা নাটকেও ক্লাইম্যাক্স-সৃষ্টিতে অনেক নাট্যকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেবের হৃদয়হীন লোলুপতা ও পাশবিকতার হাত থেকে ক্ষেত্রমণিকে নবীনমাধবের উদ্ধারের দৃশ্যে, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রতিমার চরণতলে মাথা রেখে রঘুপতির আর্তনাদে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে, যেখানে ভারতসম্রাট, পুত্র আরঙ্গজীবের হাতে আগ্রার দুর্গে বন্দী ও পৌত্র মহম্মদের তত্ত্বাবধানে দুর্গের বাইরে আসতেও অসমর্থ, সেখানে, গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যোগেশের সর্বস্ব রক্ষিত রিয়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের ফেল হওয়ার দুঃসংবাদে, রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলির প্রায় শেষ দৃশ্যে ঘটনায় (crisis বা turning point) সংকট বা আবর্তনমুখ দেখা গেছে।

ঘটনার অবরোহণ পর্বে নাট্যদ্বন্দ্বের অবসানকাল। ট্রাজিডিতে নায়কের বিরুদ্ধে যে অশুভ শক্তি বাধার মধ্য দিয়ে এতক্ষণ অগ্রসর হচ্ছিল, এখানে তা সম্পূর্ণরূপে বাধামুক্ত। এই শক্তি স্বাধীনভাবে এখন নিজের শক্তি প্রয়োগ করে চলবে। কমেডিতেও যাবতীয় বাধা, বিপত্তি, ভুল বোঝাবুঝি এই পর্বে দূরীভূত হয়ে নায়ক-নায়িকার জীবনে শুভ লগ্নকে আসন্ন করে তুলবে। এই পর্বের সূচনা হলেই নাট্যকৌতূহল রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। দর্শক বুঝতে পারে ঘটনাধারা কোথায় চলেছে, তার পরিণামও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকার জীবনে দু' একটি অপ্রত্যাশিত বাধাকে এনেও অনেক সময় নাট্যোৎকণ্ঠা রক্ষার কেউ কেউ চেষ্টা করেন। কখনো কোনও একটি পথে নায়ক বিপর্যয়কে এড়াতে পারে—এর ইঙ্গিত দিয়ে ঘটনাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে নন্দের হত্যা দৃশ্যে ঘটনা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাওয়ার পর ঘটনাধারার বেগ যখন মন্দীভূত, তখন নাট্যকার চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত ও

১. —The crisis, the dramatic explosion, is created by the gap between the aim and the result" *Theory and Technique of Play writing.*

গ্রীক-হিন্দু সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে এসে নাট্যবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ কাজ সহজ নয় বলেই অনেক নাট্যকার সংকট-পর্বকে বিলম্বিত করে এই পর্বটিকে সংক্ষিপ্ত করেন। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে বিক্রমের আত্মচৈতন্য লাভের মধ্য দিয়ে ঘটনার আবর্তনমুখ (turning point) দেখানো হয়েছে, অবরোহণ পর্বকে অতি সংক্ষিপ্ত করার জন্যে।

সবশেষে নাট্যঘটনার অন্তিম পরিণাম। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববর্তী ঘটনাধারার পরিণতি এখানে। দর্শক এই সমাপ্তি-পর্বে এসে যেন একটা সম্পূর্ণতার বোধ লাভ করে। 'এই অংশে অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছু থাকবে না—একে সংক্ষিপ্ত ও অনলঙ্কৃত করতে হবে। ফ্রেতাগের কথায় "The catastrophe contains only the necessary consequences of the action and the characters."

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের অন্তিম দৃশ্য এবং 'নূরজাহান' নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যে পুত্রের জন্যে সম্রাট সাজাহানের জীবনে মর্মান্তিক ট্রাজিডি সেই আরঙ্গজীব ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসেছে তাঁর কাছে। তিনি তাকে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ক্ষমা করছেন। কন্যা জাহানারাকেও তিনি ক্ষমা করিয়েছেন—কিন্তু দারার কন্যা জহরৎ-উন্নিসা কিছুতেই ক্ষমা করল না—তিনজনেই 'শির অবনত' করেই রইলেন। পিতা ও সম্রাটের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে সাজাহানকে নাটকে বরাবর দেখেছি, এখানেও সেই একই ব্যক্তি। ক্ষমা করে ক্ষণিকের স্বস্তি পিতা পেতে চেয়েছিলেন। যদি পেতেনও তবু যে তা স্থায়ী হত না, তা তিনি জানতেন। মৃত দারা, মোরাদ, সুজার কথা মনে পড়লেই বেদনার নীরন্ধ্র অন্ধকার, আর তাদের কথা এই দৃশ্যে মনে এলেও জোর করে তাদের কথা চাপা দিয়ে আরঙ্গজীবের পিতা আরঙ্গজীবকে চোখের সামনে পেয়ে ক্ষমা করেছে—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এসে আরঙ্গজীবের সমস্ত অপকীর্তিকে তুলে ধরেছে জহরৎ—সে সত্যকে দারার পিতা অস্বীকার করতে পারেননি। এর নাম কি স্বস্তি? সাজাহানের এই ক্ষণিকের ক্ষমা এবং আরঙ্গজীবের ক্ষমাপ্রার্থনা দুইই ঘটনাধারার স্বভাবিক পরিণাম। আসফ, লায়লা, শারিয়ার, খাদিজা ও নূরজাহানের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নূরজাহান নাটকের অন্তিম দৃশ্যে ঘটনাধারা চমৎকার শমে এসে পৌঁছেচে—অপ্রকৃতিস্থা নূরজাহান বুঝতে পেরেছেন নিজের কৃতকর্মের পরিণাম—প্রবৃত্তিকে বা কামনাকে রোধ করার তাঁর শক্তি ছিল না। অন্ধ স্বামীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে লায়লা। ভয়াবহ শূন্যতা আর গভীর অন্ধকারের মাঝখানে কন্যা লায়লার হৃদয়স্পর্শী মধুর স্নেহ-ভালবাসা ও সেবার কথাগুলি নাটকীয় বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে দর্শককে ঘটনাধারার শেষ পরিণামে নিয়ে গেছে।

বৃত্ত-অঙ্ক ও দৃশ্য :

রোমক নাট্যকার সেনেকার সময় থেকে নাটককে পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত করার রীতি চলে এসেছে। কার হাতে প্রথম এই রীতিটি গৃহীত হয়েছিল, এ নিয়ে পণ্ডিতদের

মধ্যে মতভেদ আছে। সেনেকার পূর্ববর্তী নাট্যকার প্লটাসেও এই রীতি অবলম্বিত হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। তারও পূর্বে মিনাণ্ডারেও এ রীতি অনুসরণের প্রমাণ আছে। কিন্তু সে বিতর্কে না গিয়ে বলা চলে সেনেকা ও টেরেন্সের হাতেই এই রীতিটি বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং তারপর থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত নাট্যরচনায় ঐ রীতিটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে এসেছে।[১] শেক্সপীয়ারে দৃশ্য ও অঙ্ক বিভাগ (পঞ্চাঙ্ক) দুই-ই দেখা যায়। উনবিংশ শতকে ইবসেনের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত এই আদর্শ মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছে। ইবসেনের নাটকগুলি নানা অঙ্কের, কিন্তু দৃশ্য নেই। ইবসেনের রীতিতে অনেক আধুনিক নাট্যকার নাটক লেখেন। সাংকেতিক নাটকগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কবিভাগ না করে দৃশ্যবিভাগ করেছেন। 'শারদোৎসব'-এর দুটি বড় দৃশ্যকে যদি অঙ্ক মনে করি, তাহলে একে অঙ্ক-বিভক্ত বলা যায়। কিন্তু 'রাজা'য় ২০টি ও 'অচলায়তনে' ৬টি দৃশ্য আছে। 'ডাকঘরে'র মাত্র তিনটি দৃশ্য। 'ফাল্গুনী'তে প্রথমে সূচনা, তারপর প্রথম দৃশ্যের গীতি ভূমিকা, প্রথম দৃশ্য, দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি ভূমিকা, দ্বিতীয় দৃশ্য, এইভাবে ৪টি দৃশ্য—প্রত্যেকটির আবার পৃথক নাম। 'মুক্তধারা'র সব ঘটনা পথেই। 'রক্তকরবী'তে দৃশ্য একটি মাত্রই। পাশ্চাত্যের আদর্শে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকে ক্রমশ চার অঙ্ক বা তিন অঙ্কের নাটক খুব প্রচলিত হয়েছে। দৃশ্যবিভাগ অবশ্য আছে।

মনে রাখতে হবে, নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের বিভাগ বৃত্তের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিন্তু করা হয়নি। ভরতের নাট্যবৃত্তের পঞ্চপর্বিক বিভাগ নাটক ও প্রকরণের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। কিন্তু নাটক বা প্রকরণের অঙ্কসংখ্যা 'পাঁচ'-এ নির্দিষ্ট নয়; দশ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যে নাট্যঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ। পাশ্চাত্যে এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ বহুকাল প্রচলিত থাকার পর, আধুনিক কালেই অঙ্কসংখ্যার তারতম্য দেখা দিয়েছে—ট্রাজিডি ও কমেডি রচনার ক্ষেত্রে। একাঙ্ক ও ফার্সের অঙ্কসংখ্যা উদ্ভবকাল থেকেই স্বতন্ত্র; একাঙ্কে তো একটিই অঙ্ক থাকবে—আর ফার্স সপ্তদশ শতকে যখন ইংরেজিতে প্রথম লেখা হল, তখন প্রথমে তিন অঙ্ক ও পরে এক বা দুই অঙ্কে লেখা হয়েছে। সংস্কৃত দশরকম দৃশ্যকাব্যে নাটক ও প্রকরণ ছাড়া অন্যগুলিতে অঙ্কসংখ্যা নির্দিষ্ট। নাটক ও প্রকরণে অঙ্কসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ, সমবকার-এ তিন, ইহামৃগ ও ডিম-এ চার, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ ও বীথিতে এক। সংস্কৃত বিভিন্ন দৃশ্যকাব্যে সন্ধি-সংখ্যাও বিভিন্ন। নাটক ও প্রকরণে সন্ধি সংখ্যা পাঁচ, সমবকার ও ডিম-এ 'বিমর্ষসন্ধি'টি নেই, কিন্তু বাকি চারটিই বর্তমান। ইহামৃগ ও ব্যায়োগ-এ গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি নেই—কিন্তু বাকি তিনটি আছে।

---

১. "His (Seneca) dramas are cast in five formal acts". অথবা 'In the form of his plays Seneca together with Terence, established a structure which was destined to endure up to the nineteenth century. A. Nicol: *World Drama*. p. 135 (G. G. Harrup & Co. Reprint 1961).

উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ ও বীথিতে প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি নেই—বাকি দুটি আছে।

এই প্রসঙ্গে অঙ্ক ও দৃশ্য কাকে বলে এবং সন্ধির সঙ্গে তার পার্থক্যটি বুঝে নেওয়া যাক। বৃত্তে যেমন অঙ্কবিভাগ আছে, তেমনি আছে সন্ধিবিভাগ। অঙ্কবিভাগটি প্রত্যক্ষগোচর (লিখিত নাটকে); কিন্তু সন্ধিবিভাগটি রস-প্রমাতারই পক্ষে বোঝা সম্ভব। ভারতীয় আলংকারিকদের অঙ্কবিভাগ হল মূলত নাটকের বিষয়বস্তুকে কয়েকটি পর্বে বিন্যাস। কিন্তু নাটকের বিষয় তো একটি লক্ষ্যের অভিমুখে গতিশীল। বৃত্তের এই গতিশীল রূপটিকে কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয় সন্ধি-বিভাগে। বিষয়বস্তুগত অঙ্ক-বিভক্ত পর্বগুলিকে আবার কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হলে তাকে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক বলে; সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে অবশ্য অঙ্কের মধ্যে কোনও দৃশ্যভাগ নেই—অঙ্কের আদিতেও নেই। পাশ্চাত্য নাটকেই এই বিভাগ দেখা যায়। সেখানে নাটকের প্রত্যেকটি অঙ্ক অর্থবোধগম্যতার দিক থেকে এক হিসেবে অনেকখানি সম্পূর্ণ। অঙ্কের প্রথমে যে বিষয়টির ইঙ্গিত থাকে, অঙ্কের শেষে তার সমাপ্তি দেখানো হয়। গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এক এক অঙ্কের বিষয়গুলিকে আরও ছোট ছোট করে ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু পরস্পর দুই অঙ্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নও নয়। তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। অঙ্ককে দৃশ্যে বিভক্ত করার কারণ কি? ক. দর্শকদের কাছে নাট্যের আবেদন, এর ফলে সহজতর হয়। খ. একটি বিশেষ পরিমণ্ডলে স্থাপিত হলে নাট্যঘটনা চিত্তাকর্ষক হয়। গ. নানা দৃশ্যে অঙ্ককে বিভক্ত করলে অভিনয়ের নানা সুবিধা হয় ঘ. কখনও কখনও দৃশ্য চরিত্রগুলোকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে। তবে একথাও ঠিক যে অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোজনে নাটকের গতি ক্ষুণ্ণ হয়।

আমাদের বাঙলা নাটকের একেবারে প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত ও তারাচরণ শীকদার অঙ্ক-বিভাগ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও দৃশ্য বা সন্ধি-বিভাগ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন না। রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব ছয় অঙ্কের নাটক; এর বিষয়বস্তুর যে বিন্যাস তিনি করেছেন, যেমন প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহ অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ে—ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে—কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার, চতুর্থে—শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্‌ঘোষণ, পঞ্চমে—নানারহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিদেবন, ও ষষ্ঠে—বিবাহনির্বাহ। এই বিভাগের সঙ্গে নাটকের সন্ধি-বিভাগের কোনো সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাবে না। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' চার অঙ্কের নাটক—কিন্তু দৃশ্য-বিভাগ সম্পর্কে তিনি বিশেষ অবহিত নন;—দৃশ্য যোজনার কোনো প্রয়াস নেই। মধুসূদনই সর্বপ্রথম অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ এবং সন্ধি-বিভাগের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম বাঙলা নাটক রচনা করেন। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' দুটিই দৃশ্যে বিভক্ত পাঁচ অঙ্কের নাটক। নিখুঁত সন্ধিবিভাগ না থাকলেও সন্ধি-সচেতনতা 'কৃষ্ণকুমারী'তে অধিকতর লক্ষণীয়। দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ—এঁরা সকলেই শেক্সপীয়রের পঞ্চাঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগের রীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগে ব্যতিক্রম হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দিকের 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জনে' শেক্সপীয়রের রীতি অনুসৃত হলেও তিনি পরবর্তী অধিকাংশ নাটকেই অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগের নিয়ম মানেননি। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা নাটকের অঙ্ক বিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়েছে। তবে তিন অঙ্কের নানা দৃশ্যযুক্ত নাটকের দিকে অনেকেই প্রবণতা দেখাচ্ছেন আধুনিক কালে।

বৃত্ত-রূপ ও বৃত্ত-প্রকৃতি—অ্যারিস্টটল :

অ্যারিস্টটল তাঁর The Art of Poetry গ্রন্থের ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ ও ষষ্ঠবিংশতি পরিচ্ছেদে নাট্যবৃত্ত সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে আমরা সূত্রাকারে এইভাবে উপস্থিত করছি।

ক. বৃত্ত-নির্মাণ-ব্যাপারে নাট্যকার প্রচলিত কাহিনীই গ্রহণ করুন, অথবা নিজস্ব মৌলিক কাহিনী উদ্ভাবন করুন, প্রথমেই তাঁকে একটা সরল, স্পষ্ট ও সর্বজনীন রেখাচিত্র অঙ্কন করে নিতে হবে। যে ভাষায় ঐ রেখাচিত্র রূপলাভ করবে, সে সম্পর্কেও তাঁকে সচেতন হতে হবে। বৃত্তের বিভিন্ন দৃশ্যকে তাঁর চোখের সামনে যতটা সম্ভব রাখতে হবে। সমস্ত ঘটনাকে এইভাবে প্রত্যক্ষ-দর্শন করে তিনি ঘটনাংশের প্রাসঙ্গিকতা স্থির করবেন।[১]

খ. বৃত্তকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। আর এর জন্যে প্রয়োজন সুবিন্যাস ও পরিমিত আয়তন। এর দৈর্ঘ্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনা ও দর্শকদের দেখবার ধৈর্যের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল—তথাপি স্মৃতিতে যতটুকু ধরে রাখা যায়, ততটুকু ঘটনাই এর দৈর্ঘ্য। কিংবা এমন বলা যায় যে, কোনো নায়কের একাদিক্রমে দুভাগ্যজনক ঘটনার ভিতর দিয়ে সৌভাগ্যলাভ বা সৌভাগ্যসূচক ঘটনার ভিতর দিয়ে দুঃখময় পরিণতিলাভ দেখাতে গেলে যে-সময়ের প্রয়োজন, তাই সে নাটকের আয়তন।[২]

---

১. His story, again, whether already made or of his own making, he should first simplify and reduce to a Universal form, before proceeding to lengthen it out by the insertion of episodes. Or, At the time when he is constructing his plots, and engaged on the Diction in which they are worked out, the poet should remember (1) to put the actual scenes as far as possible before his eyes. In this way, seeing everything with the vividness of an eye-witness as it were, he will devise what is appropriate. Chap. 7

২. As a beautiful whole is made up of parts···a story or a plot must be of some length, but of a length to be taken in by the memory. Chap. 7 A length which allows of the hero passing by a series of probable or necessary stages from misfortune to happpiness, or from happiness to misfortunes, may suffice as a limit for the magnitude of the story. Chap 7.

গ. বৃত্তের ঐক্য চাই। বৃত্ত-ঐক্য মানে ঘটনা-ঐক্য। ঘটনা-ঐক্য ও নায়ক-ঐক্য এক নয়। নায়কের জীবনে পরস্পর অসংলগ্ন বহু বিভিন্ন ঘটনা থাকতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনাকে একটিমাত্র মূল ঘটনায় বা ঐক্যে বিধৃত করা যায় না। নাটক যেহেতু একটি ঘটনার অনুকরণ, সেইহেতু একটিমাত্র ও সম্পূর্ণ ঘটনারই তা অনুকরণ। সেইজন্য ঐ একটি সম্পূর্ণ ঘটনার অন্তর্গত ঘটনাংশগুলিকে এমনভাবে পরস্পর সম্পর্কে গ্রথিত করতে হবে যাতে তাদের জীবদেহে অঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গাবলীর সম্পর্কের মতো জৈবিক বলে মনে হয়। একটি কোনো ঘটনাংশের বিচ্যুতি বৃত্তটিকে পঙ্গু ও স্থানচ্যুত করবে।[১]

ঘ. আদর্শ বৃত্তে একটি কাহিনীই থাকবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে একমুখী। দুই উদ্দেশ্যমুখী বৃত্ত (Plot of double issue) রচনাও ঠিক নয়। অর্থাৎ এই ধরণের নাটকে ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় না—প্রথমত একটা লক্ষ্য থাকে, সেখানে পৌছানোর পর আবার একটি লক্ষ্যের দিকে তা অগ্রসর হয়। আর উপকাহিনীযুক্ত কাহিনী রচনাও ঠিক নয়; এতে একটি বৃত্তের একটি কাহিনীর সঙ্গে অন্য কাহিনীকে শুধু যুক্ত করাই হয় না, ভাল ও মন্দ মানুষের দুই বিপরীত পরিণামও দেখানো হয়। ট্রাজিডিতে এ বৃত্ত চলে না; এতে ট্রাজিডি রসের সঙ্গে কমিক রসের মিশ্রণ হয়ে যায়—কমিডিতে এ বৃত্ত অবশ্য চলতে পারে।[২] এপিসোডিক কাহিনী সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এতে ঘটনাগুলির পারস্পরিক যোগ অপরিহার্য ও সম্ভাব্য নয়।[৩]

ঙ. সম্পূর্ণ বৃত্তের তিনটি অংশ থাকবে আদি, মধ্য ও অন্ত্য। যার পূর্বে কিছু নেই

---

১. The Unity of a plot does not consist as some suppose, in its having one man as its subject. An infiinity of things befall that one man, some of which it is impossible to reduce to unity. The story as an imitation of an action, must represent one action a complete whole with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole. Chap 8.

২. The perfect plot, accordingly, must have a single and not (as some tell us) a double issue ; ...After this comes the construction of plot which some rank first, one with a double story (like the Odyssey) and an opposite issue for the good and the bad personages. Chap 13.

৩. I call a Plot episodic when there is neither probability nor necessity in the sequence of its episodes. Chap 9. Now a whole is that which has beginning, middle, and end. A beginning is that which is not itself necessarily after anything else and which has naturally something else after it : an end is that which is naturally after something itself, either as its necessary or usual consequent, and with nothing else after it, and a middle, that which is by nature after one thing and has also another after it. (Chap. 7)

কিন্তু পরে কিছু আছে তাই হল আদি। যার পরে কিছু নেই, কিন্তু পূর্বে কিছু আছে তাই হল শেষ; আর যার পূর্বে ও পরে কিছু আছে তাই হল মধ্য। আবার আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত ঘটনাবলীর মধ্যে থাকবে কার্যকারণ যোগসূত্র।

চ. বৃত্ত দু'রকম—সরল ও জটিল। যেখানে ঘটনাধারা একাদিক্রমে ঘটে যায় এবং ঘটনা একটিমাত্র তারই নাম সরল বৃত্ত। সরল বৃত্তে কোনো বীর নায়কের জীবনে ঘটনার বৈপরীত্য বা প্রত্যভিজ্ঞানের পথ ধরে পরিবর্তন আসে না। ঘটনার বৈপরীত্য (peripeti) হল নাট্যক্রিয়ার একটি পরিবর্তনসূচক বিন্দু। একে পরিস্থিতির বিপর্যয়ও (Reversal of the situation) বলে। যখন নায়কের জীবনের ঘটনাগত পরিস্থিতি বিপরীত পথে যায়—মন্দ অবস্থা থেকে ভাল অবস্থার দিকে কিংবা সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যের দিকে, তাকেই ঘটনার বৈপরীত্য বা পরিস্থিতি-বিপর্যয় বলে। আর প্রত্যভিজ্ঞান বা আবিষ্ক্রিয়া (Discovery) হল অজ্ঞানতা থেকে নায়কের জ্ঞানলাভের অবস্থা। চরিত্র অথবা ঘটনার সঙ্গেই আবিষ্ক্রিয়ার সম্পর্ক। ব্যক্তির সম্পর্কে আবিষ্ক্রিয়া নায়কের মনে প্রেম বা ঘৃণা জাগ্রত করে। ঘটনার বৈপরীত্য সুখ বা দুঃখ নিয়ে আসে নায়কের জীবনে। 'ঘটনার বৈপরীত্যে' নায়কের এক অবস্থা থেকে তার বিপরীত অবস্থায় পরিবর্তন আনে, অবশ্য এই পরিবর্তন সর্বদা ঘটে সম্ভাব্য ও অপরিহার্য ঘটনাসূত্রে। যে বৃত্তে এই ঘটনার বৈপরীত্য কিংবা আবিষ্ক্রিয়া অথবা এই দুয়েরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাকেই বলে জটিল (Complex) বৃত্ত। বৃত্তের এই দুই অংশ ছাড়া আরও একটি অংশ আছে অবশ্য তা ট্রাজিডিরই ক্ষেত্রে, তার নাম দুর্ভোগ অংশ—যা বেদনাদায়ক বা ধ্বংসাত্মক, যেমন মঞ্চের ওপর মৃত্যু, দৈহিক নির্যাতন, আঘাত ইত্যাদি।[১]

সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ কোন্ সুদূর অতীতে অ্যারিস্টটল বৃত্ত সম্পর্কে যে সুস্থ সুচিন্তিত কথা বলেছিলেন, তা সর্বাংশে আজ গৃহীত না হলেও তার বক্তব্য পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগ্রত করেছে। তাঁর বৃত্ত-সম্পর্কিত বক্তব্যের অনেক কথা আজিও অপরিবর্তিত আছে। বৃত্ত রচনার পূর্বে মনের মধ্যে তার একটা স্পষ্ট রূপরেখা ভেসে ওঠা চাই। বৃত্তের ঘটনাবলীকে চোখের সামনে দৃশ্য করে তুলে নিজেকে নাট্যকার দর্শকরূপে মনে করে নাট্যরচনা করেন। যদি নাট্যকার তার সর্বজনীন রূপ ও ভাষা সম্পর্কে সচেতন হন, তাহলে ভালো নাটক লেখা যায়—অ্যারিস্টটলের এ নির্দেশ একেবারে মূল্যহীন হয়ে যায় নি। একালে যাঁরা বৃত্তের চেয়ে চরিত্রের গুরুত্ব বেশী বলেন, তাঁরা কয়েকটি চরিত্রকে পূর্ব থেকে বেছে নিয়ে কোনও একটি পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি কী হতে পারে—কিংবা মূল চরিত্রটিকে কোনো একটি দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে তার বিপরীত পক্ষকে এনে ঘটনাধারাকে গতিদান

১. *The Art of Poetrry*, Chap. 10 & 11.

করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, নাট্যকারের মূল প্রতিপাদ্যটি আগে মনে আসে, তারপর সেই ideaকে চরিত্রের আশ্রয়ে রূপ দেন। কিন্তু যাঁরা একথা বলেন, তাঁরা নাট্য ঘটনার পরিণামের কথা মনে রেখেই অগ্রসর হন। গুস্তাভ ফ্রেতাগ, জন হাওয়ার্ড লসন—এমনকি জর্জ বার্নার্ড শ পর্যন্ত নাট্যরচনার পূর্বে নাট্যকারকে যে তাঁর প্রতিপাদ্য ভাব বা চিন্তা সম্পর্কে অবহিত হতে হয়—একথা বলেছেন। এর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের খুব বড় বিরোধ নেই। তিনি জানতেন ঘটনা জীবন বা চরিত্রাশ্রয়ী। এ দুয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।[১] বৃত্তের আয়তন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তিনি উপকাহিনীযুক্ত নাটক অনুমোদন করেন নি বলে তার আয়তন সম্পর্কে কিছু বলেন নি। সরল বা জটিল বৃত্তসম্বলিত নাটকের আয়তন—যা মানুষ স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম—তাঁর এ উক্তি আধুনিককালের নাটকের আয়তনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অ্যারিস্টটলের ঘটনা-ঐক্য সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তাঁর সমকালেই বা পূর্বে নাট্যরচনায় উপকাহিনীর প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে উপকাহিনী রচনায় রোমান্টিক নাট্যকারগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—অ্যারিস্টটলের নির্দেশিত ঘটনা-ঐক্য সেখানে না থাকলেও নাট্যরস-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত হয় নি। অ্যারিস্টটলের সরল বৃত্ত ও জটিল বৃত্তের বিভাগ অনেকেই গ্রহণ করেছেন, শুধু উপকাহিনীযুক্ত হলে তাকে যৌগিক বৃত্ত বলা হয়। আধুনিক কালে সরল ও যৌগিক বৃত্তের বদলে একরেখ বৃত্ত ও বহুরেখ বৃত্ত (উপকাহিনীযুক্ত) এই নাম অবশ্য কেউ কেউ ব্যবহার করছেন—জটিল বৃত্তের নাম 'বক্ররেখ' দেওয়া হয়েছে। সরল বা একরেখ বৃত্তে ঘটনাধারার গতি একমুখী, তাই অবিভাজ্য। কিন্তু বক্ররেখ বৃত্তের গতি সরলরৈখিক নয় বলে তা দুভাগে বিভাজ্য। যেখানে নাটকে ধীরে ধীরে ঘটনা জটিলতা পাচ্ছে, তাকে ঘটমান জটিলতা এবং হঠাৎ কোনো চরিত্রের উপস্থিতিতে বা কোনো ঘটনায় নাটকে একবার মাত্র জটিলতা দেখা দিলে, তাকে অপ্রত্যাশিত জটিলতা বলা চলে। ঘটনার বৈপরীত্যে এবং আবিষ্ক্রিয়ায় বা দুয়েরই সংযোগে নাট্যবৃত্ত যে উৎকর্ষলাভ করে—অ্যারিস্টটলের এ সিদ্ধান্তও অস্বীকৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে মালিনীকে আশ্রয় করে নবধর্ম-প্রতিষ্ঠা নাট্যকারের অভিপ্রায়। এই পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যঘটনা প্রবহমান। এখানে মালিনীর দিক থেকে ঘটনার বৈপরীত্য দেখা যায় নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাঝখানে সে নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছে সহজেই, সুপ্রিয় তার বশীভূত হয়েছে, বিদ্রোহী ক্ষেমঙ্কর বশীভূত হয়নি—বাইরে থেকে সৈন্য-সংগ্রহের জন্যে দূরদেশে চলে গেছে। ফিরে এসে বন্ধু সুপ্রিয়ের আচরণে সে বিস্মিত। তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সুপ্রিয় মালিনীকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই সে মালিনীর পিতার হাতে বন্দী হয়েও বন্ধুকে হত্যা করেছে—মালিনী হত্যাকারীকে

১. "Again Tragedy is the imitation of an action, and an action implices personal agents, who necessarily possess certain distinctive qualities both of character and thought···and these thought and character—are two natural causes from which actions spring;', Ibid, Chap. VI.

নবধর্মের প্রেরণায় রচনা করেছে। এ বৃত্ত সরল বা একরেখ। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বৃত্ত জগৎসিংহ-ধনদাস-বিলাসবতী ও মদনিকাকে নিয়ে উপকাহিনী সম্বলিত বহুরেখ বৃত্ত। ভীমসিংহ, জগৎসিংহের সঙ্গেই তাঁর কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে চান। কিন্তু তাকে শুধু জগৎসিংহ দাবী করল না—মানসিংহও দাবী করল এবং তার সঙ্গে যোগ দিল মারাঠা ও মুসলমান শক্তি। ঘটনার বৈপরীত্য দেখা দিল। যে-কোনো একজনকে কন্যাদান করলে রাজ্যরক্ষা করা যাবে না। তাই মর্মান্তিক প্রস্তাব কন্যাকে হত্যার সিদ্ধান্তও নিতে হল—পিতৃব্য শয়নকক্ষে হঠাৎ জাগ্রতা কৃষ্ণাকে হত্যা করতে পারল না—কিন্তু কৃষ্ণা নিজেই হল আত্মঘাতিনী। এ বৃত্তের গতি সরল নয়, জটিল বা বক্র-বহুরেখ বৃত্ত। উপকাহিনীহীন জটিল বৃত্তকেই বক্ররেখ বলা চলে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে ভৈরবাচার্য যে দৃশ্যটিতে রোষেনারাকে হত্যা করে বসেছে এবং যে-ভাবে তাকে নিজ কন্যা বলে চিনতে পেরেছে, তাতে ঘটনার বৈপরীত্য ও আবিক্রিয়া দুইই আছে। এটি উপকাহিনীহীন জটিল বা বক্ররেখ বৃত্ত। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অ্যারিস্টটল নির্দেশিত বৃত্ত-চিন্তা এখনও আমাদের নাট্যবিচারকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে। তাঁর ঘটনা-ঐক্য এখনও রক্ষিত হয়, তবে আরও দুটি উপায়ে ঐ ঐক্যকে রক্ষার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ইবসনের Ghosts নাটকের ঘটনাধারা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত নয়। একটি সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পিত। ঐ সত্যই ঘটনা ঐক্যকে ধরে আছে। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে এই রকম তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার কথাই মুখ্য। তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে ঘটনা-ঐক্য আছে এক ধরণের। কেউ কেউ চক্রাকার রীতিতে (circular) ঘটনা-ঐক্য সৃষ্টি করতে চান। Schnitzler-এর লেখা Raigan নাটকে দশটি দৃশ্যে যৌন সম্পর্কের এক বিচিত্র কাহিনী উপস্থাপিত। একটি যুবতীর সঙ্গে এক সৈনিকের যৌন-সম্পর্ক। সৈনিকের সঙ্গে এক পরিচারিকার, পরিচারিকার সঙ্গে এক যুবকের, যুবকটির সঙ্গে এক তরুণী পরস্ত্রীর, তাঁর স্বামীর সঙ্গে এক অবিবাহিতা মেয়ের, মেয়েটির সঙ্গে এক কবির, তার সঙ্গে এক চিত্রাভিনেত্রীর—এই ভাবে শেষে প্রথম যুবতীটির সঙ্গে শেষ ব্যক্তিটির যৌন সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ রীতি অবশ্য অনেকটা কৃত্রিম হয়ে পড়ে বহুজনের সম্পর্কে।

বৃত্ত ও উপবৃত্ত—ভারতীয় আদর্শ: নাট্যশাস্ত্রে ইতিবৃত্ত পরিকল্পনায় প্রাসঙ্গিক কাহিনী স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইতিবৃত্তং দ্বিধাচৈব বুধস্তু পরিকল্পয়েৎ
আধিকারিমেকং স্যাৎ প্রাসঙ্গিকমথাপরম্।[১]

অর্থাৎ ইতিবৃত্তে ভাগ থাকবে দুটি—ক. আধিকারিক ও খ. প্রাসঙ্গিক। মূল কাহিনী হল আধিকারিক, আর তারই পরিপোষক ঘটনা হল প্রাসঙ্গিক। বিশ্বনাথ বলেন—

১ নাট্যশাস্ত্র (২১।২, ৪, ৫)

ইদং পুনর্বস্তুবৈধিবিধং পরিকল্প্যতে।
আধিকারিকভেদং স্যাৎ প্রাসঙ্গিকমথাপরম্॥[১]

এখানে বস্তু মানে ইতিবৃত্ত। পণ্ডিতগণ দুই প্রকার বস্তু কল্পনা করেছেন—একটি হচ্ছে আধিকারিক ও অন্যটি প্রাসঙ্গিক। প্রধান ফলে স্বামিত্বকে বলে অধিকার। সেই ফলের প্রভু হল অধিকারী। তার ইতিবৃত্তই আধিকারিক বস্তু। আমাদের এখনকার ভাষায় এটি মূল বৃত্ত। আর এই আধিকারিক কাহিনীর উপকারের নিমিত্ত যে বস্তু-রচনা তার নাম প্রাসঙ্গিক।[২] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, রামের আধিকারিক কাহিনীতে সুগ্রীবাদির কাহিনী হল প্রাসঙ্গিক। আবার এই প্রাসঙ্গিক বস্তু ঘটনার আকারেও থাকতে পারে যা উপকাহিনীর মর্যাদা পায় নি। যেমন 'শকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দুজন পরিচারকদের কথাবার্তা।[৩] সংস্কৃত আলংকারিকগণ আধিকারিক ইতিবৃত্ত ও প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্তের কথা বলেছেন, তবে যেখানে প্রাসঙ্গিক-বস্তু মূলের উপকারার্থ একটি স্বতন্ত্র কাহিনীর রূপ লাভ করে নি, তাকে আমাদের sub plot মনে করা ঠিক নয়। নায়কের সহায়ক-চরিত্রের কর্ম-প্রয়াসকেই আলংকারিকগণ প্রাসঙ্গিক বস্তু বলেছেন—কিন্তু এগুলির সমস্তই আমরা যাকে উপকাহিনী বলি তা নয়।[৪] যাই হোক, যেখানে তা কাহিনীর মর্যাদা পেয়েছে, তাকে উপবৃত্ত বলা চলবে।

সিদ্ধান্ত : গ্রীক আলংকারিক অ্যারিস্টটল এই উপকাহিনীযুক্ত বৃত্তকে নাট্যবৃত্ত রূপে স্বীকার করেন নি। গ্রীক নাটকে উপবৃত্তের অস্তিত্ব যে ছিল এবং অনেক দর্শক ঐ ধরণের বৃত্তকে যে সানন্দে গ্রহণ করতেন সে তথ্য তিনি জানিয়েছেন। কেউ কেউ তাকে প্রথম শ্রেণীর নাটক বলে মনে করতেন।[৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কী প্রাচ্যে কী প্রতীচ্যে নাট্যবৃত্তে উপবৃত্ত যুক্ত করার ঐতিহ্য অতি পুরাতন। ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে রোমান্টিক নাটকে এই উপবৃত্ত-যুক্ত বৃত্ত রচনার প্রয়াস খুবই হয়েছে। শেক্সপীয়রও উপবৃত্তের সৃষ্টি করেছেন প্রচুর। তারপর নাট্যবৃত্তে উপবৃত্ত সংযোজনের রীতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। আধুনিককালে বৃত্তে উপবৃত্ত সংযোজনে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা কিভাবে কোন্ কোন্ নীতিতে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হচ্ছে—সেই ঐক্যবিধায়ক নীতি (Unifying Principle) সম্পর্কে অনেক নাট্যকারই এখন সচেতন। নাট্যবৃত্তে তাই উপবৃত্তের

---

১. সাহিত্যদর্পণ : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৪২ নং শ্লোক

২. অস্যাধিকারিকোতিবৃত্তস্য উপকরণানামিতরৎ যচ্চরিতং তৎপ্রাসঙ্গিকম্।—তদেব ৪২ ও ৪৩ নং শ্লোকের টীকা।

৩. ধনঞ্জয় ১।২৯

৪. বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'বাংলা নাটকের টেকনিক'-এ পৃঃ ৮, সং ১৯৭৪।

৫. After this comes the Construction of Plot which some rank first, one with a double story (like the Odyssey). *Poetics*

স্থান স্বীকার করে নিতে হবে। তবে এই কাহিনী নাট্যবৃত্তে কি কি শর্তে কিভাবে থাকতে পারে, তা ভেবে দেখা দরকার।

ক. মূল বৃত্তের অধীন হয়ে থাকবে উপবৃত্ত, কখনও নিজস্ব মহিমায় মূল বৃত্তকে ম্লান করবে না।

খ. মূলের রসকে পুষ্ট করার জন্যে, মূলের ভাব বা চরিত্রগুলিকে আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তোলাই হবে উপবৃত্তের একমাত্র কাজ।

গ. ঐ কাজ করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে এ-কাহিনী নাট্যবৃত্তে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে বা মূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে জটিল করতেও পারে।

ঘ. উপবৃত্তের অন্তর্গত চরিত্র বা চরিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি একটি কাহিনীর রূপ তাকে নিতে হবে এবং যে ভাবেই হোক বিশ্বাস্য ও স্বাভাবিকতার পথ ধরে তাকে মূল বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। দুটি একটি চরিত্র অনেক সময় মূল বৃত্তের সঙ্গে যোগ-সাধনের সহায়তা করে।

ঙ. মূল থেকে বা পৃথকভাবে এ কাহিনী জন্ম নিয়ে মাঝে মাঝে মূলের সঙ্গে যোগ রেখে শেষ পর্যন্ত মূলের যে রস-পরিণাম সেই ধরণের রস-পরিণাম লাভ করতে পারে।

চ. মূল কাহিনীর ভাবের সঙ্গে বা মূল বৃত্তের চরিত্রগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দুয়ের যে-কোনো একটি রক্ষা করে উপবৃত্ত অগ্রসর হতে পারে। মূলকাহিনীতে শেষ-পরিণাম বিষাদান্ত বা সুখান্ত হলে উপবৃত্তের চরিত্র বা চরিত্রগুলির পরিণাম যে তাই হবে, তা বলা যায় না—পরিণতি ভিন্ন হতে পারে, সেখানে বৈসাদৃশ্যের ভেতর দিয়েই মূল কাহিনীকে তা পুষ্ট করবে। তবে সাধারণত একই পরিণাম বেশীর ভাগ উপবৃত্তেই দেখা যায়।

ছ. মূল বৃত্তে একাধিক উপবৃত্ত থাকতে পারে। মূলের সঙ্গে এক বা একাধিক কোনো সূত্রে যুক্ত থেকে আপন আপন পথ ধরে তারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং অন্তিমে মূলের সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে।

জ. দ্বন্দ্বমূলক মূল কাহিনীর দুই পক্ষের মধ্যে যে-কোনো এক প্রধান চরিত্রকে নিয়ে কিছু পরে একটি কাহিনী গড়ে উঠতে পারে এবং স্বতন্ত্রভাবে তা প্রবাহিত হয়ে মূলের মধ্যে শেষে আত্মোৎসর্জন করতেও পারে। একে উপবৃত্ত না বলে শাখাবৃত্ত বলাই সঙ্গত।

ঝ. ট্রাজিডি বা কমেডি দুই শ্রেণীর নাটকেই উপবৃত্ত বা শাখাবৃত্ত থাকতে পারে, তবে কমেডিতেই বেশী দেখা যায়।

বাংলা নাটকে মধুসূদন সর্বপ্রথম 'কৃষ্ণকুমারী'তে জগৎসিংহ বিলাসবতী-ধনদাস-মদনিকাকে নিয়ে একটি শাখাবৃত্ত রচনা করেছিলেন। ধনদাসের লোভ বিলাসবতীর প্রতি, বিলাসবতী চায় জগৎসিংহকে; তাই জগৎসিংহকে ধনদাস আকৃষ্ট করেছে কৃষ্ণকুমারীর প্রতি, জগৎসিংহের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সে গেছে কৃষ্ণার পিতা ভীমসিংহের কাছে। এদিকে বিলাসবতী ঐ বিবাহ পণ্ড করার জন্যে সহচরী মদনিকাকে

পাঠিয়েছে। মদনিকা ও ধনদাসের ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে। মদনিকা জয়ী হয়েছে—জগৎসিংহের কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয় নি—সে আত্মঘাতিনী হয়েছে। বিলাসবতীর সঙ্গে জগৎসিংহের সম্পর্ক ঠিকই রয়ে গেছে—মদনিকার জন্যেই মূল বৃত্তে ট্রাজিডির ঘোর ঘনঘটা দেখা দিয়েছে, অথচ সে শাস্তি পায় নি, শাস্তি পেয়েছে ধনদাস। দেখা যাচ্ছে ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণাকে নিয়ে যাদের মধ্যে বিবাদ তাদেরই অন্যতম জগৎসিংহ যে অবস্থায় ছিলেন নাটকের শুরুতে, অন্তিমেও সেইখানে। কৃষ্ণা বা ভীমসিংহের পরিণতির সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই।

দীনবন্ধুর কমেডি 'নবীন তপস্বিনী'তে মূল কাহিনী রাজা রমণীমোহন, দুই রানী রাজপুত্র বিজয় ও কামিনীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে—এরই পাশে জলধর-জগদম্বা, বিনায়ক-রতিকান্ত ও মল্লিকা-মালতীকে নিয়ে রচিত হয়েছে উপবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' কমেডিতে তিনটি উপবৃত্ত আছে। অক্ষয়দের প্রধান বৃত্তের সঙ্গে শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণের তিনটি উপকাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্তের মূল বৃত্তের সঙ্গে চাণক্য-আত্রেয়ী, হেলেন-আন্টিগোনস-সেলুকস এবং ছায়া-চন্দ্রকেতুর তিনটি উপবৃত্ত বর্তমান। দীনবন্ধুর রচিত 'নীলদর্পণ' ট্রাজিডিতে গোলোক বসু-নবীনমাধবের মূল বৃত্তে সাধুচরণ-ক্ষেত্রমণির উপবৃত্ত রয়েছে। দুই বৃত্ত পরস্পর যুক্ত থেকেও এবং সাদৃশ্য রেখে একই পরিণাম লাভ করেছে। ঘটনা ও রস-পরিণাম দু'দিক থেকেই সাদৃশ্য। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মূল কাহিনী চন্দ্রগুপ্তের নন্দ বংশ ধ্বংস করে সিংহাসনলাভ ও গ্রীক শক্তিকে দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা। সেলুকস-হেলেন-এন্টিগোনস উপবৃত্তটি মূলের সঙ্গে প্রথম দৃশ্যে ও মাঝে মাঝে অন্যান্য কয়েকটি দৃশ্যে যুক্ত হয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রবাহিত। ছায়া-চন্দ্রকেতুর কাহিনী মূলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ছায়ার আকর্ষণে। তৃতীয় উপবৃত্তটি চাণক্য চরিত্রের অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই চাণক্য মূল বৃত্তের প্রধান চরিত্র চন্দ্রগুপ্তের বড় সহায়ক। কিন্তু এমন সহায়ক চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্যে এ কাহিনী উপবৃত্ত হিসেবে অপ্রাসঙ্গিক—যদিও স্বতন্ত্র কাহিনী হিসেবে এর মূল্য খুব বেশী। মূল বৃত্তে পরিণাম ঘটেছে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহে। হেলেন যাকে ভালবেসেছিল সেই এন্টিগোনসকে পায় নি—ঘটনাধারায় জানা গেছে সে তার অগ্রজ। ছায়াও যাকে ভালবেসেছিল বৃহত্তর স্বার্থে তাকে বেদনার সঙ্গে ত্যাগ করেছে; সেও চন্দ্রগুপ্তের ভগ্নীরূপে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। মূল কাহিনীতে শান্তি, হারানো কন্যা আত্রেয়ীকে পেয়ে চাণক্যের জীবনেও শান্তি। কিন্তু ছায়ার জীবনে রয়ে গেল অশান্তি। এন্টিগোনস হেলেনকে নিজের ভগ্নীরূপে জানতে পেরেছে বলে ধীরে ধীরে সেও যেমন, হেলেনও তেমনি মানসিক শান্তি ফিরে পাবে এবং চন্দ্রগুপ্তকে হৃদয় দিয়েই ভালবাসতে পারবে। কিন্তু ছায়া? তার উপবৃত্ত মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নি—যদিও নাট্যকার আপাতদৃষ্টিতে তাকেও মহীয়সী করেছেন। গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিমূলক 'প্রফুল্ল' নাটকে 'যোগেশের' প্রতিপক্ষ ভ্রাতা রমেশের ষড়যন্ত্রকে পুষ্ট করার

প্রয়োজনে এসেছে কাঙালী-জগমোহনের উপবৃত্ত। এদের কাহিনীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এরা বারবার রমেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং যোগেশের পরিণামকে সর্বাত্মক করেছে। নাটকের শেষে যোগেশের সাজান বাগান শুকিয়ে গেছে—কিন্তু কাঙালী জগমোহনের কী হল? 'পুলিশ ইন্সপেক্টরের হাতে বন্দী হয়ে বড় জোর সে কয়েদ খাটবে—কিন্তু তারপর, আবার তাদের ঘৃণ্য জীবনের ধারা স্বাভাবিক পথেই চলবে। মূলের পরিণাম আর উপবৃত্তের পরিণাম তাই গভীরতর অর্থে এক সুরে বাঁধা নয়। সাদৃশ্যের সাহায্যে এবং মূল বৃত্তের সঙ্গে গভীরভাবে সমন্বিত হয়ে তার রস-পুষ্ট করার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'জামাই বারিক'-এর নাম করা যায়। অভয়-কামিনীর মূল বৃত্তের পাশে পদ্মলোচন-বগলা-বিন্দুর উপকাহিনী প্রবহমান। উপবৃত্তটি স্বতন্ত্রভাবে উজ্জ্বল, তবে মূলের অধীন। নাট্যসূচনা থেকেই অভয়ের সঙ্গে পদ্মলোচনের যোগ। সংসার-ত্যাগী হয়ে দুজনেই চলে গেছে বৃন্দাবনে—স্ত্রীর অত্যাচারে অভিমান করে। সেখানে ছদ্মবেশী যে মেয়েকে অভয় বিয়ে করল, সেই তার বিবাহিতা স্ত্রী কামিনী, পদ্মলোচনও অনুতপ্তা এক স্ত্রীর কাছে ফিরল—অন্য জন মারা গেছে। দুজনেরই পরিণাম এক আবার ঘটনাগত সাদৃশ্য খুব বেশী।

নাটকের ঐক্যনীতি : অ্যারিস্টটল :

নাটকের ঐক্য-সমস্যা সম্পর্কে প্রথম গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন অ্যারিস্টটল। Poetics গ্রন্থের ষষ্ঠ ও ষষ্ঠ বিংশতি পরিচ্ছেদে তিনি এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। নাটকের ঐক্য ঘটনাগত, কালগত ও স্থানগত এই তিন রকম হতে পারে। ঘটনাগত ঐক্যই (Unity of action) মূল ও প্রথম এবং এই ঐক্য থেকে কালগত (Unity of time) ও স্থানগত (Unity of place) ঐক্যের চিন্তা জন্ম নিয়েছে। অ্যারিস্টটল ঘটনাগত ঐক্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। কালগত ঐক্য সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে একটুখানি মন্তব্য করেছেন, কিন্তু স্থানগত ঐক্য সম্পর্কে কিছু বলেন নি ঠিক, তবে তাঁর বক্তব্যে একটু আভাস পাওয়া যায়।

ঘটনাগত ঐক্য বা বৃত্ত-ঐক্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে, নাটকের 'নায়ক-ঐক্য' (Unity of hero) থাকলেই ঘটনা-ঐক্য রক্ষিত হল। একটি মানুষের বা নায়কের জীবনে বহু-বিচিত্র ঘটনা থাকতে পারে। এই সব বিভিন্ন ঘটনাবলীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা যায় না। সেইজন্যে তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে যেহেতু বৃত্ত একটিমাত্র ঘটনার অনুকরণ, সেইজন্যে তা একটিমাত্র সমগ্র ঘটনাকেই অনুকরণ করবে। আর এই সমগ্র ঘটনাটি বহু ঘটনাংশ নিয়ে এমন ঐক্যসূত্রে রচিত হবে যে এর কোনো একটি ঘটনাংশ সমগ্র থেকে বর্জিত হলে বা স্থানচ্যুত হলে "the whole will be disjointed and disturbed."[১] একটিমাত্র ঘটনার অন্তর্গত প্রত্যেকটি ঘটনাংশকে জৈবিক

১. *Poetics* : Mr. S. H. Butcher, Chap VIII.

অঙ্গ হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনাংশ কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হয়ে ঐ আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত সমগ্র বা সম্পূর্ণ একটি ঘটনাকে সৃষ্টি করবে। আর এই ক্ষেত্রেই দেখা দেবে যথার্থ ঘটনা-ঐক্য।

কাল-ঐক্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে ২৪ ঘণ্টার বা তার চেয়ে অল্প কিছু বেশী সময়ের ঘটনাই নাটকে উপস্থাপন করতে হবে।[১] মহাকাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজিডির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, নাট্যকার যে-কাহিনী গ্রহণ করবেন, তাতে সুদৃঢ় ঐক্য তো থাকবেই এবং তাকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। নাট্যঘটনা দেখার পর দর্শকের স্মৃতিতে যদি তা ধরে রাখা সম্ভব হয়, তবেই তা সংক্ষিপ্ত। নাট্যঘটনার আয়তনের সংক্ষিপ্তি এবং সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য-সাধন প্রয়াসের যে ইঙ্গিত তিনি করেছেন, তাতে তিনি স্থানগত ঐক্য সম্পর্কে হয়তো একটু আভাস দিয়েছেন[২]—এমন কথা মনে করা অন্যায় নয়। কারণ ঘটনা-ঐক্যের ওপর তিনি যে জোর দিয়েছেন, তার সঙ্গে এই দুই ঐক্যের সম্পর্ক গভীর। কাল-ঐক্য ও স্থান-ঐক্য রক্ষিত হলে ঘটনা-ঐক্য রক্ষা করা সহজ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় ঐক্যনীতি :

ভারতীয় আলংকারিকদের বিশেষত আচার্য ভরতের এই ঐক্যবিধি সম্পর্কে বক্তব্য কি তা এবারে লক্ষ্য করা যাক।

বহু ঘটনার দ্বারা নাট্যবৃত্তকে ভারাক্রান্ত করতে ভারতীয় নাট্যতাত্ত্বিকেরা নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে ভরত বলেছেন যে, যেখানে বৃত্তে বহু ঘটনা, সেগুলো উপস্থাপিত করতে গেলে রসহানি ঘটতে পারে তাই সেখানে অঙ্কের আদিতে বিষ্কম্ভক[৩] ও দুই অঙ্কের মাঝখানে প্রবেশক কে[৪] এনে কিংবা চুলিকা[৫], অঙ্কাবতার[৬] ও অঙ্কমুখ[৭] এর

১. Ibid Chap V.

২. "His Statement (Poetics 17) that, as contrasted with epic, tragic episodes are short and (Poetics 96) "confined in less extended limits. ...crowded into a narrow compass" is the nearest he comes to any utterance regarding a unity of place. (*D. O W. L.*) Edtd. J. T. Shipley pp 431.

৩. সংস্কৃত নাটকে অপ্রধান এক বা একাধিক মধ্যম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী নাট্যঘটনার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ইঙ্গিত করেন—এদেরই নাম বিষ্কম্ভক।

৪. যে সব তথ্য নাটের পাত্রপাত্রীদের জানা নেই সেই সব তথ্যাদি দুই অঙ্কের মাঝখানে এসে নিম্ন শ্রেণীর কোনো লোক প্রাকৃত ভাষায় তাদের বলে দেয়—একেই প্রবেশক বলে। প্রবেশকের সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তন ও কোনো নাটকীয় চরিত্রের আগমনও সূচিত হয়।

৫. যবনিকার অন্তরাল থেকে পাত্রপাত্রীদের দ্বারা সূচিত প্রয়োজনীয় বিষয় হল চুলিকা।

৬. কোনো অঙ্কের শেষদিকে সূচিত ঘটনাংশ্লেষ অবিচ্ছিন্ন রেখে পরবর্তী অঙ্কের অবতারণার নাম অঙ্কাবতার।

৭. যে অঙ্কের ভিতর সমস্ত নাটকের বীজার্থ নিহিত তার নাম অঙ্কমুখ।

সাহায্যে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করতে হয়।[১] স্পষ্টই বোঝা যায় এ সব নির্দেশের অর্থ হল অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা থেকে মুক্ত করে নাট্যবৃত্তকে রস-পরিণামের উপযোগী করে তোলা। আর তা নাট্যঘটনার ঐক্য রক্ষার জন্যেই। নাটকের বৃত্ত-গঠন সম্পর্কে বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'-এ যে নির্দেশ আছে, তাতেও বোঝা যায় নাট্যঘটনা-ঐক্য সম্পর্কে তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন। নাট্যবৃত্তকে ভরত ও বিশ্বনাথ গোপুচ্ছাগ্রের[২] মতো করতে বলেছেন। গরুর পুচ্ছের প্রথমে অল্পলোম, মধ্যভাগে বেশীলোম এবং শেষে স্বল্পতা ও একাগ্রতা দেখা যায়। অর্থাৎ নাট্যের মুখসন্ধিতে মূল বা অধিকারিক কাহিনীর বীজ স্থাপন, প্রতিমুখসন্ধি ও গর্ভসন্ধিতে প্রাসঙ্গিক ঘটনা বা কাহিনী যুক্ত করে তাকে জটিল ও স্ফীত করতে হবে। তারপর বিমর্ষসন্ধিতে বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে একত্র করে নির্বহন সন্ধিতে কাহিনীর একমুখী পরিণামকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। তাছাড়া নাট্য-কাহিনীতে যে সব ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক সেগুলোকেও 'বিন্দু'র সাহায্যে মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করার তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতীয় আলংকারিকগণ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে উপরে উল্লিখিত যে পাঁচটি উপায়ের কথা বলেছেন, গোপুচ্ছাগ্রের মতো কাহিনী রচনা করবার যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্জনের যে কৌশল অবলম্বন করার কথা বলেছেন, তাতে বুঝি যে Unity of impression বা ভাবগত ঐক্য রক্ষার দিকেই তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অ্যারিস্টটল যে অর্থে ঘটনা-ঐক্যকে বুঝিয়েছেন, সেই একটিমাত্র ঘটনার উপস্থাপনা জনিত (উপকাহিনী বর্জিত) সুদৃঢ়-ঐক্যের দিকে ভারতীয় আলংকারিকেরা জোর দেন নি।

নাট্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যদর্পণে কাল-ঐক্য সম্পর্কে কিছু নির্দেশ আছে। ভরত বলেছেন প্রত্যেকটি অঙ্কে সাধারণতঃ এক দিনের কার্যই উপস্থাপিত হবে। যদি একটি অঙ্কে তা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রবেশকের সাহায্য নিতে হবে। অনেকদিনব্যাপী ঘটনার কথা একটি অঙ্কে যে যোজনা করা অনুচিত একথা বিশ্বনাথ জানিয়ে দিয়েছেন। ভরত বলেছেন নাট্যের কোনো পাত্র দূরদেশে গেলে সেখানে অঙ্কচ্ছেদ করা দরকার। একটি অঙ্কে একদিনের ঘটনাই দেখাতে হবে, দুই অঙ্কের ব্যবধান কাল এক মাসের বেশী হবে না এবং একবছরের বেশী ব্যবধান নিষিদ্ধ। নাট্যে একাধিক অঙ্ক থাকলে বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে যে ব্যবধান তাতে একাধিক বছরের ঘটনা তাই স্থান পেতে পারে। সেইজন্য একটি সমগ্র নাটকে কত বছরের ঘটনা উপস্থাপিত হতে পারে তার কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয় নি।

---

১. নাট্যশাস্ত্র (২১।১৩৫-১৩)।

২. কার্যং গোপুচ্ছাগ্রং কর্তব্যং কাব্যবস্তুনমাসাদ্য ॥
যে চেদোত্তা ভাবাস্তে সর্বে পুংস্কৃতঃ কার্যাঃ।
নাট্যশাস্ত্র, ২০।৪৬-৪৭
গোপুচ্ছাগ্রসমাস্রং তু বস্তুদং তস্য কীর্ত্তিতম্, সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (১১)।

স্থান-ঐক্য সম্পর্কে তাঁদের কোনো নির্দেশ নেই। অঙ্কের মধ্যে স্থান-ঐক্য কোনো সংকৃত নাটকে রক্ষিত হয়েছে, আবার কোথাও স্থানের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়।

অ্যারিস্টটল-পরবর্তী চিন্তা :

অ্যারিস্টটল ঘটনা-ঐক্য ও কাল-ঐক্য সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনেকদিন পর ষোড়শ শতকে রেনেশাঁস-যুগে ইতালির নাট্যতাত্ত্বিকদের তা বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। অবশ্য তাঁরা ঘটনা-ঐক্য মেনে নিয়ে কাল-ঐক্যের বিচার শুরু করলেন এবং স্থান-ঐক্যের কথাও জানালেন। ইতালীয় নাট্যশাস্ত্রী রবারতেল্লি[১] (Robertelli), গিরাল্ডি সিনথিও[২] (Giraldi Cinthio), সেগ্‌নি[৩] (Segni), মিন্টুর্ণো[৪] (Minturno) প্রভৃতি এই আলোচনায় যোগ দিলেন।

কাল-ঐক্য সম্পর্কে রবারতেল্লি বললেন যে নাট্যঘটনার কাল ১২ ঘণ্টার বেশী হবে না। তিনি অ্যারিস্টটলের 'সূর্যের এক আবর্তন' (Single revolution of Sun)-এর এই অর্থ ই করলেন (১৫৪৮)। সেগ্‌নি ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জানালেন যে ঐ সময় ২৪ ঘণ্টা। ১৫৫০-এ মগ্‌গি (Maggi) জানালেন যে ঐ সময় ৩ ঘণ্টা। মিন্টুর্ণোর মতে তা ক্ষেত্র বিশেষে ২ দিনেও হতে পারে। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে কস্টেলভেট্রো (Costelvetro) বললেন অভিনয়ের সময় এবং নাটকের ঘটনা-কাল একই হওয়া উচিত। আর নাট্যঘটনার স্থান একই জায়গায় হবে—একটি বিশেষ শহরে বা ঘরের মধ্যে তা সীমিত থাকবে না, থাকবে "to that one place alone which could be visible to one person."[৫] অর্থাৎ কস্টেলভেট্রো তিন রকম ঐক্যকে কঠোরভাবে মানার পক্ষপাতী। মনে রাখতে হবে স্থান-ঐক্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটলে শুধুমাত্র যার আভাস, তাকে স্পষ্টভাবে ইনি প্রথম গ্রহণ করতে বললেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নাট্যকার Jean de la Taille তাঁর Art of Tragedy-তে জানালেন যে এই তিন ঐক্য আড়াইশ বছরব্যাপী ফরাসী নাট্যকারদের গ্রহণীয়। ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই ছাড়া মোটামুটিভাবে অধিকাংশই ট্রাজিডিলেখক এই ঐক্য সূত্রকে ট্রাজিডির ক্ষেত্রে মেনে নিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের ড্রাইডেন, ফার্কুহার, স্পেনের লোপ ডি ভেগা—এঁরা ঐক্যসূত্রের বিরোধিতা করলেন। ড্রাইডেন কাল-ঐক্য ও স্থান-ঐক্য কোনোটিকেই মানতে চাইলেন না। An Essay of Dramatic Poesy-তে তিনি জানালেন যে নাট্যঘটনার কালসীমা ঠিক বেঁধে দেওয়া

---

১. *Commentary on Aristotle's Poetics.*
২. *Discorsi Sulle Commedie Sulla Tragedie.*
৩. *Retorica et Poetica d' Aristotele.*
৪. *De Poeta libri sex.*
৫. H. B. Charlton Edtd. Costelvetro's *Theory of Poetry.*

যায় না। অ্যারিস্টটলের ২৪ ঘণ্টার ঘটনা যদি ৩ ঘণ্টার অভিনয়ে তুলে ধরা যায়, তাহলে ২৪ বছরের ঘটনাও ৩ ঘণ্টায় তুলে ধরায় দোষ কি? মোট কথা, তিনি ট্রাজিডির ক্ষেত্রে নাট্যকারের কালসীমা বাড়াতে ইচ্ছুক, কিন্তু কমিডির ক্ষেত্রে নয়।

স্পেনের নাট্যকার লোপ ডি ভেগা (Lope De Vega) জানিয়েছিলেন 'When I have to write a Comedy I lock in the precepts with six Keys.'[১] ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের বললেন দর্শকদের খুশী করা ছাড়া আর কোনো নাট্য-রচনার বিধি নেই।[২] অষ্টাদশ শতকের ফার্কুহার (Farquhar)[২] কাল-ঐক্য ও স্থান-ঐক্যকে মানতে চাইলেন না। উনিশ শতকের গেটে এবং হুগোও ঐক্যসূত্রকে মূল্য দিতে চাইলেন না। কিন্তু বিশ শতকের টি, এস, এলিয়ট কাল-ঐক্য ও স্থান-ঐক্য দুয়ের প্রতিই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত :

কাল-ঐক্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, নাটকের ঘটনাকে ১২ ঘণ্টা, ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা এরকম সময়ের মধ্যে সীমিত করা ঠিক নয়। তবে দর্শকদের মনে যাতে অবিশ্বাসের আঘাত না লাগে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে যতটা সম্ভব কম সময়ের ঘটনাই উপস্থাপনা করা উচিত। অ্যারিস্টটলের নিয়মের কিছু শিথিলতার অর্থ নিয়মবিহীন স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়।

স্থান-ঐক্য সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। শেক্সপীয়ারের সময় মঞ্চে কোনো দৃশ্যপট থাকত না—তিনি ইচ্ছামতো তাই স্থান পরিবর্তন করেছেন। তথাপি তিনি যে সব নাটকে একটি বিশেষ স্থানে বা তার নিকটবর্তী স্থানে নাট্যঘটনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সেগুলির আবেদন সবচেয়ে গভীর। 'ওথেলো'তে ভেনিস ও সাইপ্রাসের মধ্যেই তাঁর ঘটনা সীমিত, 'হ্যামলেটে' এলসিনোর দুর্গের চারপাশে ঘটনার ঘোরাফেরা—কিন্তু স্থানিক ঐক্যের দুর্বলতা 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা'তে দেখা যায়। অধ্যাপক নিকল দেখিয়েছেন আধুনিক নাট্যকারেরা নিজেদের অজ্ঞাতে কাল-ঐক্য ও স্থান-ঐক্যকে অনেকখানিই মেনে চলেছেন। স্থান-ঐক্য বলতে একটিমাত্র স্থানে সব ঘটনা ঘটবে—এই নিয়ম অবশ্য রক্ষা করা সব সময় সম্ভব হয় না। একাঙ্ক নাটকে এটা সম্ভব, পঞ্চাঙ্ক নাটকে কঠিন। তাই এবিষয়ে নাট্যকারদের কিছু স্বাধীনতা থাকা দরকার। যদি দর্শকদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে না হয়, তাহলে স্থান-ঐক্যের বিধি কঠোরভাবে গ্রহণ না করলেও চলে।

---

১. ...The New Art of writing Plays : 1609 Lope D Vega pp. 198. *Dramatic Theory and Criticism*.—B. H. Dukore.

২. Critique of School for Wives-এ Uranie-এর মুখে শুনি—"I am interested only in whether it affects me. When it entertains me I am certainly not going to ask whether I was wrong or whether the rules of Aristotle forbade me to laugh.

ঘটনা-ঐক্যের বিশেষ আলোচনা অ্যারিস্টটল :

এবার ঘটনা-ঐক্যের কথা। নাটকের ঘটনা-ঐক্যের স্বীকৃতি প্রায় সর্বজনীন। কাল-ঐক্য বা স্থান-ঐক্যের বিরুদ্ধে যত আলোচনা হয়েছে, ঘটনা-ঐক্যের বিরুদ্ধে কিন্তু তত হয়নি। ঘটনা-ঐক্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আমরা প্রথম Aristotle-এর Poetics-এ পাই। গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন যে নাট্যবৃত্ত (Plot) যেহেতু একটি ঘটনার অনুকরণ, সেইজন্যে তা অবশ্যই একটিমাত্র ঘটনাকেই অনুকরণ করবে, আর এই ঘটনা হবে সম্পূর্ণ। একটিমাত্র ঘটনা বহু ঘটনাংশের যোগেই সৃষ্ট। ঘটনাংশগুলির ঐ একটিমাত্র ঘটনার সঙ্গে থাকবে জৈবিক সম্পর্ক। ঘটনাটির সঙ্গে তার অংশগুলির গঠনগত সংযোগ এমনই হবে যে একটিমাত্র অংশকে সরিয়ে নিলে সমগ্র ঘটনাসৌধ অসম্বদ্ধ ও স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ মূল ঘটনাটিকে সম্পূর্ণতাদানের জন্যে ঘটনাংশগুলি বা ছোট ছোট ঘটনাবলী পরস্পর কার্যকারণ যোগে যুক্ত থাকবে। এ পর্যন্ত তিনি যা বলেছেন তা হল পরস্পর কার্যকারণসূত্রে ও জৈবিক সম্পর্কে গঠিত একটিমাত্র ঘটনাই নাটকে থাকবে এবং তা হবে সম্পূর্ণ। আর এ ধরণের আয়তসম্পূর্ণ ও একক ঘটনা-উপস্থাপনকেই ঘটনা-ঐক্য বলে। এ ঐক্যের অর্থ নায়ক-ঐক্য নয়। কারণ একটি মানুষের জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনা থাকতে পারে এবং সেগুলোকে একটিমাত্র ঘটনায় পরিণত করা যায় না। সুতরাং একটি মানুষের জীবনের পরস্পর বিভিন্ন নানা ঘটনা নিয়ে নাটক লিখলে ঘটনা-ঐক্য থাকবে না। আর এক ধরণের বৃত্তে ঘটনা-ঐক্য থাকে না বলেই তিনি মনে করেন। তা হল দুই উদ্দেশ্যমুখী বৃত্ত (Plot of double issue). প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি লক্ষ্যের অভিমুখে যেখানে নাট্যঘটনা অগ্রসর না হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত একটি লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর অন্য একটি উদ্দেশ্যের দিকে চলে তাকেই Plot of double issue বলে এবং এক্ষেত্রেও ঘটনা-ঐক্য রক্ষা করা যায় না।

এই অধ্যায়েই অ্যারিস্টটল আরও এক জাতের বৃত্তকে ঘটনা ঐক্যের পরিপন্থী বলেছেন অন্তত ট্রাজিডি নাটকের পক্ষে। এতে একটি বৃত্তের মধ্যে দুটো কাহিনী থাকে। শুধু তাই নয়, ভাল ও মন্দ মানুষের দু' রকম বিপরীত পরিণাম এতে দেখানো হয়। এই শ্রেণীর নাটক যথার্থ ট্রাজিডি দেখার আনন্দ দেয় না—এতে ঘোরতর শত্রুরা বন্ধু ভাবে অন্তিমে মঞ্চ ত্যাগ করে এবং কেউ কাউকে হত্যা করে না বা নিহতও হয় না। অর্থাৎ এখানে তিনি একাধিক কাহিনী যুক্ত নাট্যবৃত্তকে যেমন ঐক্যের বিরোধী বলে মনে করছেন, তেমনি ট্রাজিডির ক্ষেত্রে কমিডি-রসের মিশ্রণও চাইছেন না। অ্যারিস্টটলের ঘটনাঐক্য বুঝতে গেলে এই কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। তিনি যা চাননি—

ক. নায়ক-ঐক্য, খ. দুই উদ্দেশ্যসাধক বৃত্ত, গ. উপকাহিনীযুক্ত বৃত্ত, ঘ. ট্রাজিডিতে কমিক রসের মিশ্রণ। এগুলো ঘটনা-ঐক্যের প্রতিকূল।

আমাদের কথা ও সিদ্ধান্ত: পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটলের ঘটনা-ঐক্যকে মেনে নেওয়া হলেও তিনি ঘটনা-ঐক্যের পরিপন্থী বলে যেগুলো নির্দেশ করেছেন, তার সমালোচনা হয়েছে। নায়ক-ঐক্য অনেক নাটকেই রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একই ব্যক্তির জীবনে নানা ঘটনার মধ্যে যদি এমন সমস্ত ঘটনা বেছে নেওয়া হয়, যাতে ঐ ব্যক্তির জীবনের বিশেষ একটা দিক আলোকিত হয়ে ওঠে, তাহলে নায়ক-ঐক্য ঘটনা-ঐক্যের পরিপন্থী হয় না। চরিত-নাটকে যেখানে একটিমাত্র ব্যক্তির জীবন উপস্থাপ্য, সেখানে তাঁর জীবনের নানা কাজের মধ্যে একটি কোনো দিক উজ্জ্বল করে তোলার জন্যে তাঁর সেই শ্রেণীর ঘটনাগুলো নিয়ে ঘটনা-ঐক্য রক্ষা করা যেতে পারে। উপকাহিনীযুক্ত কাহিনী থাকলে ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়, একথাও আর এখন বলা চলে না। অ্যারিস্টটল যে ধরণের ঐক্য-নির্দেশ করেছেন, তা হয়তো রক্ষিত হয় না, কিন্তু তবুও ঐক্য না থেকেই পারে না। উপবৃত্ত যেখানে মূল কাহিনীর অধীন হয়ে মূলকে পুষ্ট ক'রে নাট্যবৃত্তে থাকে, তা এক বা একাধিকই হোক, ঘটনা-ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করে না। এই উপকাহিনীযুক্ত কাহিনী এবং ট্রাজিডিতে কমিডি-রসের মিশ্রণ—অ্যারিস্টটলের যুগের সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। ড্রাইডেন তাই An Essay of Dramatic Poesie-তে Neander-এর মুখে বলেছেন যে যেহেতু প্রকৃতিতে আছে বৈচিত্র্য সেইজন্য নাটকেও ঐ দুয়ের মিশ্রণ সমীচীন ও সঙ্গত। ডঃ জনসন 'The Rambler'-এ, ভিক্টোর হুগো Preface to Cromwell-এ এই মতকেই সমর্থন করেছেন। ট্রাজিডির ঘটনায় কমিক উপাদান থাকবে কিনা, না থাকলে ঘটনা-ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় কিনা—এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলতে পারি যে সামগ্রিকভাবে নাট্যঘটনা দর্শকচিত্তে উদ্দিষ্ট রস পরিণাম লাভ করেছে কিনা তাই দেখা দরকার। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে এ দুয়ের মিশ্রণে ঘটনা-ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় না একথাই মনে করতে হবে।[১] শুধু তাই নয়, ট্রাজি-কমিডি এলিজাবেথীয় কাল থেকে রচিত হয়ে আসছে এবং আজও পর্যন্ত তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক নাট্যশ্রেণী বলে গৃহীত হয়েছে। আসল কথা অ্যারিস্টটল ঘটনা-ঐক্যের প্রতিকূল বলে যেগুলিকে মনে করেছিলেন, সার্থক নাট্যকারদের হাতে তার তিনটি অন্তত এক ধরণের ঘটনা-ঐক্য রক্ষা করে নাট্যরচনাকে সার্থক করেছে। তাঁর ঘটনা-ঐক্য সূত্রের বিরোধিতা করা হয় নি, তবে তিনি যে রকম সুদৃঢ় ঘনপিনদ্ধ এক উদ্দেশ্যমুখী একক ঘটনার ঐক্যের কথা বলেছেন, সেই ঐক্য রক্ষার দিকে শুধুমাত্র দৃষ্টি দিলে হবে না। এক্ষেত্রে ঘটনা-ঐক্যের অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছে। আর সেইজন্যে A. W. Schlegel অতি সুন্দরভাবে Unity of Action-এর সংজ্ঞা দিয়েও বলেছেন যে ঘটনা-ঐক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ খুব সহজ নয়। আর যে অর্থে ঘটনা-ঐক্যকে আমরা বুঝে থাকি, প্রাচীন অনেক ট্রাজিডিতে তা লক্ষ্য করা গেলেও সব ক্ষেত্রে নয়। আধুনিক কালের

১. অধ্যাপক নিকল বলেছেন,—"This being so, the final test so far as a work of dramatic art is concerned, will not be one based on 'nature' but on the artistic effect of the whole." *The Theory of Drama* pp. 53.

অনেক ট্রাজিডিতেও নয়। তিনি বলেছেন, "In the higher, proper signification action is an activity dependent on the will of man. Its unity will consist in the direction towards a single end, and to its completeness belongs all that lies between the first determination and the execution of the deed."[১] অর্থাৎ ঘটনা (বা নাট্যক্রিয়া) যথার্থ ও গভীরতর অর্থে মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল একটি ক্রিয়া। একটি একক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দিকে অগ্রসরণের মধ্যেই এর ঐক্য। নায়কের প্রথম ক্রিয়ারম্ভের সংকল্প ও কর্ম-সম্পাদনের মধ্যবর্তী যাবতীয় ঘটনাবলী দেখে এর সম্পূর্ণতাকে বুঝে নিতে হবে। ঘটনা-ঐক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করেও তিনি বলেছেন যে এই অর্থে অনেক ট্রাজিডিতে যেখানে বাধার সাহায্যে বৃত্তে জটিলতা আসে, সেখানে একই ট্রাজিডিতে একাধিক ঘটনার সাক্ষাৎ মিলতে পারে, এবং তার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান ও কোন্‌টি অপ্রধান তা নির্ণয় করা সহজ হয় না। রাসিনের Andromache-তে দেখি Orestes বিয়ে করতে চায় Hermioneকে, কিন্তু Hermione, Pyrrhusকে বাধ্য করছে বিয়ে করতে, Pyrrhus কিন্তু বিয়ে করবে না Hermioneকে, সে বিয়ে করবে Andromacheকে। Andromache তার ছেলের কথা ও বিগত স্বামীর স্মৃতি মনে করে Pyrrhusকে গ্রহণে অনিচ্ছুক। এ নাটকের ঘটনা-ঐক্য নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। সকলের পরিণাম হয়েছে একই। কিন্তু এই চারজনের মধ্যে কার actionকে মূল বলা হবে? নৈতিক মর্যাদায় Andromache সকলের ওপরে।

তাই সেদিক থেকেই এখানে মূল ঘটনা স্থির করতে হবে। রাসিন হয়তো সে-কথা মনে রেখেই এর নাম দিয়েছেন Andromache-র নামে। যাই হোক, ঘটনা ও ঘটনা-ঐক্য সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাও এক আধটুকু পরিবর্তিত অর্থেই যে গৃহীত হতে পারে এ দৃষ্টান্ত তারই প্রমাণ।

ভাবগত ঐক্য (Unity of impression) :

ফরাসী নাট্যসমালোচক ফ্রান্সিস সার্সি প্রথম এই ভাবগত ঐক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেন। তিনি বলেছেন যে যদি কোনো ভাবকে দর্শকচিত্তে তীব্র ও স্থায়ী করতে হয়, তাহলে "An impression must be single."[২] নাট্য-কবিগণ বুঝেছিলেন যে দর্শকদের আত্মার গভীরে দাগ কাটতে গেলে একটি বিশেষ স্থানেই ভাবের আবেদন পাঠাতে হবে। আর ঐ ভাবের মধ্যে যতই ঐক্য থাকবে আবেদনও হবে ততই তীব্রতর ও স্থায়ী। একই নাটকে ট্রাজিক ও কমিক উপাদানের মিশ্রণ সম্পর্কে গভীর

১. *Lectures on Dramatic Art and Literature* (1801-11) Chap. XVII,
২. *A theory of the theatre*, ed, cit, pp 41-42,

আলোচনা করতে গিয়ে সার্সি আরও বলেছিলেন যে সমস্ত মেলোড্রামা, সমস্ত ট্রাজিডি, তা ক্লাসিক বা রোমান্টিক যাই হোক না কেন, যদি তাতে কমিক উপাদান থাকে, তাহলে তা মূল ভাবের অধীন হয়েই থাকবে, আর তা'না হলে "It would have destroyed the Unity of impression which the author always strives to Produce."[১]

সার্সির এই আলোচনায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে অধ্যাপক নিকল ভাবগত ঐক্যকে মেনে নিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নাটকের ঘটনাগত ও কালগত ঐক্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার শেষে নিকল জানিয়েছেন, "The whole thing might in one way be summed up by saying that in drama the one essential unity is unity of impression."[২] তাঁর মতে এই ভাবগত ঐক্যের সঙ্গে প্রাচীন ঘটনাগত ঐক্যের সংযোগ আছে। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। ঘটনাগত ঐক্য, বৃত্ত-সংগঠনের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়, আর ভাবগত ঐক্য জোর দেয় সাধারণ দর্শকদের ওপর সমস্ত নাটকটি যে ফলশ্রুতি নিয়ে আসে তার ওপর অর্থাৎ তাদের চিত্তে সামগ্রিকভাবে নাটক যে ধারণার বা ভাবের উদ্রেক করে তার ওপরে। এখানে ভাবগত ঐক্য বলতে যে একটিমাত্র ভাবই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকমনে জাগিয়ে রাখবে, তা নয়। এই ভাবগত ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে নাটকের মধ্যে নানাভাবের অবতারণা করেও। প্রত্যেক নাটকেই একটি মূল ভাব থাকে আর তারই আনুষঙ্গিক অনেক সহকারী ভাব থাকতে পারে। এই সমস্তই মূল ভাবের অধীন হয়ে দর্শক মনে জাগ্রত হয়। জার্মান নাট্যতাত্ত্বিক জি ফ্রেতাগও প্রত্যেক নাটকেই যে একটি মূল ভাব থাকে একথা জানিয়েছেন। অধ্যাপক নিকল ভারতীয় আলংকারিকদের রসবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং বলেছেন সহৃদয় দর্শকদের চিত্তে যে অবস্থায় রসাস্বাদন ঘটে, unity of impressionও সেই অবস্থার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ভারতীয় রসবাদে একটি মূলভাব তার অনুষঙ্গী নানা ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়ে যে ভাবে দর্শকচিত্তে একটি-মাত্র রসোদ্রেক করে, নাটকের unity of impression অনেকখানি তাই। একথা সত্য যে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ নাট্যঘটনা যেমন ঘটনাগত ও ভাবগত ঐক্য সৃষ্টি করবে তেমনি নাটকের ঘটনাধারায় যদি কিছু বৈচিত্র্য ও গঠনগত কিছু শিথিলতা থাকে, তাহলে অ্যারিস্টটল কথিত ঘটনাগত ঐক্য খুব ভালোভাবে লক্ষণীয় হয়তো হবে না, কিন্তু ভাবগত ঐক্য মোটের ওপর রক্ষিত হবে। ঘটনাগত ঐক্য কার্যকারণযোগে কতখানি রক্ষিত হয়েছে এ বিচার না করে সাধারণ দর্শকদের মনে একটা ভাবগত ঐক্যের বোধ সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা তাই দেখা দরকার। ভারতীয় আলংকারিক ভরত ঘটনা-ঐক্যের কথা বলেছেন, কিন্তু অ্যারিস্টটলের পন্থায় নয়। তিনি নাটকে রস নিষ্পত্তির কথাই

১. Ibid : pp. 45.
২. *The Theory of Drama* : Indian Reprint 1974 pp. 56.

বলেছেন এবং তাঁর ঘটনাগত ঐক্য ভাবগত ঐক্য বা unity of impression.[১] বিভাব অনুভাব সঞ্চারী-ভাবের সহযোগে ভাবের রস-পরিণাম তিনি যে ভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর সেই রসাভিব্যক্তির ক্রম মনে রেখে সার্সি ও নিকলের ভাবগত ঐক্যকে বোঝবার চেষ্টা করা সমীচীন নয়। সে চেষ্টা করলে ঘটনাগত ঐক্যকে উপেক্ষা করে ভাবগত ঐক্য সম্ভব কিনা এই প্রতিবাদ উঠবেই।[২]

চরিত্র :

চরিত্র নাটকের অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপাদান। কারো কারো মতে চরিত্রই নাটকের প্রাণ। নাট্যকার পিরাণদেল্লো বলেন যে, যদি কোনো ঘটনা বা তার অন্তর্গত ভাবকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়, তাহলে একটি স্বাধীন মানবীয় ব্যক্তিত্ব দরকার। ঐ ঘটনার চালক-শক্তিই হল চরিত্র।[৩]

কিন্তু চরিত্র বলতে আমরা কি বুঝি? চরিত্র শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল আচরণ বা ব্যবহার। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্র হল মানুষের অন্তর্নিহিত কতকগুলো ভাব ও বিশ্বাসের সমষ্টি, যার দ্বারা সে নিজের সঙ্গে ও বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ে চলে। আবার ঐ ভাব ও বিশ্বাসগুলো মানুষের আচরণেই ফুটে ওঠে। সুতরাং মানুষের আচরণের প্রকৃতি দেখে বা কর্মে ও আচরণে তার বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করে চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে হয়। এই চরিত্রকে আশ্রয় করেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ। কিন্তু ব্যক্তিত্ব কী? যে বংশে মানুষের জন্ম, সেই বংশের কতকগুলো প্রবণতাকে রক্তগত সূত্রে সে লাভ করে। এগুলো প্রচ্ছন্ন থেকে তার দেহ-মনকে বিশিষ্টতা দেয়—এদের সঙ্গে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্মিলিত হয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বকে রচনা করে। জীববিদ্যার দিক থেকে ব্যক্তিত্বকে একটি ডিম থেকে জীবের বিকাশ, আকৃতিপরিবর্তন, পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও পরে তার জীর্ণতা, ক্ষয়, মৃত্যু ও আবার আকৃতি পরিবর্তন-এর উপমা দিয়ে এক ধীর প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু ছাড়া এই ধীর প্রবাহে কোনো চাঞ্চল্য

---

১. নাট্যশাস্ত্রে বীজ ও বিন্দুর সঙ্গে নাট্যের প্রতি অঙ্কের সংযোগ স্থাপন করে, নায়ককে প্রতি অঙ্কে উপস্থিত করে বা তার প্রসঙ্গ এনে (২০।১৫।৩০), অবান্তর বিষয় বর্জন করে (২০।২৪) অঙ্কের পূর্বে বিষ্কম্ভকের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যের দৃশ্য এনে নাট্যরচনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে "All these, not only helped the play to produce an unity of impression, but also imparted to its plot a rapidity of movement which is essential for any kind of successful dramatic representation." *Natya Sastra*, Introduction. Page XLV. tr. Monomohan Ghosh.

২. নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য সং ১৯৭৪ পৃঃ ২২০-২১.

৩. Luigi Pirandello-র উক্তিটি S. W. Dowson লিখিত (সম্পাদিত John. D. Jump) *Drama and the Dramatic* গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ৬৮, সং ১৯৬৮ তিনি লিখেছেন, "Every action (and every idea it contains) needs a free human personality if it is to appear live and breathing before us. It needs something that will function as its motor characters in other words."

নেই।[১] যাই হোক, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের আলোচনায় চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব[২] এই দুয়ের কথাই মনে রাখা দরকার। কিন্তু সর্বদা একথাও মনে রাখতে হবে যে বাস্তবজগতের মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এবং নাট্যকার সৃষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কখনই এক নয়। বাস্তবজগতে বংশগত প্রবণতা, (heredity) ব্যক্তির ভাব ও বিশ্বাস এবং পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের প্রবাহ যেমন চলতে থাকে, তেমনি চরিত্রের লক্ষণগুলি তার কর্মে ও আচরণে লক্ষণীয় হয়। কিন্তু নাটকে তা হয় না। একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েই নাট্যকারের নাট্যরচনা। সৃষ্টির আভ্যন্তর প্রেরণা থেকেই চরিত্রগুলোর উদ্ভব। নাট্যকারের কল্পনা থেকেই চরিত্রগুলো বংশগত প্রবণতা লাভ করে এবং নাটকে সৃষ্ট জগৎ হল তাদের পরিবেশ। নাট্যকার যা চান, তারা তাই, তাঁর ইচ্ছে মতোই তাদের আচরণ। নাটকের চরিত্রগুলি 'কি' এবং তারা 'কে'—এ দুটি প্রশ্নের উত্তর নিতে গেলেই তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। চরিত্রটি 'কি' বললে তার জবাব—বিশিষ্ট ভূমিকায় তার আচরণবৈশিষ্ট্য চরিত্রকেই প্রকাশ করবে আর চরিত্রটি 'কে' বললে তার মনুষ্যসুলভ ব্যক্তিত্বজ্ঞাপক রূপটি জানতে কৌতূহলী করবে। সব নাটকে ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরেখ নয়। তাই চরিত্রের আলোচনাতেই অধিকতর মনোনিবেশ করা হয়। যাই হোক নাটকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই ধারণাটুকু নিয়ে প্রাচীন আলংকারিকগণের চরিত্র-চিন্তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

চরিত্র ও অ্যারিস্টটল :

প্রথমেই অ্যারিস্টটলের কথা। তিনি তাঁর Poetics গ্রন্থের ষষ্ঠ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে সূত্রাকারে বিবৃত করে আমাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উপস্থিত করছি। গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চরিত্রের শুধুমাত্র সংজ্ঞাটি দিয়ে তিনি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে নাটকের চরিত্রের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তার আলোচনা করেছেন।

চরিত্রের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন, "By character I mean that in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents." অর্থাৎ চরিত্র হল এমন এক ধর্ম যার জন্যে মানুষের ওপর কতকগুলো গুণ আমরা আরোপ করি। এই গুণকে তিনি বলেছেন নৈতিক (moral)।

---

১. "An egg with an ancesty, developing, changing its form ; always in a slow gradual way except for the shocks of birth and death, such is the broadest metaphor of the human personality developed by the organic point of view." J.E. Calderwood and H. E. Toliver Edtd "*Perspectives on Drama*' গ্রন্থের Character change and the Drama প্রবন্ধ—by Harold Rosenbarg, p. 324

২. চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে R. G. Gordon লিখিত '*Personality*' গ্রন্থের বক্তব্যের আলোকে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা' গ্রন্থে পৃঃ ২৩০, সং ১৯৭৮।

ক. তিনি নাট্যচরিত্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দাবী করেছেন। প্রথমত চরিত্রটিকে ভালো (good) হতে হবে। ভালো চরিত্র তো ভালো হবেই কিন্তু মন্দ চরিত্রেও কিছু ভালো দিক দেখাতে হবে। নাটকের মধ্যে চরিত্রটি যা করছে বা বলছে তার মধ্যে তার কিছু নৈতিক অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। এই অভিপ্রায় টুকু ভালো হলেই চরিত্রটি ভালো।

খ. চরিত্রটিকে যথাযথ (Propriety) হতে হবে। নায়ক অথবা রাজা হবে সাহসী ও বীর, নারী হবে কোমল ও মধুর স্বভাবসম্পন্না এবং আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকবে দাসদের। এইগুলো থাকলেই রাজা, নায়ক, নারী বা দাস-দাসীর চরিত্র হবে যথাযথ। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটলে বা নারীর বৈশিষ্ট্য পুরুষে বা পুরুষের বৈশিষ্ট্য নারীতে আরোপিত হলেই চরিত্র ঔচিত্য হারাবে।

গ. চরিত্রটিকে হতে হবে বাস্তব (true to life), অবাস্তব উপাদানে চরিত্র-সৃষ্টি করলে চলবে না।

ঘ. আর শেষ কথা হল চরিত্রটির মধ্যে সঙ্গতি (consistency) থাকা দরকার। চরিত্রটির লক্ষণ যদি অসঙ্গতিই হয়, তাহলে অসঙ্গতির সঙ্গতিও রক্ষা করতে হবে।

ঙ. চরিত্রটিকে প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য (necessary and probable) করেও তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন চরিত্র মানুষের গুণমাত্র, ঘটনা নয়। মানুষের সুখ-দুঃখ প্রকাশ পায় ঘটনায়। তার শেষ পরিণাম মৃত্যুও এক ধরনের ঘটনা—তার কোনো গুণ নয়। ঘটনা ছাড়া ট্রাজিডি সৃষ্টি সম্ভব নয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্র ছাড়াও ট্রাজিডি সম্ভব। নাটকে চরিত্রের চেয়ে বৃত্তের গুরুত্ব বেশী।

সমালোচনা :

চরিত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের উক্তিগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত, তথাপি নাটকের চরিত্রের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তিনি নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকী তিনটি বৈশিষ্ট্য এতকাল পরে আজিও অত্যন্ত মূল্যবান। সব চরিত্রের মধ্যেই কিছু নৈতিক উদ্দেশ্য থাকবেই তাঁর এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো কোনো নাটকের চরিত্রের মধ্যে এই উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। অবশ্য যদি ট্রাজিডি নায়কের চরিত্রের কথা মনে করে তিনি ঐ উক্তি করে থাকেন, তাহলে তাঁর বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। ভালো ও মন্দের মাঝামাঝি ট্রাজিডির নায়ক-চরিত্রের মধ্যে এমন বেশ কিছু গুণ থাকে যার জন্যে তার প্রতি আমরা সহানুভূতিসিক্ত হই। আবার অ্যারিস্টটল যখন চরিত্র ছাড়াও নাটক-সৃষ্টির কথা বলেন তখন হয়তো ঘটনামুখ্য নাট্যবৃত্তের কথাই বলেন, কিন্তু সেখানেও চরিত্রের অস্তিত্ব কি স্বীকার্য নয়? নাটকে চরিত্রের চেয়ে বৃত্তের গুরুত্ব বেশী—এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন নাটকের বৃত্ত একটি বিশেষ পরিকল্পনায় রচিত। আর তার মধ্যে চলে একটি নাট্যক্রিয়া। ঘটনাবলীকে নিয়েই নাট্যক্রিয়া। আবার এই ঘটনাবলীর সৃষ্টি হয় চরিত্র থেকে ও চরিত্রের চিন্তা থেকে।

কিন্তু নাটক জীবন-ঘটনার সুখ-দুঃখেরই অনুকরণ করে, নাটকের চরিত্রগুলিকে নয়। জীবনের সুখ-দুঃখই ঘটনার রূপ নেয়। সুখ বা দুঃখের অবসানও হল ঘটনাবিশেষ এবং তা কোনো গুণ নয়। চরিত্র হল গুণবিশেষ এবং তারও প্রকাশ ঘটনায়। সুতরাং ঘটনাই মূল এবং তার গুরুত্ব চরিত্রেরও অধিক। অ্যারিস্টটলের এই যুক্তিতে আমরা কিন্তু খুব আশ্বস্ত হই না। নাট্যক্রিয়া যদি হয় নাটকের ঘটনাবলী, তাহলে ঐ ক্রিয়ার কর্তার গুরুত্ব কীভাবে হ্রাস পায়, তা ঠিক বোঝা যায় না। অ্যারিস্টটল জানেন কর্তা বা চরিত্র থেকেই ঘটনাবলী জন্মাচ্ছে সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে যোগ একেবারে আত্মিক। কিন্তু নাটকে ঘটনাবলী যখন অগ্রসর হয়, তখন চরিত্র যেন সেই ঘটনা স্রোতের অধীন এক যাত্রী মাত্র। চরিত্র জনক হলেও ঘটনাবলীর ওপর যেন তার আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। বিষয়টি পরবর্তী কালে অনেক সমালোচকেরই মনে উদিত হয়েছে এবং অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। উইলিয়ম হেনরি হাডসন স্পষ্ট-ভাবেই বলেছেন—"Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work."[১] কিংবা "The foundation of good fiction is character-creating and nothing else."[২]

হেনরি আর্থার জোন্‌সও বলেছেন যে নাটকে কাহিনী ঘটনা ও পরিস্থিতি চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত না হলে তা "Childish and unintellectual"[৩] শেক্সপীয়রের নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়েই হাডসন শুধু প্রমাণ করেছেন যে নাটকে বৃত্তের চেয়ে চরিত্র কতো গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে আমরা পূর্বেই পিরানদেল্লার মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। মোট কথা নাটকে চরিত্র এবং ঘটনা দুইই গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাকে বাদ দিয়ে যেমন চরিত্রের অনুপ্রবেশ চলে না, তেমনি চলে না চরিত্রকে বাদ দিয়ে ঘটনার অনুপ্রবেশ। তবে কোনো নাটক চরিত্রমুখ্য বা কোনো নাটক ঘটনামুখ্য হতে পারে। কিন্তু চরিত্রমুখ্য নাটকগুলি বেশী সার্থক হয় বলে সেখানে ঘটনার কোনো মূল্য নেই একথা ঠিক নয়। দুয়ের মধ্যে যোগ এমনি অন্তরঙ্গ যে এদের পার্থক্য করাই কঠিন হয়। নাটকে এদের মধ্যে কার স্থান প্রথমে এবং কার স্থান নিম্নে এ-নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। একটি সমগ্র নাট্যক্রিয়ায় ঘটনা ও চরিত্র সম্মিলিতভাবেই অগ্রসর হয় শুধুমাত্র ঘটনাবলী নয়। তাই এ দুয়ের শ্রেষ্ঠত্বেই নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব।[৩]

যাই হোক অ্যারিস্টটল যে চরিত্রকে গুণধর্ম বলেছেন এবং তা যে তার আচরণে প্রকাশ পায়, এর সঙ্গে আমাদের আলোচিত চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও বিরোধ নেই। নাটকের চরিত্রকে যথাযথ করে তোলা, তার মধ্যে সঙ্গতি বজায় রাখা, তাকে বাস্তব অর্থাৎ আমাদের কল্পনায় তাকে সত্য করে তোলা (Real to our imagina-

১. *An Introduction to the Study of Literature.* p. 186, Reprint 1944.

২. Arnold Bennet, D. O. W. L. p. 51.

৩. অ্যারিস্টটলের বক্তব্যকে আমরা মনের মতো করে বুঝে তাকে অযথা ভুল বুঝছি কি না—এর ইঙ্গিত দিয়েছি বৃত্তের আলোচনায়।

tion) চরিত্রকে অপরিহার্য এবং নাট্য পরিকল্পনার আভ্যন্তর প্রয়োজনে সম্ভাব্য করে তোলা—তাঁর এই সব সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক।

চরিত্র ও ভারতীয় আলংকারিক ঃ

চরিত্র সম্পর্কে এবারে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারণার কিছু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। আংলকারিক ভরত, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ নাট্যে নায়ক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নায়ক-নায়িকার চরিত্রের শ্রেণী, তাদের সঙ্গী, নায়িকা-চরিত্রের শ্রেণী, প্রতিনায়ক চরিত্র, অন্যান্য চরিত্র, তাদের ভাষা, সম্বোধন রীতি প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু নাটকে চরিত্রের সঙ্গে বৃত্ত, সংলাপ প্রভৃতির সম্পর্ক নির্ণয়ে তাঁদের কোনো উৎসাহ নেই। তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রেণী বিন্যাসেই বিশেষ আগ্রহী। তাঁদের আলোচনার অরণ্যে প্রবেশ না করে মাত্র কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা নায়ক নায়িকা ও প্রতিনায়ক চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্য ঘটনাকে পরিণামমুখী পথে যিনি চালনা করেন, তিনিই নায়ক। তিনি বহুগুণান্বিত—উচ্চবংশসম্ভূত, সুদর্শন, কর্মকুশল, বিনয়ী, উদার, মঞ্জুভাষী, কলারসিক, বীর, দৃঢ়চেতা—প্রভৃতি। একই নায়ক চরিত্রে সব গুণ অবশ্য নাও থাকতে পারে। ধীর, ললিত, শান্ত ও উদার এই চার রকম হতে পারে নায়ক। নায়ক চরিত্রে বরাবর সঙ্গতি থাকা দরকার। দৃশ্যকাব্যের মধ্যে 'নাটক' নামক শ্রেণীর উপজীব্য প্রেম বলে নায়িকার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা মনে রেখে তাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—দক্ষিণ (অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়েও প্রথমার প্রতি অনুরক্ত), শঠ (অন্য নায়িকার প্রতি আসক্তি যে প্রথমার কাছে গোপন করে), ধৃষ্ট (অন্যার সঙ্গে আশ্লেষের চিহ্ন যে প্রথমাকে দেখায়), ও অনুকূল (যখন নায়কের একটিমাত্র প্রণয়িনী)। শোভা, বিলাস, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, স্থৈর্য, তেজ, লালিত্য, ঔদার্য এই আটটি পুরুষোচিত লক্ষণ থাকবে নায়কের। নায়ক চরিত্রের বিরুদ্ধ হল প্রতিনায়ক চরিত্র ; আত্মসংযমী ও ধীরোদ্ধত হলেও সে পাপী, ভয়ঙ্কর ও একগুঁয়ে হবে। প্রাসঙ্গিক কাহিনীর নায়ক চরিত্রের নাম পীঠমর্দ—ইনি নায়কের সহায়ক ও বুদ্ধিমান। নায়ক-সহায়ক দ্বিতীয় চরিত্র হল সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ বিট ; তৃতীয় সহায়ক চরিত্র হল কিঞ্চিৎ আকার, প্রকট-দম্ভ, লোভী, রক্তচক্ষু প্রাকৃত ভাষী হাস্যরসিক বিদূষক। এছাড়া আছে মূর্খ আত্মাভিমানী হীনবংশজ রাজ-শ্যালক শ-কার চরিত্র। বিশ্বস্ত, সাহসী, ম্লেচ্ছ দূত চেট, রাজকার্য থেকে অবসরপ্রাপ্ত রাজসহায়ক কঞ্চুকী চরিত্র। এছাড়া নায়িকা চরিত্রের তিন শ্রেণী—স্বীয়া (নায়কের পত্নী) অন্যা (অন্যের স্ত্রী) এবং সাধারণ স্ত্রী। স্বীয়া হবে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, অভিজ্ঞা হলে প্রগল্‌ভা, অনভিজ্ঞা হলে মুগ্ধা ও কতকটা অভিজ্ঞা হইল মধ্যা। ঐ স্বীয়ার আবার বারো প্রকার—প্রত্যেক প্রকারের আবার দু রকম ভেদ। নায়কের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে নায়িকা-চরিত্রের আটটি ভেদ। স্বাধীনভর্তৃকা (যার অধীনে স্বামী), বাসকসজ্জা (নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য সজ্জা),

বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, (অন্যার সঙ্গে মিলন-চিহ্ন দেখে নায়িকা ক্রুদ্ধা), বিপ্রলব্ধা (প্রতারিতা), প্রোষিতভর্তৃকা (যার স্বামী বিদেশে) ও অভিসারিকা। এঁদের আলোচনায় বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্থির করে দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁদের বিভিন্ন গুণও নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৃত্তের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়নি।

নায়ক চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষার কথা তাঁরা বলেছেন, কিন্তু অন্য চরিত্রগুলিতে কী ধরনের সঙ্গতি থাকবে তা বলেননি। নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য যেভাবে তাঁরা বর্ণনা করেছেন তাতে বোঝা যায় যে পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নারী চরিত্রে আরোপ করা চলবে না—এদিক থেকে অ্যারিস্টটলের চরিত্রগুলোকে 'যথাযথ' করে অঙ্কন করার সাদৃশ্য আছে। তাঁরা সমস্ত চরিত্রের গুণ নির্দেশ করে দেওয়ার ফলে সব চরিত্রকেই ভালো হতে হবে—অ্যারিস্টটলের মতো এমন দাবী করেননি। চরিত্রগুলোকে অপরিহার্য বাস্তব ও সম্ভাব্য করে তোলার ব্যাপারেও তাঁরা কিছু বলেননি। এঁদের শ্রেণীবিভাগ ও চরিত্র-পরিচয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পরিচয় আছে, তথাপি মনে হয় সংক্ষেপে চরিত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন তা আমাদের চরিত্র-বিচারে বেশী উপযোগী।

সিদ্ধান্ত :

এবার আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা জানি, নাট্যকার একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বিশেষ দৃষ্টির ছায়াতলে নাট্যবৃত্ত, নাট্যচরিত্র ও নাট্যপরিস্থিতি সৃজন করেন। সুতরাং চরিত্র, বৃত্ত, পরিস্থিতি, সংলাপ সব কিছুই তাঁর সেই পরিকল্পনার অধীন। তাঁর সেই দৃষ্টি বৃত্তে গতিদান করে চরিত্রগুলোকে স্বেচ্ছামতো বাঙ্ময় করে, স্বেচ্ছামতো আচরণে প্রবৃত্ত করে। অতএব সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নাটকের নেপথ্যে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গী। তথাপি আলোচনার সুবিধের-জন্য পৃথকভাবে চরিত্রগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। নাট্যচরিত্র টি. এস. এলিয়টের কথায় প্রথমত নাট্যকারের বিশেষ দৃষ্টির (vision) 'Objective Co-relative.'[১]। নাট্যবৃত্তের দাবীগুলি পূরণের বাইরে এদের আর কোনো ভূমিকা নেই। সেইজন্য নাটকের চরিত্র সংক্ষিপ্ত আয়তনেই রূপ দিতে হবে। আয়তনের সংক্ষিপ্তির মধ্যেই চরিত্রকে পূর্ণতা দিতে হবে। চরিত্রগুলোকে অ্যারিস্টটলের কথামতো সঙ্গতিপূর্ণ, অপরিহার্য, যথাযথ, সম্ভাব্য ও কল্পনায় জীবন্ত করে তুলতে হবে। সংস্কৃত আলংকারিকদের বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগে আমরা প্রবেশ করতে চাইনে। কিন্তু মোটামুটি দুই শ্রেণীর নাট্যচরিত্র লক্ষণীয় হতে পারে। টাইপ বা শ্রেণী চরিত্র। এগুলিকে স্থিতিশীলও বলা চলে। আর ব্যক্তি চরিত্র বা বিকাশধর্মী চরিত্র এগুলিকে গতিশীল বলা যেতে পারে। শ্রেণী চরিত্রের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্পষ্ট। দু' একটি বৈশিষ্ট্যে বা একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে বরাবর নাটকের মধ্যে এ চরিত্র বর্তমান থাকে।

---

১. *Drama and the Dramatic* : S. W. Dawson লিখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, p. 48 (Methuen and Co. Ltd. 1970).

বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তাদের সেই একই রূপ ধরা পড়ে। গ্রীক ও ল্যাটিন কমেডিতে, কমেডিয়া ডেল আর্টে, ফার্সে এই শ্রেণীর চরিত্র তো থাকেই। অন্য নাটকেও এ শ্রেণীর চরিত্র থাকতে পারে। সাধারণত বৃদ্ধ কৃপণ, ঈর্ষান্বিত স্বামী, ষড়যন্ত্রকারী চাকর, বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধ, ভণ্ড সন্ন্যাসী, চতুর প্রতারক প্রভৃতি চরিত্রকেই টাইপ বা শ্রেণীচরিত্ররূপে বেছে নেওয়া হয়। জেকোবীয়ান নাটকের প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি, রেস্টোরেশন যুগের পরগাছা শ্রেণীর মানুষ, মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ও সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভূত মাতৃ অনুরক্ত পিতৃদ্রোহী সন্তান প্রভৃতিও টাইপ শ্রেণীর চরিত্র। কিন্তু বিকাশশীল ব্যক্তিত্বময় চরিত্রই নাটকের প্রকৃত গৌরব। অধিকাংশ বিকাশশীল চরিত্রে ব্যক্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে। আবার কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্ব বড়ই জটিল রূপ নিয়ে নাটকে দেখা দেয়। এগুলো এরিক বেন্টলির কথায় 'Mysterious Characters'[১] শেক্সপীয়রের হ্যামলেট এর দৃষ্টান্ত। প্রথম শ্রেণীর টাইপ চরিত্রের উদাহরণ শেক্সপীয়রের ফুল, ফলস্টাফ, আমাদের বাংলা নাটকের করিমচাচা, বিদূষক, রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা চরিত্র। বিকাশশীল চরিত্রগুলি নাটকের ঘটনার সংঘাতে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। নানা চরিত্রের সংস্রবে, তাদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই এ চরিত্রসমূহ বিবর্তিত হয়ে পরিণতি লাভ করে। আর এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রগুলি চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

চরিত্রের সঙ্গে ঘটনার যোগ যেমন নিবিড়, তেমনি সংলাপেরও। চরিত্র থেকে সংলাপ পৃথক করলে নাট্যগতিও রুদ্ধ হবে এবং চরিত্রও প্রাণহীন হয়ে উঠবে। এইজন্য এমন কথাও বলা হয় যে "The life of the character is the life of the language."[২] নাটকের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে সংলাপের সহায়তা নিতেই হবে। দু ভাবে সংলাপ চরিত্র উপলব্ধিতে সহায়ক হতে পারে। প্রথমত কোনো একটি চরিত্র নিজে যা বলে চলেছে অন্য চরিত্রের কাছে যা অন্য চরিত্র তার সম্পর্কে যা বলছে তার দ্বারা। কিংবা চরিত্রটির স্বগতোক্তি বা জনান্তিক ভাষণের দ্বারা। সাধারণ সংলাপের সাহায্যে চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন সম্ভব না হলে অনেক সময় স্বগতোক্তির প্রয়োজন হয়, যেমন হয়েছে শেক্সপীয়রের ট্রাজিডিতে। স্বগতোক্তি অভিনীয়মান চরিত্রগুলির শ্রোতব্য নয়, অথচ দর্শকের শ্রোতব্য কোনো চরিত্র-বিশেষের একটি বিশেষ মুহূর্তের সর্মগ্র হৃদয়-মথিত উক্তি। আর অন্য সকলের কথোপকথনের মধ্যে মাত্র দুজনেরই আলাপ যা মঞ্চের অন্য সকলের শ্রোতব্য নয়, অথচ দর্শকের শ্রোতব্য, তাই হল জনান্তিকে ভাষণ।

আরও একটি কথাও মনে রাখা দরকার। নাটকের টাইপ-চরিত্র আদ্যন্ত নাটকে একটি বড় ভূমিকা পালন করলেই সাধারণত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নাটকের অধিকাংশ গৌণ চরিত্র শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়েই দেখা দেয়। প্রধান

১. *Selected Prose*—T. S. Eliot—Hamlet p. 107.
২. *Drama and the Dramatic* : S. W. Dawson, 'Character and the Idea' p. 51.

চরিত্রগুলিকে বা নায়ক চরিত্রকে ট্রাজেডিতে বিকাশধর্মী করে অঙ্কন করা হয়।

নাট্যচরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে রূপ দেওয়ার স্বাধীনতা নাট্যকারের খুবই সীমিত। সেইজন্য মাঝে মাঝে দু' একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের দ্বারা নাট্যকার নাটকের মূল ভাব ও মূল চরিত্র বা প্রধান প্রধান চরিত্র সম্পর্কে পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলতে পারেন। এই প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা, গিরিশ ঘোষের করিমচাচা, দ্বিজেন্দ্রলালের দিলদার চরিত্রের সৃষ্টি। গ্রীক নাটকের কোরাস, আমাদের যাত্রার বিবেক, শেক্সপীয়রের অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা নাটকের এনোবেরাস চরিত্রই এই প্রয়োজনেই এসেছে।

চরিত্র ও বাঙলা নাটক :

আমাদের বাংলা নাটক প্রধানত ঐতিহাসিক সামাজিক ও পৌরাণিক এই তিন খাতে উদ্ভবের পর থেকে বহু বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই তিন শ্রেণীর নাটকে তিন ধরনের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাসের স্পর্শে অতিশয় বেগবান হয়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্রগুলির আভিজাত্য ও জীবনবোধের গভীরতাও লক্ষণীয় হয়েছে। পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক পরিবেশ চরিত্রগুলির আচরণ ও বৈশিষ্ট্যকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সামাজিক নাটকে সমাজ মানসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলি অনুরূপ বিশিষ্টতা লাভ করেছে। নাট্যকারের নাট্যমানস বা তাঁর বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার রঙেও চরিত্রগুলি কম অনুরঞ্জিত নয়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র-সৃষ্টিতে আমাদের নাট্যকারগণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর নারায়ণ' নাটকের কর্ণ, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের আরঙ্গজীব, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নাটকের সদা, তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটকের অসীম, দিগিন্দ্রচন্দ্রের 'জীবন জোত' এর গীতা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বময় চরিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। টাইপ বা শ্রেণী-চরিত্র সৃষ্টিতেও তাঁরা পশ্চাদ্‌পদ নন। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের ভজহরি, 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের করিমচাচা, রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা, তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকের গোপী প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র। ব্যক্তিত্বধর্মী চরিত্র চিত্রণে সামাজিক নাটকেই তুলনামূলক-ভাবে নাটকারগণের নৈপুণ্য বেশী। রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্র-চিত্রণে নূতন পন্থা নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তি-চরিত্র নয়, সমষ্টি চরিত্রের দিকেই তখন তাঁর দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ। ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয়, সমষ্টির দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণী-সমস্যা বা সামগ্রিক ভাবে মানব-সমস্যা তখন তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছে।

সংলাপ : অ্যারিস্টটল

এবার সংলাপের আলোচনা। নাট্যবৃত্তকে গতিশীল রাখার জন্যে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক উক্তিই হল নাট্যসংলাপ। পাশ্চাত্যে অ্যারিস্টটল পরবর্তী কালে নাট্যসংলাপ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে অ্যারিস্টটল এ সম্পর্কে যা

বলেছেন, প্রথমেই তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি তাঁর The Art of Poetry গ্রন্থের বিংশতি থেকে দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশে ভাষা, শব্দ ও রীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বর্ণ, শব্দাংশ, অন্বয়ীশব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিভক্তি, কারক অথবা বাক্যাংশ প্রভৃতি ভাষার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তিনি বৈয়াকরণের পন্থায় যে আলোচনা করেছেন, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে শব্দ দু রকম :—অর্থহীন উপাদানে গঠিত একক শব্দ এবং অর্থযুক্ত উপাদানে অথবা অর্থহীন উপাদানে গঠিত যুগ্ম শব্দ। প্রচলিত বা দেশী শব্দ এবং বিদেশী শব্দের সংজ্ঞাসহ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। 'রূপক'-এর নানা সম্ভাবনাও দৃষ্টান্তসহ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ক. ভাষার আদর্শ রীতি হবে স্বচ্ছ।[১] প্রচলিত অথবা সার্থক শব্দ যেখানে ব্যবহৃত, সেখানেই রীতি স্বচ্ছ। খ. আবার বিরল-ব্যবহৃত রূপকাশ্রয়ী শব্দে রচিত এবং স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গী থেকে পৃথক রীতিই হল সমুন্নত। নানা ধরনের রীতি প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করাও দরকার। গ. সবচেয়ে বড় বিষয় হল রূপক প্রয়োগে দক্ষতা; এটা অপরের কাছ থেকে শেখার নয়। "It is also a sign of genius, since a good metaphor implies an intuitive perception of the similarity in dissimilars."[২]

অ্যারিস্টটলের বক্তব্য থেকে রীতির স্বচ্ছতা, সমুন্নত রীতি, নানা রীতি প্রয়োগে সঙ্গতি এবং রূপক প্রয়োগের গুরুত্ব—এই কয়েকটি বিষয় জানতে পারি। তাঁর বক্তব্য কাব্য ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তথাপি আধুনিক কালেও তাঁর এ বক্তব্যের মূল্য এতটুকু খর্বীকৃত হয়নি। নাটকের বৃত্তপরিকল্পনা ও নাটকের বিষয় থেকেই তার রীতিটি নির্ধারিত হবে এবং সব ক্ষেত্রে Grand style বা সমুন্নত রীতিতে নাটক লিখিত হবে না। তাছাড়া নাটকের চরিত্র অনুযায়ী তার ভাষাও হবে বিভিন্ন। ট্রাজিডি নাটকের নায়কের আচরণে ও সংলাপে তাঁর কালে বিশেষত সফোক্লিস ও ইস্কাইলাসের নাটকে সমুন্নত রীতি লক্ষ্য করা যাবে: কিন্তু সব যুগের নাটকে বিশেষত যেখানে ট্রাজিডিতেও কমিক উপাদান এসে মিশেছে, সেখানে ঐ রীতি আদ্যন্ত লক্ষণীয় হওয়ার কথা নয়।' অবশ্য রূপক-প্রয়োগে দক্ষতার কথা যা তিনি বলেছেন, তা সব যুগের নাট্যকারের পক্ষেই সত্য।

নাট্যসংলাপ ও ভারতীয় আলংকারিক ঃ

সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাটকের ভাষা ও রচনারীতি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে চার রকম রীতি বা 'বৃত্তি'র উল্লেখ আছে।[৩] ক. কৌশিকী

১. "The perfection of Diction is for it to be atonce clear and not mean···the Diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms, i.e., strange words, metaphors, lengthened forms, and everything that deviates from the ordinary modes of speech"—*The Art of Poetry* : tr. I. Bywater chap. 22. pp. 75,

২. Ibid : tr. Bywater chap. 22 ; p. 78.

৩. নাট্যশাস্ত্র (২০/২৫-৩২)

খ. সাত্বতী, গ. আরভটি ও ঘ. ভারতী বৃত্তি। শৃঙ্গাররসে ও হাস্যরসে প্রথমটি, বীর অদ্ভুত ও ভয়ানক রসে দ্বিতীয়টি, রৌদ্র ও বীভৎস রসে তৃতীয়টি ও অন্য রসে ভারতী বৃত্তির প্রয়োগ হয়। এই চারটি বৃত্তি বা রীতির মধ্যে সাত্বতী হল এমন একটি বৃত্তি যাতে অধ্যবসায়, শৌর্য, ত্যাগ, দয়া ও ঋজুতা বহুল পরিমাণে থাকে, যা হর্ষ ও অল্প শৃঙ্গারযুক্ত, শোকশূন্য ও অদ্ভুত রসসমন্বিত। অ্যারিস্টটল যাকে Grand Style বলেছেন এও তাই। ভারতী হচ্ছে মৌখিক রীতি—ভরত বলেন প্রধানত করুণ ও অদ্ভুত রস সৃষ্টিতে এই রীতির আশ্রয় নেওয়া হয়।[১] কৌশিকী হচ্ছে মাধুর্যপূর্ণ রীতি। আর আরভটি হল তেজোময় রীতি।

বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' এ 'সংলাপ' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। উপরে যে 'সাত্বতী' রীতির কথা বলা হল, তার চারটি ভাগ ক. উত্থাপক, খ. সাংঘাত্য, গ. সংলাপ ও ঘ. পরিবর্তন। সুতরাং সাত্বতী বৃত্তির অন্যতম উপবিভাগ হল 'সংলাপ'। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—"সংলাপঃ স্যাদ্ গভীরোক্তির্নানাভাব সমাশ্রয়ঃ"[২] অর্থাৎ নানাভাবের ব্যঞ্জনাপূর্ণ গভীরোক্তিই হল সংলাপ। বর্তমানকালে নাটকের উক্তি-প্রত্যুক্তি বোঝাতে যে সংলাপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তার মূল কিন্তু এই শব্দ। এ ভাষা যে নানা ভাবদ্যোতক ও ব্যঞ্জনাপূর্ণও হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তবে সাত্বতী বৃত্তিতে রচিত দৃশ্য-শ্রব্য কাব্যের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য নয়। 'সাহিত্যদর্পণ'-এ আরও নানাপ্রকার উক্তির বর্ণনা আছে। যে উক্তি অন্যের শোনবার নয়, তা হল 'স্বগত'; সকলেই যা শুনবে তা 'প্রকাশ'; অন্য পাত্রের নিকট গোপন কিছু বিষয় যদি পিছন ফিরে বলা হয়, তা 'অপবারিত'; তিনটি পতাকার মতো হাত দিয়ে অন্য পাত্রকে আবৃত করে অন্য সকলের কথার মধ্যে দুজনের পরস্পরের আলাপকে বলে জনান্তিক; অন্য পাত্র না থাকলে কোনও অযুক্ত বিষয় যেন শুনেছে এমন ভান করে 'কি বলছ'—একথা বলা হলে তা 'আকাশ-ভাষিত'।[৩]

নাটকের পাত্র-পাত্রীরা কি ধরনের ভাষা প্রয়োগ করবে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে।[৪] শিক্ষিত উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ পাত্রগণের ভাষা হবে সংস্কৃত ও স্ত্রীলোকের ভাষা হবে শৌরসেনী প্রাকৃত—কিন্তু গান বা শ্লোকে স্ত্রীলোকের ভাষা মহারাষ্ট্রী। রাজার অন্তঃপুরবাসিগণের ভাষা হবে মাগধী—চেট, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠিগণের অর্ধমাগধী, বিদূষকের 'প্রাচ্যা', ধূর্তগণের 'অবন্তিকা', যোদ্ধা ও নাগরিকগণের 'দাক্ষিণাত্যা', শক ও শবরগণের 'শাবরী'। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ-বিধি থেকে বোঝা যায় সংস্কৃত নাটক সমাজের কোন অবস্থায় উদ্ভূত হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভাষা-প্রয়োগের বিধি সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যসংলাপে ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কেও নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ লক্ষ্য করার মতো। নাট্যসংলাপ পদ্যে

---

১. নাট্যশাস্ত্র (২২।২৫)
২. সাহিত্যদর্পণ (৬।১৩১)
৩. সাহিত্যদর্পণ (৬।১৩৭-৪০)
৪. নাট্যশাস্ত্র (১৭।৩১-৬১)

রচনার দিকেই ভরতের নির্দেশ। দীর্ঘ ও ঘন ঘন গদ্যের ব্যবহার এই কারণেই ঠিক নয় যে এতে দর্শক ক্লান্তি বোধ করবে।[১] শুধু পদ্যে নাট্যসংলাপ রচনার কথাই নয়—নানা ছন্দের গঠন সম্বন্ধেও নাট্যশাস্ত্রে নির্দেশ আছে। বিভিন্ন রসের অনুকূল ছন্দ প্রয়োগ করতে হবে। বীর ও ভয়ানক রসের অনুকূল ছন্দ হবে 'আর্যা'। শৃঙ্গাররসের অনুকূল ছন্দ হবে মালিনী ও মন্দাক্রান্তা ও করুণরসের উপযোগী ছন্দ হবে শকরী ও অতিধৃতি[২]। উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে চেয়ে যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। দুরূহ শব্দ বর্জন, দর্শকদের বোধগম্য শব্দার্থের সুষম প্রয়োগ, রসানুকূল ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য-গঠনের দ্বারা নাট্যকে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।[৩] এ ছাড়া পাঁচ রকম উপমা, রূপক, দশ রকম যমক ইত্যাদি তেত্রিশ প্রকার অলংকার, ষোল প্রকার বীথ্যঙ্গ ও দশ প্রকার লাস্যাঙ্গের প্রয়োগ-বিধিও আছে।[৪]

সমালোচনা :

পরিশেষে একটি কথা বলা দরকার। অ্যারিস্টটল ও ভরত দুজনেই নাটকের ভাষা বা সংলাপ যে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষা থেকে পৃথক-এর ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক নাটকে, রোমক নাটকে, এমনকি রোমান্টিক যুগে শেক্সপীয়রের নাটকে পদ্য ভাষা নাটকে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে যুক্তি ও চিন্তার প্রসারে ক্রমশ নাটকে পদ্যের পরিবর্তে গদ্য আপন আসন অধিকার করে নিয়েছে। ক্রমশ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের অত্যন্ত নিকটে আসার প্রবণতা দেখাচ্ছে, বিশেষ করে বাস্তবতাপ্রধান নাটকে (Naturalistic Drama) একেবারে মুখের বুলিকে নাটকে স্থান দেওয়ার পক্ষে ওকালতিও করা হচ্ছে। প্রতিদিনকার সমকালীন পরিস্থিতি ও দৈনন্দিন সাধারণ চরিত্রকে নাটকে নিয়ে এসে আধুনিক নাট্যকারগণ প্রচলিত নাট্যসংলাপকে বর্জন করতে চাইছেন। পদ্যকে বিদ্রূপ করে ইবসেন বলেছেন যে "language of the gods".[৫] এর বিরুদ্ধে অবশ্য টি. এস এলিয়ট আছেন। তাঁর বক্তব্য হল—"The human soul in intense emotion, strives to express itself in verse".[৬] অধ্যাপক নিকল মনে করেন নাটকের ভাষা-কখনো দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা হতে পারে না।[৭] Raymond Williams বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে বলেছেন "Surely, the medium of naturalism—the representation of everyday speech is immeasurably less satisfying in the twentieth century than in the sixteenth.[৮]

---

১. নাট্যশাস্ত্র (২০।৩৪).
২. নাট্যশাস্ত্র (১৭।১১০-১২).
৩. নাট্যশাস্ত্র (১৭।১১৯-২২).
৪. সাহিত্যদর্পণ (৬।১৭০)
৫-৮ এগুলি Raymond Williams লিখিত *Drama From Ibsen to Eliot* (Chatto & Windus, 1954) গ্রন্থের Introduction-এ উদ্ধৃত মন্তব্য ও স্বয়ং সমালোচকের পৃ. ২২ ও ২৬.

সিদ্ধান্ত ঃ

নাট্যবৃত্তের ক্রিয়াকে গতিশীল ও পরিণামমুখী করার জন্যে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক প্রাণময় উক্তি-প্রত্যুক্তিই হল নাট্যসংলাপ। অধ্যাপক নিকল নাট্যসংলাপকে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে অ্যারিস্টটলের মতো বৃত্ত নাটকের প্রাণ নয়। ডাবলিউ. এইচ. হাডসন[১] বা হেনরি আর্থার জোন্‌সের মতো চরিত্রকে তিনি নাটকের প্রাণ বলে মনে করেন নি। নাট্যসংলাপই তাঁর মতে নাটকের জীবন। তিনি বলেছেন, 'Action is to drama what is body is to man, in its language, resides the drama's soul'.[২]

বস্তুত বৃত্ত ও চরিত্র নাটকের অপরিহার্য উপাদান হলেও সংলাপবর্জিত নাটক অর্থহীন। মূকাভিনয় বা অভিনেতৃদের অঙ্গভঙ্গী, দৃশ্যসজ্জা, এবং আলোকসম্পাতের নানা কৌশল নাট্যবৃত্তের অন্তর্গত বিষয়টিকে কতকটা আভাসিত করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হলেই এগুলির যথার্থ সার্থকতা। সংলাপ চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে। চরিত্রগুলি সংলাপের দ্বারাই পরস্পর ভারসাম্য রক্ষা করে। সংলাপের সাহায্যে বৃত্তের প্রকৃতি ও অগ্রগতি দর্শকদের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়। নাট্যকারের পরিকল্পনা বা তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার রূপটিকে উপস্থাপিত করে দর্শকচিত্তে উদ্দিষ্ট রস-সঞ্চারের মাধ্যম হল সংলাপ। বাস্তবজীবনে প্রতিদিনের কাজকর্মে অপরের সঙ্গে আলাপে মানুষ যে সংলাপ ব্যবহার করে, নাটকীয় সংলাপ ঠিক তা নয়। হেনরি আর্থার জোন্‌স[৩] বলেন, বাস্তবজীবনে রাস্তার কলহের ভাষায় অনেক অনাটকীয় শব্দ বা বাক্যাংশের পৌনঃপুনিকতা ও ভাবাবরোহ (anticlimax) থাকে, কিন্তু নাটকীয় সংলাপে এ সমস্ত থাকা উচিত নয়। নাটকীয় সংলাপ হবে সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, চরিত্র-প্রকাশক ও প্রাণময়। ঔচিত্য অনুযায়ী তা পাত্র-পাত্রীদের মুখে সংযোজিত হবে। নাটকে সাধারণত তিনভাবে প্রথানুগ পথে সংলাপ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ক. দীর্ঘকাল থেকে পদ্যেই প্রধানত নাট্যসংলাপ রচিত হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগে অবশ্য কিছু কিছু অংশে গদ্যসংলাপও দেখা গেছে, যেখানে সাধারণ মানুষ এসেছে অথবা কমিক দৃশ্যে। পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে এবং বিশেষত আধুনিক যুগে গদ্য নাট্যসংলাপের প্রধান বাহন হয়েছে। খ. বাস্তবজীবনের সংলাপের চেয়ে নাটকের সংলাপ কতকটা দীর্ঘ এবং তা সুন্দরভাবে ভারসাম্য রক্ষায় সমর্থ। ক্লাসিকাল নাটকে ছিল সংলাপের দীর্ঘতা—পরে তা ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগে সংলাপ ছিল সাধারণতঃ অলংকারপূর্ণ।

---

১. Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work. We have only to turn to Shakespeare to find a telling illustration. *An Introduction to the study of Lit.* W. H Hudson. pp 186.

২. *Perspectives on Drama*: Edtd by J. L. Calderwood ও H. E. Toliver-এর গ্রন্থে নিকল লিখিত Dramatic Dialogue প্রবন্ধ pp 339-43.

৩. *An Introduction to the Study of Literature.* Hudson. Chap IV pp 155.

রেস্টোরেশন যুগের উচ্চস্তরের কমেডিগুলিতে সংলাপ চরিত্রগুলির ভারসাম্য রক্ষায় সার্থকতালাভ করেছে। গ. চরিত্রগুলির হৃদয়ভাব অনুযায়ী সংলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সংলাপ আবেগদীপ্ত বা লঘুভাবদ্যোতক হবে চরিত্রের মেজাজ, স্বভাব ও হৃদয় নিহিত ভাবের প্রেরণায়। আধুনিক কালে বার্নার্ড শ-এর নাটকে সংলাপ দীর্ঘ আলোচনার রূপ নিয়েছে। আবার আধুনিক কালের অনেক কমিডির সংলাপ চরিত্রগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও হয় না। কিন্তু এটা ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। বার্নার্ড শ-এর আলোচনা-মুখ্য (Discussion Drama) সার্থক নাটকগুলিতে সংলাপ চরিত্রের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা নাট্যদ্বন্দ্বকেও চমৎকার প্রকাশিত করেছে।[১] যাই হোক, ক্ষুদ্রাকারে সংলাপের বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে নির্দেশ করতে পারি।

ক. নাটকের বৃত্ত ও চরিত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ থাকবে সংলাপের। নাট্যবৃত্তের ক্রিয়ার অগ্রগতি ও চরিত্রগুলির ভাষ্যরূপেই সংলাপ নাটকে দেখা দেবে। অবান্তব সংলাপ সর্বথা বর্জনীয়। চরিত্রের ভাষ্য বলে সংলাপ হবে প্রাণময়। যে পরিমণ্ডলে চরিত্রগুলি দেখা দেবে, সেই পরিবেশের সঙ্গে তাদের সংলাপের একটা চমৎকার সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

খ. নাটকের সংলাপকে হতে হবে স্বাভাবিক, যথোপযুক্ত ও গতিগর্ভ। পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশিত বা বিকশিত করে তুলবে সংলাপ। সংলাপ পরিস্থিতি বা ঘটনা-সন্ধি সৃষ্টি করবে। যে পরিস্থিতিতে এবং যার মুখে নাটকীয় ভাষা শুনছি, তা যেন ঔচিত্য রক্ষা করে চলে।

গ. নাট্যসংলাপ হবে জোরালো এবং তাৎক্ষণিক। নাট্যবৃত্তটি যে রাজ্যের তার পরিমণ্ডলটিকে সৃষ্টি করে তুলবে সংলাপ। জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে একাধিক চরিত্রের সমাবেশ প্রয়োজন। দুটি চরিত্রের মধ্যে যখন কোনও আদর্শগত দ্বন্দ্ব চলবে এবং একে অপরের উক্তির প্রতিক্রিয়ায় কথা বলবে, অথবা আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে নায়ক ও নায়িকার শেষ সাক্ষাৎকারের আলাপ চলবে (তা দর্শকদের কাছে নাট্যশ্লেষের ব্যঞ্জনা আনবে বলে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হবে) তখন সংলাপ হবে খুবই আবেদনবহ।

ঘ. সংলাপকে আদ্যন্ত নাটকীয় হতে হবে। এর জন্যে নাট্যকারকে সব রকম কলা-কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কখনো বাক্যগত সুরের উত্থান-পতন, কখনো একই শব্দের একাধিকবার প্রয়োগ, কখনো ধ্বনি-গম্ভীর বর্ণ-সমাবেশ বা ধ্বনিমঞ্জুল কোমল বর্ণযোজনা করতে হবে। একই স্থানে একজন পাত্রের মুখে অন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও দীর্ঘ সংলাপ বাঞ্ছনীয় নয়। বাক্যে ও শব্দে নাট্যশ্লেষের প্রয়োগ, নানা রূপ অলংকারের সন্নিবেশ, নানা রূপকল্পের সৃজন প্রভৃতির সাহায্যে সংলাপকে প্রশংসনীয় করে তোলা যায়।

১. But in most effective plays, the dialogue is not only suited to the speaker, but carries along the conflict more than any physicel action on the stage. *D.O.W.L.* Edtd : Joseph T. Shipey pp 97.

সংলাপ ও বাংলা নাটক :

আমাদের বাংলা নাটকে সংলাপের বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একেবারে গোড়ার দিকে 'কীর্তিবিলাস' বা 'ভদ্রার্জুন' নাটকে সংলাপে গদ্য ও পদ্য দুই ভাষারই ব্যবহার হয়েছে। একই নাটকে গদ্য ও পদ্য ভাষার প্রয়োগ আছে। পয়ার ও ত্রিপদীর চালে সেখানে ভাষার আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। গদ্য ভাষাতেও সমাসবদ্ধ দুরূহ ও অলংকৃত শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষণীয়। গদ্য এ দুই নাটকে ভাষার সাধু রীতিকে অবলম্বন করেছে। 'ভদ্রার্জুন'-এর লেখক তারাচরণের গদ্য বাক্যগুলি অনেকখানি হ্রস্ব ও বাক্যগঠনে অন্বয়বোধ সম্পর্কে সচেতনতা আছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন সংলাপ রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর একই চরিত্র কখনও সাধু ভাষা কখনও চলিত ভাষা ব্যবহার করেছে। এই আদর্শ মধুসূদন গ্রহণ না করলেও দীনবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন। প্রহসন রচনায় রামনারায়ণ চলিত রীতির সার্থক ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদন সংলাপের ব্যাপারে প্রহসনেই সবচেয়ে বেশী সার্থক। এখানে তিনি চলিত রীতির প্রয়োগে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক হলেও মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকে কলির মুখে কতকটা অংশ ছাড়া নাটকে আর কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন নি। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের পয়ার-ত্রিপদীর তুলনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাট্যসংলাপে অধিকতর উপযোগী হলেও মধুসূদন সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে এ রীতি পরিহার করেছিলেন। মধুসূদনের পর এই অমিত্রাক্ষর সংলাপকে কিছু কিছু নাটকে (যেমন রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী) রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। মাঝখানে গিরিশচন্দ্র নাট্যসংলাপে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'হরধনু ভঙ্গ' নাটকেই সর্বপ্রথম 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ'-এর ব্যবহার করেছিলেন। পরে 'রাবণ বধ' নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই রীতিকে অবলম্বন করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর নাট্যসংলাপ রচনার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল এই ছন্দটি। তাই রীতিটি 'গৈরিশ ছন্দ' নামে আজ বিশেষ পরিচিত। চতুর্দশ অক্ষরে অমিত্রাক্ষরের পদ্য পঙ্‌ক্তিকে সীমিত না রেখে তাকে ভেঙে সাজালে অভিনয়ের সুবিধে হয় এবং ছন্দ আরও স্বাধীনতা পেয়ে আরও শ্রুতিমধুর হয়—এই ধারনার বশবর্তী হয়ে গিরিশচন্দ্র এই রীতিটিকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'বিক্রমাদিত্য' নাটকে সংলাপে আর একটি নূতন রীতির ইঙ্গিত করেছিলেন। 'পদ্য পঙ্‌ক্তি ধরনের গদ্য'-এর সাহায্যে নাটকটি লিখিত। অভিনয় ও অভিনেতৃগণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর এই নূতন রীতির উদ্ভাবন। কিন্তু তাঁর এ রীতি নাট্যসংলাপকে প্রাণময় করে তুলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সাধারণ চলিত ভাষাকে পদ্যের পঙ্‌ক্তিতে লেখা হয়েছে মাত্র। গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, তারও একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের এই 'আভিনয়িক পদ্য পঙ্‌ক্তির গদ্যে' গদ্যের ছন্দ ও পদ্যের তাল কোনটাই আকর্ষণীয় হয়নি। এইভাবে দেখা যায় বাংলা নাটকে পদ্য ছন্দের দিকে

দিকে নাট্যকারদের সচেতনতা থাকলেও যুগধর্মে তা ধীরে ধীরে গদ্যকেই আশ্রয় করার দিকে তাঁদের ঠেলা দিয়েছে। ফলে কথ্য গদ্যরীতিই নাটকের সংলাপরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চরিত্রের সঙ্গে আত্মিক যোগ রক্ষা করে যেখানে বাঙলা নাটকে সংলাপ দেখা দিয়েছে সেখানে তা সার্থক হয়েছে। নীলদর্পণ নাটকের ভদ্রেতর চরিত্রগুলির যেমন—ক্ষেত্রমণি, আদুরী, তোরাপ, রাইচরণের সংলাপ তাই এত স্বাভাবিক, উপভোগ্য ও গতিমান। কিন্তু ভদ্রচরিত্রগুলির অর্থাৎ নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতির সংলাপ আড়ষ্ট, কৃত্রিম ও গতিহীন। ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের কোলাহলমুখর রাজ্যে ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান চরিত্রের সংলাপ গাম্ভীর্যময় ও ধ্বনিগম্ভীর হওয়া সমীচীন। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যদিও অতিরঞ্জন এবং কাব্যিক উচ্ছ্বাসেরও মাত্রাধিক্য মাঝে মাঝে ঘটেছে। কোনো অঞ্চলবিশেষের ভাষা যদি চরিত্রের মুখে দেওয়া হয়, তা হলে তার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষিত হওয়া দরকার। যদি বাঙলা নাটকে কেউ হিন্দী, ওড়িয়া, পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, বাঙলা-ইংরেজি মিশ্রিত ভাষা বা খাঁটি ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন, তাহলে সেই ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। দীনবন্ধু ও অমৃতলাল এ বিষয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'নবান্ন' 'পলিক' 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি নাটকের সার্থকতা এসেছে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগে।

পূর্বেই বলা হয়েছে নাটকের সংলাপকে নাটকীয় করে তুলতেই হবে। আর তার জন্যে সংলাপের মধ্য দিয়ে গতি, আবেগ, দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল প্রভৃতি ব্যঞ্জিত করে তোলা দরকার। সংলাপের ভাষাকে তাই খুবই সাবধানতার সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত। রঙ্গমঞ্চে আর কোনো একটি চরিত্র যখন সম্মুখে দণ্ডায়মান, তখন কোনো একটি চরিত্র-বিশেষের মুখে দীর্ঘ সংলাপ অবাঞ্ছিত—এতে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার অসুবিধে তো হয়ই, উপরন্তু নীরব অপর পাত্রটির অবস্থা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত, হ্রস্ব সংলাপই নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখতে বিশেষ সহায়ক। স্বল্পশব্দপ্রয়োগ এমনকি একটি মাত্র শব্দপ্রয়োগের দ্বারাও নাট্যসংলাপ রচনায় আধুনিক কালের অনেকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংলাপে নাটকীয় গুণ সঞ্চারের জন্যে মাঝে মাঝে একই শব্দের দু'বার প্রয়োগ, কখনো বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন-দ্যোতক ছোট ছোট শব্দ বা বাক্যের একাধিকবার প্রয়োগ, কখনো আকস্মিকভাবে বা অপ্রত্যাশিতভাবে কারও মুখে সংলাপের সূচনা, কখনো শ্লেষ-বক্রোক্তির সহায়তায় বা অন্য নানা ধরনের অলংকার-সন্নিবেশে বাক্যকে ঝাঁঝালো চাকত্ব-দান বা ব্যঞ্জনাঢ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়। সংলাপ চরিত্রের মুখেই দিতে হবে এবং চরিত্রের মুখেই নাটকীয় ঘটনাধারা বা অন্যচরিত্রের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সংঘটিত ঘটনার পরোক্ষ-বিবৃতি ঠিক নাটকীয় সংলাপ নয়—তথাপি সংস্কৃত নাটকেও যেমন, আমাদের বাঙলা নাটকেও অনেক স্থলে পরোক্ষ-বিবৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু ঘটনা রঙ্গমঞ্চে দেখানোর অসুবিধেও আছে। সেই সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ-

বিবৃতি হয়তো গ্রহণযোগ্য—কিন্তু যতদূর সম্ভব সেগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীতে, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, কমলে কামিনী—প্রভৃতি নাটকে এই পরোক্ষ-বিবৃতি মাঝে মাঝে দীর্ঘ হয়ে পড়ায় নাট্যসংলাপ জমে নি। গর্ভসন্ধি বা climax-এর পর নাট্যঘটনার বেগ যখন মন্দীভূত হয়ে আসে এবং উপসংহারে গিয়ে নাট্যকার যখন সব কিছুর সমাধান দেখাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন, তখন অনেক সময় সংলাপ প্রাণময়তা ও নাটকীয়তা হারিয়ে নিছক সংবাদবাহী হয়ে ওঠে। স্বগতোক্তি, জনান্তিকে উক্তি, বা নাটকের শেষে কোনো চরিত্রের দীর্ঘ বক্তৃতাধর্মী সংলাপের মধ্য দিয়ে সব কিছুর সমাধান-প্রয়াস প্রশংসনীয় নয়। শেক্সপীয়রের হাতে স্বগতোক্তি যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে অন্য নাট্যকারদের পক্ষে তা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। স্বগতোক্তি ও জনান্তিকে উক্তি এক হিসেবে বড়ই কৃত্রিম। রঙ্গমঞ্চের অপর চরিত্রের শ্রোতব্য নয় অথচ দর্শকদের শ্রোতব্য সংলাপকে প্রাণহীন বলেই মনে হয়।

পাশ্চাত্যের ইবসেনের আদর্শে আমাদের বাঙলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের দৃশ্যগুলির সূচনায় বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ দিয়েছেন। একালেও বাঙলা নাটকে সেই রীতি জনপ্রিয় হয়েছে। এর দ্বারা নাট্যকাররা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করারও সুযোগ নিচ্ছেন। অবশ্য আধুনিক কালের উদ্ভট নাটক বা এপিক থিয়েটারের বক্তব্য দর্শকদের কাছে পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে নাট্যকার নাট্যারম্ভের পূর্বেই নাটকের বক্তব্যের আভাস দিয়ে দিতে চাইছেন। এসব ক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের প্রয়াস কতকটা সমর্থন-যোগ্য। কিন্তু সকল নাটকের ক্ষেত্রেই নাট্যকারের মতামত জ্ঞাপন সমীচীন মনে হয় না। নাট্যকারকে যথাসম্ভব নির্লিপ্তই থাকতে হবে। নাট্যকারের মতপ্রকাশের বাহন কোনও চরিত্র নাটকে থাকলেও অন্য চরিত্রগুলোর সংলাপে নাট্যকারকে নির্লিপ্ত থেকে তাদেরও মতামতকে আকর্ষণীয় করে তোলার উপযুক্ত সংলাপ প্রয়োগ করতে হবে।

সঙ্গীত ও অ্যারিস্টটল :

ট্রাজিডির আলোচনায় অ্যারিস্টটল সঙ্গীতকে নাটকের অন্যতম উপাদান বলেছেন। ট্রাজিডিকে অলংকৃত ও সৌষ্ঠবদান করতে গেলে কিংবা তার অভিনয়কে আনন্দদায়ক করে তুলতে গেলে সঙ্গীতের স্থান উপাদান হিসেবে সর্বোচ্চ বলেই তিনি মনে করেছেন।[১] Poetics গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে তিনি নাটকে কোরাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "The Chorus too should be regarded as one

১. "Of the remaining elements, Song holds the chief place among the embellishments."—*Poetics* : S. H. Butcher, Chap. V

"Melody is the greatest of the pleasurable accessories of Tragedy." Ingram Bywater, *The Art of Poetry*, Chap. V.

of the actors, it should be an integral part of the whole and share in the action, in the manner not of Euripides but of Sophocles." নাটকের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এবং প্রথানুগত্যের জন্যে কোরাসকে আনলে চলবে না। গানের দ্বারা নিছক আনন্দটুকু পরিবেষণই এর লক্ষ্য হবে না। কোরাসকে নাটকের অন্যতম এক অভিনেতা বলেই মনে করতে হবে এবং নাটকের সঙ্গে থাকবে তার আত্মিক যোগ। আমরা জানি, গ্রীক নাটকের উদ্ভব হয়েছে ডিথিরাম্ব (Dithyramb) ও ফ্যালিক (Phalic) কোরাস-গীতি থেকে। তাই গীতকে নাটকের অন্যতম উপাদানরূপে সেখানে সহজেই গ্রহণ করা হয়েছে। কোরাস সফোক্লিসের নাটকের আত্মিক অংশ হয়ে উঠেছে। গ্রীক নাটক রচিত হওয়ার পূর্বেও এই গায়কদলের ঐকতান-সঙ্গীত ছিল। সেই কোরাসই বিবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাটকের জন্ম দিয়েছে। গ্রীক নাটক অভিনয়ের সময় সমবেত গায়কের দল রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ স্থানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত থাকত এবং তাদের সামনেই অভিনীত নাট্যঘটনা অগ্রসর হত।

গ্রীক নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নাট্যসংলাপ ক্রমশ যতই উন্নত হয়েছে সমবেত ঐকতান-সঙ্গীতের গুরুত্বও তত হ্রাস পেয়েছে। ইস্কাইলাসের নাটকে বা সফোক্লিসের নাটকে কোরাসের গুরুত্ব থাকলেও ইউরিপিডিসের নাটকে তার স্থান সংকুচিত হয়েছে। এখানে নাটকের সঙ্গে কোরাসের যোগ খুব ঘনিষ্ঠও নয়। এইভাবে নাটকের বিবর্তন-ইতিহাস পরবর্তী কালেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংলাপ ক্রমশ গুরুত্ব পেয়ে সঙ্গীতকে গৌণ করে ফেলেছে এবং প্রায় তাকে স্থানচ্যুত করতে চলেছে। এলেজাবেথান যুগে, রেস্টোরেশন যুগে এবং আরও পরে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পাশ্চাত্য নাটকে সঙ্গীত তাই আর অপরিহার্য উপাদান নয়। অবশ্য অপেরায় বা গীতাভিনয়ে, নৃত্যনাট্যে ও আমাদের বাংলা যাত্রায় গানের বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। আবার আধুনিক কালের ব্রেখটের এপিক থিয়েটারে সঙ্গীতকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাহলেও আধুনিক কালের ট্রাজিডি ও কমিডিতে সঙ্গীতের স্থান যে সীমাবদ্ধ হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সঙ্গীত ও আচার্য ভরত ঃ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও সঙ্গীতের মূল্যবান গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ব্রহ্মার নাট্যবেদ-সৃষ্টির সময় সামবেদ থেকে 'গীতি-উপাদান' নেওয়া হয়েছিল বলে ভরত আমাদের জানিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রে এই গীত সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে—

"গীতেষু যত্নঃ প্রথমং তু কার্যঃ
শয্যা হি নাট্যস্য বদন্তি গীতম্।"

অর্থাৎ নাট্যপ্রয়োগের সময় নানাগীতে সকলের আগে প্রযত্ন করবে। কারণ গীতের মধ্যেই নাটকের শয্যা বা সুখে অবস্থানের স্থান। আজকাল আমরা 'কণ্ঠসঙ্গীত'কে

সঙ্গীত বলে থাকি। কিন্তু 'সঙ্গীতরত্নাকরে' বলা হয়েছে যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্মিলনের নাম সঙ্গীত। "নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।" প্রাচীনভারতে সঙ্গীতের এমনই মর্যাদা ছিল যে, নাট্যশালা 'সঙ্গীতশালা' নামেও অভিহিত হত।[১] প্রাচীন ভারতে নাট্যানুষ্ঠানে তিন শ্রেণীর গান সন্নিবিষ্ট হত।

ক. নাট্যারম্ভের পূর্বে 'পূর্বরঙ্গ'-এ নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে এক ধরনের সঙ্গীত থাকত। অভিনেতব্য নাটকের সঙ্গে এই সঙ্গীতের অন্তরঙ্গ কোনো যোগ থাকত না কিন্তু এ সঙ্গীত, পরিমণ্ডলটিকে সুরের মায়ায় ও বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে একটি বিশিষ্ট লোকে উন্নীত করত।

খ. নাট্যানুষ্ঠানের আদি অঙ্কে প্রধান কোনো পাত্র বা পাত্রী রঙ্গালয়ে যখন প্রবেশ করত ও ঐ অঙ্কটির অভিনয় শেষে যখন চলে যেত, তখন সেই অঙ্কের রসানুকূল 'ধ্রুবা-গীতি' গাওয়ার রীতি ছিল।

গ. নাট্যের অঙ্গীভূত গানও থাকত। এইগুলিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রস্তাবনায় ও পঞ্চমাঙ্কে এমন গান আছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে ভরতের পরবর্তীকালে গানের স্থান খুবই সীমিত হয়েছে দেখা যায়। ভরতের পরবর্তী সংস্কৃত নাট্যআলংকারিকগণ নাট্যের এই উপাদানটি-সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন নি। ভারতীয় নাট্যতাত্ত্বিকেরা রসকেই নাট্যের আত্মা বলে স্থির করেছিলেন। আর এই রসের অনুকূল সঙ্গীত-যোজনায় তাঁদের আপত্তি ছিল না। প্রত্যেক রসের অনুকূল সঙ্গীত নাট্যানুষ্ঠানে যে গীত হত এও ঠিক।[২] কিন্তু নাটকের অঙ্গীভূত নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, পাত্র-পাত্রীদের কণ্ঠ-সঙ্গীত সংস্কৃত নাটকে খুব বেশী নেই।

সিদ্ধান্ত :—সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল যে সঙ্গীত যখন মানুষের হৃদয়ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন এবং নাটক যখন দৃশ্যাত্মক পথে জীবন-অভিজ্ঞতারই রূপায়ণ, উপস্থাপন ও দর্শকচিত্তে সঞ্চারণ, তখন এর উপযোগিতা থাকবেই। ভারতীয় আলংকারিকদের 'রসানুকূল' শব্দটিকে গ্রহণ করে বলতে পারি রসানুকূল সঙ্গীত এবং ঔচিত্য-অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীদের কণ্ঠে একক, দ্বৈত বা সমবেত সঙ্গীত-যোজনা দোষের নয়। এইভাবে সঙ্গীত সংযোজিত হলে গানের সংখ্যা-বাহুল্য বা সংখ্যাল্পতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠবে না। নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী, জাতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী রসানুকূল বা নাট্যঘটনা ও চরিত্রোপযোগী নাটকে সঙ্গীত-সন্নিবেশ সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

আমাদের বাংলা নাটক জন্ম-মুহূর্ত থেকেই সঙ্গীতের আশীর্বাদ-পুষ্ট। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাট্যরীতির সঙ্গে দেশীয় যাত্রার আদর্শের সম্মিলনেই বাংলা নাটকের জন্ম। আর যাত্রার প্রাণই হল সঙ্গীত। তাছাড়া, বাংলাদেশের জলবায়ু গানের অনুকূল,

---

১. কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে 'সংগীতশালা' নাট্যশালা অর্থেই প্রযুক্ত।

২. The music of the drama is not described at length in the later theorists ; What is clear is that each sentiment has its special appropriate music and each [illegible] accompaniment. *The Sanskrit Drama* : A. B. Keith P. 33.9.

এখানকার প্রকৃতিতে—আকাশে-বাতাসে গানের রেশ। জাতির কোমল-প্রকৃতিও গানের সুরে বাঁধা। তাই বাঙালীর লেখা নাটক গানকে সহজে বর্জন করতে পারে নি। আমাদের নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য ও যাত্রানাট্যের কথা বলছি না, অন্য নাটকেও বিভিন্ন নাট্যকার গান সংযোজিত করেছেন। একক কণ্ঠে, দ্বৈতকণ্ঠে এবং সমবেত কণ্ঠে তিন ধরনের গানই আমাদের নাটকে আছে। আবার নেপথ্য সঙ্গীতও আছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সময় থেকে নাটকে গান সন্নিবেশের বাহুল্য দেখা যায়। তিনি নানা ধরনের গান লিখে নিজ নাটকের অন্তর্গত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বহু গান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলির অপরিহার্য অঙ্গ হল গান। গানের মধ্য দিয়েই অধিকাংশ নাটকের মূলভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে।

গান যদি নাটকের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে রসানুকূল হয়ে অর্থাৎ নাটকের আভ্যন্তর প্রয়োজনে সংযোজিত হয়, তাহলে তার উপযোগিতা স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ীই গানের স্বল্পতা বা বাহুল্য নাটকবিশেষে দেখা যেতে পারে। গান নাটকে নিম্নোক্ত প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে।

ক. কোনো নাটকের বক্তব্য এমনই গূঢ়-গভীর যে সংলাপে ঠিক তাকে পরিস্ফুট করা যাচ্ছে না, তখন গানের সাহায্যে সেই ভাবটিকে চমৎকার ব্যঞ্জিত করে তোলা যায়। দৃষ্টান্ত—রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক।

খ. কোনো কোনো চরিত্রের আন্তর প্রকৃতিটি এমন যে তার হৃদয়-রহস্য উদ্‌ঘাটনে সংলাপই যথেষ্ট নয়, তখন গানের প্রয়োজন খুব বেশী।

গ. আদ্যন্ত নাটকের মধ্যে একটি বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে হলে মাঝে মাঝে 'ধ্রুবা-গীতি'র মতো সমবেত সঙ্গীতের দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলি এর দৃষ্টান্ত—শারদোৎসব, মুক্তধারা প্রভৃতি।

ঘ. কোনো চরিত্র-বিশেষের দুর্বহ বেদনা বা আনন্দোচ্ছলতা অনেক সময় একখানি গানের সাহায্যেই ভালভাবে ব্যক্ত হয়।

ঙ. নাটকের পরিস্থিতি সৃজনেও অনেক সময় গান সহায়ক হয়।

চ. অনেক সময় চরিত্রের নীরস বক্তব্যের কিয়দংশ গানে ব্যক্ত হলে তার আবেদন গভীর হয়।

ছ. রসানুকূল গানের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ট্রাজিডি নাটকের কাব্যমূল্য যে বৃদ্ধি পায়, একথাও অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ফ্রেডারিক শীলার তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'On the use of chorus in Tragedy'-তে। গ্রীক ট্রাজিডি কোরাস থেকে জন্ম নিয়েছে একথা স্বীকার করেও তিনি বলেছেন তখন প্রকৃতি ও জীবনেই ছিল ঐ গান। প্রকৃত জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরূপে তখন নাটকেও কোরাস এসেছিল। আধুনিক ট্রাজিডিতে সেই কোরাস

আর দেখা যায় না। প্রকৃতির বুকে জীবনের মধ্যে সেই গান এখন লুপ্ত। তবুও আধুনিক নাট্যকারগণ কোরাস সৃষ্টি করে কাব্যিক কলাকৌশলে সেই প্রাচীন জীবনের সারল্য ও আদিমতাকে আনতে চান। "It gives life to the language and it gives repose to the action"—যা তার কাব্যমূল্যকেই বৃদ্ধি করে।

অ. নাটকের কাহিনী দর্শকদের কাছে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, অভিনয়-দর্শনের আগ্রহকে ধরে রাখার জন্যও মাঝে মাঝে গানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলা নাটকে নাটকের এই আভ্যন্তর প্রয়োজনেও Dramatic relief-এর কাজ করেছে গান।

ঝ. দৃশ্যের শুরুতে ও দৃশ্যের শেষে সঙ্গীতের ব্যবহার বাংলা নাটকে আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক নাটকেই তা লক্ষণীয়। ইংরেজি নাটকের এপিলোগের আদর্শে বাংলা ফার্সের সমাপ্তিতে সঙ্গীত যোজনা করে কখনো নাট্যকারের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন বা মিনতি বা কখনো ফার্সটির মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে ফার্সটির মূল সুরের প্রকাশ প্রথম দৃশ্যের সঙ্গীতেই বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ অমৃতলালের কথা বলা যায়। এঁর গ্রাম্যবিভ্রাট, যাদুকরী, কালাপানি, দ্বন্দ্বে মাতনম্, রাজাবাহাদুর, সাতাশ আটাশ, একাকার প্রভৃতি বহু ফার্সের আদিতে ও শেষে দুটি সঙ্গীত আছে।

ঞ. দ্বৈত সঙ্গীতের সহায়তায় নাট্যরসকে ঘনীভূত করার চেষ্টা বাংলা নাটকে অনেকেই করেছেন—গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি।

ট. নাটকের বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তকে ঘনীভূত করে তুলতে নেপথ্য-সঙ্গীতের ব্যবহারও হয়েছে বাংলা নাটকে। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমারসভা (২/১ দৃশ্য) এবং বিসর্জন (১/৩ দৃশ্য) নাটকে ও আরও অনেক নাটকে তা লক্ষ্য করা যায়।

দৃশ্য (Spectacle) ও অ্যারিস্টটল :

ট্রাজিডির আলোচনায় দৃশ্যকে ট্রাজিডির ষষ্ঠ উপাদানরূপে অ্যারিস্টটল নির্দেশ করেছিলেন। যেহেতু নাটকে ঘটনার অনুকরণ বলতে পাত্র-পাত্রীদের অভিনয়কেই বোঝায়, সেইজন্য প্রথমত বলা যায় "Spectacular equipment will be a part of Tragedy"[১] অ্যারিস্টটলের The Art of Poetry গ্রন্থের অপর অনুবাদক ইনগ্রাম বাইওয়াটার 'Spectacle' শব্দের অর্থ করেছেন 'Stage-appearance of the actors'. অর্থাৎ মঞ্চে অভিনেতৃগণের উপস্থিতি। নাটক দৃশ্যাত্মক বলে মঞ্চে অভিনেতৃবর্গের উপস্থিতি এবং তাঁদের সাজসজ্জা এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা কী দৃশ্য ফুটিয়ে তুলছেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এখানে তাঁদের সংলাপকে বর্জন করে শুধু তাদের রূপসজ্জা ও অঙ্গভঙ্গী মঞ্চে লক্ষ্য করে দর্শকমনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, দৃশ্য অর্থে অ্যারিস্টটল তাই বোঝাতে চেয়েছেন। গ্রীক রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট ছিল না। তাই নাট্যবর্ণিত

---

১. *Poetics*—S. H. Butcher Chap. VI.

বিষয়কে বা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অবস্থা ও অবস্থানকে দেখিয়ে দেওয়াই হল দৃশ্যের উদ্দেশ্য। নাটকে কোনো ঘটনা যেখানে ঘটছে, সেই স্থানটিকে ও ঘটনাটিকে দৃশ্য করে তুলতে হবে সেই সময়ের অভিনেতৃগণের। আর তা করতে হবে তাদের অবস্থান সাজসজ্জা ও তার হাব-ভাবের মধ্য দিয়েই। এইভাবে নাট্য-স্থান ও ঘটনার প্রেক্ষাপটকে দৃশ্য করা হত অ্যারিস্টটলের কালে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রেক্ষাপটকে ঘন করে তোলার জন্যে দৃশ্যপটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দৃশ্যপটে অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে ও পাত্র-পাত্রীদের হাবভাব, ক্রিয়াকলাপে ও সজ্জায় এই পটভূমি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নাটকের পাত্রপাত্রীরা কোন্ অবস্থায় রয়েছে তাও দেখানো যায় অনেকখানি তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে। তাদের মানসিক অবস্থাটি যে কেমন, তাও দৃশ্য হয়ে ওঠে রঙ্গমঞ্চে তাদের বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় উপস্থিতিতে।

আধুনিককালে যন্ত্রযুগে উন্নত ধরণের মঞ্চনির্মাণের ফলে, আলোকসম্পাতের নানা কৌশলে এবং অভিনেতৃদের ভাবপ্রকাশের নানারূপ নৈপুণ্যে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে নাটকের দৃশ্য অংশ।[১]

দৃশ্য ও ভারতীয় আলংকারিক :

ভারতীয় আলংকারিকেরাও নাটকের দৃশ্য অংশের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরাও অবশ্য রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট (Scenery) ব্যবহারের কথা বলেন নি। কিন্তু অভিনয়কে আহার্য, বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক—এই চারভাগে ভাগ করে অভিনয়-সাফল্যের বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের সময় কোনো দৃশ্যপট থাকত না—শুধু একটি পর্দা সব সময় মঞ্চের পশ্চাৎভাগে ঝুলত। নাটকের যে স্থানটিকে তাঁরা দৃশ্য করতে চাইতেন, পাত্রপাত্রীদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে দর্শকদের তা অনুমান করে নিতে হত। রাজা যখন রথে আরোহণ করছেন, তখন রঙ্গমঞ্চে রথ আনা হত না। রাজা রথে ওঠবার এমন একটা ভাব করতেন যাতে দর্শকদের অনুমান করে নিতে হত রাজা রথে উঠলেন। দৃশ্যপট ব্যবহারের ঘাটতি অভিনেতৃগণ এইভাবে পূরণ করতেন। অবশ্য নেপথ্য ব্যবস্থা বা আহার্য অভিনয়ের সাহায্যেই ঐ অসম্পূর্ণতাকে আরও ভালোভাবে পূরণ করা হত। অভিনয়ের যে অংশ

---

১. রবীন্দ্রনাথ নাটকের দৃশ্য অংশের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু দৃশ্যপটকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাকখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।...নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্রে সেই দাবিকে খাটো করে। তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপট তার বিপরীত।...আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভীড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদার্য্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না। (তপতী নাটকের ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ)

আহরণীয় বস্তুর সাহায্যে নাট্যরসাভিব্যক্তির সহায়ক, তারই নাম আহার্য অভিনয়। এর সমস্ত ব্যবস্থাপনা নেপথ্যেই। এর প্রধান অঙ্গ তিনটি—ক. পুস্তক, খ. অলংকার ও গ. অঙ্গরচনা। রঙ্গমঞ্চে প্রকৃত বিমান, পাহাড়, গুহা এবং অশ্বকে তাঁরা আনতেন না, আনতেন মাদুর, কাপড়, চাটাই ও চামড়ার তৈরি ঐসব জিনিসের প্রতিরূপ। কৃত্রিম হাত, মাথা এবং নানারকম পুতুল আনাও হত। এইগুলিই হল 'পুস্ত'। 'মাল্য' 'আভরণ' আর 'বস্ত্র'ই ছিল 'অলংকার'। মুকুট, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, হার—প্রভৃতি আভরণ দেবতা ও রাজাদের পরিধেয় ছিল। অবশ্য এগুলো মেয়েরাও পরতেন; তাছাড়া কানের নানা অলংকার, কিঙ্কিণী, নূপুর, আলতা ও নানারঙের কাপড় প্রভৃতি তাদের পরতে হত। নটনটীদের মুখে-হাতে ও দেহের নানাস্থানে রঙ মাখিয়ে অঙ্গরচনা করতে হত। নটেরা চার রকম শ্মশ্রু ব্যবহার করতেন, সাদা, অপরিষ্কার, বিচিত্র ও রোমশ। তাছাড়া দৈত্য-রাক্ষসদের ভূমিকায় নানা মুখোস ব্যবহারের রীতিও ছিল। এই আহার্য অভিনয় পাত্রপাত্রীদের বাহ্য পরিচয়কে সুন্দরভাবে দৃশ্য করে তুলত।

এছাড়া আঙ্গিক অভিনয়ে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করা যেত। এ অভিনয় ছিল তিনরকম, মুখজ, চেষ্টাকৃত ও শারীর। মাথা, চোখ প্রভৃতির নানারূপ সঞ্চালন ব্যাপার ছিল 'মুখজ'। এই অভিনয় আবার ছিল তেরো রকমের। চোখ বা দৃষ্টির অভিনয় ছত্রিশ রকমের। হাতের অভিনয়ের নাম 'চেষ্টাকৃত'। দু'ভাবে হাতের ব্যবহার হত। একখানি হাতে 'অসংযুত' এবং দু'খানি হাতকে মিলিত করে 'সংযুত' অভিনয় হত। অসংযুত হাত চব্বিশ রকমের ও সংযুত হাত তেরো রকমের। শরীর বলতে বক্ষোদেশ, উদর, পার্শ্ব, কটি, উরু, জঙ্ঘা প্রভৃতির অভিনয়। 'সাত্ত্বিক' অভিনয় শারীরিক অবস্থারই অভিনয়। স্থূলভাবে একে আঙ্গিক অভিনয়ই বলা উচিত। স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ ও স্বরভেদ (স্বরভঙ্গ) মূর্ছা—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব শরীরে নানা পরিস্থিতিতে অভিনয়ে প্রয়োজন সময়ে ফুটে উঠবে বা দেখানো হবে।

মোটামুটি এই সামান্য পরিচয় থেকে বোঝা যায় দৃশ্যপট ব্যবহার না করেও নাট্যঘটনাকে দৃশ্য করে তোলার জন্যে অভিনয়ের কতো রকম ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে ছিল।

সিদ্ধান্ত ঃ

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল দৃশ্যও নাট্যানুষ্ঠানের একটি মূল্যবান উপাদানরূপেই গণ্য হবে, যতদিন নাটককে অভিনেতব্য বলে মনে করা হবে। 'দৃশ্য' মানেই দৃশ্যপট নয়, এর অর্থ অনেক ব্যাপক। আলোচনার শুরুতেই তা বলা হয়েছে। পাঠ্য নাটকের (Reading Drama) ক্ষেত্রেও spectacle-এর একটা মোটামুটি নির্দেশ নাট্যকার দিয়ে থাকেন, সেগুলি থেকে পাঠককে তার দৃশ্যরূপটি কল্পনায় অনুমান করে নিতে হয়। এই দৃশ্য নানাভাবে নাটকের রসনিষ্পত্তির সহায়ক। ক. দৃশ্য দর্শকের মনে নাট্যঘটনার পটভূমিটিকে তুলে ধরে। খ. কখনো বা অভিনেতৃগণের বেশবাস ও অলংকারাদির

সাহায্যে তাদের পরিচয়কে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে। গ. কখনো বা নাটকের মূল বিষয়ের ব্যঞ্জনা বা পাত্রপাত্রীদের মনোজগৎকে সংকেতিত করার জন্যে একটি পথ, নির্জন অন্ধকার কক্ষ, একগুচ্ছ ফুল, একটি দণ্ড প্রভৃতিকে দৃশ্যরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আধুনিককালেও মরুমায়া সৃষ্টির ব্যাপারে আগ্রহও কম নয়। দৃশ্য নাটকে রসসঞ্চারের সহায়ক হলেও তা রসের আলম্বন বিভাব নয়, উদ্দীপন বিভাব।[১] নাট্যপ্রযোজকের কলাকৌশলের ওপর দৃশ্যের সার্থকতা নির্ভরশীল—একথা অ্যারিস্টটল বলেছেন। আর এর স্বতন্ত্র ভাবগত আবেদন থাকলেও নাট্যের সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে "It is the least artistic and connected least with the art of poetry,"[২]

ভাবনা বা চিন্তা (Thought) ঃ

ভাবনা বা চিন্তাকে নাটকের অন্যতম উপাদান বলা হলেও 'Poetics'-এ এ সম্পর্কে আলোচনা খুবই সামান্য। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে 'ভাবনার' বিষয়টি অলংকারশাস্ত্রের (Rhetoric) অন্তর্গত। চরিত্র ও সংলাপের সঙ্গে ভাবনার আছে অন্তরঙ্গ যোগ। নাটকের কোনো চরিত্র যখন কোনো বিষয়ের একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করে কিংবা যখন কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে যায়, তখনই তার সংলাপে 'ভাবনা' দেখা দেয়। কোনো বিষয়কে অতিরঞ্জিত বা লঘু করে তুলতে গেলেও ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়। করুণ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতিগুলি জাগ্রত করার প্রয়োজনেও 'ভাবনা'র সাহায্য আবশ্যক। নাটকের চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মনের গতিবিধির সামঞ্জস্য চাই—নইলে উদ্দিষ্ট ভাবসঞ্চার করা যায় না। ক্রিয়ার দ্বারাও দর্শকের চিত্তে ভাবের উদ্বোধন সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে নাটকের পাত্রপাত্রীদের কোনো কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যা দিতে হয় না। অপর পক্ষে বক্তাকে তার সংলাপের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ভাব জাগ্রত করতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে চিন্তাকে বাদ দেওয়া চলে না। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই পর্যন্ত।

বস্তুত ভাষামাত্রই চিন্তাপ্রসূত। অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টির দ্বারা আমরা যে পদ উচ্চারণ করি, তা একটি বস্তুর প্রতীক। এই বস্তুটিকে দ্যোতিত করতে গেলেই চিন্তার প্রশ্ন আসেই। চিন্তাহীন উচ্চার্য ধ্বনি অর্থহীন। সুতরাং যে কোনো ধরনের সংলাপ-প্রয়োগে বক্তার চিন্তাশক্তি সক্রিয়, একথা মনে রাখতে হবে। কিন্তু এ চিন্তা নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের। বক্তা যখন কোনো একটি বিষয়কে প্রমাণ করতে যান, কোনো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে যান, তখন আরও সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োজন হয়। অ্যারিস্টটল এই দিক থেকেই চিন্তা বা ভাবনার কথা বলেছেন। কিন্তু চরিত্র ও সংলাপের সঙ্গে

---

১. নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ঃ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ ১৯৭৮ সং. পৃঃ ২৪১
২. *Poetics* tr. Butcher, Chap. VI.

এই ভাবনার যোগ যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, তাতে ট্রাজিডির বিভিন্ন অংশের আলোচনায় একে পৃথক মর্যাদা দিলে বিষয়টি বড়ই জটিল হয়ে পড়ে। তাই অ্যারিস্টটল 'It belongs more properly to that department of inquiry' বলে এর বিস্তৃত আলোচনা করেন নি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনে নানা সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিয়েছে, ভাবও আর কল্পনার রাজ্যে স্থির থাকতে চাইছে না। সাহিত্যের বা নাটকের ক্ষেত্রেও তাই মননশীলতা বা চিন্তার অভিব্যক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে। জর্জ বার্ণার্ড শ এই বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন নাটক আলোচনা, (Discussion) ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ভাবনার যত প্রাধান্যই ঘটুক, নিছক ভাবনা বা তত্ত্ব সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে না। সাহিত্যেও তার 'রসরূপ' চাই।[৩] এ কথাটি না বুঝলে নাটকেও ভাবনার কোনো মূল্য নেই। একালের সমস্যা-সমাধানের দায় অবশ্য অ্যারিস্টটলের ছিল না।

---

৩. *The Art of Poetry* : tr. Bywater, Chap. 19, pp. 66

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যশ্রেণী-বিভাজনের ইতিকথা ও তত্ত্ব

পাশ্চাত্যের নাট্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকদের শ্রেণীবিভাগ :

মিশ্র চারুকলার অন্তর্গত এক নাট্যকলারই আজ কতো শ্রেণী। উদ্ভবকাল থেকে বহু সহস্র বৎসরের বিবর্তনে নাট্যকলায় এসেছে নানা পরিবর্তন। বিভিন্ন যুগে দর্শকদের রুচি ও প্রতিভাবান নাট্যকারগণের নৈপুণ্যে বিষয়বস্তুতে, রূপরীতিতে, রসপরিণামে, আয়তনে, অভিনয়ে—এই পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে নাটক নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সুদূর অতীতেও অ্যারিস্টটল এবং ভরত দুজনেই নাটকের এই শ্রেণী-বিভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অ্যারিস্টটলের কালে নাটকের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা একালের মতো লক্ষণীয় অবশ্যই হয় নি। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে নাট্যধারার যে অগ্রগতি ও বহুশাখায়িত বিস্তার ঘটল, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তথাপি তাঁর কাল পর্যন্ত নাট্যসাহিত্যের যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ-তত্ত্ব সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যে কতো সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর এ বিষয়ে চারটি প্রধান সূত্রের ইঙ্গিতদানের ব্যাপারে।[১] ভারতীয় অলংকারিক আচার্য ভরতের শ্রেণীবিভাগ অ্যারিস্টটলের চেয়ে ব্যাপক ও আরও সূক্ষ্ম। তথাপি একথাও মনে রাখতে হবে যে বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'এ পরবর্তীকালে উপরূপকের যে আঠারোটি ভেদ লক্ষ্য করা যায়, ভরত তার নামোল্লেখ করেন নি। ভরতের সময় নাট্যের এই ভেদ নিশ্চয়ই লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। মোট কথা নাট্য-সৃষ্টি না হলে আলংকারিকদের পক্ষে শ্রেণী বিভাগ করা তো সম্ভব নয়।

অ্যারিস্টটলের পূর্ববর্তী ও সমকালীন গ্রীসে নাট্যসাহিত্যের যে বিকাশ ও সমৃদ্ধি লক্ষণীয় হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁর নাট্যশ্রেণীবিন্যাস। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে তিনি নাটকের যে দুটি প্রধান শ্রেণী লক্ষ্য করেছিলেন, আজিও সেই বিভাগকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।[২] এ দুই বিভাগ হল, ক. ট্রাজিডি ও খ. কমেডি। প্রথমটিতে ভয়-বিস্ময় ও করুণ ভাবাত্মক গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ এবং দ্বিতীয়টিতে হাস্যাস্পদ নিম্নশ্রেণীর লঘু চরিত্রের অনুকরণ। গ্রীসের বিখ্যাত

---

১. অ্যারিস্টটল এই চারটি সূত্রকে Efficient cause, Final cause, Material cause, ও Formal cause এই চারটি হেতুবাচক শব্দের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। *D. O. W. L.* pp. 62-64. Edtd. by Joseph T. Shiply. New Revised Edn.

২. অ্যাবারক্রম্বি নাট্যরীতিকে এই দুই শ্রেণীকে অবশ্য একালে মানতে চান না।

নাট্যকারগণ ইস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের প্রসিদ্ধ বিভিন্ন নাটকগুলি দেখবার তাঁর সুযোগ ঘটেছিল। তাই ট্রাজিডির নানা শ্রেণী-কল্পনা করতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয় নি। কিন্তু অ্যারিস্টোফেনিস ছাড়া আর কোনও বড় নাট্যকারের কমেডি দেখার তাঁর সৌভাগ্য হয় নি। তাই কমেডির নানা শ্রেণীবিন্যাস তিনি করে যেতে পারেন নি। অ্যারিস্টটল ট্রাজিডির চারটি ভাগ করেছিলেন—ক. সরল ট্রাজিডি (Simple) খ. জটিল ট্রাজিডি (Complex) গ. নৈতিক ট্রাজেডি (Ethical) ও ঘ. করুণভাবাত্মক ট্রাজিডি (Pathetic).

অ্যারিস্টটলের পরে হোরেস (খ্রীঃ পূঃ ৬৫-৮৮) মিনাণ্ডারের কমেডিগুলি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কমেডি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নি। অ্যারিস্টটল নাটকের যে দুটি ভাগ করেছিলেন, সেই ট্রাজিডি ও কমেডিকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং 'অ্যাটায়ারিক ড্রামা' বলে একটি নূতন শ্রেণীর কথা বলেছেন এবং এ শ্রেণীটি যে কমেডি থেকে পৃথক তাও বলেছেন। গ্রীসের জগৎবিখ্যাত নাট্যকারদের পর রোমে ট্রাজিডি-রচনায় সেনেকা এবং কমেডি-রচনায় প্লটাস ও টেরেন্স খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু হোরেসের পর নাটকের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে দীর্ঘকাল নাট্যতাত্ত্বিকেরা নীরব ছিলেন।

তারপর এল মধ্যযুগ। খ্রীস্টকে কেন্দ্র করে যে উৎসব তারই সূত্র ধরে নাটকের নূতন ধারা সূচিত হল—জন্ম নিল 'লিটারজিকেল প্লে', 'মিরাকল প্লে' এবং 'মরালিটি প্লে'। ধর্মীয় রূপকজাতের এসব নাটক সৃষ্টি হিসেবে নিতান্তই তুচ্ছ। তথাপি এই যুগেই নূতন নূতন শ্রেণীর নাটক রচিত হয়েছে—একথা মনে রাখতে হয়।

আরও মনে রাখতে হয় এই যুগেই মহাকবি দান্তে কমেডি সম্পর্কে আমাদের একটি নূতন কথা শুনিয়েছিলেন। তাঁর মহাকাব্যকে Divine Comedy নামে অভিহিত ক'রে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানালেন, কমেডির সূচনা প্রতিকূলতা ও ভীষণতার মধ্যে হলেও তার সমাপ্তি সুখদায়ক, আনন্দদায়ক ও মুগ্ধকর হয়, এবং তা শান্ত-নম্র রীতিতেই প্রকাশিত হয়।[১] অ্যারিস্টটল কমেডিতে হাস্যোদ্দীপকতাকেই বড় করে দেখেছিলেন, কিন্তু দান্তের কাছে সে কথাটি বড় মনে হয় নি। তিনি ভেবেছিলেন কমেডির সুর আনন্দের সুর—তৃপ্তির সুর।

এরপরেই দেখি ষোড়শ শতকে ইতালীতে ও ফ্রান্সে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি নাট্যতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করেছেন। শুধু নাট্যশ্রেণীই নয়, ট্রাজিডি ও কমেডি সম্বন্ধেও এঁরা গভীরভাবে ভেবেছেন। দানিয়েল্লো (Daniello) মিন্টুর্ণো (Minturno) স্ক্যালিগের (Scaliger) প্রভৃতি অভিজ্ঞ ইতালীয় নাট্যশাস্ত্রী-গণের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দানিয়েল্লো জানালেন যে, কমিডি লেখকেরা তাঁদের পরিচিত পারিবারিক

১. দান্তে লেখেন, Comedy begins adversely and terribly, but closes on a note of happiness, delight and charm.—A. Nicoll-এর *The Theory of Drama* গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ৮৫।

ঘটনা নিয়েই লেখেন—তাঁদের বিষয়কে হীন বা ক্ষতিকরও বলা যায় না। আর ট্রাজিডি রচয়িতৃগণ উচ্চস্তরের রাজার মৃত্যু এবং বিশাল সাম্রাজ্যের পতনকাহিনী বর্ণনা করেন।[১] মিন্টুর্ণো বললেন, ট্রাজিডিতে গুরুগম্ভীর ঘটনাই থাকবে; এর প্রধান চরিত্রগুলো হবে অভিজাত শ্রেণীর। আর কমেডিতে নগর অথবা গ্রামের সাধারণ মানুষের কথাই থাকবে।[২] স্ক্যালিগের মুখেও একই ধরনের কথা শোনা গেল।[৩] ইতালীতেই ইংরেজি ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'অপেরা'র সৃষ্টি হল। এল "প্যাস্টোর‍্যাল ড্রামা"। দেখা গেল ষোড়শ শতকে ট্রাজিডি ও কমিডি সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা শুরু হয়েছে এবং Opera ও Pastoral Drama নামে নাটকের দুটি নূতন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে। ইংলণ্ডে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে "পারিবারিক ট্রাজিডি" দেখা দিল।

সপ্তদশ শতকে পিয়েরি কর্ণেই (Pierre Corneille 1606-84) এর La Cid (1636) নাটকটি প্রকাশিত হলে নাটকের আরও একটি শ্রেণী স্বীকৃতি পেল। এটি সেখানকার অ্যাকাডেমির বিচারে বিশুদ্ধ ট্রাজিডি বা বিশুদ্ধ কমিডি নয়—এ হল ট্রাজি-কমিডি। কর্ণেই আরও জানালেন যে ট্রাজিডিমাত্রই বিয়োগান্ত নয়। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই শতকেই ফ্রান্সে মলিয়ের (Moliere) কমেডিকে যথেষ্ট উন্নত করে তুললেন। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসন পুনরায় ফিরে পেলেন। তখন থেকেই সমাজে ও রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল এই শতকেই। ড্রাইডেনের হাতে 'হিরোয়িক ড্রামা' জন্ম নিল। এ শতকের শেষ দিকে তিন অঙ্কের হাস্যরসাত্মক লঘুস্তরের ফার্স সৃষ্টি হল।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), দিদেরো (১৭১৩-৮৪) বুমারশেই প্রভৃতি অনেক নাট্যতাত্ত্বিক এসেছেন। বুমারশে জানালেন, মানুষের সঙ্গে মানুষেরই হৃদয়ের যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে—কিন্তু not between man and King? তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল, যে সমকালীন ও সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যা 'সিরিয়াস ড্রামা'তে রূপ পায়—সেইজন্য 'সিরিয়াস ড্রামাই' বেশি চিত্তাকর্ষক 'হিরোয়িক ড্রামার' চেয়ে। প্রাচীন ট্রাজিডিতে দেবতার হৃদয়হীন আচরণ তাঁর ভাল লাগে নি। তিনি জোর ওকালতি করেছেন সিরিয়াস ড্রামার পক্ষে। আর এই সিরিয়াস ড্রামার জনক ও প্রচারক হলেন দিদেরো (Diderot)[৪]। দিদেরো স্বয়ং নাট্যকারও। তিনি ট্রাজিডিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন, ক. পারিবারিক ট্রাজিডি (Domestic) ও খ. বুর্জোয়া ট্রাজিডি। কমেডিরও দুটি শ্রেণী তিনি স্থির করলেন, ক. গে-কমিডি (Gay), খ. সিরিয়াস কমেডি (Serious)। বুর্জোয়া ট্রাজিডি হল মহৎ ব্যক্তিদের শোচনীয় পরিণাম। তিনি ট্রাজিডি ও কমেডি নাটকের এই দুই শ্রেণী বিভাগে সন্তুষ্ট ছিলেন না—তিনি মনে করতেন এ দুয়ের মধ্যে আরও অনেক ভেদ

১, ২, ও ৩ এর বক্তব্যগুলি A. Nicoll-এর *The Theory of Drama* গ্রন্থ থেকে—পৃঃ ৮৫, ৮৭।

৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃঃ ২৩৭-৩৮

সম্ভব। তিনি প্রধানত যে চারটি ভাগের কথা বলেছেন উপরে আমরা তার উল্লেখ করেছি। ভলতেয়ার অবশ্য নাটকের নূতন শ্রেণীর কথা জানান নি তিনি নাটকের স্থান-ঐক্য, ও কাল-ঐক্য রক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। যাই হোক, এই অষ্টাদশ শতকেই 'মেলোড্রামা' প্রতিষ্ঠা পেল। জেন্টিল কমিডি, সেন্টিমেণ্টাল কমিডি, ড্রেম প্রভৃতি নাটকের আরও নানা শ্রেণী বিভাগের কথা শোনা গেল। এ শতকের শেষ দিকে রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক্যাল রচনারীতির ভেদও স্বীকৃত হল—শ্লেগেল রোমাণ্টিক কথাটির বিশেষ তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন।

উনিশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটল—নানা মতবাদের উদ্ভব হল। ফলে সাহিত্যের মধ্যেও নানা পরিবর্তন লক্ষণীয় হল। সেই সঙ্গে প্রচুর নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থও লেখা হল। বিভিন্ন ধরনের নাটক লেখা হতে থাকল—রোমাণ্টিক নাটক, বাস্তব ও অতিবাস্তবধর্মী নাটক, সমস্যামূলক নাটক, সাংকেতিক নাটক, অভিব্যক্তিবাদমূলক নাটক, কাব্যনাটক প্রভৃতি। বিশ শতকের নানা চিন্তা ও মতবাদের আক্রমণে একদিকে মানুষ যেমন জর্জর, অন্যদিকে বস্তুবাদের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ায় অধ্যাত্মবাদ বা রহস্যবাদের দিকে নাট্যকারেরা প্রবণতা দেখাতে থাকলেন। আর এরই সঙ্গে ফ্রয়েডের নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু কিছু নাট্যকার মানবমনের অবচেতন-স্তরেও অভিযান চালিয়ে যেতে থাকলেন। সুতরাং নানা বৈচিত্র্যে নানা শ্রেণীর অন্তর্গত হল নাটক। বিশ শতকে বহু নাট্যতাত্ত্বিক নানা মূল্যবান গ্রন্থে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরলেন। একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যতাত্ত্বিক অধ্যাপক নিকল সামগ্রিকভাবে নাট্যশিল্পকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করলেন।

ক. ট্রাজিডি খ. মেলোড্রামা গ. কমেডি ঘ. ফার্স ও ঙ. ট্রাজি-কমিডি। তিনি ট্রাজিডি ও কমেডিরও নানা বিভাগ করে তাদের বিস্তৃত পরিচয় দিলেন।

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ তাঁর রচিত নাটকগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে যে সব নাম দিলেন, তাতে বোঝা যায় তিনিও নাটকের কতো রকম শ্রেণী-বিভাজনের পক্ষপাতী ছিলেন। কোনো নাটককে তিনি বলেছেন 'ইতিহাস', কোনোটিকে 'রোমান্স', কোনোটিকে 'ফ্যাণ্টাসিয়া', কোনোটিকে 'ক্রনিকেল প্লে' বা কোনোটিকে 'মেলোড্রামা' প্রভৃতি।

বস্তুতপক্ষে নাটকের সমস্ত রকম সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ আজ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার J. L. Calderwood ও H. E. Toliver তাই তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছেন "The possible categories are almost unlimited. We might group plays by their length, subjectmatter, historical period, sexual gender of character, scenic location etc."[১] শ্রেণীর সীমাহীনতার কথা চিন্তা করেই তাঁরা "Etc" বলে দায়িত্ব শেষ করেছেন।

---

১. *Perspectives on Drama* : Edtd. by J. L. Calderwood and H. E. Toliver p. 135.

যাই হোক, অধ্যাপক নিকল নাটকের যে প্রধান পাঁচটি শ্রেণীকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তা মূলত নাটকের ভাব বা রস-পরিণাম ও নাটকের অন্তর্গত ঘটনার প্রাধান্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। ট্রাজিডি ও কমেডির ভেদ তাঁর মতে বুঝতে হবে দর্শকচিত্তে তার ভাবাবেদনের বা রসোদ্রেকের দিক থেকে। ট্রাজিডেতে বেদনা, বিস্ময়, অন্ধকার; কমেডিতে আনন্দ, তৃপ্তি, আলো। ট্রাজিডিতে চিত্তের গভীরভাবে আলোড়ন ও সহানুভূতির উদ্রেক। কিন্তু কমেডিতে চিত্ত নয় বুদ্ধিরই মৃদু আলোড়ন, এবং সহজে সহানুভূতির উদয় হয় না। মেলোড্রামা ও ফার্স—দুটিতেই চরিত্র-চিত্রণের গভীরতার চেয়ে ঘটনারই অত্যধিক প্রাধান্য। সহজ কথায় এ দুটি পরিস্থিতি-প্রধান। মেলোড্রামা অগভীর হলেও রসপরিণাম ট্রাজিডির মতই, আর ফার্স অগভীর হলেও রস-পরিণাম কমেডি-গোত্রীয়। নিকল-কথিত এই প্রধান শ্রেণীবিন্যাস ছাড়া আরও কয়েকটি নাট্য শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা চলে। একথা অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক নাটকেরই একটা বিষয় থাকে—যাকে আমরা বৃত্ত বা কাহিনী বলে থাকি। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নাট্যকারের কল্পিত হতে পারে, আবার তা কোনো পরিচিত আধার থেকেও গৃহীত হতে পারে। নাটকের এই বিষয় ও তার প্রকৃতির কথা মনে রেখে নাটককে নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়; যেমন সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক প্রভৃতি। যে রীতি বা স্টাইলে নাটকটি লিখিত তার দিকে দৃষ্টি রেখে নাটককে ক্লাসিক, রোমান্টিক—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আয়তনের অর্থাৎ অঙ্কের কথা মনে রেখে একাঙ্কিকা, নাটিকা, মহানাটক প্রভৃতি বিভাগ অনুমিত হতে পারে। নাটকের ঘটনা ও চরিত্রকে যে কৌশলে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে একে বাস্তবধর্মী, অতিবাস্তবধর্মী সাংকেতিক; অভিব্যক্তিবাদমূলক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।

নাটক যে ভাষায় লিখিত হচ্ছে তা গদ্য কি পদ্য অথবা দুয়ের সংমিশ্রণে কিনা—এ চিন্তা থেকেও নাটককে কাব্যনাট্য, গদ্যনাট্য ও গদ্যপদ্যময় এভাবে বিন্যস্ত করা যায়। উপাদানের ওপরে গুরুত্ব দিয়েও নাটককে অপেরা বা গীতিনাট্য, যাত্রা, নৃত্যনাট্য, প্রভৃতিতে ভাগ করা চলে। আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে নাটকের এই রকম বহু শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি প্রধান রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পাশ্চাত্যের নাট্যশাস্ত্রের নানা গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে এই সব শ্রেণীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি সব শ্রেণীর সূক্ষ্ম বিভাগ তালিকার আকারে উপস্থিত করতে অনেকেরই আগ্রহ নেই। বরং এ-বিষয়ে আমাদের বাংলা-সাহিত্যের নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা' গ্রন্থে পাশ্চাত্যের ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত শ্রেণীর ইঙ্গিতকে সংগ্রহ করে একটি পূর্ণ তালিকা দিতে চেয়েছেন।[১] ডঃ ভট্টাচার্যের এই প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। আমরা অতখানি সূক্ষ্ম বিভাগ না করলেও আলোচনার শেষে একটি তালিকা দিয়েছি। পাশ্চাত্যের শ্রেণী বিভাগের ইতিহাস

১. নাট্যতত্ত্বমীমাংসা —ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ পৃ: ২৯১-৯২

লক্ষ্য করা গেল। এখন সংস্কৃত আলংকারিদের শ্রেণী-সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেতে পারে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের বিভাগ

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ভরত, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ তিনজনেই দৃশ্য কাব্যগুলিকে মোট দশটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বৃত্ত বা কাহিনীর প্রকৃতি, এবং দৈর্ঘ্যাদির জন্যও বটে আর দৃশ্য কাব্যগুলির অভিনয় ব্যাপারে বিভিন্ন অংশে অনুসৃত 'বৃত্তি'র অর্থাৎ স্টাইলের তারতম্যের জন্যেও এই বিভাগ। অধ্যাপক কীথ বলেন যে, বিভিন্ন দৃশ্যকাব্যে নানা ধরনের উপাদান প্রয়োগের জন্যেই এক একটি শ্রেণী বিশিষ্টতা লাভ করেছে।[২] মোট কথা, স্টাইল বা রীতির ভিত্তিতে, আয়তনের ভিত্তিতে ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিত্তিতে ও উপাদান যোজনার ভিত্তিতেই যে সংস্কৃত আলংকারিকদের শ্রেণীবিভাগ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দৃশ্য কাব্যের দশটি প্রকার হল—ক. নাটক, খ. প্রকরণ গ. অঙ্ক ঘ. ব্যায়োগ ঙ. ভাণ চ. সমবকার ছ. বীথী জ. প্রহসন ঝ. ডিম. ও ঞ. ঈহামৃগ। এগুলির মধ্যে নাটক ও প্রকরণই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত নাট্যের যতকিছু গৌরব—এই দুই শ্রেণীর জন্যেই।

ক. **নাটক**.[৩] নাটকের বিষয়বস্তু কখনো কবিকল্পিত হবে না, এর কাহিনী হবে সুপরিচিত অর্থাৎ ঐতিহাসিক পৌরাণিক বা লোক প্রসিদ্ধ। এর নায়ক হবেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, উদাত্ত গুণসম্পন্ন অথবা রাজর্ষি—নানা গুণে গুণী কখনও বা দেবানুগৃহীত, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। নানা রসে অঙ্কগুলি পূর্ণ থাকবে, তবে অঙ্গীরস হবে বীর, শান্ত বা শৃঙ্গার এবং নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুতরসের প্রয়োগ থাকবে। কার্যসাধনে চার পাঁচজন পুরুষ থাকবেন। অঙ্কসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ। সমাপ্তি হবে সুখকর। ভাষার গদ্য হবে সরল ও সমাসবিহীন এবং পদ্য হবে স্বচ্ছ ও মধুর। এর বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের মতো। ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটি—এই চারকম বৃত্তির সব কটিই এতে ব্যবহৃত হতে পারে। নায়ক অথবা বিষয়বস্তু থেকে নাটকের নামকরণ করতে হবে। এতেও পাঁচটি সন্ধি থাকবে। দৃষ্টান্ত—শকুন্তলা, উত্তররাম চরিত।

খ. **প্রকরণ**.[৪] প্রকরণে বিষয়বস্তু হবে সম্পূর্ণরূপে কবিকল্পিত। এর নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী বা বণিক। নায়ক দুর্দিনে পতিত হয়ে সম্পত্তি, প্রণয় বা কর্তব্যসম্পন্ন করার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে সাফল্য লাভ করবেন। এতে উদাত্ত নায়ক, দেবচরিত্র বা রাজা-

---

২. "The types of drama are distinguished by the theorists according to the use which they make of the various dramatic elements enumerated". A. B. Keith : *The Sanskrit Drama*. p. 345.

৩. নাট্যশাস্ত্র (২০।১০-১১, ৩।১-১৪)

৪. নাট্যশাস্ত্র (২০।৪৮)

রাজড়ার প্রণয়লীলার কথা বর্ণনা করা যাবে না। তবে নায়ক হবেন ধীর ও প্রশান্ত শ্রেণীর, নশ্বর ধর্ম, কাল ও অর্থে তিনি আসক্ত হবেন। দাস, বেশ্যা বা বীট এর স্থানও এতে নির্দিষ্ট হয়েছে। নাটকের মতো এতে অঙ্কসংখ্যাও হবে পাঁচ থেকে দশ এবং এর নামকরণ হবে নায়ক বা নায়িকার নাম অনুযায়ী। এতে নায়িকা হতে পারেন তিন রকম কুলস্ত্রী বেশ্যা বা উভয়েই। এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রকরণেই দাস, বেশ্যা, চেট, বীট, জুয়াড়ী থাকবে। অধ্যাপক কীথ 'প্রকরণ'কে 'বুর্জোয়া কমেডি' বা 'কমেডি অব ম্যানার্স' নামে অভিহিত করেছেন।[১] এতেও নাটকের মতো কার্যসাধনে চার বা পাঁচজন পুরুষ থাকবে, বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের মতো, চারটি 'বৃত্তি'রই এতে প্রয়োগ হতে পারে। ভাষাও হবে নাটকের মতই এবং এর অঙ্গীরস শুধু শৃঙ্গার হবে। পাঁচটি সন্ধিই এতে থাকবে। এর দৃষ্টান্ত হল 'মৃচ্ছকটিক' বা 'মালতীমাধব'।

অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক[২] :

এটি এক অঙ্কের দৃশ্যকাব্য। সাধারণ মানুষ হবে এর নায়ক। এর বিষয়বস্তু হবে পরিচিত কাহিনী কখনো বা অন্যরূপও হতে পারে। প্রখ্যাত ইতিহাস কাহিনীকে নাট্যকার স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা বিস্তৃতভাবে দেখাতে পারেন। দেবচরিত্র এতে একেবারেই থাকবে না। এতে যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা থাকবে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তা দেখানো হবে না। নারীদের ক্রন্দনে 'অঙ্ক' পূর্ণ থাকবে—'ভারতী' বৃত্তিতে এ রচিত হবে এবং এর অঙ্গীরস হবে করুণ। কারো পতনের কথা এর বৃত্তে থাকবে। মুখসন্ধি ও নির্বহণ সন্ধি ছাড়া অন্য সন্ধিগুলি থাকবে না এতে। দৃষ্টান্ত-'শর্মিষ্ঠা-যযাতি'।

ব্যায়োগ[৩] :

পুরাণ বর্ণিত বিখ্যাত কোন রাজর্ষিই হবেন ব্যায়োগের নায়ক—একদিনের ঘটনাই এতে উপস্থাপিত হবে। অল্পসংখ্যক স্ত্রী চরিত্র এতে থাকবে। যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যক্তিগত সংঘর্ষ, ক্রোধযুক্ত কথাকাটাকাটিও থাকবে, কিন্তু স্ত্রীলোক কোনোরকম সংঘর্ষের হেতু হবে না। মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি ও নির্বহণ সন্ধি এই তিনটিই এতে থাকবে। শৃঙ্গার শান্ত হাস্যরসের মধ্যে যে-কোনও একটি অঙ্গীরস হবে; এটি এক অঙ্কের—স্ত্রী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রেরই এতে সংখ্যা বাহুল্য থাকবে। এর দৃষ্টান্ত 'সৌগন্ধিকাহরণ'।

ভাণ[৪] :

ধূর্ত অথবা বিট একটিমাত্র চরিত্রই থাকবে ভাণে। একটি মাত্র চরিত্র এখানে দুভাবে অভিনয় করবে—একাকী মঞ্চে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিজের অভিজ্ঞতার

১. *The Sanskrit Drama* : A. B. Keith. p. 345.
২. নাট্যশাস্ত্র) ২০।৯৪-৯৬)
৩. নাট্যশাস্ত্র (২০।৯০-৯৩)
৪. *The Sanskrit Drama* : A. B. Keith. p. 348.

ব্যাপার সে বলবে অথবা অন্যব্যক্তি সম্পর্কিত ঘটনারও বর্ণনা করতে পারে।, নায়ক চরিত্র মাঝে মাঝে তার নিজের সামনে বা দূরে অন্য কোনও এক বক্তার কল্পনা করে নানা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে তার সঙ্গে কথা কইবে। অধ্যাপক কীথ একে বলেছেন 'Monologue' বাংলায় বলা যেতে পারে 'একোক্তি'। বীর বা শৃঙ্গার রসই হবে অঙ্গীরস। এর বৃত্তি 'ভারতী' এবং এতে মুখ ও নির্বহণ—মোট দুটি সন্ধিই থাকবে। আর অঙ্ক হবে এক। দৃষ্টান্ত—'লীলামধুকর'।

সমবকার[৫] :

দেবতা ও অসুরের কাহিনী আশ্রয় করে রচিত হবে সমবকার। বিমর্ষ ছাড়া বাকি চারটি সন্ধিই এতে থাকবে। বারোজন বিখ্যাত দেবতা ও মানব এর নায়ক হবেন। সমস্ত রসই এতে থাকবে তবে অঙ্গীরস হবে বীর। সমস্ত বৃত্তিই থাকবে, তবে কৈশিকী বৃত্তি অল্প থাকবে। যুদ্ধ, কাপট্য, কোলাহল, প্রেমলীলা—এতে বর্ণিত হবে, এর অঙ্ক সংখ্যা তিন এবং তিনটি অঙ্কে পৃথক পৃথক ঘটনা থাকবে এবং তাদের মধ্যে সংযোগ নিবিড় হবে না। তিন রকম প্রতারণা, তিন রকম উত্তেজনা ও তিন রকম প্রেম এতে থাকবে। ১৮ নালিকা অর্থাৎ ৩৬ ঘটিকায় এর সমগ্র বিষয়বস্তু নিষ্পন্ন হবে। বারো জন নায়ক নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করবেন। দৃষ্টান্ত—'সমুদ্রমন্থন'।

বীথী[৬] :

বীথির সঙ্গে ভাণের কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এ এক অঙ্কে রচিত ও অঙ্গীরস শৃঙ্গার। একটি বা দুটি চরিত্রেরই অভিনয় এতে থাকবে—চরিত্র হবে উত্তম মধ্যম অথবা অধম শ্রেণীর। বিশ্বনাথ তিনটি চরিত্রের অভিনয়ের কথা বলেছেন এবং আকাশ-ভাষণের সাহায্যে বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি রচনারও নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ ও নির্বহণ এ দুটি সন্ধিই এতে থাকবে ও কৈশিকী-বৃত্তিবহুল হবে। বিভিন্ন রসের সমাবেশ এতে মালা রচনা করে বলে এর নাম বীথী। ভরত ১৩ রকম বীথীর উপবিভাগ করেছেন। উদ্ঘাত্যক অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎ-প্রলাপ, ব্যাহার ও মৃদব। 'নাট্যশাস্ত্র' এর বিংশ পরিচ্ছেদের ১১৭-১২৯ পর্যন্ত শ্লোকে এই উপবিভাগগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত—'মালবিকা'।

প্রহসন :

নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের ব্যাপারই কবিকল্পনার সাহায্যে প্রহসনে উপস্থিত করা হয়। অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু নাটকোত্তের কল্পিত। সকল রকম নিন্দনীয় চরিত্রের কলহ ও

---

৫. নাট্যশাস্ত্র (২০।৬৪-৭৭)
৬. নাট্যশাস্ত্র (২০।১১২-১৫)

নানা কৌশলের কথাই এর উপজীব্য। একটি মাত্র অঙ্কেই প্রহসন রচিত হয়, তবে বিশ্বনাথ দুটি অঙ্কের কথাও ইঙ্গিত করেছেন।[১] মুখ ও নির্বহণ এই দুটি মাত্র সন্ধিই এতে থাকে এবং আরভটী বৃত্তি, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক এতে থাকে না। এর অঙ্গীরস হয় হাস্য। বিশ্বনাথ বলেন তপস্বী, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে একজনকে এখানে নায়ক করা হয়। নাট্যশাস্ত্রে প্রহসনের দু'রকম ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। ক. শুদ্ধ প্রহসন ও খ. মিশ্র বা সংকীর্ণ প্রহসন। 'দশরূপক' ও 'সাহিত্যদর্পণ'-এ প্রহসনের আরও একটি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, তা হল 'বিকৃত'। শৈবসন্ন্যাসী, ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ—এদের নিয়ে হাস্যপরিহাসযুক্ত যে রচনা এবং যাতে নিন্দনীয় নিম্নশ্রেণীর লোকেদেরও প্রসঙ্গ থাকে ভরত তাকেই বলেছেন শুদ্ধ প্রহসন।[২] এর ভাষা অবিকৃত ও স্বাভাবিক হয়। দশরূপকের মতে শুদ্ধ প্রহসনে ব্রাহ্মণ, দাস-দাসী, পরজীবী প্রভৃতি চরিত্রকে যথোচিত বেশভূষায় ও যথোপযুক্ত ভাষায় উপস্থাপিত করতে হয়।[৩] সাহিত্যদর্পন-এ বলা হয়েছে যে শুদ্ধ প্রহসনের একজন নায়ক হবেন ধূর্ত। যে প্রহসনে বেশ্যা, দাস, বিট ধূর্ত ও অসতী নারী তাদের দুর্বিনীত ভাব এবং উচ্ছৃঙ্খল বেশভূষা ও গতিবিধি নিয়ে দেখা দেয় তা হল নাট্যশাস্ত্রমতে মিশ্র বা সংকীর্ণ প্রহসন। "সাহিত্যদর্পণ'-এ বলা হয়েছে ধূর্তছাড়া অপর যে-কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত হলেই তা হবে সংকীর্ণ। বহু ধূর্ত ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হলেও যে সংকীর্ণ প্রহসন হয়, এ কথা সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত আছে।[৪] বীথীর লক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে এ শ্রেণীর প্রহসনকে 'দশরূপকে' 'মিশ্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর তৃতীয় শ্রেণীর নাম হল বিকৃত। 'সাহিত্য দর্পণ' এ বিশ্বনাথ বলেছেন যে যে প্রহসনে ক্লীব, কঞ্চুকী ও তপস্বী—বিট, চারণ ও,—যোদ্ধা প্রভৃতির বেশ ও ভাষা অবলম্বন করে অভিনয় করে তার নাম বিকৃত।[৫] প্রহসন সম্পর্কে ভরত আরও একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। কুৎসা বিষয়ক কোনো লোক-প্রচলিত প্রিয় বিষয় অথবা ভণ্ডামির ঘটনা ভণ্ডদের কলহের মধ্য দিয়ে প্রহসনকার অনুপ্রবিষ্ট করতে পারেন।[৬] দৃষ্টান্ত—'কন্দর্পকেলি'।

ডিম :[৭]

ডিমের বৃত্ত অতিপরিচিত ও এর নায়কও পরিচিত এবং উদাত্ত-গুণসম্পন্ন হবে। এতে মোট চারটি অঙ্ক ও ছয় রকম রসের সমাবেশ থাকবে, আর অঙ্গীরস হবে রৌদ্ররস। শৃঙ্গার ও হাস্যরস এতে একেবারেই থাকবে না। নানা মায়া, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ভূমিকম্প, ব্যক্তিগত লড়াই, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান, ক্রোধযুক্ত বাক্যবিনিময় প্রভৃতি এতে

---

১. সাহিত্যদর্পণ (৬।২১৭ পৃঃ ৫২৯)
২. নাট্যশাস্ত্র (২০।১০১-৪)
৩. দশরূপক (৩।৫৬)
৪. সাহিত্যদর্পণ (৬।১৩৭-৪০)
৫. সাহিত্যদর্পণ (৬।২৬৮)
৬. নাট্যশাস্ত্র (২০।১০৬-৭)
৭. নাট্যশাস্ত্র (২০।৪৪-৭৭)

থাকবে। এতে ষোলটি উদ্ধত নায়ক থাকবে এবং তারা দেবতা, নাগ, রাক্ষস, যক্ষ ও পিশাচ হতে পারে। বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক এতে থাকবে না—কৈশিকী ছাড়া বাকি বৃত্তিগুলি এবং বিমর্ষ ব্যতীত বাকি সন্ধিগুলি এতে থাকবে। দৃষ্টান্ত—ত্রিপুরদাহ।

ঈহামৃগ :[৮]

এখানে নায়ক হবে দেবতা। তিনি দিব্য স্ত্রীর জন্যে যুদ্ধ করছেন—এরূপ কাহিনী নিয়ে ঈহামৃগ রচিত হবে। এর বৃত্তটি হবে সুপরিকল্পিত ও দর্শকচিত্তরঞ্জনে সমর্থ। সাহিত্যদর্পণ-এ এর পরিচয়ে বলা হয়েছে যে এর থাকবে চারটি অঙ্ক এবং এর বিষয় নানা বস্তুতে পূর্ণ অর্থাৎ মিশ্র। মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ এই তিনটি সন্ধি এতে থাকবে। এর নায়ক বা প্রতিনায়ক নর বা দেবতা হতে পারে—কিন্তু এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নেই। প্রতিনায়ক এতে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যায় কাজ করবে। প্রতিনায়ক তার প্রতি অনাসক্তা কোনও দিব্যনারীকে অপহরণ করে এনে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করছে—এরূপ ঘটনা সৃষ্টি করে অল্পঅল্প শৃঙ্গারাভাস দেখাতে হবে। বিশ্বনাথ উল্লেখ করেছেন যে কারো কারো মতে ঈহামৃগ একাঙ্ক ও এর নায়ক দেবতা, আবার কারো কারো মতে এতে দিব্য স্ত্রীলোকের জন্য যুদ্ধ থাকে (যেমন ভরত) এবং এর নায়ক হবেন ছয় জন। দৃষ্টান্ত—'কুসুমবিজয়'।

কিন্তু এই দশপ্রকার রূপকের কথাই শেষ নয়। 'সাহিত্যদর্পণ'-এ আঠারো রকমের উপরূপকেরও পরিচয় আছে। এগুলি হল—

ক. নাটিকা খ. ত্রোটক গ. গোষ্ঠী ঘ. সট্টক ঙ. নাট্যরাসক চ. প্রস্থান ছ. উল্লাপ্য জ. কাব্য ঝ. প্রেংক্ষণ ঞ. রাসক ট. সংলাপক ঠ. শ্রীগদিত ড. শিল্পক ঢ. বিলাসিকা ণ. দুর্মল্লিকা ত. প্রকরণিকা থ. হল্লীশ দ. ভাণিকা। অতিসংক্ষেপে এদের কথা কিছু বলা যাচ্ছে।

ক. নাটিকা : যে উপরূপকের বর্ণনীয় বিষয় কবিকল্পিত, যা স্ত্রীচরিত্রবহুল ও যাতে চারটি অঙ্ক থাকে তার নাম নাটিকা। বিখ্যাত রাজা নায়ক ও গীতনিপুণা রাণী হবেন এর নায়িকা। নায়ক মহিষীর ভয়ে সর্বদা এতে শঙ্কিত থাকবেন। সব সন্ধিই থাকবে। দৃষ্টান্ত—'রত্নাবলী'।

খ. ত্রোটক : সাত, আট পাঁচ বা নয় অঙ্কযুক্ত দিব্যপুরুষ ও মানুষের বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত ও প্রত্যেক অঙ্কেই বিদূষকের উপস্থিতি থাকবে। অঙ্গীরস শৃঙ্গার। দৃষ্টান্ত—'বিক্রমোর্বশী'।

গ. গোষ্ঠী : নায়ক নয়টি বা দশটি ; বৃত্তি কৈশিকী, গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি নেই, স্ত্রীচরিত্র পাঁচ ছয়টি ; এক অঙ্ক ও রস শৃঙ্গার। দৃষ্টান্ত—'রৈবতমদনিকা'।

---

৮. নাট্যশাস্ত্র (২০।৭৮-৮২)

ঘ. সট্টক : সমস্ত সংলাপই প্রাকৃতে; বিষ্কম্ভক, প্রবেশক থাকবে না—অদ্ভুতরসের প্রাধান্য থাকবে ও বাকি বৈশিষ্ট্য নাটিকার মতো। দৃষ্টান্ত—'কর্পূরমঞ্জরী'।

ঙ. নাট্যরাসক : একাঙ্ক, বহু তাল ও লয়যুক্ত, নায়ক উদাত্ত, প্রতিনায়ক থাকবে—অঙ্গীরস হাস্য, বাসকসজ্জা নায়িকা, মুখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকবে—বাকিগুলি থাকবে না। দৃষ্টান্ত—'বিলাসবতী'।

চ. প্রস্থান : নায়ক হবে দাসজাতীয়, উপনায়ক তার চেয়েও হীন, নায়িকা হবে দাসী। কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তি থাকবে। মদ্যপানের বিষয় অবলম্বন করে উদ্দিষ্ট বিষয়ের উপসংহার হবে। দুইটি অঙ্ক থাকবে। দৃষ্টান্ত—শৃঙ্গারতিলক।

ছ. উল্লাপ্য : নায়ক ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন ও কাহিনী দিব্য; এতে এক অঙ্ক, রহযুদ্ধের বর্ণনা ও 'অগ্রগীত' নামক মনোহর সঙ্গীত থাকে; নায়িকা চারজন। হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণরস থাকে। দৃষ্টান্ত—'দেবীমহাদেব'।

জ. কাব্যম; আরভটীবৃত্তিহীন, একাঙ্ক, হাসসংকুল, শৃঙ্গাররসপূর্ণ। নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন—মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণসন্ধি থাকে। দৃষ্টান্ত—'যাদবোদয়'।

ঝ. প্রেংখণ : গর্ভ ও বিমর্ষসন্ধিহীন, সূত্রধার বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকহীন, এক অঙ্কের হীনচরিত্রের নায়ক সম্বলিত; নেপথ্য থেকে এতে নান্দী ও প্ররোচনা গীত হয়। দৃষ্টান্ত—'বালিবধ'।

ঞ. রাসক : এতে থাকে পাঁচটি চরিত্র, নায়িকা প্রসিদ্ধ চরিত্রের, কিন্তু নায়ক মূর্খ—তার উদাত্তভাবের ক্রমবিকাশ দেখানো হয়। মুখ ও নির্বহণ সন্ধি থাকে, প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ থাকে। নান্দী হয় শ্লেষযুক্ত, সূত্রধার থাকে না, অঙ্ক এক। বৃত্তি কৈশিকী ও ভারতী। দৃষ্টান্ত—'মেনকাহিতম'।

ট. সংলাপক : অঙ্ক তিন বা চার, নায়ক পাষণ্ডব্যক্তি—শৃঙ্গার ও করুণ ছাড়া অন্যান্য রস থাকে; নগর-অবরোধ, ছল, যুদ্ধ, ভয়ে পলায়ন প্রভৃতি বিষয় এর উপজীব্য। দৃষ্টান্ত—মায়াকাপালিক।

ঠ. শ্রীগদিত : ঘটনা—ইতিহাস বা পুরাণপ্রসিদ্ধ, নায়ক ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন ও বিখ্যাত, নায়িকাও খ্যাতনামা,—গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি অনুপস্থিত—'শ্রী'শব্দের বহুল প্রয়োগ, তাই এর নাম শ্রীগদিত। একাঙ্ক। দৃষ্টান্ত—'ক্রীড়ারসাতল'।

ড. শিল্পক : চারটি অঙ্ক, চারটি বৃত্তি, শান্ত ও হাস্য ছাড়া অন্যান্য রস, ব্রাহ্মণ নায়ক, শ্মশানাদির বর্ণনা ও নীচজাতীয় উপনায়ক এতে থাকে। দৃষ্টান্ত—'কনকাবতী মাধব'।

ঢ. বিলাসিকা : শৃঙ্গাররসের বহুল প্রয়োগ, বিদূষক বীট ও পীঠমর্দের উপস্থিতি, স্বল্পঘটনা, মনোহরবেশযুক্ত হীনশ্রেণীর নায়ক এতে থাকে। অঙ্ক এক। দৃষ্টান্ত নেই।

ণ. দুর্মল্লিকা : চার অঙ্কের কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তিযুক্ত, গর্ভসন্ধিহীন, সর্ববিষয়ে দক্ষ পাত্রগণযুক্ত এবং নীচ মন এমন নায়ক-সম্বলিত। দৃষ্টান্ত—বিন্দুমতী।

ত. হল্লীশ : এক অঙ্কের। সাত, আট বা দশটি স্ত্রীচরিত্র ও উদাত্তবচনযুক্ত একটি

পুরুষচরিত্র থাকে; মুখসন্ধি ও নির্বহণসন্ধি ছাড়া অন্য সন্ধি অনুপস্থিত। দৃষ্টান্ত—'কেলি রৈবতক'।

খ. ভাণিকা: এক অঙ্কের। মুখ ও নির্বহণসন্ধিযুক্ত; এর নায়িকা উত্তমশ্রেণীর, কিন্তু নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তি। কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তি থাকে। দৃষ্টান্ত—'কামদত্তা'।

ঘ. প্রকরণিকা: এ হল নাটিকা। নায়ক বণিক, নায়িকা নায়কের সমান বংশজাতা। দৃষ্টান্ত নেই।

সংস্কৃত আলংকারিকদের শ্রেণী বিভাগ-তত্ত্ব:

ভরত নাট্যের যে শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ প্রমুখ অন্যান্য আলংকারিকগণ যা মেনে নিয়েছিলেন, তার মূলে কোন্ চিন্তা কাজ করেছে তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এখানেই বোঝা যাবে নাট্য-শ্রেণীবিভাজনের মূলে কি তত্ত্ব নিহিত আছে। নাট্যের যে দশটি শ্রেণী তাদের অঙ্ক-সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখি, নাটক ও প্রকরণের অঙ্কসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ। অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, বীথী ও প্রহসন—এগুলির প্রত্যেকটিরই অঙ্কসংখ্যা এক। সমবকার এর অঙ্ক তিন, ডিম এর এবং ঈহামৃগ এর অঙ্কসংখ্যা চার। এর থেকে বোঝা যায় 'সমবকার'কে সুনিশ্চিতভাবে অঙ্ক দেখেই চেনা যায়—কারণ তিন অঙ্কের আর কোনও নাট্যই নেই। চার অঙ্ক হলে ডিম বা ঈহামৃগ এই দুয়ের একটি হতেই হবে। কিন্তু কি কি বৈশিষ্ট্য দেখে এদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে? নায়ক, সন্ধি ও বিষয়বস্তু এ ব্যাপারে সহায়তা করবে। ডিমের নায়ক অতিশয় পরিচিত, কিন্তু ঈহামৃগ এর নায়ক দেবতা। 'ডিম'-এ থাকবে চারটি সন্ধি—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও নির্বহণ; কিন্তু 'ঈহামৃগ'-এ সন্ধি থাকবে তিন—মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ। বিমর্ষ সন্ধির উপস্থিতি ডিমকে ঈহামৃগ থেকে পৃথক করে। তাছাড়া ডিম এ দিব্য স্ত্রীলাভের জন্য নায়কের যুদ্ধ থাকে না, তা থাকে 'ঈহামৃগ'এ। সুতরাং এখানে নায়ক, সন্ধি ও বিষয়বস্তু তিনের সাহায্যেই এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে হয়। এক অঙ্কের নাট্যগুলির মধ্যে অঙ্গীরস করুণ শুধু অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক এর। শুধু রসের দিক থেকেই উৎকৃষ্টিকাঙ্ক সম্পূর্ণ একক ও স্বতন্ত্র। আবার একটিমাত্র চরিত্রের আকাশ-ভাষিত সম্বোধন বা একোক্তি-রীতিতে অভিনয়ের ব্যাপার দেখে ভাণকে চেনা খুবই সহজ। বীথী ও প্রহসন দুয়েরই অঙ্গীরস দেখে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়—প্রহসনের অঙ্গীরস হাস্য, বীথীর শৃঙ্গার। ভাণের অঙ্গীরস বীর বা শৃঙ্গার দুইই হতে পারে—তবে বীথী ও ভাণের পার্থক্য একোক্তি (Dramatic monologue) বা অভিনয় রীতি দেখেই করা যাবে। ব্যায়োগকে পৃথক করতে গেলে রসের দিক থেকে করা যাবে না। নায়কের পরিচয় ও তিনসন্ধির উপস্থিতি ও একদিনের ঘটনার উপস্থাপন—এ সব লক্ষ্য রেখেই একে বুঝতে হবে। নাটক ও প্রকরণ দুয়েরই অঙ্ক যখন এক, এবং দুয়েরই অঙ্গীরস ও অন্যান্য অনেক লক্ষণই এক, তখন এদের পার্থক্য কিভাবে নির্ণীত হবে? বিষয়বস্তুই এক্ষেত্রে দুয়ের পার্থক্য দেখিয়ে দেবে।

নাটকের বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক, কিন্তু প্রকরণের হবে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক।

আবার 'উপরূপক'গুলিও বিশেষ কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রেখেই যে-বিভক্ত হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সট্টক ও নাটিকার অনেক লক্ষণ একরূপ হলেও—সট্টক আদ্যন্ত প্রাকৃতভাষাই রচিত হবে। ভাষা দেখেই একে পৃথক করা যায়। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখব, সংস্কৃত আলংকারিকগণ সন্ধি, অঙ্ক, বিষয়বস্তু, রস, রচনারীতি বা অভিনয়-রীতি, নায়ক-পরিচিতি—প্রভৃতি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে নাট্যের নানা শ্রেণী-বিভাগ কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের অষ্টাদশ উপরূপক বিভাগের পশ্চাতেও এই চিন্তা সক্রিয় ছিল।

আরও একটি বিষয় সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দিষ্ট আঠারটি উপরূপক এর মধ্যে 'করুণ'কে অঙ্গীরস করে একটিও উপরূপক নেই। দশটি রূপকের মধ্যে একমাত্র অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্কই শুধু করুণ-রসাত্মক। নাট্যসৃষ্টিতে করুণরসের প্রতি এমন ঔদাসীন্য স্বভাবতই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অধ্যাপক কীথও বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করে পারেন নি।

করুণ-রসাত্মক নাটকের সংখ্যা-বিরলতার কারণ :

কীথ যা ইঙ্গিত করেছেন আমরা তা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে যদি বলি, তাহলে তাঁর বক্তব্য এইরূপ দাঁড়ায়। ভারতীয় হিন্দুগণ কর্মফলে বিশেষভাবে আস্থাবান। তাঁরা মনে করেন যে এ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু কর্মফল ভোগ করে, তা তাঁদের বহু বহু জন্মের কৃতকর্মেরই ফল। প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ—এই তিন রকম কর্ম-ফল ভোগ মানুষকে করতে হয়। 'প্রারব্ধ'—যা জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে জীবের মধ্যে বর্তমান, 'ক্রিয়মাণ' যে কর্ম সে এ জন্মে করছে তার ফল এবং যা যোগ-বিয়োগের ফলে প্রারব্ধ'কে বাড়িয়ে বা কমিয়ে 'সঞ্চিত'হচ্ছে। সুতরাং মানুষ নিজ কর্মের দ্বারাই নিজ অদৃষ্টকে রচনা করে চলেছে। মর্তজীবনে দুঃখ-দুর্গতি, ব্যথা, শোক মানুষকে চঞ্চল ও বিমূঢ় নিশ্চয়ই করে। কিন্তু এর জন্যে সে বিধাতার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করতে চায় না। কারণ এ দুঃখের জন্য বিধাতাপুরুষ দায়ী নন, দায়ী সে নিজেই। পুরুষকারকে যে সম্পূর্ণরূপে সে অস্বীকার করে, তা নয়। কিন্তু দুঃখের বিরুদ্ধে, তার মহাসর্বনাশের বিরুদ্ধে তার মন সর্বশক্তি একাগ্র করে প্রতিবাদ করতে চায় না। অথচ নিয়তির প্ররোচনায় জীবনে শোচনীয়তা গ্রীকদের জীবনেও দেখা গেছে। সেখানে গ্রীক-পুরুষ ঐ শোচনীয়তা বরণ করেও সেই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে। তাই গ্রীক ট্রাজিডির নায়কের মনোভাব ব্রাহ্মণ্যশাসিত ভারতীয় নায়কদের মধ্যে দেখা যাবে না। ভারতীয় নাট্যকারদের হাতে ট্রাজিডি সৃষ্টি না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক কীথ তাই বলেন যে এর জন্য দায়ী, "mental outlook of

the Indian people and their philosophy of life."[১] অধ্যাপক ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কীথের এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন।[২] তিনি কীথের মন্তব্য মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সংস্কৃত সাহিত্য যে বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে সাহিত্যে জীবনের বিষাদময় সত্তা অপেক্ষা আনন্দময় সত্তাটিই অধিকতর কাম্য হয়ে উঠেছিল। বিজয়োৎসবেই ভারতে প্রথম নাট্যের উৎপত্তি এবং রাজারাজড়াদের আনন্দদানের জন্যই মুখ্যত করুণ রসকে বর্জন করা হয়েছে। সেইজন্যই তাঁর মতে ট্রাজিডি সৃষ্টির আগ্রহ এখানে দেখা যায় নি।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে ডঃ ভট্টাচার্যের আলোচনা নূতন ও চিন্তাপূর্ণ হলেও তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত ভারতীয় নাট্যকারগণ সৃষ্ট নাটকগুলির অঙ্গীরস যাই হোক না কেন, তা সহৃদয় দর্শকচিত্তে নিত্য আনন্দেরই হেতু। করুণরস-মুখ্য নাটকেরও ফলশ্রুতি বিষাদান্ত নয়। দুঃখময় ঘটনা বা ভাবও রসে পর্যবসিত হলে ঐ ব্যথা বা দুঃখ থাকে না। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া যায় যে করুণরসাত্মক পরিবেশ থেকেই ভারতবর্ষে প্রথম নাট্যের উৎপত্তি তাহলেও গ্রীক ট্রাজিডির অনুরূপ ট্রাজিডি আমরা পেতাম না। অদৃষ্টবাদের উপর যাদের এমন গভীরতম বিশ্বাস তাদের জীবনচেতনাই সম্পূর্ণ পৃথক। কর্মসংঘাতমুখর যে জীবনকে গ্রীক নাটকে আমরা দেখি, সংস্কৃত নাটকে তা কখনই লভ্য নয়। এখানেও নাটকে দুঃখ, ব্যথা, বেদনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু পরিণামে তা সম্পূর্ণরূপে নায়কের মন থেকে মুছে যায়। ফলে এখানে নাটক ট্রাজিকমিডি হয়ে যায়। অধ্যাত্মরসরসিক, অদ্বৈতরসপুষ্ট, অদৃষ্টবাদী ভারতীয়রা শুধু ট্রাজিডি-রস সৃষ্টিতেই অনীহা দেখিয়েছে তাই নয়, নাট্যসংঘাত, নাট্যক্রিয়া, গতিবেগ প্রভৃতি নাটকের কতকগুলি লক্ষণকে তাঁরা গ্রীক ট্রাজিডির মত বড় করে দেখেন নি। তাছাড়া আরও একটি কথাও মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষের জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং এ সকলের প্রভাবে এদেশের মানুষের স্বভাব-ধর্ম মূলত শান্ত। কর্মময় সংঘাত-মুখর চঞ্চল জীবনস্রোতে মত্ত হতে সে চায় না। অধ্যাত্মপ্রবণ চিত্ত তার অদ্বৈতরসেই বিশেষভাবে লালিত। সুতরাং রঙ্গমঞ্চে যে জীবনকে তারা দেখতে চেয়েছে, তা তাদের জাতীয় স্বভাব ও জীবনাদর্শেরই অনুকূল। নাট্যে অঙ্গীরসকে করুণ করলে স্বরচিত অদৃষ্টের পরিচয় মিলবে ঠিকই, কিন্তু তা পটুয়াদের পটখেলার মতো নীতিকথার বাহন হবে। তাদের মজ্জাগত স্বভাবধর্ম তাতে আশ্বস্ত হবে না। আমাদের মনে হয়, অদৃষ্টবাদ, অধ্যাত্ম-তত্ত্বে গভীর বিশ্বাস, দেশের নৈসর্গিক কারণ, ভৌগোলিক সংস্থান সব কিছুর

১. অধ্যাপক কীথ আরও বলেন গ্রীক ট্রাজিডির জীবনদৃষ্টি ভারতীয় নাট্যকারদের নয়। "The conception of human activity striving with circumstance, endeavouring to assert itself in the teeth of forces superhuman in power and un-controllable, and meeting with utter ruin, but yet maintaining its honour which affords the spring of tragedy in Greece is allien to Indian thought. *The Sanskrit Drama*, pp. 354.

২. নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, পৃঃ ২৮৪-৮৭

সম্বন্ধে ভারতীয়দের যে জীবনবোধ তার সঙ্গে গ্রীক জীবনাদর্শের গুরুতর পার্থক্য। তাই গ্রীক ট্রাজিডির অনুরূপ ট্রাজিডি সৃষ্টির প্রয়াস এখানে হয় নি। শান্তি ও কল্যাণের সুরে এমনভাবে নাট্যের উপসংহার করার চেষ্টা হয়েছে, যাতে নাট্যবৃত্তের অন্তর্গত ব্যথা-বেদনাও আর দর্শকচিত্তে স্থায়ী কোনো চিহ্ন রেখে যায় না। তাছাড়া আরও একটি কথাও মনে রাখা দরকার। ভারতীয় নাট্যকারগণ করুণরসকে প্রধান করে নাটক লেখাকে তাঁদের আদর্শের প্রতিকূল বলে ভাবতেন। তাঁরা হয়তো মনে করতেন সাধারণ মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনচর্যার পক্ষে ঐ রস ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

নাট্যশ্রেণীর তালিকা : অধ্যায়ের আলোচনা শেষে আমরা নাট্যের শ্রেণী-বিভাগের একটি তালিকা দিচ্ছি। এ তালিকা অধ্যাপক নিকলের তালিকা থেকে বিস্তৃত আবার ড: সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মতো তা বহু বিস্তৃত নয়। পাশ্চাত্যের ও বাঙলা নাটকের প্রায় অধিকাংশ নাটকগুলিকে কোনো না কোনো শ্রেণীর অন্তর্গত করতে গেলে এই শ্রেণী বিভাগই যথেষ্ট।

(ক) ভাব ও ঘটনার ভিত্তিতে— (১) ট্রাজিডি, (২) কমেডি, (৩) ট্রাজি-কমিডি। এই তিনটিই ভাব বা রসের ভিত্তিতে। (৪) মেলোড্রামা, (৫) ফার্স। এই দুটি ঘটনার ভিত্তিতে।

(খ) আয়তন বা অঙ্কের ভিত্তিতে— (১) মহানাটক, (২) নাটক, (৩) নাটিকা, (৪) একাঙ্ক। এগুলির মধ্যে মহানাটকের অঙ্কসংখ্যা 'সাহিত্যদর্পণে' নির্দিষ্ট তা সব সময়েই দশ। সংস্কৃতে এইরূপ নাটক আছে। এর প্রথম নিদর্শন 'বালরামায়ণম্'। পাশ্চাত্যে বৃহদায়তন নাটককে এই নামে অভিহিত করা চলে। টমাস হার্ডির তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'The Dynasts' নাটকটিতে উনিশটি অঙ্ক আছে। এ ধরনের নাটক ঠিক অভিনেয় নয়। আয়তনে ছোট নাটককেই বর্তমান কালে নাটিকা বলা হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি সংস্কৃতে আঠারটি উপরূপকের মধ্যে 'নাটিকা' অন্যতম এবং তার আয়তন সংক্ষিপ্ত নয়—তা চার অঙ্কের। সুতরাং 'নাটিকা' বললে বর্তমান কালে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে সংস্কৃত উপরূপকের কোনো সম্পর্ক নেই।

(গ) রচনারীতির ভিত্তিতে— (১) ক্লাসিক নাটক, (২) রোমান্টিক নাটক।

(ঘ) ভাষার ভিত্তিতে—(১) গদ্যনাটক, (২) পদ্য নাটক, (৩) গদ্য-পদ্য-মিশ্র নাটক, (৪) কাব্যনাটক। সংস্কৃতে গদ্যপদ্যময় নাটককে 'চম্পূ' বলা হয়।

(ঙ) উপাদান-বাহুল্যের ভিত্তিতে—(১) গীতিনাট্য বা অপেরা, (২) নৃত্যনাট্য, (৩) যাত্রা।

(চ) নাট্যবিষয়কে উপস্থাপনের ভিত্তিতে—(১) বাস্তবধর্মী নাটক, (২) রূপক নাটক, (৩) রূপক সাংকেতিক বা সাংকেতিক নাটক, (৪) অভিব্যক্তি-বাদমূলক নাটক, (৫) এপিক থিয়েটার, (৬) কিমেতি নাটক।

(ছ) বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে—(১) পৌরাণিক, (২) সামাজিক, (৩) ঐতিহাসিক, (৪) ছদ্ম ঐতিহাসিক, (৫) পারিবারিক, (৬) জীবনী বা চরিত নাটক (৭) কাল্পনিক, (৮) লোকনাট্য।

(জ) বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিত্তিতে—(১) ধর্মমূলক, (২) নীতিমূলক, (৩) আধ্যাত্মিক, (৪) রাজনৈতিক, (৫) দেশপ্রীতিমূলক, (৬) অপরাধমূলক, (৭) রোমাঞ্চকর।

এগুলির মধ্যে ভাব ও ঘটনার ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভক্ত নাটকগুলির বিস্তৃত পরিচয় পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণীর নাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। গণনাট্য-নবনাট্য ও থার্ডথিয়েটারের কথাও সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কমেডি ও তার নানা রূপ

মানুষের জীবন নিরবচ্ছিন্ন বেদনার করুণ রাগিণী নয়। জীবনে যেমন ব্যথা আছে, দুঃখ আছে, মর্মান্তিক যন্ত্রণার হাহাকার আছে, তেমনি আছে মোহ ও মত্ততার চঞ্চলতা, হাসি ও আনন্দের প্রফুল্লতা—সুখ ও শান্তির প্রসন্নতা। জীবনের একপিঠে সব হারানোর অমাবস্যা, অন্যপিঠে সব পেয়েছির পূর্ণিমা। একদিকে সংগ্রাম-মুখর জীবনের গহন-গম্ভীর রূপ, অন্যদিকে শান্তি-কামী মানুষের লঘু-চপল মূর্তি। একই জীবনের এই দুইরূপ অর্থাৎ তার সমগ্র রূপ ধরা পড়ে যথাক্রমে ট্রাজিডি ও কমেডিতে। জীবনের এই হাল্কা মেজাজের—হাসি-আনন্দ ও অবারিত প্রসন্নতার সুরটি কমেডির বীণায় বেজে ওঠে। এখানে ক্ষয়-ক্ষতির দুর্ভাবনা মানুষকে পীড়িত করে না, মৃত্যুভয় বা মহা সর্বনাশের আশঙ্কাও তার নেই। হাসি-খুশির মোড়কে জীবন এখানে বিচিত্র রঙে রঙীন ও মধুর। কমেডিতে জীবন কখনো মায়াঘেরা এক স্বপ্নরাজ্য—আবার কখনো বা ভবিষ্যতের ভাবনামুক্ত ক্ষণিকের মানস-উপভোগ্য অপরূপ এক নন্দনকানন।

নাটকের এই বিশেষ শ্রেণীটির উদ্ভব অতি প্রাচীনকালে। সুদূর অতীতে গ্রীসের অ্যারিস্টোফেনিসের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত। যুগে যুগে কালধর্মে জীবনের মূল্যবোধ ও রূপ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে কমেডিরও রূপ-বিবর্তন ঘটেছে। তাই কমেডিতে সব সময় জীবনের লঘু-তরল প্রসন্নতার দিকটি আর প্রতিফলিত হয় না। মিলনান্ত হলেও জীবনের গুরুগম্ভীর দিককেও আজ আর সে উপেক্ষা করছে না। দুই বিপরীত রূপ যখন একই জীবনের অন্তর্গত, দুই-ই যখন জীবনের সত্য, তখন একের রাজ্যে অন্যের অবস্থান খুবই সঙ্গত। তাই জীবনের দুর্গতি বা ভয়াবহ রূপকে উপস্থাপিত করেও কখনো কমেডি সমস্ত দুর্যোগের অন্তরালবর্তী প্রসন্ন রূপের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে, আবার কখনো হাসি তামাসা উদ্ভটত্বের বহিরাবরণের মধ্যে জীবনের গম্ভীর স্বভাবটিকেও আভাসিত করছে। কমেডির সংজ্ঞা এক কথায় দেওয়াও আজ কঠিন। কমেডির জন্ম, তার নানা লক্ষণ ও সংজ্ঞা, তার প্রবণতা, বিভিন্ন শ্রেণী, তার-আবেদন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করলে কমেডির জগৎ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হবে না। একে একে সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

কমেডির উদ্ভব :

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা[১] বলেছেন ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দেই সর্বপ্রথম গ্রীসের ডায়োনিসাস দেবতার উৎসবে নাট্য-প্রতিযোগিতায় কমেডি স্থানলাভ করেছিল। কিন্তু অনুমান

১. অধ্যাপক এ নিকলের 'World Drama' পৃঃ ১০, জন গ্যাসনারের 'Masters of the Drama' পৃঃ ৮০.

করা হয় এর আরও কিছু পূর্ব থেকেই নানা জনপ্রিয় আমোদ-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপাদানকে আশ্রয় করে কমেডির একটা রূপ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। একথা মেনে নেওয়া চলে যে তখন কমেডির কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল না বলে বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণ ঐ সুসংহত প্রাক্‌রূপে ঘটছিল। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন যে প্রথম অবস্থায় কমেডি রচনার একটা স্থূল প্রয়াসই হয়েছিল —পরে এর আবির্ভাব ঘটেছে ফ্যালিক গীতি (Phallic songs) থেকে।[১] এই ফ্যালিক-গান হত ডায়োনিসাস দেবতার শীতকালীন ধর্মোৎসবে। গ্রীসে মদ্য, শস্য আর প্রজননের দেবতা হলেন ডায়োনিসাস। তাঁর সম্মাননায় উৎসবের দিন একদল লোক শোভাযাত্রা করে তাঁর বেদীর নিকট উপস্থিত হত। শীতকালীন উৎসবের শোভা-যাত্রাকারীর ঐ দলকে বলা হত কোমাস। এই 'কোমাস' থেকেই কমেডি নামটির উৎপত্তি। শোভাযাত্রার দলটি গান গাইতে গাইতে চলত। তাদের যে নেতৃত্ব করত, সে অন্য গায়কদের সঙ্গে অথবা জনতার সঙ্গে নানারকম রসিকতা করত। কখনো বা এই দলের লোকেরা ঘোড়া, ছাগ, মোরগ, ব্যাঙ, পাখী প্রভৃতির মুখোস প'রে ও নানা সাজে সজ্জিত হয়ে নাচ-গানে মেতে উঠত। ডায়োনিসাস দেবতার প্রতীক হিসেবে এক বিশালকায় লিঙ্গকে তারা বহন করে নিয়ে যেত। এদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হলেও তা ছিল অশ্লীল ও তাদের হাবে-ভাবে কামকলার চিত্রই ফুটে উঠত। গ্রীসের নিকটবর্তী শহর মেগারাডে এর কিছু পূর্ব থেকেই সিসিলির দুই কবি এপিকারমুস (Epicharmus) ও সফরণের (Sophron) লেখা স্থূল ফার্স প্রচলিত হয়েছিল। শোভাযাত্রার গানে এই ফার্সের প্রভাব কতকটা পড়েছিল। ফলে গ্রীক কমেডিতে সামাজিক ব্যঙ্গ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।[২]

দেশীয় (গ্রীসের) কোমাসের সঙ্গে ঐ স্থূল ফার্সের সংমিশ্রণের ফলে ক্রমশ তা কাহিনীর আকৃতি নেয় ও ঐক্যতানবাদ্যের (অর্কেস্ট্রা) সঙ্গে যুক্ত হয় ও শেষে এথেন্স নগরীতে আসে। এখানেই ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কমেডি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। সিটি ডাইনোসিয়াতে বৈকালে কমেডির অনুষ্ঠান হত। এইভাবে প্রাচীন কমেডির (Old Comedy) জন্ম হয়েছিল গ্রীসে। এই কমেডির শ্রেষ্ঠ রচয়িতা অ্যারিস্টোফেনিস হলেও তিনি এর জনক নন। তাঁর রচিত ৪০ খানি কমেডির মধ্যে যে এগারখানি মাত্র পাওয়া গেছে, তারই ওপর ভিত্তি করেই 'প্রাচীন কমেডি' সম্পর্কিত আমাদের যা কিছু ধারণা। এই কমেডিতে শোভাযাত্রীদের উদ্ভট, উচ্ছৃঙ্খল ও অশ্লীল আচরণ,

১. "The one (tragedy) orginating with the authors of the Dithyramb, the other (comedy) with those of the phallic songs". অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের Ingram By Water অনূদিত 'The Art of Poetry' থেকে Chap. IV, পৃঃ ৩১.

২. "Social satire became more established when crude form of Farce or mime was imported from sicily, where it attained some literary development in the works of the two poets, Epicharmus and Sophron" (জন গাসনারের লেখা 'Masters of the Drama, Dover Publications, পৃঃ ৮১).

রুচিবিগর্হিত গান ও নাচ, অদ্ভুত মুখোস ও সাজসজ্জা যেমন থাকত, তেমনি থাকত সমকালীন রাজনৈতিক ও দার্শনিক সমস্যার উপস্থাপনা। এ এক বিচিত্র উদ্ভট প্রদর্শনী যাতে নগরের সবচেয়ে নতুন মজাদার খবরের সঙ্গে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় বস্তুর সংমিশ্রণ, অতি নিম্নস্তরের ভাঁড়ামির সঙ্গে গভীর ভাবের সমন্বয়, অতি স্থূল হৈ চৈ-এর সঙ্গে মধুর সুরের সংযোগ এবং নাচ-গান হৈ হুল্লোড়ের মত্ততার সঙ্গে শ্লেষ-বিদ্রূপের আঘাত লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর হাস্যকর পোষাক, জীবজন্তুর মুখোসে কোরাসের আবির্ভাব, পায়ে ও গায়ে আঁটশাট ও মোটা পোষাক তো দেখা যেতই। উপরন্তু অত্যন্ত 'অভব্য' প্রজনন-শক্তির প্রতীক 'লিঙ্গদেহ'টিকে দর্শকদের কাছে দর্শনীয় করে তোলা হত। হাস্যরস সৃষ্টি করে দর্শকদের আমোদ-দান এর উদ্দেশ্য হলেও সমাজ ও ব্যক্তির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি-বিকৃতিকে আক্রমণও ছিল এর হয়তো গভীরতর অভিপ্রায়। আধুনিক কালেও আমরা যে নানা জাতের কমেডি দেখছি তার নানা উপাদানের মূল অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিতে যে লুকিয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। যে যৌন ধর্মানুষ্ঠান থেকে এর উদ্ভব তার বাস্তবতা কমেডিতে স্থান পেয়েছে; তাই নির্বোধ ও সাধারণ মানুষই এর উপজীব্য। এইজন্য কমেডিকারের দৃষ্টিভঙ্গী অ-বীরোচিত—অ্যারিস্টটলকে তাই বলতে হয়েছে "Comedy tends to represent the agents as worse than the men of Present day."[১] যৌন বিষয়ে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা কমেডিতে অতিরঞ্জন ও উৎকল্পনার স্থান করে দিয়েছে। এই কারণে অ্যারিস্টোফেনিসের এই 'প্রাচীন কমেডি' আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে ট্রাজেডি ও কমেডির সৃষ্টি, সেই অনুষ্ঠান-দেবতা ডায়োনিসাসের কথা মনে রেখে এই দুই প্রজাতির (Species) তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার। অনুমান করা চলে আদিম মানুষ ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি-জগতের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। শীতের প্রকৃতির ম্লান শ্রীহীন বিষণ্ণতা বসন্তে নবপ্রাণে নবরসে সঞ্জীবিত হয়েছে। শীত ও বসন্তের বছরে বছরে চক্রাকারে আবর্তন যেন জন্ম ও মৃত্যুর প্রতীক। দেবতা চিরতরে মরতে পারে না। দেবতারই কাহিনী যেন ঐ প্রকৃতি-জগতের পরিবর্তন-কাহিনীতে সংগুপ্ত। উর্বরাশক্তি তথা প্রজননশক্তির দেবতা ব্যাবিলনে 'তামমুজ', মিশরে 'ওসিরিস', এসিয়া মাইনরে 'অ্যাটিস, ফিনিসে অ্যাডোনিস আর গ্রীসে ডায়োনিসাস। গ্রীকদের কাছে ট্রাজিডি হচ্ছে এমন এক ধর্মানুষ্ঠান যেখানে ঐ দেবতার যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কথা কীর্তিত হয়—আর কমেডি ঐ দেবতারই পুনর্জন্ম ও পৃথিবীদেবীর সঙ্গে তাঁর গোপন বিবাহের কাহিনী। সুতরাং জীবনের অব্যাহত গতিকে মৃত্যুর পরেও বহমান করে রাখার ইঙ্গিত আছে কমেডিতে। ট্রাজিডিতে যে জীবনের অবসান, তারই সূচনা

---

১. Ingram By Water-এর অনূদিত 'Poetics'

কমেডিতে।[১] কিন্তু এর থেকে এমন মনে করা অনুচিত যে প্রত্যেকটি কমেডিতে প্রাচীন এই অনুষ্ঠানের মর্মবাণী স্পষ্টভাবে ঝঙ্কৃত হচ্ছে এবং সকল কমেডি রচয়িতা এই তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেই কমেডি লেখেন। তবে অনেক কমেডিতেই এই ধর্মোৎসবের তত্ত্বকথার ছাপ আভাসিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কমেডির সমাপ্তি সুখদায়ক হয়, অশুভ ব্যাপারটির রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে। এই অশুভ ব্যাপারটি নাটকীয় ঘটনায় ঘনীভূত হয়ে মৃত্যুরই (আক্ষরিকভাবে কখনই নয়) সামিল হয়ে ওঠে এক সময়, বিশেষ করে ট্রাজিকমিডিতে ; অথচ তার অবসানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সুর জেগে ওঠে। এই দিক থেকে ঐ ধর্মানুষ্ঠানের মৃত্যু ও মৃত্যু-অতিক্রান্তির ইঙ্গিত অনেক ট্রাজিকমিডিতে মেলে। ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত শীত-বসন্তের, জীবন-মৃত্যুর, বা উর্বরাশক্তি-বন্ধ্যাত্বের দ্বন্দ্ব অনেক কমিডিতে পিতা-পুত্রের ভাবগত সংঘর্ষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কমেডিতে তরুণ বা তরুণীর যদি মৃত্যুর ইঙ্গিত থাকে তাও কিন্তু কল্পিত, পরিশেষে পুনরাবির্ভাব দেখাতে হবেই।

আরও একটি দিক থেকে এই উৎসবের স্বাক্ষর কমেডিতে লক্ষণীয়। উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি কামনায় এই ধর্মোৎসবে অধিকাংশ পূজারী, নারী-সহবাস ও ভোগ্যবস্তু থেকে বিরত থাকতেন অন্তত কয়েকটা-দিন। মৃত দেবতার পুনরাবির্ভাবের কালটিকে যেদিন থেকে তারা গণনা করে, সেদিন থেকেই প্রচণ্ড মত্ততার মধ্যে যৌনমিলন ও ভোগ্যবস্তুতে তারা আবার লিপ্ত হয়। আধুনিককালে অনেক কমেডি তরুণ-তরুণীর বিবাহ-সংঘটনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এবং একটি নূতন প্রাণবন্ত সমাজের কথাই ঘোষণা করে। কখনো বা এই বিবাহ না দেখিয়ে কোনো এক বৃদ্ধের স্ত্রী বা কন্যাকে এক তরুণ কর্তৃক কৌশলে অপহরণের চিত্র দেখানো হয়। কোথাও বা কমেডির শেষে ভূরি ভোজনের ইঙ্গিত থাকে। মোটকথা সকল বন্ধন থেকে মুক্ত একটি আনন্দময় সমাজের আভাস যে অনেক কমেডিতে লক্ষ্য করা যায় তার মূলে এই ধর্মানুষ্ঠানেরই যেন গুপ্ত প্ররোচনা। দীর্ঘকাল ব্যবধানে লেখা আমাদের বাঙলা কমেডি থেকে আলোচিত বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডিতে পদ্মাবতীর জীবনে শচী ও মুরজার চক্রান্তে যে অশুভ মেঘ জমে উঠেছিল, তা এক হিসেবে মৃত্যুরই সামিল অথচ ঐ পদ্মাবতী যে মুরজারই অভিশপ্তা কন্যা—এই সত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুর্যোগ-অন্ধকার কেটে গেছে এবং অশুভ-শক্তি রূপান্তরিত হয়েছে শুভ শক্তিতে। মধুসূদনেরই প্রহসনধর্মী কমেডি 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কর্তাবাবুর সঙ্গে পুত্র নবকুমারের বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘটনার সূচনা। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ মিলিয়ে গেলেও মূল বিরোধ কিন্তু পিতা-পুত্রের আদর্শগত সংঘাত। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'য় সব চিরকুমারের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

১. 'Perspectives on Drama' গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় এল ক্যালডারউড ও হ্যারোল্ডের লেখা Introduction to Comedy প্রবন্ধ। পৃঃ ১৬৫-৬৭

য়ছে এবং নির্মলার সঙ্গে পূর্ণের, নৃপের সঙ্গে শ্রীশের এবং নীরার সঙ্গে বিপিনের
ণয় দেখিয়ে শেষে এক নবতর প্রাণপ্রাচুর্যময় সমাজের ইঙ্গিত করা হয়েছে। দীনবন্ধু
ত্রের প্রহসনধর্মী কমেডি 'সধবার একাদশী'তে অটলবিহারী তরুণী খুড়শাশুড়িকে
ৌশলে অপহরণ করেছে দেখতে পাই।

কিন্তু শুধু গ্রীসেই নয় ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করেই যে নাটকের উদ্ভব তা আমাদের
শেও লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখানে কমেডির কথাই বলছি, সুতরাং এ দিকে
ই রেখেই আমরা আলোচনা করতে চাই। জাতীয় ধর্মোৎসবের সঙ্গে নাট্য-উদ্ভবের
ম্পর্ক বিষয়ে আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে কোনো আলোকপাত করেন
।। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় ব্রহ্মাই নাট্যবেদের স্রষ্টা। ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য,
ামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে তিনি
াঞ্চমবেদ' বা 'নাট্যবেদ'-এর সৃষ্টি করেন। ভরতকে ব্রহ্মাই নাট্যবিদ্যা শিখিয়েছিলেন।
ন্দ্রের 'ধ্বজমহ' উৎসবে দৈত্যদের পরাজয় ও দেবতাদের বিজয়-কাহিনীর ইঙ্গিতবহ দৃশ্য-
থ্য কাব্যের অভিনয় ভরত তাঁর শতপুত্রদের নিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। এরপর বিশ্বকর্মা
চিত প্রেক্ষাগৃহে ভরতের 'অমৃতমন্থন'-এর অভিনয় হয় ও পরে হিমালয়ে শিবের সম্মুখে
নরায় 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' এর অভিনয় তাঁরই প্রযোজনায় ও অংশগ্রহণে সম্পন্ন
য়।[১] ভরতের আলোচনায়-এর বেশী কিছু তথ্য মেলে না। শুধু জানা যায় 'নাট্যবেদ'
চনা কালে চারটি বেদ থেকেই উপাদান গ্রহণ করা হয়েছিল। 'The Sanskrit
)rama' গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক কীথ বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নাট্যসৃষ্টির উপাদান
ওটুকু ছিল তার চমৎকার আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁরও পূর্বে ম্যাক্সমূলার
প্রথম ঋগ্বেদের সূত্রগুলিতে নাট্য-উপাদান কেমন ছিল, তা দেখাবার চেষ্টা করেন।[২] এ
ঙ্গে বৈদিক 'মহাব্রত' অনুষ্ঠানের কথাই আমরা বিশেষভাবে বলব। এই অনুষ্ঠানে
গ্নিষ্টোমযজ্ঞের প্রয়োজনে সোম ক্রয় করা হত। অনুষ্ঠানটি যেদিন শেষ হত, সেদিন একজন
সোম-বিক্রেতাকে তার বিক্রীত সোমের মূল্য না দিয়ে প্রহার করে বিদায় করা হত।
াছাড়া এই উৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এতে একখণ্ড গোল সাদা চামড়া
য়ে একজন বৈশ্য ও শূদ্রের লড়াই হত। শূদ্রের রঙ হত কালো আর বৈশ্যের সাদা।
শেষ পর্যন্ত শূদ্র পরাস্ত হত।

এই বিষয়টিকে অধ্যাপক কীথ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে গ্রীসে নাট্যোৎপত্তির
ঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য অনুভূত হয়।[৩] এখানে গোল সাদা রঙের চামড়ার খণ্ডটি হল
ষ্ণ, শূদ্র হল অন্ধকার। আলোর উৎস সূর্যকে আর্যেরা লাভ করতে চাইছে অন্ধকারের
তীক শূদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে। আর্য-শূদ্রের এই বিরোধকে বসন্ত-শীতের বিরোধও

১. ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়।

২. ম্যাক্সমূলারের কথা কীথ তাঁর The Sanskrit Drama গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই বলেছেন
পৃঃ ১৫।

৩. A. B. Keith-এর লেখা The Sanskrit Drama গ্রন্থের Dramatic elements in Vedic Ritual. পৃঃ ২৪

মনে করা যায়। শীতের সূর্য ম্রিয়মান, তার শক্তিবৃদ্ধির কামনাতেই এ অনুষ্ঠান। সূর্য পূর্ণশক্তিতে আবির্ভূত হয়ে ধরিত্রীকে করবে শস্যশ্যামলা। এই উৎসবের সঙ্গে আরও একটি কৌতুককর কাহিনী যুক্ত ছিল—একটি ব্রাহ্মণ ছাত্রের সঙ্গে এক গণিকার কলহ। এই কলহের ভাষা ছিল রুচিবিগর্হিত, অত্যন্ত অশ্লীল এবং এই কলহের পর যৌনক্রিয়াও আবশ্যিক ছিল উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে।[১] সংস্কৃত নাট্যসৃষ্টির পশ্চাতে এ কাহিনীর তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখানে ট্রাজিডি সৃষ্ট না হওয়ায় এর আলোকে সম্পূর্ণ চক্র (cycle) টিকে লক্ষ্য করা কঠিন।

এর অনেক পরে সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি। ইংরেজিতে আমরা যাকে Tragedy বলি সংস্কৃত নাটকে তার নিদর্শন নেই। কমেডি অবশ্য আছে—কিন্তু পাশ্চাত্যের কমেডির মধ্যে হাস্যরসের যেমন একটা প্রধান স্থান, সংস্কৃত নাটকের কমেডিগুলিতে কিন্তু তা নয়। সংস্কৃত প্রহসনের অঙ্গীরস হাস্যরস। কিন্তু সংস্কৃত প্রহসনগুলির যে বিভাগ রয়েছে, তাতে সকল শ্রেণীকেই কিন্তু কমেডি আখ্যা দেওয়া যায় না। অধ্যাপক কীথ[২] সংস্কৃত দশরূপক এর মধ্যে পাঁচ থেকে দশ অঙ্কে সমাপ্ত প্রকরণকে বলেছেন 'বুর্জোয়া কমেডি' বা 'কমেডি অব ম্যানার্স' আর 'প্রহসন'কে বলেছেন ফার্সের সগোত্র। অথচ অধ্যাপক নিকল সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রসিদ্ধ নাটক-প্রকরণগুলির অধিকাংশকে রোমান্টিক ট্রাজি-কমিডি বলেছেন, 'World Drama' গ্রন্থে। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য আদর্শ-সম্বলিত ট্রাজেডি রচিত না হওয়ার কারণ ইঙ্গিত করে শেষে তিনি বলেছেন—"The result is that nearly all the play produced on the Indian stage belong to what we should call romantic tragi-comedy, of a strongly poetic, even lyrical tone." গম্ভীর এবং বেদনাময় দৃশ্য এগুলিতে আছে কিন্তু তার সুর নম্র; হাস্যকর দৃশ্যও আছে, কিন্তু বাস্তবতা বহুলাংশে আবৃত। এগুলির সঙ্গে শেক্সপীয়রের 'সিম্বেলিন' 'এ উইন্টার্স টেল' ও 'দি টেম্পেস্ট'-এরই সাদৃশ্য আছে বলে অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্ত। একথা ঠিক যে প্রণয়-চিত্রের পটভূমিকা সৃষ্টিতে এবং গাঢ়তর রোমান্সের আবহাওয়া সৃষ্টিতে আমাদের কালিদাস অতুলনীয়—তাঁর চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়। ভবভূতির নাটকে কালিদাসের তুলনায় বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে তিনিও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

খ্রীস্টানদের নাট্যসৃষ্টির পশ্চাতেও এইরূপ জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট লক্ষ করা যাবে। এঁদের দেবতা হলেন খ্রীস্ট। খ্রীস্টের ঈস্টার উৎসব ও খ্রীস্টমাস উৎসবকে কেন্দ্র করে লিটারজিক্যাল প্লে ও মিস্ট্রি প্লের সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যযুগের খ্রীস্টান জগতে। বাইবেলের অন্তর্গত যিশু খ্রীস্টের আত্মোৎসর্গ ও নবজীবনলাভের কাহিনী ছিল এগুলির প্রেরণাস্থল। খ্রীস্টভক্ত সাধু-সন্তদের অলৌকিক জীবনচরিত নিয়ে মধ্যযুগেই দেখা দেয় 'মিরাকেল প্লে'।

---

১. ঐ গ্রন্থেই কীথ বলেন—'In the older form of the ritual we actually find the sexual union as a fertility rite is permitted'. পৃঃ ২৫

২. ঐ গ্রন্থেই কীথ পৃঃ ৩৪৫

মিস্ট্রি প্লে থেকেই আবার আর একটি ধর্মমূলক শাখার উদ্ভব ঘটে, এর নাম 'মরালিটি প্লে'। এ অনেকটা রূপক জাতীয় নাট্য। এর থেকেই এল ছোট্ট নাটিকা 'ইন্টারলুড'। ধীরে ধীরে তাতে ফার্সের উপাদান প্রবেশ করল—শুধুমাত্র আমোদ দান করাই হল এর উদ্দেশ্য। আর সাধুসন্তদের অলৌকিক জীবন-মহিমা-কেন্দ্রিক 'মিরাকেল প্লে' দ্রুত রোমাঞ্চকর 'রোমান্টিক নাটক'-এর জন্ম দিয়েছে।

বাঙলা কমেডি ঃ

দেশীয় যাত্রা, সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজি নাট্যাদর্শের সম্মিলিত প্রেরণা বাঙলা নাটক-সৃষ্টির মূল। বাঙলা নাটকের একেবারে প্রাথমিক যুগে পুরোপুরি পাশ্চাত্য আদর্শ-গ্রহণ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের রূপ-রীতির দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। পাশ্চাত্যের কমেডি-রচনার উদ্ভব ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের যেমন সুস্পষ্ট স্তর আছে, বাঙলা কমেডি-রচনার ক্ষেত্রে তার একান্তই অভাব। হাস্যরসাত্মক, আক্রমণাত্মক নিম্নশ্রেণীর প্রহসন বাঙলা নাট্যসৃষ্টির সূচনায় যত বেশী লেখা হয়েছে তুলনায় কমেডির সংখ্যা অনেক কম। 'প্রণয়'কে মূল উপজীব্য করে তারাচরণ সিকদার সর্বপ্রথম অনেকখানি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রোমান্টিক ট্রাজি-কমিডি 'ভদ্রার্জুন' লেখেন। এইটি প্রথম বাঙালী নাট্যকারের কমেডি-রচনার প্রয়াস। কিন্তু বাঙালা কমেডি-উদ্ভবের ইতিবৃত্তের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রেরণা অনুসন্ধান করা মূঢ়তা। বরং 'যাত্রা'র উদ্ভব ইতিহাসের মধ্যে ঐ প্রেরণা যে প্রচ্ছন্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও দেবতার জন্ম ও মৃত্যুর রূপক আরোপের প্রশ্নটি অবান্তর।

কমেডির সংজ্ঞা ও তার লক্ষণ ঃ

বহুকাল পূর্বে অ্যারিস্টটল কমেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করেই এ আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "As for Comedy, it is (as has been observed) an imitation of man worse than the average; worse however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous, which is a species of the ugly."[১] অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা থেকে কমেডির লক্ষণগুলি এইভাবে বলা যেতে পারে—

ক. কমেডি হল সাধারণ মানুষের থেকে নিম্নতর মন্দ মানুষের জীবনবৃত্তের অনুকরণ;

১. The Art of Poetry ইনগ্রাম বাইওয়াটারের অনূদিত পঞ্চম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩৩

খ. এখানে 'মন্দ' বলতে মানুষটি যে নানা রকম দোষে দোষী একথা বলা হচ্ছে না—

গ. শুধুমাত্র তার একটি দোষের কথাই বলা হচ্ছে—যা হাস্যোদ্দীপক এবং কুৎসিতেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র।

ঘ. অ্যারিস্টটল এই সংজ্ঞার পরে 'Ridiculous' শব্দটির আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এর অর্থ ভ্রান্তি বা অঙ্গবিকৃতিও করা যেতে পারে এবং তা কখনই ক্ষতিকারক নয়।[১] অ্যারিস্টটল মিনাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ কমেডিগুলি দেখবার সুযোগ পান নি। শুধুমাত্র অ্যারিস্টোফেনিস বা তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের কমেডিগুলি দেখেই এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন। অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিগুলিতে ত্রুটি-বিকৃতিময় চরিত্রের উপস্থাপনার সাহায্যে এক উদ্ভট জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এ কমেডি অনেকটা রাজনৈতিক চরিত্রধর্মী। অবাস্তব, অতিরঞ্জিত টাইপ চরিত্র ও বৃত্ত নিয়ে এর কারবার-এবং এতে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার উদ্দাম লীলা। এতে অশ্লীলতা আছে, সমাজ-সমালোচনা তথা বিদ্রূপ আছে আবার উচ্চাঙ্গের চিন্তা-ভাবনাও আছে। অ্যারিস্টটল যখন কমেডির সংজ্ঞা দিলেন, যখন অ্যারিস্টোফেনিসের সব বৈশিষ্ট্যকে মনে রাখেন নি। দার্শনিক অনেকখানি স্বাধীনভাবেই তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে জানা যাচ্ছে, তিনি কমেডিকে খুব উচ্চস্তরের রচনা মনে করেন নি; হাস্যরস সৃষ্টি করাই হবে কমেডির প্রধান লক্ষ্য। এতে যে-চরিত্র হাস্যাস্পদ তার কোনো দোষ ত্রুটি বা বিকৃতিই হবে ঐ হাস্যরসের কারণ—কিন্তু সেই ত্রুটি-বিকৃতি ক্ষতিকর নয়, অর্থাৎ সমাজের ভাল-মন্দের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং কমেডিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা সমাজ-সংশোধনের কোনো সচেতন অভিপ্রায় থাকবে না।

অ্যারিস্টটল কমেডির কোনো আয়তন নির্দিষ্ট করে দেন নি। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্রাজিডির আলোচনায় তাঁর কমেডি সম্পর্কে আরও একটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে[২] জানা যায় যে কমেডির শেষে কোনো মৃত্যুর ব্যাপার থাকবে না, পরম শত্রুও বন্ধুভাবে মঞ্চত্যাগ করবে। সুতরাং অনুমান করা যায়, কমেডির বৃত্তে যদি বিরোধ ঘনীভূত হয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, তাহলেও সেই আবহাওয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে যথার্থ মিলনাত্মক সমাপ্তি হয়। সুতরাং ব্যক্তি-আক্রমণমুক্ত অপেক্ষাকৃত নিম্নচরিত্রাশ্রয়ী, বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক মিলনান্ত বৃত্তের রূপায়ণই যে কমেডি—অ্যারিস্টটলের বক্তব্য থেকে এই সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি।

অ্যারিস্টটল-পরবর্তীকালে গ্রীসে, রোমে, ইতালীতে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে কমেডির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ প্রচুর কমেডি লেখা হয়েছে এবং

---

১. ঐ গ্রন্থের পৃঃ ৩৩ এ অ্যারিস্টটল বলেন—"The Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productivity of pain or harm to others."

২. Aelius Donatus-এর মন্তব্য De Commoedia at Tragoedia প্রবন্ধ

নাট্যতত্ত্ববিদ ও নাট্যকারেরা এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান চিন্তাও করেছেন। অ্যারিস্টোফেনিসের পরে মিনাণ্ডার ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারেরা অ্যারিস্টোফেনিসের মতো ব্যঙ্গাত্মক কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ ও রাজনৈতিক বিষয়পূর্ণ কমেডি লিখলেন না। পরিচিত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দিকে তাকিয়ে গার্হস্থ্যজীবনকে বিষয় করে ব্যঙ্গমুক্ত স্নেহ-প্রেমের জটিল মিলনান্ত বৃত্ত কমেডিতে তাঁরা নিয়ে এলেন। অট্টহাস্য নয়, স্মিতহাস্যই এখানে বড় হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে যে রোমান্টিক কমেডি বা রোমান্টিক ট্রাজি-কমিডি সৃষ্ট হয়েছে, এখানেই তার মূল। আরও পরে রোমের প্লটাস (Plautus) মিনাণ্ডারের ভাবাবেগময় বাস্তবতা, ল্যাটিন ফার্স ও 'মাইম' এর বাস্তবতা, ভাঁড়ামি এবং প্রাচীন 'বারলেস্কে'র বিদ্রূপ ও হাস্যকে মিশ্রিত করে কমেডি লিখলেন। টেরেন্স বুদ্ধিজীবীদের দিকে লক্ষ্য রেখে মিনাণ্ডারকে আদর্শ করে কমেডির আর এক জগৎ সৃষ্টি করলেন। এখানে সব কিছু মার্জিত ও কোমল; ভাঁড়ামির প্রশ্রয় নেই নীতিকথার উপদ্রব নেই, অট্টহাস্য নেই—আনন্দোপভোগের জন্যে একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনা করে মার্জিত, রোমীয় ভদ্র তরুণদের জীবনবৃত্তকে তিনি উপস্থাপিত করলেন। তাঁর Adelphi (Brothers) কমেডিটি আধুনিক সমস্যামূলক নাটকের উৎস। এর অনেক পরে এলেন শেক্সপীয়র তাঁর অপরূপ রোমান্টিক কমেডি ও ট্রাজি-কমিডি নিয়ে—বেন জনসন এলেন বিদ্রূপাত্মক কমেডি নিয়ে ইংলণ্ডে, স্পেনে এলেন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে লোপ ডি ভেগা ও ক্যালডেরণ, ফ্রান্সে বিশ্বখ্যাত মলিয়ের সপ্তদশ শতকে; এই শতকেই ইংলণ্ডে রেস্টোরেশন যুগে দেখা দিলেন জন ড্রাইডেন, স্যাডওয়েল, জর্জ এথিরীজ, ওয়েচার্লি ও কনগ্রীভ—কমেডি রচনার এক বিপুল বন্যা। ফলে এর সংজ্ঞা ও লক্ষণ সম্পর্কে নানা দিক থেকে চিন্তা চলতে থাকল। কেউ বললেন কমেডি হল ব্যক্তিগত আচার-আচরণের শিক্ষামূলক কাহিনী;[১] কেউ বললেন, এর সূচনা হয় অশুভ এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কিন্তু এর বৃত্ত সুখ-পরিণাম লাভ করে ও সুর হয় আগাগোড়া নম্র। কারো মুখে[২] নূতন কথাও শোনা গেল। বলা হল, কমেডি যেমন সুখ-পরিণামী হতে পারে, তেমনি বেদনান্তকও হতে পারে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সপ্তদশ শতকের ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই বললেন যে, যে-কমেডিতে নায়কের মৃত্যুর ভয় নেই, অবস্থা-বিপর্যয়ের বা নির্বাসনের দুশ্চিন্তা নেই অথচ ঘটনার গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আছে তাকে সাধারণ কমেডি থেকে পৃথক করে 'হিরোইক কমিডি' বলা উচিত। হেগেল যে দ্বন্দ্ববাদের সূচনা করেছিলেন তারই সূত্র ধরে কেউ[৩] ট্রাজিডি ও কমেডি বা নাটকের সকল শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অনুসন্ধান

---

১. মহাকবি দান্তের একখানি চিঠিতে (Epistle to Congrande) মন্তব্য

২. ষোড়শ শতকের ইতালীয় নাট্যতত্ত্ববিদ কস্টেলভেট্রো।

৩. হেগেল, তাঁর 'Aesthetics' এ, তাঁরই শ্লেগেলের Lectures on Dramatic Art and Literature ও ফার্ডিনান্ড ব্রুনেতিয়েরের 'The Law of the Drama' প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

করলেন। নায়ক যে বাধার মুখোমুখি হয় নাটকে, সেই বাধার প্রকৃতি অনুযায়ী নাটক ট্রাজিডি, মেলোড্রামা, কমেডি বা ফার্স হয়। কমেডিতে নায়ক তার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সচেতনভাবে যে-ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত, তার বিরুদ্ধ বাধাটি যদি অনতিক্রম্য না হয়, তাহলেই তা কমেডি। আর অনতিক্রম্য হলেই ট্রাজিডি।

একালের কেউ কেউ যেমন আর ডাবলিউ কোরিগান সেই অ্যারিস্টটলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন[১]—যে গুরুগম্ভীর ও উদ্ভট রাজ্যের মাঝখানেই কমিডির আসন। অ্যারিস্টটলের 'Ludicrous' শব্দটি এই স্থানটিরই ইঙ্গিতবহ। কমেডিতে চরিত্রমহিমা, নীতিবোধপীড়ক ঘটনা এবং বেদনাদায়ক পরিণতি থাকবে না।[২]

নরথ্রোপ ফ্রাই বললেন স্যাটায়ার ও রোমান্সের প্রভাবেই কমিডির সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝখানেই তার স্থান।

যাঁরা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কমেডির সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন তাঁদের একজনের[৩] মত হল ট্রাজিডিতে পুত্রের যে অপরাধবোধ তাই কমেডিতে বিপরীতভাবে পিতার অপরাধ হয়ে দেখা দেয়। মাতার প্রতি আকর্ষণ ও অধিকার নিয়ে পুত্র-পিতার কলহে এখানে পুত্রই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। এখানে এক নারী ও দুই পুরুষ-সম্বলিত বৃত্তে এক-জনকে মাতা, একজনকে পিতা ও অপরজনকে পুত্ররূপে ধরে নিতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু কমেডির ক্ষেত্রে এই উক্তির-সত্যতা লক্ষ্য করা গেলেও অনেক কমেডিতে এই সূত্র-প্রয়োগ কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের মনোভঙ্গীর কথা মনে রেখে রিচার্ড ডুপ্লে সার্থক কমেডির পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন যে জগৎ সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণের ফল হল কমেডি। কমেডি রচয়িতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। দূর থেকে নিরপেক্ষভাবে তিনি জীবনচক্রে, আন্দোলিত ঘূর্ণায়মান মানুষকে দেখেন। নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের ভুল-ত্রুটি, তার অর্থহীন অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রচলিত সমাজ বা জীবনাদর্শ থেকে তাদের বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন। এ সকলের জন্যে তাঁর চিত্তে কোনো গভীর বেদনা নেই। অথচ এই নিরীক্ষিত জীবনচিত্রগুলি তিনি কমেডিতে উপস্থাপিত করে দেখাতে চান তাঁর সহকর্মীদের কি করা উচিত বা কি হওয়া উচিত।[৪] কমেডি-স্রষ্টার দৃষ্টি-

---

১. "Comedy operates in that middle zone betweem the serious and the absurd which Aristotle called the ludicrous"—Comedy; Meaning and Form গ্রন্থে Robert. W. Corrigan-এর Introduction P. 7.

২. Comedy lies between Satire and Romance—'Perspectives on Drama গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের Introduction to Comedy' প্রবন্ধ পৃঃ ১৬৭

৩. Comedy: Meaning and Form গ্রন্থের On the Psychology of Comedy প্রবন্ধ Ludwig Jekels লিখিত।

৪. উক্ত গ্রন্থের Richard Dupleyর লেখা whatever happened to Comedy প্রবন্ধ

ভঙ্গীটি এখানে সুন্দরভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে—কিন্তু একটি বিশেষ আয়তনে রচিত 'কমিডি' নামক প্রজাতিটির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা নেই।

এবার একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক এলারডাইস নিকলের বক্তব্য লক্ষণীয়। ট্রাজিডি ও কমেডির ভেদ নিরূপণে মাঝে মাঝে যে দুরূহতা সৃষ্টি হয় সে কথা মনে রেখেও তিনি তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থের 'Comedy' অধ্যায়ের নানাস্থলে বিক্ষিপ্তভাবে কমেডির যে সব লক্ষণের কথা বলেছেন—সেগুলি আমরা এইভাবে নির্দেশ করতে পারি।

(ক) কমেডিতে সাধারণতঃ কোনো নায়ক চরিত্র থাকে না; কতকগুলি চরিত্রের পাশাপাশি উপস্থাপন হাস্যরসের হেতু হয়। (খ) কমেডিতে কোনও বিশেষ শ্রেণীর একটি বা কতকগুলি টাইপ চরিত্র থাকে। টাইপ বা শ্রেণী চরিত্র আশ্রয়ের কারণ হল আবেদনের সর্বজনীনতা। (গ) হাস্যাস্পদ চরিত্রগুলি এতে দলবদ্ধভাবে বা জোড়ায় জোড়ায় দেখা দেয়। সাধারণত একটি বা একাধিক হাস্যাস্পদ চরিত্র এতে থাকলেও আরও কয়েকটি স্বাভাবিক চরিত্র থাকে, যাদের সঙ্গে বৈপরীত্যে প্রথমোক্ত চরিত্রগুলির অসঙ্গতি বা ত্রুটি ভালভাবে পরিস্ফুট হয়। (ঘ) কমেডিতে সমাজের অন্তত একটা দিকের চিত্র থাকে। শ্রেষ্ঠ কমেডিতে যুগের চিত্র প্রতিফলিত হলেও তা বৃহত্তর মানবসমাজের সার্বজনীন চিত্র হয়ে ওঠে। (ঙ) ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর সূত্র অনুসরণ করে নিকল বলেছেন কমেডিতে দর্শকেরা অনুভূতিশীল নয়। অনুভূতির সঙ্গে নীতিবোধের আছে আত্মিক সম্পর্ক, আর নীতিবোধ সমস্যার আকারেই ব্যক্ত হয়; সেইজন্য কমেডিতে কোনও সমস্যা থাকে না। (চ) আবার বের্গসঁর কথায় কমেডিতে হাস্যাস্পদ টাইপ চরিত্র বা চরিত্রগুলি অসামাজিক—কারণ হাসি এমন একটা সামাজিক ব্যাপার যা একা নয়, সকলেরই সঙ্গে উপভোগ্য। টাইপ-চরিত্রের যে উৎকেন্দ্রিকতা অসামাজিক, তাই হাস্যরসের কারণ। (ছ) সাধারণত কমেডির বিষয়বস্তু হয় প্রেম এবং এতে চিরন্তন পুরুষ ও চিরন্তনী নারীর সম্বন্ধ দেখানো হয়। (জ) সাধারণ মানুষের অতিপরিচিত এলাকাতেই কমেডির মানুষদের বিচরণ—সেইজন্য এখানে বাস্তবতাও থাকে অনেক বেশী। (জ) এর উপসংহারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়ার কথা বা মিলনদৃশ্য থাকে।

কমেডির বহু লক্ষণের কথা এবং নানা শ্রেণীর কমেডির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলেও নিকল Pure বা 'বিশুদ্ধ কমেডি'র লক্ষ্য যে হাস্যরস-সৃষ্টি, এ কথায় জোর দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য আমরা কমেডিতে হাসিরই সন্ধান করি, সেখানে নৈতিক ন্যায়-অন্যায় উদ্দেশ্যমূলকতা বা অন্য কিছু চাই না।[১] নাটকের এগারো রকমের শ্রেণীবিভাগ করে

১. "It is the laughter we look for in Comedy, not the sense of moral right or of moral wrong, not the purpose or the significance of the play,"—এ. নিকলের The Theory of Drama পৃঃ ১৯৩

শেষোক্ত শ্রেণীতে তিনি সেই সব কমেডিগুলিকে স্থান দিয়েছেন যেগুলির উপসংহারে সুখ এবং বিষয়বস্তু ও সংলাপে হাস্যকরতা। আর এগুলির আলোচনায় মনোযোগী হয়ে তিনি হাস্যরসের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করে পারেন নি।

কমেডি সম্বন্ধে নানাজনের চিন্তা-ভাবনার কথা বলা হল। কমেডি যে জীবনের বা সমাজের নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি-বিকৃতির হাস্যকর ও আনন্দদায়ক রূপায়ণ এ বিষয়ে অনেকে একমত। কমেডিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থাকতে পারে এবং সমাজ-সংশোধন কামনাও থাকতে পারে—কিন্তু তা যেন হাস্যরসকে ছাড়িয়ে অর্থাৎ আমাদের মানসিক অনুভবকে অতিক্রম করে হৃদয়ের স্তরে কোনো নীতিবোধকে বা সংবেদনশীলতাকে জাগ্রত না করে। অর্থাৎ ব্যঙ্গের জ্বালাও যেন উপভোগ্য হয়। মিলনান্ত পরিণাম কমেডির একটা প্রধান শর্ত। কিন্তু অনেক ট্রাজিডিও মিলনান্ত বা আপাতসুখাবহ (happy ending) হয়। সুতরাং মিলনান্ত পরিণামটুকু দেখেই কোনো নাট্যরচনাকে কমেডি বলা চলবে না। কমেডির বৃত্ত, চরিত্র ও সংলাপ এই তিন দিকেই নজর দিতে হবে। সমগ্র নাট্যদেহে কমিক পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়েছে কিনা এবং তার সঙ্গে নাটকটির মিলনান্ত পরিণাম সুসমঞ্জস কিনা দেখতে হবে। প্রশ্ন উঠবে, অনেক গুরুগম্ভীর নাটকে কমিক পরিমণ্ডলটি গড়ে তোলার বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় না অথচ তার পরিণাম মিলনান্ত। এক্ষেত্রে তাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হবে? উত্তরে বলা যায় প্রথমেই দেখতে হবে এই ধরনের নাটকে মোটামুটিভাবে একটা রোমান্সের পরিবেশ আছে কিনা এবং নাটকটির প্রধান পাত্র-পাত্রীদের জীবনের সংকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ট্রাজিডির সীমানা স্পর্শ করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস্য পথে মিলনান্ত হয়েছে কিনা। এমন হলেই একে রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডি[২] বলতে হবে। আর যদি ঐ সংকট গুরুত্বপূর্ণ না হয়, বাধা বা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার সহজ সম্ভাবনা থাকে এবং প্রধান চরিত্রগুলি যুগপৎ মানস ও কতকটা হৃদয়দ্বারে উপভোগ্য হয়, তাহলে তাকে শুধু রোমান্টিক কমেডি বলতে হবে। অবশ্য এখানেও রোমান্টিক পরিমণ্ডলটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাস্তবের সঙ্গে তার সমন্বয়ের চেষ্টা নাটকটির মধ্যে থাকা দরকার। যদি ঐ গুরুগম্ভীর মিলনান্ত নাটকটিতে চরিত্রগুলি শ্রেণী-চরিত্র না হয়ে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয় এবং প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বজনিত কোনো সমস্যা বা আধুনিক জীবনের কোনো সমস্যা তাতে মুখ্য স্থান লাভ করে তাহলে তাকে 'ড্রেম' বলতে হবে। আমাদের মতে রোমান্টিক ট্রাজি-কমিডিগুলি বা নিছক ট্রাজি-কমিডিগুলিই প্রকৃতপক্ষে serious বা high comedy. ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী নাট্যকার দিদেরো (Diderot) একটি প্রবন্ধে নাটকের শ্রেণীবিভাগকালে চারটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেন, (ক) Gay Comedy, (খ) Serious Comedy, (গ) Domestic tragedy ও (ঘ) Tragedy

২. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

of the great. এইখানেই তিনি 'serious comedy' কে স্বীকৃতি দেন। Pity ও Sympathy বা করুণা ও সমবেদনা জাগ্রত করবে এই ধরনের কমেডি এমন কথাও দিদেরো বলেছিলেন। কিন্তু কমেডি কখনো এই দুই ভাব জাগ্রত করে না। সুতরাং serious Comedy বলতে তাঁরা যা বুঝেছিলেন, তা কখনই কমেডি নয়। তবে যেখানে রোমান্সের আবহাওয়া নেই, কোনো সমস্যা নেই, হাস্যরসোদ্রেককরও কিছু নেই, চরিত্রগুলো টাইপ এবং মোটামুটিভাবে জীবনের এমন একটা বৃত্ত, যা গহন-গম্ভীর নয়, লঘুতরলও নয়, অথচ মিলনান্ত তাকেই বিশেষ ক্ষেত্রে serious কমেডি বলা যেতে পারে। কিন্তু কমেডির উপসংহার বেদনাদায়ক হয়—এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কমেডির ও ট্রাজিডির ভেদকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করে দিয়ে এবং জীবনে হাসিকান্নার দ্বন্দ্বের সহাবস্থানের সূত্রে একই নাটকে দুইকে স্থান দিয়ে কমিক পরিবেশকে নাটকে বজায় রেখে শেষে যন্ত্রণাকাতর মানুষের চিত্র দেখানো যেতে পারে। একমাত্র 'অ্যাবসার্ড কমেডি'তেই এর দৃষ্টান্ত মিলবে; কিন্তু মনে রাখা উচিত, 'অ্যাবসার্ড নাটকে'র রচয়িতৃগণ ট্রাজিডি ও কমেডির ভেদই স্বীকার করেন না।[১] যাই হোক এ পর্যন্ত এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে কমেডির বিষয়বস্তু বা চরিত্রের মধ্যে হাস্যের উপাদান থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যেখানে থাকে সেখানে 'বিশুদ্ধ কমেডি' আর যেখানে, হাস্য মৃদু বা হাস্য প্রসন্নতার নামান্তর, পরিবেশ রোমান্টিক ও প্রেম সাধারণত মুখ্যবস্তু সেখানে রোমান্টিক কমেডি; যেখানে হাস্য নয়, প্রসন্নতা বেদনার মেঘে সমাচ্ছন্ন ও পরিশেষে প্রসন্নতা, সেখানে রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডি বা শুধু ট্রাজি-কমেডি; যেখানে হাস্যও নেই প্রসন্নতাও নেই, অথচ নাটক মিলনান্ত সেখানেই কমেডি serious বা গম্ভীর।

কমেডি বৃত্ত-বিহীন নিশ্চয়ই নয়। রোমান্টিক কমিডিতে ও ট্রাজি-কমিডিগুলিতে সুস্পষ্ট ও বেশ সংহত বৃত্তই থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর কমিডির বৃত্ত অনেকখানি শিথিল। কমেডির বৃত্ত ট্রাজিডির মতো সুসংহত ও কার্যকারণসূত্রে সুগ্রথিত না হলেও নাট্যকার্যের বীজবপন, জটিলতা অগ্রগতি, চূড়ান্ত অবস্থা, ধীর অবরোহণ ও সমাপ্তি এই পর্যায়গুলির মধ্যে অন্তত বীজবপন, চূড়ান্ত অবস্থা, ও সমাপ্তি থাকা দরকার। রোমান্টিক কমেডি-গঠনের একটা নির্দিষ্ট ছক আছে। নাট্যকার্যের সূচনায় নায়ক-নায়িকার অনুরাগের বীজ বপন করা হয়। পরে একটা বাধা তাদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে এবং বৃত্তটি তখন অনেকখানি দ্বন্দ্বাত্মক রূপ নেয়। ঐ বাধা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে একটা সংকট-জাল রচনা করে—তারপর একটা বিপরীতমুখী চাপে ঐ সংকট-জালকে ছিন্ন করা হয়—

---

১. Ionesco বলেন—"Personally, I have never undersood the distinction that are made between the Comic and tragic"—Perspectives on Drama গ্রন্থে E. D. Leyburn লিখিত 'Comedy and Tragedy Transposed প্রবন্ধে উদ্ধৃত পৃঃ ১৭৮

আপাত পরাজয়ের মধ্য থেকে নায়ক-নায়িকার তখন জয় ও মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। বাঙলা বহু নাটক মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' অমৃতলালের 'খাসদখল,' রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' প্রভৃতি কমিডিতে বৃত্ত-গঠনের এই রীতি মোটের ওপর অনুসৃত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ কমেডি স্রষ্টা অ্যারিস্টোফেনিস কোন্ সুদূর অতীতে যে-কমেডিগুলি লিখেছিলেন আশ্চর্যের বিষয় সেগুলিতে পরবর্তীকালের সকল শ্রেষ্ঠ কমিডির উপাদানগুলি, প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে দেখতে পাই। অ্যারিস্টোফেনিসের ব্যঙ্গ, সূক্ষ্ম কবিকল্পনা, বাস্তবতা, হাস্যোদ্দীপকতা, সমাজ ও রাষ্ট্রসচেতনতা—সমস্তই পরবর্তী-কালে শ্রেষ্ঠ কমিডি লেখকদের মধ্যে নানাভাবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর প্রয়োগপদ্ধতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এঁদের হাতে উজ্জ্বল হয়েছে, তাঁর বহু উপাদানের মধ্যে এঁরা যে সব-গুলিই গ্রহণ করেছেন তা নয়—কারো মধ্যে একটি কারো মধ্যে একাধিক লক্ষণ সূক্ষ্মতর হয়েছে। বস্তুতপক্ষে আজ শ্রেষ্ঠ কমিডি লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা যে জগতের সন্ধান পাচ্ছি, তাতে এটুকু বলা যেতে পারে যে এ জগতে মানুষের ভবিষ্যৎ-ভাবনা নেই, ব্যথার দীর্ঘশ্বাস নেই। যে সব মানুষ জীবনে সঙ্গতি হারিয়েছে—একটু বেশী যাত্রায় কোনো বৃত্তির অধীন হয়ে পড়েছে—যারা ভদ্র, প্রতারক, ফন্দীবাজ, উৎকেন্দ্রিক, অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ—যারা আত্ম প্রবঞ্চিত, অহমিকায় স্ফীত, উদ্ভট চিন্তায় মশগুল—যারা নিজবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারে না এবং যারা মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কের সহায়ক অলিখিত নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে বসে, যুক্তি ও ন্যায়-বিচারকে পদদলিত করে—তাদেরই ভিড় এ জগতে। এদের প্রতি কমেডি-স্রষ্টার মনোভাব কেমন? বিশ্ববিখ্যাত কমেডি লেখক জর্জ মেরিডিথের কথায় বলা যাক—"The spirit overhead will look humanely malign and cast an oblique light on them followed by volleys of silvery laughter. That is the comic spirit."[১]

ড্রেম (Drame) ও বিশুদ্ধ কমেডি: 'ড্রেম' নামে এক শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। দিদেরোর (Diderot) বুর্জোয়া নাটকের (Le drame bourgeois) এর মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভিক্টর হুগোর রোমান্টিক ড্রেমের এবং তাঁর সমকালীন রচিত বেশ কিছু নাটকে এই শ্রেণী চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। গুরুগম্ভীর নাটক যা সাধারণত কিছু কমিক-উপাদান মিশ্রিত এবং ক্লাসিক্যাল ট্রাজিডির সুরগত ঐক্যের যা বিরোধী তাই হল ড্রেম।[২]

---

১. জন গ্যাসনারের লেখা Masters of the Drama গ্রন্থে উদ্ধৃত মন্তব্য পৃঃ ২৮৬

২. "Serious often tragic play with some mingling of the comic, in contrast to the unity of tragic tone characterestic of classic tragedie." D. O. W. L. Edtd. J. T. Shipley pp. 106

ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ ড্রেম ও কমেডির পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে যে মূল্যবান কথাটি বলেছেন, সেকথা স্মরণে রেখেই অধ্যাপক নিকল এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[১] তিনি ড্রেমকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন—(ক) মিলনান্ত ড্রেম, (খ) পুরোপুরি সুখদায়ক উপসংহার নয় এমন ড্রেম, (গ) গুরুগম্ভীর বৃত্তের সঙ্গে কমিক উপাদানের মিশ্রণ সম্বলিত 'ড্রেম-কমিডি'। এগুলির দৃষ্টান্ত যথাক্রমে—The Road to ruin, The Merchant of Venice ও Secret Love. উপসংহারের দিক থেকে ড্রেমকে নিকল তিনভাগ করলেও এর কোনো শ্রেণীকেই কিন্তু কমেডি বলা যায় না। দার্শনিক বের্গসঁ বলেছেন যে প্রথমত 'ড্রেম'-এ থাকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল চরিত্র কিন্তু বিশুদ্ধ কমেডিতে (pure Comedy) থাকে টাইপ বা শ্রেণীচরিত্র। শেক্সপীয়রের Measure for Measure এর চরিত্রগুলি টাইপ নয়, ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত বলেই 'ড্রেম'। দ্বিতীয়ত ড্রেমের মধ্যে কোনো না কোনো প্রকারের একটা সমস্যা থাকবেই। কিন্তু বিশুদ্ধ কমেডিতে এই সমস্যা থাকে না। অভিনীত কমেডির ঘটনাটি যতই সর্বজনীন হোক, আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তা সমগ্রভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তৃতীয়ত ড্রেমের চরিত্রগুলির প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকে—সংবেদনশীলতা সেখানে একটা বড় কথা—কিন্তু বিশুদ্ধ কমেডিতে দর্শকদের এই সংবেদনশীলতা থাকার কথা নয়—কেবলমাত্র শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডিগুলিতে চরিত্রগুলির প্রতি কতকটা সংবেদনশীলতা জাগ্রত হয়, তবে এখানেও মানস-বৃত্তিও (Intellect) জাগ্রত থাকে। মনে রাখা উচিত, এই সূত্রটিও বের্গসঁ এর। ড্রেম হল সভ্যতা-সচেতন কালের ফসল। মানুষের তৈরী আইনের সঙ্গে প্রকৃতির আইনের বিরোধের ইঙ্গিত দিয়ে শেক্সপীয়রের হাতে 'Measure for Measure'এ এর প্রথম আবির্ভাবের আগমনী গান।

অষ্টাদশ শতকে এর স্বচ্ছন্দ বিচরণ নীতিশাসিত মানুষের সমাজে ব্যক্তির সুখ-সুবিধা প্রেম ও বিবাহসমস্যার মধ্যে। তারও পরে এ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসেছে—সামাজিক কুসংস্কার, গৃহে নারীর স্থান, বিবাহ-পূর্ব নারীর সতীত্ব, পতিতাদের জীবন-সমস্যার কথায় ড্রেম আধুনিক কালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২] ইবসেনের 'Doll's House', বার্ণার্ড শ-এর 'Widower's Houses' 'Apple Cart' প্রভৃতি আধুনিককালের গুরু ড্রেম—ড্রেম-কমেডি নয়। আমাদের মতে ড্রেমকে ট্রাজিডি বা কমেডি কোনো শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। সমাজ শাসিত নিয়মের বিরুদ্ধে এর নায়ক দাঁড়ায়, কর্তৃপক্ষের অন্যায় বা নীচতার প্রতিবাদ করে, স্বাধীনভাবে পছন্দ মতো বিবাহ করে। আর নারীরা সংসার বাঁচানোর তাগিদে পণ্য হয় ও পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আধুনিক কালের মানুষের নানা জটিল সমস্যা রূপায়ণে ড্রেমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়

---

১. The Theory of Drama : A Nicoll. pp. 187 and 239-41.
২. The Theory of Drama, A Nicoll pp 240

বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাভাষায় অনেকেই এই ধরনের সমস্যামূলক নাটক লিখেছেন, এগুলোকে ড্রেম বলা যেতে পারে।

কমিডি ও সমাজ :

হাসি ঠিক একক মানুষের উপভোগ্য বিষয় নয়। হাসির ভোজে বহুর নিমন্ত্রণ। যদি কখনও মানুষ একাকী হাসে, তাহলেও অন্য অনেকের সাহচর্য মনে মনে সাধারণত সে কল্পনা করে থাকে। প্রবল উচ্ছ্বসিত অট্টহাসিতে চঞ্চল হতে একক মানুষকে সাধারণত দেখা যায় না। নাটকের একটি অতি চমৎকার বাগবৈদগধ্যময় উক্তি যদি একাকী পড়া যায়, তাহলে মনে এক ধরনের পরিতৃপ্তি-জনিত স্মিতহাস্য যে দেখা যায় না, তা বলা যায় না। কিন্তু আর সকলের সঙ্গে যদি ঐ বাক্‌কেলির হাস্য অনুভব করা যায়, তাহলেই তার যথার্থ তাৎপর্য ফুটে ওঠে। সংস্কৃত সাহিত্যে আত্মগত ও পরগত হাস্যের কথা ভরত বলেছেন।[১] আত্মগত হাসিতে হাস্যকারী শুধু নিজেই হাসে কিন্তু যখন সে অপরকে হাসায়, তখন তা পরগত। অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ-নিরপেক্ষ পাত্র-বিশেষের আত্মগত হাসি অর্থহীন, অসুস্থতার লক্ষণ—পাঠ্য কমেডি বা প্রহসনে একক হাসি সম্ভব, কিন্তু ক্ষেত্র-সংকীর্ণতায় তার তাৎপর্য সীমিত। সেইজন্য বলা ভাল যে হাসি এক সামাজিক বৃত্তি এবং বহুজন-সম্মিলিত আসরই হল তার প্রকৃত ক্ষেত্র। হাসি অনেক সময় কোনো একজন ব্যক্তি বা টাইপ চরিত্রকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়। এম বের্গসঁ মশায় বলেছেন হাসির পাত্রটি অসামাজিক হলেই হাসির সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কথায় কোনো কিছু "নিয়মসম্মত" হওয়ার মধ্যে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নেই। কিছু ঘটলে "কিম্বা আর এক-রূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।"[২] হাসির দ্বারাই হাস্যাস্পদের অসামাজিকতা বা নিয়ম-ভঙ্গকে সামাজিক মানুষ আক্রমণ করে। সমাজের কোনো সুস্থ, কৃতী, স্বাভাবিক ও শক্তিশালী মানুষকে কেন্দ্র করে সামাজিক অপর মানুষ হাসে না। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের, আচার-আচরণের যে সাধারণ বিধি বা আদর্শ, তা থেকে চ্যুত অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মানুষই হাসির পাত্র হয়। বিশুদ্ধ কমেডিতে যে টাইপ বা শ্রেণী চরিত্র থাকে, তা যদি সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নততর ও স্বাভাবিক হয় তাহলে কখনো হাসির হেতু হবে না। অবশ্য উন্নত বাক্‌কেলির সাহায্যে ঐ চরিত্র হাসি সৃষ্টি করতে পারে সামাজিকের মনে। কিন্তু এক্ষেত্রে চরিত্রটির সূক্ষ্ম বাক্‌বিকারই হাস্যরসের কারণ হয়, চরিত্রটি কোনক্রমেই হীন নয়। চরিত্রটি সচেতনভাবেই এখানে হাসির সৃষ্টি করছে—

---

১. নাট্যশাস্ত্র : ৬।৪৮ক
২. পঞ্চভূত : রবীন্দ্রনাথ

স্বভাবে সে হাস্যাস্পদ নয়। ভণ্ড বা কৃপণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অসামাজিক এবং তার চারিত্রিক নীচতার জন্যে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের। বিশুদ্ধ কমেডিতে এমন চরিত্র একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি—সুতরাং হাস্যাস্পদ। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক হাসি অসামাজিক ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আশ্রয় করে। অসামাজিককে সামাজিক করার গোপন কামনা হাস্যরসিকের অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকারই কথা। এই কারণে সমাজের সঙ্গে হাসির নিগূঢ় যোগকে উপেক্ষা করা চলে না। হাস্যরসিক সাধারণত বিচার ও পর্যবেক্ষণমূলক মনোভাব নিয়ে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন। আমাদের অলংকার শাস্ত্রেও আছে 'কবিহি সামাজিক তুল্য এব।' সমাজজীবন যেখানে বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত, হাস্যরসিকদের মধ্যে সেখানে সমাজচেতনা নিশ্চয়ই থাকবে।

বিশেষ করে স্যাটায়ার-মূখ্য বা ব্যঙ্গাত্মক কমেডিতে হাস্যরসিকের সমাজচেতনা খুব প্রবল। সেখানে তিনি স্রষ্টা ও বিচারক দুইই। রিচার্ড ডুপ্লে বলেছেন—"The laughter of Comedy is a social corrective."[১] সমাজের সমকালীন দোষ-ত্রুটিগুলিকে উৎখাত করবার গূঢ়তর অভীপ্সা অ্যারিস্টোফেনিস, মলিয়ের, বার্ণার্ড শ প্রমুখ ব্যক্তিদের রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। পারিপার্শ্বিক সামাজিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তাশীলতা জাগ্রত করার ক্ষেত্রটি যেখানে অবাধিত, হাস্যের যথার্থ অঙ্গন সেখানেই। বাঙলা-হাস্যরসাত্মক নাটকে সমসাময়িক সমাজের নানা দোষ-ত্রুটি, সামাজিক মানুষের স্খলন-পতন-সংশোধনের অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ট্রাজিডি ও কমেডি :

ট্রাজিডি ও কমেডি—নাটকের এই দুই প্রধান শ্রেণীতে জীবনের দুই ভিন্ন অথচ একান্ত সত্য রূপ রূপায়িত হয়। ট্রাজিডিতে জীবনের অন্ধকারময় দিক এবং কমেডিতে আলোকিত দিক ফুটে ওঠে। একটিতে মানুষের দুঃখ-দুর্গতি, ব্যথা-অশ্রু, অন্যটিতে হাসি-আনন্দ, ও সুখ-তৃপ্তি। অ্যারিস্টটল ট্রাজিডি ও কমেডির মধ্যে স্পষ্ট ভেদ কল্পনা করে-ছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ভেদই স্বীকৃত হয়েছে এবং এ দুইকে পৃথক-প্রজাতিরূপে আলোচনা বহুকাল থেকে চলে আসছে। আমরাও আপাতত সেই ভেদের কথা মনে রেখে এদের পার্থক্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি।

(ক) উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিকল্পে, ডায়োনিসাস দেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে ট্রাজিডি ও কমেডি দুয়েরই সৃষ্টি হয়েছিল একদা গ্রীসে। এই উৎসবের সঙ্গে যোগ রেখে ট্রাজিডি ও কমেডির সংজ্ঞা দেবার কিছু চেষ্টা হয়েছে। ঐ দেবতার মৃত্যু-যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কাহিনী ট্রাজিডির বিষয় ছিল একদা, তাই ট্রাজিডিতে ব্যাহত আশাহীন জীবনের ব্যর্থতার

১. রিচার্ড ডুপ্লের লেখা প্রবন্ধ 'Whatever happened to Comedy' প্রবন্ধ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

চিত্র ; আর দেবতার পুনর্জীবন ও বিবাহের বিষয়কে আশ্রয় করা হত কমেডিতে—তাই কমেডিতে আনন্দোজ্জ্বল প্রাণচাঞ্চল্যের হাস্যময় বিজয়কাহিনী। দুইকে মিলিয়ে নিয়ে জীবনচক্রের পূর্ণতা। ট্রাজিডিতে যার শেষ, কমেডিতে তার সূচনা। সেইজন্য নর্থরোপ ফ্রাই বলের Tregedy হল 'uncompleted Comedy',[১] ট্রাজিডিতে বিচ্ছেদ আছে, মৃত্যুও থাকতে পারে কিন্তু তা জীবনের চূড়ান্ত অবস্থা নয়। কমেডিতে জীবন যখন নবীভূতরূপ লাভ করে, তখনই তার চক্রাকারে গতিপথের পূর্ণতা। তত্ত্বের দিক থেকে কথাটি হয়তো সত্য এবং এদিক থেকে দুয়ের যোগও গভীর ; কিন্তু পৃথকভাবে যখন ট্রাজিডি ও কমেডির আমরা অভিনয় দেখি, তখন এই তত্ত্ব-চিন্তার কথা মনে থাকে না ; আর সেইজন্যই ট্রাজিডিতে হারানোর বেদনাকে চূড়ান্ত মনে করে আমরা হাহাকার করে উঠি। কিং লীয়র কর্ডেলিয়াকে হারিয়ে তাকে ফিরে পাবার আর কোনো সান্ত্বনাই খুঁজে পায় নি—

"Thou'lt come no more,
Never, never, never, never, never !"

'কৃষ্ণকুমারী'তে অপ্রকৃতিস্থ রাজা ভীমসিংহ কন্যা কৃষ্ণাকে হারিয়ে মর্মান্তিক বেদনায় ভ্রাতা বলেন্দ্রকে বলেছেন, "ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা !—কৃষ্ণা ! আমার কৃষ্ণা ! আমার কৃষ্ণা !"

(খ) ট্রাজিডির বৃত্তের গতিপথ এক হিসেবে সরলরৈখিক ; কিন্তু যে অনুষ্ঠান থেকে এর উদ্ভব, তার ইঙ্গিত বৃত্তাকার বা চক্রাকার গতির দিকে। কমেডিতে বৃত্তাকার গতিপথটি অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু ট্রাজিডিতে নয়। ম্লান, শ্রীহীন শীত থেকে বসন্তে, অসঙ্গত অস্বাভাবিক সমাজ আদর্শ থেকে স্বাভাবিকতার সঙ্গতিময় রাজ্যে ফিরে আসার প্রবণতা আছে কমেডিতে। কিন্তু ট্রাজিডির নায়ক পারিপার্শ্বিকের চাপে, আত্মগত ত্রুটির ফলে, অথবা দৈবের চক্রান্তে ধীরে ধীরে সরলরেখায় সর্বনাশের পথে অগ্রসর হয়। তার পরাজয় ও মহাসর্বনাশের মধ্যেও যে মানবমহিমার স্বাক্ষর, যে অবিনাশিতার ইঙ্গিত, তা কমেডির পাত্র-পাত্রীর বিজয়লাভের মতো স্পষ্ট ও অবিমিশ্র নয়।

(গ) ট্রাজিডির আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে—সমস্ত অন্তরদেশকে আলোড়িত করে তোলে ট্রাজিডি নায়কের ক্রিয়াকলাপ ও পরিণতি, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক, জীবনের উদ্দেশ্য ও তার স্বরূপ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগ্রত করে। কিন্তু কমেডির সঙ্গে আমাদের চিত্তদেশের যোগ নিতান্তই ক্ষীণ ; এখানকার হাসি-আনন্দ-গান সব কিছুই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। মনের উপরি-স্তরেই তার আবেদন—ক্ষণিকের হাসি-সুখ-গানে এখানে মেতে-ওঠা চিত্তে স্থায়িভাবের কোনো স্বাক্ষর পড়ে

১. 'Perspectives on Drama' গ্রন্থে জে. এল. ক্যালডারউড ও হ্যারল্ড ই. টলিভার লিখিত An Introduction to Comedy প্রবন্ধে উদ্ধৃত পৃঃ ১৭০

না ট্রাজিডি মানুষকে নানা জীবন সমস্যার প্রশ্নে চিন্তান্বিত করে—ভবিষ্যতের নানা ভাবনা জাগ্রত করে মনে। অপরপক্ষে কমেডি বর্তমানকে ছাড়িয়ে অগ্রসর হতে পারে না—যে স্বাভাবিক অবস্থায় জীবন ছিল, সেই অতীতের দিকে ফিরে যাবার তার আগ্রহ। ট্রাজিডি অনুভূতিগ্রাহ্য, কিন্তু কমেডি বুদ্ধিগ্রাহ্য।[১]

(ঘ) ট্রাজিডির নায়ক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আত্ম-পরিচয় উদ্ঘাটন করে—সে কি ছিল, সে কি করেছে এবং কেন তার এ পরিণতি—এ সম্পর্কে সে সচেতনই থাক বা অসচেতনই থাক, তার চিত্র দর্শকমনে তার পরিচয়কে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তোলে; তার পরিণাম সম্পর্কে প্রথম থেকেই নাট্যঘটনা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দর্শকদের কৌতূহলী করে রাখে। নায়কের ফলভোগের জন্যে সেই যে দায়ী, অধিকাংশক্ষেত্রে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে (অবশ্য দৈবচক্রান্তের ট্রাজিডি ছাড়া)। এই ধরনের উৎকণ্ঠা, মানসিক আলোড়ন, ঘটনার তরঙ্গ ও ঘাতপ্রতিঘাত কমেডিতে নেই। প্রধান পাত্র-পাত্রীদের পরিণাম এখানে তেমন অনিশ্চিত নয়। বিশুদ্ধ কমেডিতে তারা শ্রেণী চরিত্র বলে তাদের চরিত্র প্রথম থেকেই স্পষ্ট, তারা হাল্কা মেজাজের পাত্র-পাত্রী। কি তারা চায় এবং কি পেলে তারা খুশী হয়, তা বুঝতে কোনই অসুবিধে হয় না। ট্রাজিডির চরিত্র যেমন ঘটনার মুখে বিকাশশীল, কমেডির তা নয়; কোনো কোনো কমেডিতে শাস্তির মধ্য দিয়ে চরিত্র পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়—কিন্তু চরিত্র প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত হয় না। যদি কোথাও হয়, বুঝতে হবে তা কমেডির ধর্ম লঙ্ঘন করেছে। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদ একেবারে শেষে বলেছে, 'আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলিও পেয়েছি।··· এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।' কিন্তু এ উক্তি তার চরিত্র-পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ নয়।

(ঙ) একজন সমালোচক বলেছেন ট্রাজিডি ও কমিডির পার্থক্য মূলত অভিজ্ঞতা ও স্বতোলব্ধ জ্ঞানের পার্থক্য। পাশব জীবনের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে কিংবা ব্যক্তিগত স্বপ্ন-পূরণের জন্যে মানুষ সংগ্রাম করে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা; কিন্তু স্বতোলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের উৎকেন্দ্রিকতা, খেয়ালিপণা ও তার নানা বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনো লাভ নেই। তাই প্রথমটির চিত্র ট্রাজিডিতে, আর দ্বিতীয়টির চিত্র কমেডিতে—অভিজ্ঞতার জ্ঞান ও স্বতোলব্ধ জ্ঞানের পার্থক্যই দেখা যায় এ দুটিতে।[২] ট্রাজিডির নায়ক নিজের সচেতন ইচ্ছায় একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। আঘাত-বিপদ যাই আসুক, সে পথ চলে। জীবন অভিজ্ঞতাই তাকে চলার প্রেরণা দেয়।

১: "Horace Walpole said that life is a tragedy to the man who feels, a Comedy to the man who thinks"—পৃঃ ১৭৬ Perspectives on Drama. সম্পাদকদ্বয়ের বক্তব্য।

২. Robert W. Corrigan-এর Comedy : meaning and form গ্রন্থের ভূমিকা।

কমেডির হাস্যাস্পদ ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি তার স্বভাবগত। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থহীন। হাসির হাতিয়ারেই তার স্বতোলব্ধ স্বভাবকে আঘাত করতে হবে।

(চ) ট্রাজেডিতে জীবনের চিরন্তন, বিশ্বজনীন রূপ এবং কমেডিতে একটি বিশেষ কালের সামাজিক ও পরিবর্তনশীল রূপ ধরা পড়ে; অবশ্য শ্রেষ্ঠ কমেডিতে মানুষ বা সমাজের যে ত্রুটি তুলে ধরা হয় তারও একটা চিরন্তন আবেদন থাকে।[১] মানুষের চিন্তাধারা, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়—কিন্তু প্রমিথিউস, ইডিপাস, ম্যাকবেথ, লীয়র, হ্যামলেট প্রভৃতি ট্রাজিডিগুলিতে জীবনের এমন রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, যা নিত্যকালের সত্য; আজিও তাদের আবেদন ক্ষুণ্ণ হল না। কিন্তু কমেডির স্রষ্টা জীবনকে পূর্ণভাবে দেখতে চাইলেও এত গভীরে যেতে চান না। জীবনের বহিরঙ্গের উজ্জ্বলিত রূপই তাঁর উপজীব্য।

(ছ) কমেডির হাস্য সামাজিক। তাই কমেডিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ। নানা ধরনের মানুষকে এখানে এনে হাস্যের ভোজে বসিয়ে দেওয়া হয়—কমেডি স্রষ্টার দৃষ্টিও তাই একাগ্র নয়—কোনো একটি বা দুটি চরিত্রের প্রতি মনোযোগী হয়ে তাঁর সতর্ক পদযাত্রা নয়। ট্রাজিডিতে কিন্তু নায়ক চরিত্রের সর্বব্যাপী প্রাধান্য। তার বেদনা, ও অন্তহীন দুঃখের দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি। বহুজনের কলরবে নায়কের হাহাকার যেন অশ্রুত না হয়—অল্প চরিত্রের মাঝখানেই তার জীবনের বেদনা-রাগিণী বাজবে। তাই ট্রাজিডিতে কমেডির তুলনায় চরিত্রের স্বল্পতা অনেক সময় লক্ষণীয়।

(জ) রবীন্দ্রনাথ বলেন আঘাত, ট্রাজিডি ও কমেডি উভয়ক্ষেত্রেই আছে। 'কমেডির হাস্য এবং ট্রাজিডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে।'[১] তিনি আরও বলেন ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের, কথার সঙ্গে কার্যের অসংগতি এগুলির মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা বা আঘাত আছে। অসংগতি ট্রাজিডি ও কমেডি দুয়েরই বিষয়। কমেডিতে ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করলেন, তখন দাম্পত্য সুখের চরমসীমায় তিনি উপস্থিত, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল, প্রাণপ্রিয়া সীতাকে নির্বাসন দিতে হল; এখানে ট্রাজিডিতে আশার সঙ্গে ফলের, ইচ্ছার সঙ্গে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। কমেডি কিভাবে ট্রাজিডিতে রূপান্তরিত হতে পারে তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তাই তিনি বলেছেন,—"স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হতে থাকে।"[২]

কিন্তু ট্রাজিডি-কমেডির বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ দুয়ের ভেদরেখা ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছে। ট্রাজিডির মধ্যে কমেডি ও কমেডির মধ্যে

---

১. রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধ

২. ঐ

ট্রাজিডির উপাদান যোজনা না করে শিল্পীরা তৃপ্তি পাচ্ছেন না। উদ্ভট বা কিমিতি কমেডি-গুলিতে সচেতনভাবে নাট্যকারেরা জীবনের স্ববিরোধিতা, ভিতরের দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার চিত্র উদ্ঘাটিত করছেন। বিখ্যাত নাট্যকার Ionesco নিজেই বলেছেন—"Personally, I have never understood the distinction that are made between the comic and the tragic. Since the comic is the intuition of the absurd, it seems to me more hopeless than the tragic.……The comic offers no escape……the comical is tragic, and the tragedy of the man derisory."[১]

(ঝ) ট্রাজিডির গঠন দৃঢ়পিনদ্ধ, তুলনায় কমেডির গঠন শিথিলবদ্ধ। ট্রাজিডিতে ব্যক্তিচরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিতে শ্রেণীচরিত্রের। ট্রাজিডির গহন-গম্ভীর কাহিনীর রস-পরিণাম ভয়ানক ও করুণ, কমেডির লঘুচালের কাহিনীর রসপরিণাম সাধারণত হাস্য বা ভাবগত পরিণাম তৃপ্তি, মিলন বা সুখ। দর্শকের হৃদয়-দুয়ারেই ট্রাজিডির মাথা কোটা, আর তার মনের আসরেই কমেডির লীলাবিলাস। ট্রাজিডি ও কমেডি দুয়েতেই নায়ক বাধা বা দ্বন্দ্বের আবর্তে পতিত; কিন্তু ট্রাজিডির বাধা দুস্তর ও অনতিক্রম্য, কমেডির বাধা তুলনায় শক্তিহীন ও সহজেই অতিক্রম্য।

হাস্য, হাস্যের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ :

হাসি মানুষের বিশেষ সম্পদ। হাসিতে মানুষেরই আছে একচেটিয়া অধিকার—ইতর প্রাণী হাসতে জানে না। হাসির প্রকাশ হয় আনন্দের মধ্যে। কিন্তু এ আনন্দ চিত্তের অন্যান্য আনন্দ থেকে আলাদা। অসঙ্গতি ও বৈষম্যই এর নিদান। সঙ্গতি স্থায়িত্বের কারণ; অসঙ্গতি অস্থায়িত্বের হেতু; তাই চিত্তে স্থায়িভাবের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে হাসি সমর্থ নয়। অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় তাই হাসির মূল্য কিছু কম। এর আবেদনও হৃদয়ে নয়, মনে। "এ রস মধুর নয়। কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন।"[২] হাসি, তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক, তার স্বরূপগত তরলতা উপেক্ষণীয় নয়। সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেন, 'সত্ত্বাভাবো হি হাস্যঃ।'[৩] অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্যের বা সত্ত্বগুণের অভাব ঘটলেই হাসির জন্ম। সেইজন্য সকল রসের তুলনায় এর স্থান কিছু নিম্নে।

---

১. Perspectives on Drama গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃঃ ১৭৮

২. প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থের 'ভারত চন্দ্র' পৃঃ ২৫৫

৩. অভিনব ভারতী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪০

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পরস্পর পরস্পরের রতির আলম্বন। দুষ্মন্তের চিত্তে যে রতি স্থায়িভাব তার আলম্বন শকুন্তলা। দুষ্মন্তই স্থায়িভাবের আশ্রয়—শকুন্তলা আলম্বন। রসবেত্তা দর্শক স্থায়িভাবের আশ্রয় হতে পারে না। কিন্তু প্রহসন বা কমেডিতে যেখানে হাস্যরসের ব্যাপার, সেখানে কেবলমাত্র আলম্বনের জ্ঞান হয়। আশ্রয়টি থাকে না স্থায়িভাবের। হাস্যরসচর্বণায় ব্রহ্মের সদ্ অংশ ও চিদ্ অংশের বিকাশ হয়—কিন্তু আনন্দাংশের হয় না। তাই এ নিম্নশ্রেণীর। সংস্কৃত আলংকারিকগণ উৎপত্তি, আস্বাদন ও প্রকাশবৈচিত্র্যের দিক থেকে হাস্যরসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪৮ক···৬১ শ্লোক), ধনঞ্জয়ের 'দশরূপ'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদে (৮২-৮৪ শ্লোকে) এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে (২০০-২০১ শ্লোক) এ হাসি-সৃষ্টির কারণ, হাসির প্রকার—প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা আছে। অশোভন বেশ বা অলংকার, বেহায়াপণা, লোভ, কলহ, অঙ্গবিকৃতি, অপ্রাসঙ্গিক কথা, নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি—প্রভৃতি থেকে হাসির উদ্রেক হতে পারে বলে ভরত মনে করেছেন।[১] ধনঞ্জয় এতগুলি কারণের কথা না বলে সংক্ষেপে বলেছেন নিজের বা পরের বাগ্-বেশের বিকৃতি থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি।[২] বিশ্বনাথ বিষয়টিকে সংহত করে জানিয়েছেন—আকার, কথাবার্তা, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি থেকে জাত কুহক (মনোবিভ্রম) থেকে হাস-স্থায়িভাবযুক্ত হাস্যরস হয়।[৩] এঁরা তিনজনেই বলেছেন হাস্য ছয় রকম; উত্তম ব্যক্তিদের হাসি স্মিত ও হসিত; মধ্যমগণের বিহসিত ও অবহসিত এবং নীচগণের অপহসিত ও অতিহসিত। যে হাসিতে চোখ কতকটা রিকশিত ও অধর স্পন্দিত তা স্মিত, যাতে দন্ত ঈষৎ লক্ষিত হয়, তা হসিত। মধুর ধ্বনি বা স্বরযুক্ত হাস্যের নাম বিহসিত; যে হাসিতে স্কন্ধদেশ ও মস্তক কম্পিত হয় তা অবহসিত। যে হাসিতে চোখে জল আসে তা অপহসিত এবং যাতে অঙ্গবিক্ষেপ হয়, তা অতিহসিত। ভরত এইগুলিকে আরও বিস্তারিত করে বলেছেন। ভরতের মতে হাসি এক দিক থেকে দু রকম—আত্মস্থ ও পরস্থ। যখন কোনো ব্যক্তি নিজে হাসে তখন তা আত্মস্থ এবং যখন অপরকে হাসায় তখন তা পরস্থ।[৪] ভরত আরও বলেন যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এবং নারীরা একটু বেশী মাত্রায় হাস্যপ্রবণ।[৫]

হাসির কারণগুলি সম্পর্কে ভারতীয় আলংকারিকদের বক্তব্যে গভীর মনীষার চিহ্ন মুদ্রিত। পাশ্চাত্যের দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যিকরা এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করলেও ভারতীয় আলংকারিকদের মূল সূত্রগুলি থেকে তাঁরা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। প্রহসনের প্রসঙ্গে ভারতীয় আলংকারিকেরা

১। নাট্যশাস্ত্র ৬।৪৮ক।

২। বিকৃতাকৃতবাগ্‌বেষৈরাত্মনোঽথ পরস্য বা।
হাস, স্যাৎ পরিপোষোঽস্য হাস্যস্থায়প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ॥ (৪।—দশরূপক)

৩। সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ অধ্যায়।

৪। নাট্যশাস্ত্র।

৫। নাট্যশাস্ত্র ষষ্ঠ অধ্যায়।

বলেছেন হাস্যরস 'নীচপাত্রগত'—নিন্দনীয় চরিত্র বা নিম্নশ্রেণীর চরিত্রকেই সেখানে আশ্রয় করতে হয়। হাস্যরসকে তাঁরা অন্যান্য রসের তুলনায় কতকটা নিম্নেই স্থান দিয়েছেন। কেন সে কথা পরে বলছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অ্যারিস্টটলের কথা প্রথমেই মনে করা যায়। তিনি বলেছেন যে, মানুষ বা, তার থেকে মন্দ করে তাকে রূপায়িত করা হয়—এই জন্যই হাসির পাত্র হয় সে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের চরিত্র-বিকৃতিই যে হাসির কারণ, তাঁর মন্তব্যে এটা স্পষ্ট। কান্ট ও তাঁর পরবর্তী অনেকেই —সোপেনহাওয়ার থেকে হ্যাজলিট পর্যন্ত বলেন চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয় একই সমান্তরাল ক্ষেত্রে স্থাপিত হলে—অসঙ্গতি থেকেই হাসির সৃষ্টি। দার্শনিক এম বের্গসঁ বলেন হাস্যাস্পদ ব্যক্তির অসামাজিকতা, দর্শকদের সংবেদনশীলতার অভাব, ঘটনা, চরিত্র ও বাক্যগত যান্ত্রিকতা ও স্বয়ংক্রিয়তা হাস্যরসের কারণ। তাঁর এই তত্ত্বকে তিনি পৌনঃপুনিকতা (Repetition), বৈপরীত্য (Inversion), এবং পারস্পরিক বৈপরীত্য (Reciprocal inversion of series)—এই তিনটি পথে অনুসন্ধান করেছেন। অধ্যাপক নিকল মনে করেন স্বতোস্ফূর্ত হাসির কারণ হল নানা ধরনের বন্ধন থেকে মুক্তি। হাস্যরসের ছয়টি কারণ সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই কারণগুলি হল (ক) অসঙ্গতি, (খ) শারীরিক বা মানসিক বিকৃতি, (গ) চরিত্র-বিকৃতি, (ঘ) পরিস্থিতিবিকৃতি, (ঙ) আচার-আচরণের বিকৃতি ও (চ) বাগ্‌বিকৃতি। হাস্য প্রকাশক মনোভঙ্গীগুলির অর্থাৎ স্যাটায়ার, হিউমার, উইট প্রভৃতিরও বিশদ পরিচয় তিনি দিয়েছেন। ভারতীয় আলংকারিকেরা আকার, কথাবার্তা, বেশ, বাক, চেষ্টা—প্রভৃতির বিকৃতিকে হাস্য-উৎপত্তির হেতু বলেছেন, স্বভাব থেকে বিচ্যুতিই হল বিকৃতি—আর তা পাশ্চাত্যের অসঙ্গতিরই নামান্তর; সকল প্রকার হাসির মূল অসঙ্গতি বলাও যা, বিকৃতি বলাও তাই। ভারতীয়দের আকার-বিকৃতিকেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা বলেছেন শারীরিক বিকৃতি। বাগ্‌বিকৃতির কথা উভয়-দেশের আলংকারিকেরা বলেছেন। ভারতীয়দের চেষ্টা, (Movement) চাল-চলন বা আচার-আচরণের বিকৃতির কথাও নিকল বলেছেন। আবার এই সব বিকার থেকে হাসির স্থূল রূপও জেগে উঠতে পারে এবং সূক্ষ্ম রূপও জাগা সম্ভব। সূক্ষ্ম রূপ হলেই বাগ্‌বিকৃতি হবে উইট এবং চালচলন-আচার-আচরণ-বিকৃতি হবে হিউমারেরই সামিল।[১]

হাসি-সৃষ্টির কারণগুলি যখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তখন এ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। হাসি-সৃষ্টির সমস্ত কারণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে অসঙ্গতি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আমাদের অন্তরে বাইরে যে একটা যুক্তিসঙ্গত নিয়ম-শৃঙ্খলার রাজত্ব, সেখানে 'যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয়, তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।[২] এই অসঙ্গতি বা অনৌচিত্যের কথা অ্যারিস্টটলও বলেছেন তাঁর Poetics-এ। কমেডিতে নানাভাবে

১। 'সাহিত্যবিজ্ঞান'-এর 'হাস্যরস' প্রবন্ধে মোহিতলাল সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব-বিভাবাদির সংযোগে যে হাস্যরসের নিষ্পত্তি তাকে ইংরেজি 'humour' বলতে চান।

২। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে কৌতুকহাস্য প্রবন্ধ।

এই অসঙ্গতি দেখিয়ে হাসির সৃষ্টি করা হয়। উৎকৃষ্ট কমেডিতে উৎকেন্দ্রিক টাইপ চরিত্র থাকলে স্বাভাবিক চরিত্রও আনা হয় ও এদের বৈপরীত্যে যে অসঙ্গতি তা হাস্যের হেতু হয়। দু'রকম বিপরীত চরিত্রকে উপস্থাপিত ক'রে তাদের অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে কমেডির দ্বন্দ্বকে দেখানো হয়, কখনো বা দুটি বিপরীত ভাব বা শব্দের অসঙ্গতিও দেখানো হয়। অঙ্গবিকৃতি হাস্যসৃষ্টির কারণ হলেও তা নিম্নস্তরের, সেইজন্য উৎকৃষ্ট কমেডিতে এগুলি বর্জন করা হয়। কিন্তু ফার্সে কাণা, খোঁড়া, তোতলা, বামন, কুঁজো প্রভৃতি চরিত্রের আমদানি করা হয়। টাইপ চরিত্রের নানা ধরনের মানস-বিকৃতি যেমন পাগলামি, নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা, বাতিকতা, খেয়াল—প্রভৃতিকে আশ্রয় করে হাসির উদ্ভব হয়। আমাদের বাঙলা নাটকে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, অমৃতলাল এবং রবীন্দ্রনাথের কমেডি ও প্রহসনে অসঙ্গতি, বাগ্‌বিকৃতি, চেষ্টা-বিকৃতি ও বেশ-বিকৃতি থেকে জাত হাসির প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে। পরিস্থিতি বা ঘটনা থেকেও হাসির উৎপত্তি হতে পারে। এক একটি ঘটনার মাঝখানে চরিত্রগুলিকে এনে তার পূর্বাবস্থা থেকে অধঃপতনের চিত্র দেখিয়ে, কিংবা গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি থেকে লঘু পরিস্থিতিতে তাদের স্থাপন করে হাস্য সৃষ্টি করা যায়। একটি বিশেষ সমাজের আদর্শ বা রীতিনীতিকে কৃত্রিমভাবে অনুসরণ করতে গিয়েও চরিত্র হাস্যাস্পদ হতে পারে।

হাসি-সৃষ্টির কারণগুলির কথা বলেছি। এখন আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এগুলি হাসির হেতু আবার হাসির প্রকাশিত বাহ্যরূপও বটে। এগুলির ইংরেজি নাম উইট, হিউমার ও ফান। কেউ কেউ স্যাটায়ারকেও এর অন্তর্গত করতে চান। আমরা হাস্যরস কথাটিকে খুব স্থূল ও অসতর্ক ভাবে প্রয়োগ করে থাকি। বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে 'হাস' ভাব থেকে যে হাস্যরসের সৃষ্টি—তারই প্রকারভেদ মনে করে থাকি এগুলিকে। কিন্তু অখণ্ড ও অবিভাজ্য রসকে এইভাবে বিভক্ত করা যায় কি? সেইজন্য এগুলিকে হাস্যপ্রকাশক পদ্ধতি বা হাস্যরূপ বলা উচিত। এই রূপ বা পদ্ধতিগুলির মধ্যে হিউমার শ্রেষ্ঠ। হিউমারের কোনও বাঙলা প্রতিশব্দ নেই—শুধুমাত্র এ-কেই 'হাস্যরস' বলতে চেয়েছেন মোহিতলাল মজুমদার। কিন্তু তাঁর উক্তি সমীচীন নয়। wit হল বাক্‌কেলি, স্যাটায়ার হল ব্যঙ্গ, Fun হল রঙ্গ এবং হিউমার 'হিউমারই'। এরা হাসির এক একটি রূপ, কিন্তু হাস্যরসের নয়। নিছক ব্যঙ্গকে হাসির রূপও বলা চলে না এর আক্রমণাত্মক দিকটির জন্যে। ব্যঙ্গ নিজে হাসি সৃষ্টি করতে পারে না এবং হাসির কোনো রূপও নয়—তাই রঙ্গ, বাক্‌কেলি ও হিউমারের সঙ্গে এ মিশে থাকে। অধ্যাপক নিকল স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গের এই সীমা সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। আধুনিককালেও কেউ কেউ এ বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক পূর্বে জনসনও বলেছিলেন, "Just another reminder that a satire is not in itself a pure and exclusive form"[১] ব্যঙ্গের আসল লক্ষ্য দোষ-ত্রুটি সংশোধন। ডেকো বলেছেন, 'Satyr is

১। 'Satire' গ্রন্থে জনসনের মন্তব্য। p. 5. Edited by John D. Jump.

Reformation'. ব্যঙ্গের লক্ষ্য আক্রমণ, কিন্তু অনেক সময় ব্যঙ্গলেখক মাত্রা লঙ্ঘন করে বসেন—তখন ব্যঙ্গ নিন্দনীয়। কিন্তু রঙ্গ, বাক্‌কেলি ও হিউমারের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যখন তার আঘাত, তখন সে সমাদৃত। সুইফট্ খুব সুন্দর করে এই ব্যঙ্গের কথায় বলেছেন যে, এ যেন একটা দর্পণ, যাতে দর্শক প্রত্যেকেরই মুখকে খুঁজে পায় কেবল নিজেরটি ছাড়া। এইজন্যই 'so very few are offended with it".[১]

বাক্‌কেলি ঃ

ইংরেজি উইট (বাক্‌কেলি) শব্দটির উদ্ভব থেকে নানা অর্থ বিবর্তন ঘটেছে। ইন্দ্রিয়>অন্তরিন্দ্রিয়>মানস-শক্তি>ক্ষিপ্রবুদ্ধি>কবিপ্রতিভা—এই ভাবে। হ্যাজলিট আপাত বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের মানসিক শক্তিকে বলেছিলেন উইট। তারও পরে শব্দটি বাক্‌চাতুর্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধির সূক্ষ্মতা বা দীপ্তিই হল উইট। এর আবেদন তীব্র ও ক্ষণিক ; গতানুগতিক চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত করে নতুন চিন্তা জাগ্রত করা তার ধর্ম। হিউমারে যেখানে হাস্যস্রষ্টা ও হাস্যাস্পদ অভিন্ন হয়ে যায়, এখানে তা নয়। উইট-স্রষ্টা নিজে নির্লিপ্ত থেকে বাক্যের চমকে, শব্দের ভোজবাজিতে অপরকে হাসান। "wit wounds with a neat and unexpected strike"[২] অনুপ্রাস, শ্লেষ, প্যারাডকস্, অ্যান্টিথিসিস্ প্রভৃতি অলংকারের আশ্রয়ে উইট-স্রষ্টা শব্দ ও বাক্যের অপরূপ নৈপুণ্য দেখিয়ে থাকেন। উইট হল, নাগরিক জীবনের বুদ্ধিজীবীদের অস্ত্র। উইটের আঘাতে দর্শক বিস্মিত হয়, অপ্রত্যাশিত ধারণাগুলির উপস্থাপন-কৌশলে মানস-আঘাত পেয়েও হাসে। তথাপি দর্শক জানে, এর মধ্যেও কোনো সত্য নিহিত আছে। John Locke বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের বা চিন্তাকে খুব দ্রুততার সঙ্গে ও বৈচিত্র্যসহ একত্র করেই উইট সৃষ্টি করা হয়।[৩]

হিউমার ঃ

অ্যাডিসন Spectator পত্রিকায় যথার্থ উইটকে বলেছিলেন—"majestic and natural", হাসির সেরা হিউমার। হাসি রসের পর্যায়ে উন্নীত হলে কেউ কেউ তাকে হিউমার বলতে চেয়েছেন। শব্দটি সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নানা অর্থ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে যে-অর্থে আজ সুনির্দিষ্ট হয়েছে, তাও কিন্তু বোঝানো সহজ

১। Satire গ্রন্থে সুইফ্‌টের মন্তব্য p. 2. Edited by John D. Jump.

২। Satire গ্রন্থ p. 66. Edited by John D. Jump.

৩। এ হচ্ছে "The assemblage of Ideas and putting those together with quickness and variety" (A Dictionary of Modern Critical Terms : Edited by Rober Fowler pp. 206.

নয়। বস্তুত পক্ষে উইট এবং হিউমার এ দুইকে বুঝিয়ে বলার পরও মনে হবে কিছুই বলা হল না। বার্ণার্ড শও তাই বলেছেন—"There is no more dangerous literary symtom than a temptation to write about wit and humour. It indicates the total loss of both."[১]

আক্ষরিক অর্থে হিউমার humidity বা দেহগত চার রকম রস—যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। সুতরাং ঐ দেহগত রসগুলির প্রভাবে মানুষের যে মনোভঙ্গী বা স্বভাবপ্রকৃতি তাই হল হিউমার। পরে শব্দটির অর্থ দাঁড়ালো ঐ রসগুলির অসম সমবায়ে মানুষের খেয়ালিপনা—শেষে অর্থ হলো হাস্যকর বস্তুকে দেখবার একটা বিশেষ মনোভঙ্গী।

হিউমার ও রঙ্গ কখনই এক বস্তু নয়। হ্যাজলিট বলেছেন, হাস্যকর বস্তু বা পাত্রকে যথাস্থিতরূপেই দেখায় হিউমার—কিন্তু অন্য কিছুর সঙ্গে বৈপরীত্যের সাহায্যে হাস্যরূপকে উদ্ঘাটন করে উইট বা বাক্‌কেলি।[২] বের্গসঁ আরও সুন্দরভাবে বলেছেন আইরনির বিপরীত হল হিউমার। আইরনিতে বা শ্লেষে যাকে আমরা বিশ্বাস করি না, তাকে বিশ্বাসের ভান করি; কিন্তু হিউমারে যাকে বিশ্বাস করি, তাকে বিশ্বাস না করার ভান করি।[৩] মিঃ সালি তাঁর Essays on Laughter-এ বলেন যে, হিউমারে কোনো জিনিসকে একই সঙ্গে খেলার ছলে ও চিন্তার সঙ্গে দেখা হয়। এ এমন একটা জিনিস যা ভাবগত ও মানসিক দুইই। হিউমার স্রষ্টার মনোভঙ্গীতে সংযম, চিন্তা, করুণা ও সমবেদনার অপরূপ সংমিশ্রণ। জগজ্জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর ও ব্যাপক দৃষ্টি। হিউমারের সঙ্গে এক ধরনের বেদনা মিশে থাকে। আবার বের্গসঁর কথা উদ্ধারযোগ্য—"The humorist often takes delight in poking fun at that which he holds most sacred or at that for which he has a secret sympathy"[৪] হিউমার-স্রষ্টা নিজেই নিজের উৎকেন্দ্রিকতাজনিত ভুলভ্রান্তি নিরীক্ষণ করেন—নিজেকে নিয়েই তিনি হাসেন। ওয়াল্টার পেটার বলেন, হিউমার চোখের জলের সঙ্গে মিশে এমনকি কল্পনার সূক্ষ্মতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে করুণার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে 'রঙ্গ' সম্পর্কেও কিছু বলা আবশ্যক। রঙ্গ (Fun) হল কৌতুক—এতে আক্রমণের কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো উদ্দেশ্যের এ ধার ধারে না; অবিমিশ্র অট্টহাসিতে এ ভেঙে পড়ে। দেহ-মনের সুস্থতার পরিচায়ক হল 'রঙ্গ'। যে সমস্ত

১। Theory and Practice গ্রন্থে উদ্ধৃত, W. Jones pp 145.

২। Dictionary of world Literature : J. T. Shipley pp. 213

৩। Humour is the describing the ludicrous as it is in itself; wit is the exposing it, by comparing or contrasting it with something else. Humour is, as it were the growth of nature and accident; wit is the product of art and fancy"—On Wit and Humour : William Hazlitt pp. 606. Dramatic Theory and criticism Edid. B, F. Dukore.

৪। The Theory of Drama : A. Nicoll pp. 198, 8. Ibid pp. 199.

কারণ থেকে উদ্ভূত হয়ে হাসি হয় সশব্দ ও উচ্চ এবং যাতে কোনো উদ্দেশ্যমূলকতা নেই, তাই হচ্ছে কৌতুক বা রঙ্গ।

কমেডির শ্রেণী:

বহু বৎসরের বিবর্তনে কমেডির মধ্যে এত বেশী বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে, এর শ্রেণী-বিভাজন এক গুরুতর সমস্যা। নানা জনে এর নানা রকম শ্রেণী-বিন্যাসের কথা বলেছেন। আবার এমন অনেক নাটক আছে যাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হবে, তা স্পষ্টভাবে বলা যায় না। অধ্যাপক এ. নিকল কমিক রচনাকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। ক. ফার্স, খ. কমেডি অব রোমান্স, গ. কমেডি অব হিউমার্স, ঘ. কমেডি অব ম্যানার্স, ঙ. কমেডি অব ইন্‌ট্রিগ্। তাঁর কমেডি অব রোমান্সের একটি উপবিভাগ 'রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডি' এবং কমেডি অব ম্যানার্সের একটি উপবিভাগ —জেন্টিল কমেডি। শেক্সপীয়র ও তাঁর পরবর্তী যুগের কমেডিগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে নিকলের এই শ্রেণী পরিচয়। এখানে কিন্তু গ্রীক ও রোমান কমেডিগুলির কথা মনে রাখা হয়নি; এদের কোন্ পর্যায়ভুক্ত করা হবে, তাঁর শ্রেণী বিন্যাসে তার ইঙ্গিত নেই। অবশ্য তাঁর 'World Drama' গ্রন্থে তিনি এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিকে 'ওল্ড কমেডি' বা প্রাচীন কমেডি, অ্যারিস্টোফেনিস ও মিনাণ্ডারের মধ্যবর্তীকালের গ্রীক কমেডিকে 'মধ্যবর্তী কমেডি' এবং মিনাণ্ডারের কমেডিকে 'নব কমেডি' বলেছেন। প্লটাস ও টেরেন্সের রোমান কমেডিগুলিও 'নব কমেডি' নামে পরিচিত। এই সমস্তকে আবার 'ক্লাসিক্যাল কমেডি'ও বলে। মলিয়েরের কমেডিগুলি নানা নামে আখ্যাত হয়েছে। কেউ বলেছেন 'কমেডি অব সোসাইটি' বা 'হিউম্যান কমেডি, কেউ বলেছেন 'কমেডি অব ম্যানার্স', কেউ বলেন 'কমেডি অব স্যাটায়ার' আবার কেউ বলেন 'কমেডি অব ক্যারেক্টার।' নিকল বার্ণার্ড শ এর কমেডিকে 'কমেডি অব আইডিয়াস্' বলেছেন। এ ছাড়া আছে ব্রাইট্ কমেডি, কমিক কমিডি বা গে কমিডি, উদ্ভট কমেডি বা ডার্ক কমেডি, হিরোয়িক কমেডি, সিরিয়াস কমেডি, প্রভৃতি। আমরা নিকল-কথিত বিভাগগুলি গ্রহণ করে কমেডির বিভিন্ন রূপের পরিচয় দিচ্ছি। ফার্সের পরিচয় শেষে দেওয়া হবে— প্রথমে কমেডির শ্রেণী।

ক. রোমান্টিক কমেডি (Comedy of Romance)

শেক্সপীয়রের অধিকাংশ কমেডি এই শ্রেণীভুক্ত। কমেডির সকল শ্রেণীর মধ্যে এটিই সাহিত্য ও অভিনয়-মূল্যে শ্রেষ্ঠ। শেক্সপীয়রের কমেডিগুলির বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এ শ্রেণীর লক্ষণ স্থিরীকৃত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হয় যে, শেক্সপীয়রের দুর্লভ প্রতিভায় এর যে চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে, পরবর্তী এ ধরনের কমেডিতে তার আদর্শ মেলে না। শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে দৃশ্য-সন্নিবেশ-প্রবণতা। 'Midsummer Night's Dream'-এর বৃত্ত এথেন্সের নিকটবর্তী এক অরণ্যে সংস্থাপিত হয়েছে; সাগরের কোলে পুষ্পময় উদ্যান

সম্বলিত নগরে 'Twelfth Night' এর বৃত্ত, 'As you like it' এর বৃত্ত আর্ডেনের অরণ্যে। সচেতনভাবেই শেক্সপীয়র এ কাজ করেছেন। পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রগুলির সঙ্গতি স্থাপনে তিনি দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল চরিত্র-চিত্রণের স্বাতন্ত্র্য। এতে কতকগুলো চরিত্র অতিমাত্রায় রোমান্টিক, কিন্তু এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতির পরিচায়ক বাকী চরিত্রগুলিতে রয়েছে সুন্দর বাস্তবতা। চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রেখেও শেক্সপীয়র হিউমারের সাহায্যে এদের উঁচু সুরকে সংযত করেছেন। এই কমেডিগুলি আমাদের মানসিক বৃত্তি ও ভাববৃত্তিকে যুগপৎ আকৃষ্ট করে। এখানে হাসির উচ্ছ্বসিত রূপ নেই—হাসি স্মিত—প্রসন্নতা ও আনন্দের উপাধানে শায়িত। এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবণতা। প্রেমই রোমান্টিক কমেডির প্রধান বিষয়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনুরাগসঞ্চার, মিলনের পথে বাধা বা সংকট, পরিশেষে সংকট-মুক্তি ও মিলন—এতে দেখানো হয়।[১] প্রায়শই এই জাতের কমেডিতে এক বা একাধিক উপবৃত্ত মূলবৃত্তের অধীন হয়ে দেখা দেয়। মূলের রস-পরিণামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কখনো সাদৃশ্য, কখনো বা বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে উপবৃত্ত বা উপবৃত্তগুলির সহায়তায় মূলবৃত্তকে পুষ্ট করা হয়। শেক্সপীয়রের 'Cymbeline', 'The Winter's tale' ও 'The Tempest' এই তিনখানি স্বাদের দিক থেকে কিছু স্বতন্ত্র। দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্রে বাস্তবতার ধর্ম এগুলিতে অনেক কম, পূর্ববর্তী কমেডিগুলির তুলনায় এখানে গম্ভীর উপাদানের আধিক্য। রোমান্টিক সুরের উন্নয়ন ও ট্রাজিক সুরের ঘনীভবন এদের পৃথক করেছে। এই মিশ্রজাতের কমেডিগুলিকে নিকল রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডি বলেছেন। মোট কথা, শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডিগুলির আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক। অ্যারিস্টোফেনিসের ভাবাবেশ ও উচ্ছ্বাস, প্লটাসের উল্লাসময় হৈ চৈ, টেরেন্সের কৃত্রিম ভাবাবেগ এবং মধ্যযুগীয় ফার্সের স্থূলত্ব এতে নেই। এখানে তন্ময়তা ও মন্ময়তার আশ্চর্য সম্মেলন। নাট্যকার চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েও ঊর্ধ্বে। মনের হাসি এখানে হাত মিলিয়েছে হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে। ভাঁড়েরা এখানে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী—জ্ঞানীরা হয়েছে নির্বোধ। শেক্সপীয়রের এই আদর্শ অন্য কোনো রোমান্টিক কমেডিতেই পুরোপুরি লক্ষিতব্য নয়। তাই মোটের ওপর, একটা রোমান্টিক পটভূমি অথবা রোমান্টিক উপাদান সম্বলিত কোনো কমেডিতে যদি সংবেদনশীল চরিত্র-চিত্রণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে তাকে রোমান্টিক কমেডি বলা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত এই শিথিল আদর্শে মিনাণ্ডারের কমেডি, প্লটাস ও টেরেন্সের কমেডি, লিলি, পীল ও গ্রীন প্রভৃতির কমেডিও রোমান্টিক। আরও একটু শিথিল আদর্শে দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী',

১। "For the Comic plot normally puts its major characters, usually young lovers, on a path towards frustration, but then intercepts this development with a 'Punchline', reversal in which victory and happy ending are wrested out of apparent defeat" p, 164. Perspectives on Drama. By J. L. Calderwood and H. E. Toliver.

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'বশীকরণ' অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল', 'নবযৌবন', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাই তো', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমতো নাটক'—প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। তবে ধারাবাহিকভাবে শেক্সপীয়ারের আদর্শে এ নাটক লিখিত হয় নি।

ব্যঙ্গাত্মক কমেডি (Comedy of Humours)

শেক্সপীয়রের সমকালীন প্রসিদ্ধ নাট্যকার বেন জনসন ব্যঙ্গাত্মক কমিডিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন। জনসন তাঁর এই জাতের কমেডিকে 'কমেডি অব হিউমারস্' নামে অভিহিত করেছিলেন। অথচ 'হিউমার' বলতে আমরা যা বুঝি, তার সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক আছে মূলত ব্যঙ্গের (Satire) সঙ্গেই। তাহলে এ নামের তাৎপর্য কি? তখনকার চিকিৎসা-বিদ্যার একটি প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেই এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এই তত্ত্বে বলা হয়েছিল যে, মানুষের মেজাজ বা স্বভাব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে দেহস্থ চার রকম রসের (Fluid) সমানুপাতিক মিশ্রণে। এগুলি হল humour, Choleric, Phelgmatic ও melancholic.[১] এদের মিশ্রণ যদি সমানুপাতিক না হয়, তাহলেই মানুষ হবে উৎকেন্দ্রিক। মানুষের এই উৎকেন্দ্রিকতাকে অবলম্বন করে রচিত যে কমেডি তাকে প্রথম রসটির নাম অনুসারে জনসন নাম দিলেন 'কমেডি অব হিউমার্স'। ক. এ কমেডিতে উৎকেন্দ্রিক বা ছিটগ্রস্ত মানুষের বিদ্রূপ করা হয়। কমেডির প্রায় সব চরিত্রই অল্প-বিস্তর উৎকেন্দ্রিক হয়—রোমান্টিক কমেডি বা আচারমূলক কমিডিতে উপহাসাস্পদ চরিত্র বা চরিত্রগুলোর পাশে স্বাভাবিক চরিত্রও কিছু থাকে; অবশ্য দু'একটি স্থলে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়—যেমন, জনসনের 'Every Man In His Humour' কমেডিতে এডওয়ার্ড নোয়েল একটি স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় চরিত্র। খ. রোমান্টিক কমেডির সঙ্গে এর বড় পার্থক্য বাস্তবতায়। অবিশ্বাস্য রোমান্সের রাজ্য থেকে কমেডিকে সাধারণ মানুষের দরজায় এনে দিয়েছেন বলে জনসন খুবই গর্ববোধ করতেন। জনসন সমাজের ভণ্ডামি, কৃত্রিমতা, সামাজিক-মানুষের চাল-চলন, রীতি-নীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি। কেবলমাত্র বিশেষ কতকগুলি বাতিকগ্রস্ত মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিদ্রূপ করেছিলেন। বাস্তবতা ও বিদ্রূপের দিক থেকে আচারমূলক কমেডির সঙ্গে তাঁর কমেডির কতকটা মিল থাকলেও এ বাস্তবতা ও বিদ্রূপ মাত্রাতিরিক্ত। গ. এ কমেডিতে শ্রেণী-চরিত্রগুলোকে অতিরঞ্জিত করা হয় বলে বিদ্রূপের সুবিধে। শেক্স-পীয়রের কমেডিতে হিউমার—চিন্তাশীলতা ও করুণায় লীন হয়ে যায়; জনসনে হিউমার ক্রমশ তিক্ত হতে হতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। 'হিউমার'-এর একান্তই অভাব জনসনে। তাই এদের 'কমেডি অব হিউমারস্' বলা ঠিক নয়। অধ্যাপক নিকল এদের ব্যঙ্গাত্মক বা বাস্তবতামূলক কমেডি বলতে অধিক আগ্রহী। ঘ. সাধারণত কৃপণ, ভণ্ড, দাম্ভিক

১। An Introduction to Drama; George Whitfield, p. 74.

মনুষ্যদ্বেষী শ্রেণী-চরিত্রকে এতে আশ্রয় করা হয়—চরিত্র-কেন্দ্রিক কমেডি যে এগুলো তা চরিত্রের নামকরণেই লক্ষ্য করা যায়। 'Every Man in His Humour'-এ ব্রেনওয়ার্ম, জর্জ ডাউনরাইট, ডেলিরিও সরডিডো, ফানগোসো প্রভৃতি নামেই বোঝা যায় নাট্যকারের প্রবণতা। এ কমেডিগুলি রোমান্টিক কমেডির মতো আমাদের আশ্বস্ত করে না। রোমান্সের যাদু সেখানে আমাদের এমন একটা রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে প্রকৃতি ও সমাজ মায়ামুগ্ধ—এমনকি স্বভাব-ভয়ঙ্কর চরিত্রও তখনকার ক্ষমাসুন্দর রাজ্যে কেমন মিশে যায়—কিন্তু জনসনের এই কমেডির সমাপ্তিতে শাস্তির গুরুত্ব—মধুর সমাপ্তি ও বদান্যতার প্রসন্নতায় দীপ্ত নয়। 'ভলপোন' নাটকের শেষে প্রধান চরিত্রগুলোর কারাবরণের কথা বলা হলেও মনে হয় না সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত নীতির জয় হয়েছে। শুধু এটুকু মনে করা যায় যে, সাময়িকভাবে ভলপোনে যে চক্রান্ত হয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। ৬. এ কমেডি গঠনের একটা রীতি আছে। টাইপ চরিত্র সমাজের সাধারণ নীতি বা সাধারণজ্ঞানের আদর্শ থেকে বিচ্যুত। এ চরিত্র নিজের কোনো বদ মতলবকে হাসিল করার জন্যে সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে। আয়োজন যখন সাফল্যের সীমা স্পর্শ করতে যাচ্ছে, তখন অন্য একটি ষড়যন্ত্রের বা কৌশলের সাহায্যে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয় ও স্বস্তিজনক উপসংহার আনা হয়। এখানে উৎকেন্দ্রিকের পরাজয়ের অর্থ তার ভণ্ডামি ছলনা বা তার স্বরূপের মুখোস উদ্ঘাটন। পাশ্চাত্ত্যের বেন জনসন, মলিয়ের, কনগ্রীভ, শেরিডন বার্ণার্ড শ ও আমাদের বাঙলা সাহিত্যে অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধরনের কমিডি লিখেছেন। এই কমেডি রচনায় নাট্যকারের মনে সমাজ-সংস্কারের অভিপ্রায় থাকলেও তাকে প্রচ্ছন্ন রাখতে হবে, নইলে শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ন হবে। অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও 'বৌমা' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' এর দৃষ্টান্ত।

আচারমূলক কমেডি (Comedy of Manners)

সাধারণত 'কমেডি অব ম্যানার্স' বলতে বুঝি যেখানে সমকালীন সমাজের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি হাস্যকরতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে টাইপ চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা দেখানো হয় না—সমাজ থেকে চরিত্র যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আহরণ করে, তারই জন্য তারা এখানে হাস্যাস্পদ—তাদের ত্রুটি চরিত্রগত নয়। যেমন লোভ মানুষের একটা চরিত্রগত দোষ, তা এতে দেখানো হবে না। একজন সমালোচক এ ধরনের কমেডির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—"There have been blunt hearty men, misers, and mockers in all classes and in every age. But the dramatist of the Restoration Period in England laughed at men not so much for their characters as for the way in which they expressed this characters, not for what they were, but for what they did ; not for themselves, but for heir manners. It was this which gave the name 'Comedy of manners' to these plays".[১]

১। An Introduction to Drama : George Whitfield p. 89.

দেখা যাচ্ছে একটি বিশেষ সমাজের আচার-আচরণই এখানে লক্ষ্য। চারিত্রিক কোনো দোষ বা ত্রুটি নয়—মানুষ নয়, মানুষের কাজ ও আচরণের বৈশিষ্ট্যকে হাসির সাহায্যে আঘাত।[১] এ কমেডিতেও ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু তা জনসনের মতো আক্রমণাত্মক নয়, অত্যন্ত মৃদু। একটা পরিচ্ছন্ন সমাজের শরিক হতে চলেছে যে সব মানুষ তাদের জীবনাচরণগত ত্রুটির প্রতি এর মৃদু বিদ্রূপ। সাধারণত বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রয়াসী-ব্যক্তি, দাম্ভিক, অসার বাবুগিরিকামী ব্যক্তি ও নাছোড়বান্দা মানুষের প্রতি এর সামান্য বিদ্রূপ।

চমৎকার উইট প্রয়োগের কৃতিত্ব এ কমেডিতে যেমন লক্ষ্য করা যায়, তা অন্য কোথাও দুর্লক্ষ্য। বাক্‌কেলির আশ্চর্য আকর্ষণ কমেডিগুলিকে উচ্চমূল্য দিয়েছে। জনসনের কমেডিতে এ বৈশিষ্ট্য একরূপ নেই বললেই চলে। আচারমূলক কমেডিতে গ্রাম্যতার কিছু ছাপ আছে। কিন্তু যেহেতু এগুলো বুদ্ধিগ্রাহ্য সেজন্য ক্ষতিকারক নয়। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য এর বিষয়বস্তু ও চরিত্রের কৃত্রিমতা। এতে বাস্তবতা আছে, তবে জনসনের বাস্তবতা নেই—এতেও বাস্তবজীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়, তবে প্রকৃত জীবন এখানে দেখা দেয় কৃত্রিম হয়ে। বাস্তবের সূক্ষ্ম রূপই এতে থাকে। এথিরীজ ও কনগ্রীভ তাঁদের সময়ের পরিচ্ছন্ন দিকগুলি—যুগের দ্বিধা, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা ও আনন্দকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁরা যে 'ম্যানার্স'কে তুলে ধরে রসিকতা করেছেন তা কৃত্রিম। সপ্তদশ শতকের শেষ দিক ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর সমাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এ কমেডিকে ভালভাবে বোঝা যাবে না। ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর সমাজের আত্মসচেতন মানুষের কৃত্রিমতা ও মার্জিত কিছু হাস্যকর আচরণ-বৈশিষ্ট্য এতে রূপ পায়। স্বাভাবিক মানুষ ও ঐ সমাজ-অন্তর্গত মানুষ দুয়ের অবস্থান কমেডিতে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। আমাদের ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের কিছু মানুষের এই ধরনের আচরণ এমন কমেডির বিষয়বস্তু হতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজের কিছু আচরণ ও রীতিনীতি, ইয়ং-বেঙলীয় সমাজের চালচলন প্রভৃতিও এর বিষয় হতে পারে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন ইয়ং-বেঙলীয় সমাজের রীতিনীতিকে কটাক্ষ করেছেন। 'ব্যাপিকাবিদায়'-এ অমৃতলাল ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজ অনুকরণকারীদের আক্রমণ করেছেন। 'বাবু'তে ব্রাহ্মসমাজকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের কমেডিতে 'উইট' মুখ্য নয়। অমৃতলালের 'বাবু'তে উদগ্র আক্রমণ। উইটকে বাদ দিয়ে একটু শিথিলভাবে গ্রহণ করলে আমরা কিছু কিছু বাঙলা কমেডিকে আচরণমূলক বলতে পারি।

---

১. অধ্যাপক নিকল Manner শব্দটির তিন রকম অর্থ করেছেন, ক. মানুষের জীবনযাত্রার ধারা, খ. কৃত্রিম একটি সমাজের রীতিনীতি এবং গ. নর-নারীর কিছু উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য—"a habit of refined culture, something that looks "a little Jene-Scay-quoysh." খ ও গ এর অর্থেই তিনি শব্দটিকে গ্রহণ করতে চান। (The Theory of Drama :, pp. 223)

মার্জিত বা শোভন কমেডি (Genteel Comedy)

আর এক ধরনের কমেডির কথা নিকল বলেছেন। তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র-সমাজের কৃত্রিম হাবভাব, চাল-চলন ও রীতিনীতিকে নিয়ে পরিহাসমূলক যে রচনা, তার নাম মার্জিত বা শোভন কমেডি। যে বিশেষ সমাজে আচরণমূলক কমেডির উদ্ভব হয়েছিল, সেই সমাজ বিদায় নিলে ঐ শ্রেণীর কমেডিও লুপ্ত হতে চলল। কিন্তু সম্পূর্ণ লুপ্ত হল না। একটু পরিবর্তিত আকারে 'শোভন কমেডি'র মধ্যে তার অস্তিত্ব রক্ষা পেল। অ্যাডিসন এ নাটকের নামকরণ করেছিলেন 'Genteel'. The Modern British Dramaতে (1811) এই কমেডির পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, এতে মানুষের স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম রূপের পরিচয় থাকে। একটা অভিজাত সমাজের অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও অভ্যাসের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের ফলে এক শ্রেণীর চরিত্র যে রকম আচরণ করে তারই কৃত্রিমতাকে এখানে কটাক্ষ করা হয়। এতে গ্রাম্যতা থাকে না, সব কিছুকেই ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হয়। কৃত্রিম ভাব-প্রবণতার আবরণে অবৈধ প্রেম আচ্ছাদিত থাকে এখানে। উইট বা বাক্‌চাতুর্য এতে থাকল না। সাধারণ মানুষও নির্বাসিত হল। মদ্যপান, ষড়যন্ত্র থাকল কিন্তু ভাবাবেগের মোড়কে। অমৃত-লালের 'ব্যাপিকা বিদায়'-কে এই শ্রেণীর কমেডির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। এখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সন্দেহ আছে, হিন্দুসমাজের রীতিনীতির প্রতি উপেক্ষা আছে, বাংলা মাস সম্পর্কে ইঙ্গবঙ্গীয় নারী মিঃ পাকড়াসীর অজ্ঞতা আছে, বাঙালীর পরিচিত শব্দগুলি নিয়ে উল্লাসিকতা আছে। কিন্তু এ-টি উইট-প্রধান। তাই নিকলের শ্রেণী অনুযায়ী আচারমূলক ও শোভন কমেডি এ দুটিকে গ্রহণ না করে উইটমুখ্য বা উইটগৌণ আচারমূলক কমেডিকেই আমরা বাঙলা ভাষায় গ্রহণ করতে পারি।

ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি (Comedy of Intrigue)

ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল এই কমেডির ধারাটি বহমান ছিল—ফ্লেচারের সময় থেকে অষ্টাদশ শতক জুড়ে। ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র ও বৃত্তের জটিলতা থেকেই এ কমেডিতে হাসির সৃষ্টি হয়। ঘটনা-পরম্পরার নিপুণ সজ্জায় ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় ফ্লেচারের এ শ্রেণীর কয়েকটি কমেডি উল্লেখযোগ্য। ভুলের ওপর ভিত্তি করে এর বৃত্ত আকর্ষণীয় হয়। ফার্সের হৈ চৈ স্থূলত্ব এতে নেই, তবে ফার্সের মতই এ ঘটনানির্ভর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র ও ঘটনার জটিলতা মিলিয়ে গিয়ে হাসির সৃষ্টি করে। এ হাসি আসে আবার মানসিক অসঙ্গতি থেকে। উইট, হিউমার বা স্যাটায়ার-এর প্রয়োগ এখানে নেই বললেই চলে। তবে অন্য কমেডির তুলনায় এর সর্বজনীন আবেদন কিছু বেশী। যে ষড়যন্ত্রের কথা এতে রূপায়িত হয়, তা কোনো বিশেষ কালের বা স্থানের নয়—সব যুগের পক্ষেই তা সত্য। আমাদের বাঙলা ভাষায় কমেডির তুলনায় ফার্স লেখা হয়েছে বেশী। ঘটনানির্ভর রঙ্গরসমুখ্য অনেক প্রহসন এই শ্রেণীর। রামনারায়ণের 'উভয় সঙ্কট', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'অলীকবাবু', অমৃতলালের

'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' প্রভৃতি ফার্স এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কমেডির বিবর্তন

গ্রীসের অ্যারিস্টোফেনিসই পুরাতন কমেডির পত্তন করেন। তাঁর মাত্র এগারখানি কমেডি পাওয়া গেছে। তিনি কমেডিতে নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছেন। মানুষের সমাজের উচ্চ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে এই আক্রমণের প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। যুদ্ধ, নগরজীবনের কলুষতা, প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং সাম্যবাদের ভান প্রভৃতি নিয়ে তিনি ঠাট্টা পরিহাস করেছেন। জনপ্রিয় রাজনৈতিক বক্তা Cleon, কু-তার্কিক Socrates এবং রোমান্টিক Euripides —এঁদেরকে এবং এঁদের চিন্তাধারাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। আর এঁদের পাশাপাশি কোরাসের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক চিত্রটি তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণের তীব্রতা না থাকায় তাঁর 'Birds' কমেডিটি বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কমেডির পর তাঁর রচিত পরবর্তী কমেডিগুলিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও সাধারণ দোষ-ত্রুটি প্রদর্শনে বেশী মনোনিবেশ করা হয়েছে এবং কোরাসের ভূমিকা গৌণ হয়েছে। এর ফলে কমেডিতে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছিল বলতে পারি। তাঁর 'Plutus' কমেডির বিষয় ধনসম্পত্তি ও দারিদ্র্য, কিন্তু এতে দেবতা Plutus-কে দেবতাদের দূরতম রাজ্য থেকে মর্ত মানুষের নিকটে নামিয়ে আনা হয়েছে, এইটে খুব মূল্যবান কথা।

মধ্য পর্বের (Middle) কমেডির বড় একটা নিদর্শন মেলেনি, কিন্তু এগুলোতে খুব সম্ভবত দেবতা ও মানুষের একযোগে কাজ করার চিত্র বেশী স্থান পেয়েছিল মনে করা যায়। এর পরেই নূতন কমেডিতে (New) দেখা গেল মানুষের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে—নায়ক ও নায়িকার শেষ-পর্যন্ত মিলন দেখানোই নাট্যকারের অভিপ্রায়। খুব সম্ভবত 'ফ্যালিক' গানের প্রভাবে এই রকম হয়েছিল এবং এই রীতিটি পরবর্তীকালে কমেডির একটা প্রধান বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আর এখন থেকে তরুণদের সঙ্গে তরুণীর বিবাহ একটা সর্বজনীন আনন্দের ব্যাপার হল এবং পূর্ববর্তী কমেডিগুলির সঙ্গে এই বিশেষত্বে পার্থক্য রচনা করল।

এই সূত্র ধরেই মিনাণ্ডার কমিডি রচনায় এগিয়ে এলেন (৩০০ খৃ: পূ:)। তারও পরে প্লটাস ও টেরেন্স এই পথ ধরেই চললেন। তবে পূর্বোক্ত কাহিনীতে বা বৃত্তে তাঁরা সমকালীন জীবনের উদ্ভটত্বকেও যুক্ত করলেন। রোমান্টিক প্রণয়-চিত্রে নায়ক ও প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রগুলোকে স্পষ্টভাবেই অঙ্কন করা হল। টাইপ চরিত্রও স্থান পেল। এঁরা দুজনেই শক্তিমান কমেডি লেখক। সুস্থ বিচারবোধ ও সংযত হাস্যরসের সাহায্যে তাঁরা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। অ্যারিস্টোফেনিস থেকে টেরেন্স পর্যন্ত

কমেডি রচনার এই ক্লাসিক ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি বিশেষ দর্শনচিন্তার ছায়াতলে যেন এগুলি লিখিত। সকলের কল্যাণের অনুকূল করেই ব্যক্তির কল্যাণের চিত্র উপস্থাপিত করতে হবে। কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি যে ভালো নয়, এই গ্রীক চিন্তার আদর্শ সামাজিক এই কমেডিগুলি রচনার পশ্চাতে সক্রিয় ছিল।

কমেডি রচনার এই আদর্শ আরও পরে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল; অবশ্য ঐ আদর্শই মূলতঃ নানাভাবে নানাস্থানে গৃহীত হল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের নানা কাহিনীর সঙ্গে কখনো বা 'মিরাকেল প্লে'র মধ্যে তার প্রভাব অনুভূত হল। ইতালীতে Ribaldo ও Machiavelliর ইতর চরিত্রাশ্রয়ী কমেডিতে তার ছায়া পড়ল; অবশ্য ইতালীয় কমেডিতে 'কমেডিয়া ডেল আর্টে'র ঐতিহ্যকেও যুক্ত করা হয়েছিল। হাস্যকর লম্পট চরিত্রও তাই সহজেই ঠাঁই পেল।

ইংলণ্ডে কমেডি রচনার বিকাশ-ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ধর্মমূলক 'মিরাকেল-প্লে' যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত 'মরালিটি প্লে'তে রূপান্তরিত হল, তখন সেখানকার থিয়েটার স্বাতন্ত্র্যলাভ করল।

John Heywood-এর লেখা বাস্তব মাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইন্টারলুডের মধ্য দিয়েও ঐ ধারাটি অক্ষুণ্ণ রইল। প্লটাসের প্রবর্তিত রীতিটি অনুকৃত বা সংশোধিত আকারে গৃহীত হতে থাকল। তারপর এই ধারাটি আরও সমৃদ্ধিলাভ করল জন লিলির (John Lyly) কমেডি ও রবার্ট গ্রীনের (Robert Green) রোমান্সমূলক রচনায়। আর এই ধারা সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মহাকবি শেক্সপীয়ারের প্রচেষ্টায়।

প্রথম জীবনে শেক্সপীয়র ক্লাসিক আদর্শে একখানি ফার্সধর্মী কমেডি লিখেছিলেন। তা হল "The Comedy of Errors'. তারপর নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে লেখা 'Love's Labour's Lost'। আরও পরে 'The Two Gentlemen of Verona'। এগুলোর থেকে আরও সমৃদ্ধ রচনা হল তাঁর 'Twelfth Night', 'Much Ado About Nothing' ও 'As you Like It'. এরই মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ফলস্টাফ। কিন্তু জীবনের লঘু-চঞ্চল দিকটি তাঁকে বেশীদিন আকৃষ্ট করল না—জীবনের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে চাইলেন—ফলে সৃষ্টি হল তাঁর অমর ট্রাজিডিগুলি। ট্রাজিক ও কমিক উপাদানকে মিশ্রিত করে জীবনের শেষ দিকে তিনি লিখলেন 'The Winter's Tale' ও 'Tempest'-এর মতো ট্রাজি-কমিডি।

একই নাটকের মধ্যে ট্রাজিক ও কমিক উপাদান মিশ্রিত করে নাটক রচনার প্রয়াস যখন ইংলণ্ডে চলছে, তখন স্পেনেও ঐ একই মনোবৃত্তি নিয়ে দেখা দিলেন লোপ ডি ভেগা (Lope De Vega) ও ক্যালডেরন (Calderon)। মধ্যযুগীয় বীরত্ব ও রোম্যান্সকে তাঁরা নিয়ে এলেন একেবারে পরিচিত বাস্তব জীবনের আঙিনায়।

যুক্তিবাদী ফরাসী নাট্যকারগণদের মাঝখানে সপ্তদশ শতকে যখন মলিয়েঁ (Moliere) এলেন, তখন কমেডির সীমাও যেমন, তেমনি তার মূল্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। তিনি লিখলেন লঘুরসের ফার্স, ব্যালেট ও প্রচুর কমেডি। ১৬৫৩ থেকে

১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত ২২ খানি কমেডিতে নানাভাবে সমাজ-সমালোচনার মনোভাব তাঁর লক্ষ্য করা গেল। বিবাহ, ধর্মের ভান, সামাজিক শ্রেণীভেদ—কোনো কিছুই তাঁর আক্রমণ থেকে বাদ পড়ল না। হাস্যরস-সৃষ্টির নৈপুণ্যে, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতায়, পরিস্থিতি-রচনার কৌশলে এবং সর্বোপরি নাটকীয় গুণসম্পন্ন করার শক্তিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় কমেডি-রচয়িতা। তাঁর হাতে সামাজিক কমেডি রচনার আদর্শ স্থির হয়ে গেল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে।

রেস্টোরেশন যুগের ইংলণ্ডে মলিয়েরের আদর্শকে গ্রহণ করে এথ্রিরীজ (Etherege), ওয়াইচার্লি (Wycherly), কনগ্রীভ Congreve), ভ্যানব্রাগ (Vanbrugh) প্রভৃতি কমেডি লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন। বেন জনসন যে 'কমেডি অব হিউমারস্'-এর প্রবর্তন করেছিলেন, তারই পাশে এঁরা 'কমেডি অব ম্যানার্স'কে তুলে ধরলেন। জনসনের ধারা ম্লান হয়ে গেল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে 'সেন্টিমেন্টাল কমেডির'র জয়ঢাক বেজে উঠল। একে ট্রাজিডি বা কমেডি ঠিক কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যাবে তা নিয়ে অসুবিধেও দেখা দিল।

যুক্তিবাদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় এবং মানুষ পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম—এই বিশ্বাস থেকে ইতালিতে Goldoni, জার্মানীতে লেসিং (Lessing), ফ্রান্সে Beaumarchais —এঁরা এক নূতন ধরনের কমেডি লিখলেন।

ইংলণ্ডেও এই ধারায় গোল্ডস্মিথ ও শেরিডনকে লিখতে দেখা গেল। বুদ্ধির সঙ্গে ভাবাবেগকে মিশ্রিত করেই এ শ্রেণীর রচনা। এঁদের লেখায় ঠিক প্রচলিত নাটকের সঙ্গতি দেখা গেল না। কিন্তু জীবনের দুটো দিককে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পারায় তা জনপ্রিয়তা অর্জন করল। এগুলি বুদ্ধি ও আবেগদৃপ্ত রচনা।

রোমান্টিকতার সঙ্গে বাস্তবতার অর্থাৎ ভাবাবেগের সঙ্গে বুদ্ধির পরিপূর্ণ সমন্বয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও ঠিক সম্পূর্ণতা পেল না। রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ বাস্তবতাকে অনেকখানি দমন করে রাখল।

তারপরেই বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের আবির্ভাব ঘটল। কমেডি ও ট্রাজিডি—দুই শ্রেণীর রচনায় তিনি অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করলেন। সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁর গভীরতম বোধ, বুদ্ধিবৃত্তিকে ছাড়িয়ে মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে উদ্‌ঘাটিত করতে চাইল। সমস্ত অসঙ্গতি, সমস্ত অপূর্ণতা নিয়ে যে মানুষ—যাকে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন তারই চিত্র তিনি উপস্থিত করলেন। মানুষ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে নীতি হল এক আপেক্ষিক বস্তু এবং অমূর্ত নৈতিক মূল্য সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ট্রাজিডি ও কমেডির কৃত্রিম ভেদরেখাকে তিনি ছিন্ন করে দিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর প্রভাব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষয়িষ্ণু অবক্ষয়ী অভিজাত সমাজের চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করলেন চেকভ (Chekhov), ও ইতালীতে পিরাণ্ডেল্লো (Pirandello), মানুষের বাহ্য রূপ ও আন্তর সত্যের মধ্যে যে ব্যবধান সেটাকে অলৌকিক পন্থায় তাঁরা ব্যঞ্জিত করতে চাইলেন। আয়ার্লাণ্ডে এলেন

সিঙ্গ (Synge) এবং ইংলণ্ডে দেখা দিলেন বিশ্ববন্দিত জর্জ বার্ণার্ড শ। সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তব জীবনে তিনি দেখতে না পেয়ে বুদ্ধির শাণিত তরবারিতে আক্রমণ চালিয়ে গেছেন তাঁর কমেডিতে। আলোচনা ও তর্কের মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের অজস্র গলদ ও ত্রুটির দিকে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন। এই হল সংক্ষেপে পাশ্চাত্য কমেডি রচনার রূপরেখা।

কমেডি ও বাংলা নাটক :

আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চাইলে কি দেখতে পাই? ট্রাজিডির চেয়ে বাঙালী নাট্যকারগণ হাস্যরসাত্মক রচনায় অধিকতর উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য কমেডি নয়, ফার্স রচনা প্রচুর হয়েছে বাঙলাভাষায়। কিন্তু যথার্থ ট্রাজিডি সেই তুলনায় কিন্তু খুব কম। পাশ্চাত্যে কমেডির যেভাবে বিবর্তন হয়েছে, তাতে কমেডির বহু বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সেইখানে কমেডিকে প্রধানত হাস্যরসাত্মক লঘু কমেডি ও গম্ভীর-ভাবের গুরু কমেডি, এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। বাঙলা কমেডিতে দুই প্রকার শ্রেণীই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি প্রায় সবই গম্ভীর-রসাত্মক ও মিলনাত্মক। তাই সেগুলিকেও গম্ভীর-রসাত্মক কমেডি বলাই উচিত অন্তত রসের দিক থেকে; কিংবা যেখানে ট্রাজিডির সুর প্রবল হয়ে উঠে অন্তিমে তার নিরর্থকতা দেখিয়ে ট্রাজিডি-নায়কের জীবনকে পরম-প্রাপ্তির আনন্দে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে ট্রাজি-কমিডি বলাই ভালো। তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি আমাদের প্রথম কমেডি। 'প্রণয়'-এর মূল বিষয়। মহাভারতের কাহিনী থেকে এর ঘটনা গৃহীত হলেও দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দেবার বলরামের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে অর্জুন ও সুভদ্রার মিলন এখানে দেখানো হয়েছে। এটি একটি গুরু-কমেডি। এর পরে মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" নাটক দুটিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃত রোমান্টিক কমেডিগুলির আদর্শে এগুলির কাহিনী পরিকল্পনা—তাই এগুলোকে ট্রাজি-কমিডি বললেও অন্যায় হয় না। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" লঘু ফার্স-ধর্মী বা মিশ্র কমেডি।

দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী' ও 'কমলে কামিনী' তিনটিই রোমান্টিক লঘু কমেডি। গিরিশচন্দ্রের গম্ভীর ভাবাত্মক পৌরাণিক 'নাটকগুলি' ট্রাজি-কমিডির অন্তর্গত। অবশ্য তাঁর 'জনা' এবং ক্ষীরোদ প্রসাদের 'নরনারায়ণ' নাটকের মধ্যে ট্রাজিক সুরকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চ থেকে জনা ও কর্ণ সম্পর্কে কী মনোভাব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে তারই ওপর এর রসপরিণাম নির্ভর করছে। ভক্তিরসাত্মক নাটকে এঁদের জীবনের শূন্যতার ব্যথাকে বড় করে তোলার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই নাট্যকারের নয়। পাশ্চাত্য ট্রাজিডির সংস্কার নিয়ে রঙ্গমঞ্চে

ভক্তিমূলক নাটক দেখতে কয়জন দর্শক ভিড় করে? যাই হোক, তাঁর সামাজিক নাটক 'মায়াবসান'ও এই শ্রেণীভুক্ত গুরু কমেডি।

অমৃতলালের 'খাসদখল' ও 'নবযৌবন' লঘু রোমান্টিক কমেডি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সেবারপতন' গুরু ট্রাজি-কমিডি। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', মিশ্র নাটিকা 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা' লঘু কমেডি।

রবীন্দ্রোত্তর যুগেও কমেডি রচিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ' 'ভূতপূর্ব স্বামী' প্রভৃতি লঘু কমেডি। রোমান্টিক কমেডি রচনায় তিনি খুবই সিদ্ধহস্ত। একটুখানি বক্র ও শ্লেষাত্মক দৃষ্টি তাঁর। বনফুলও লঘু রোমান্টিক কমেডি রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর 'কঞ্চি', 'মধ্যবিত্ত', 'বন্ধনমোচন', 'মন্ত্রমুগ্ধ' প্রভৃতির মধ্যে 'কঞ্চি'কে ট্রাজি-কমিডি বলা দোষের নয়।

মনোজ মিত্রের 'অবসন্ন প্রজাপতি' নিশ্চয়ই লঘু কমেডি। তবে একালে কেউ কেউ এমন নাটক লিখছেন যাকে ট্রাজিডি বা কমেডি এ দুয়ের কোনো একটিতে বিশেষিত করা কঠিন। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছে না', বাদল সরকারের 'ঘাম শ্যাম যদু' প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, পাশ্চাত্যে কমেডি রচনার ধারা উদ্ভবকাল থেকে যে-ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, আমাদের বাংলা নাটকে কমেডির বিবর্তন তার সঙ্গে তুলিত হতে পারে না। আমাদের নাট্যকারেরা প্রায় সকলেই ট্রাজিডি ও কমেডি দুইই লিখেছেন; পুরোপুরি কমেডি রচনার মেজাজ খুব অল্পসংখ্যক নাট্যকারদের মধ্যে মেলে। লঘু রোমান্টিক কমেডি রচনায় মধুসূদন, দীনবন্ধু, অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ বিশী সাফল্যলাভ করেছেন, একথা বলা যায়।

হাস্যমূল ও বাংলা নাটক ঃ

হাসির উৎপত্তি সম্পর্কে যে নানা হেতুর কথা বলা হয়েছে, তা মনে রাখলে ফার্স ও কমেডিতে নাট্যকারদের হাস্যরসসৃষ্টির নৈপুণ্য বোঝা যাবে। ভারতীয় আলংকারিকেরা হাস্যরসের মূল হিসেবে আকার, বাক, বেশ ও চেষ্টার বিকৃতির কথা বলেছেন। অন্তত একটি করে দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে। অতিরিক্ত দীর্ঘ, স্থূল বা বামন ব্যক্তি নাটকের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে কিংবা পাশাপাশি অতিরিক্ত লম্বা মানুষের সঙ্গে বেঁটে মানুষ প্রবেশ করলে হাস্যরস সৃষ্ট হবে। দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'তে স্থূলকায় জলধরকে দেখলেই হাসি পায়। কিংবা এই ব্যক্তি যখন 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী'তে মালতীর জন্যে প্রতীক্ষা করে, বা হামাগুড়ি দিয়ে যায়, তখন আকার-বিকৃতির জন্যে হাসতে হয়। স্বাভাবিকভাবে কথা না বলে কেউ বিকৃতভাবে কোনো কিছু বললেও না হেসে পারা যায় না। 'সধবার একাদশী'তে ভোলাচাঁদের ভুল ইংরেজি, 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদারের মুদ্রাদোষ, অমৃতলালের নানা প্রহসনে সাহেবের বাংলাভাষা, হিন্দুস্থানীর

বাংলাভাষা. 'ব্যাপিকা-বিদায়'-এ ঘনশ্যামের তোতলামি প্রভৃতি বাক্‌বিকৃতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টির মূল। মধুসূদনের বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদের নাগর বেশ, দীনবন্ধুর বৃদ্ধ রাজীবের বরবেশ বেশ-বিকৃতির দৃষ্টান্ত। চেষ্টা হল আচরণ-বিকৃতি—বৃদ্ধ রাজীবের ছদ্মবেশী বধূকে চিনতে না পেরে প্রণয়-উচ্ছ্বাস, ভক্তপ্রসাদের কামার্ত হয়ে শিবমন্দিরে মুসলমান রমণীকে ভোগ করার অভিপ্রায়ে যাত্রা—প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

হাস্যাস্পদ ব্যক্তির অসামাজিকতা ও দর্শকদের তার প্রতি সহানুভূতির অভাব যে বের্গসঁর কথায় হাস্যরসের মূল, এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। হাস্যাস্পদ ব্যক্তি বা তার কথার কিংবা ঘটনার যন্ত্রবৎ স্বয়ংক্রিয়তাও হাস্যরসের কারণ হতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' নাটকে সকলেই যখন যাদবকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে, তখন সেও যন্ত্রবৎ চালিত হয়েছে। 'জামাইবারিক'এ বিন্দু ও বগলার হাতে চোরের নিগৃহীত অবস্থা যন্ত্রবৎ বলেই মনে হয়। 'সাজাহান' নাটকে দিলদারের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ অনেক উক্তি যন্ত্রবৎ মোরাদ পুনরাবৃত্তি করেছে। নাটকের পাত্রপাত্রী যে ঘটনা জানে না, তা যদি দর্শকের জানা থাকে, তাহলে কমেডি বা কার্সে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এখানে নিজের সম্বন্ধে গর্ববোধই হাসির কারণ। 'জামাইবারি'ক-এ যখন ছেলের দল লুকিয়ে পিন ফুটিয়ে একটি সাপে কামড়েছে বলে রাজীবকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করালো, তখন তার আচরণ হাসির সৃষ্টি করে।

মোট কথা হাসি যে পথেই সৃষ্ট হোক না কেন, সবচেয়ে বড় কথা অসঙ্গতি। অধিকাংশ হাস্যরসের মূলেই এই অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করা যাবে। অমৃতলালের বহু প্রহসনে নামগুলিই শুধুমাত্র হাসির কারণ হয়েছে। এখানে স্বাভাবিক নামের সঙ্গে তাদের নামের সঙ্গতি নেই বলেই হাসি পায়। স্ত্রীলোকের পুরুষালি আচরণ, পুরুষের স্ত্রীসুলভ আচরণ—এগুলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা গেলেও অসঙ্গতির সূত্রেও ব্যাখ্যা করা যায়।

ফার্স :

আধুনিককালে ফার্স বলতে আমরা যা বুঝি, পাশ্চাত্যে তার জন্ম সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে। কিন্তু ফার্সের উপাদান বহুকাল পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রাথমিক পর্যায়ে তাই ফার্সের ধর্ম লক্ষিত হয়। গ্রীসে যখন প্রথম কমেডির সৃষ্টি হয়, তখন তার মধ্যে 'মেগারীয় ফার্স'এর অনেক উপাদান প্রবেশ করে। অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিতে ফার্সের উপাদান প্রচুর। ইতালীতে অতি প্রাচীনকালে যে 'কমেডিয়া ডেল আর্ট' ছিল তাতেও ফার্সের লক্ষণ নিহিত আছে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপে তখন 'ফার্স' নামে নাট্যসাহিত্যের বিশেষ একটি স্বতন্ত্র প্রজাতির জন্ম হয় নি। মেগারীয় আমোদ প্রমোদের বিচিত্র ভাবভঙ্গী সমন্বিত অনুষ্ঠানকে এখন আমরা আধুনিক ভাষায় 'মেগারীয়

ফার্স বলছি। মূল ল্যাটিন Farcio শব্দটি থেকে ইংরেজি Farce শব্দটির উৎপত্তি। ঠেসে ভরতি করে কোনো কিছুকে স্ফীত করে তোলাই হল ফার্স শব্দটির মূল অর্থ।[১] মধ্যযুগের গীর্জায় প্রার্থনামূলক অনুষ্ঠানে কিছু ব্যাখ্যেয় অতিরিক্ত অংশ সংযোজনকে অর্থাৎ এই প্রক্ষিপ্ত অংশকেই বলত ফার্স। পরে শব্দটির অর্থ-পরিবর্তন হল। তখন এর অর্থ দাঁড়াল 'পূর্বপ্রস্তুতিহীন এক ধরনের ভাঁড়ামি।' আরও পরে হল 'এক শ্রেণীর নাট্যরচনা যাতে নিম্নশ্রেণীর কৌতুক ও অতিরঞ্জিত সংলাপ থাকবে।' সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইংলণ্ডে শব্দটির বহুল ব্যবহার হতে থাকে—কিন্তু তখনো একটা সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ এ লাভ করতে পারে নি। অধ্যাপক নিকল এর যা ইতিহাস শুনিয়েছেন, তাতে দেখি ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দেরপর থেকে ইংলণ্ডে কমেডি রচনার ধারায় অবনতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং দর্শকদের মধ্যে হাস্যকর, দুর্বল ও নিম্নমানের রচনার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তখন পাঁচ অঙ্কের কমেডির বদলে তিন অঙ্কের হাস্যোদ্রেককর নাটক রচনার ফ্যাসন প্রবর্তিত হয়। পাঁচ অঙ্কের উন্নত কমেডিগুলি থেকে এই নিম্নমানের নাটকগুলিকে পৃথক করার জন্য 'ফার্স' শব্দটির ব্যবহার হল। আর তখন থেকে ফার্স হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত, হাস্যকর নাট্যরচনা যাতে অতিরঞ্জিত, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ থাকবে। আয়তন সংক্ষিপ্ত বলে চরিত্র-বিশ্লেষণ এতে থাকবে না। প্লট বা বৃত্তের সংহত বিন্যাসও থাকবে না। হৈ হুল্লোড়, ধস্তাধস্তি, চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে অট্টহাস্যের এক জগৎ এতে সৃষ্ট হবে। এই অর্থেই 'ফার্স' আধুনিক কালেও ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অধ্যাপক নিকল করেন।' বস্তুত আধুনিক কালে ফার্স হল মূলত নিম্নস্তরের সংক্ষিপ্ত কমেডি, যার মূল-উদ্দেশ্য অঙ্গভঙ্গী, ভাঁড়ামি ও ঘটনা পরিস্থিতির-সৃজনের সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা; আর তা প্রচলিত নানা শ্রেণীর কমেডিগুলি থেকে স্বতন্ত্র।[২] ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইংলণ্ডে একটি বড় নাটক অভিনয়ের পর 'আফ্‌টার পীস' হিসেবে ঘটনা-প্রধান ছোট্ট হাস্যরসাত্মক এই ফার্স অভিনীত হতে শুরু করেছিল। উনিশ শতকে ফার্স একদিকে আচারমূলক কমেডির অবক্ষয়ীরূপে ও অন্যদিকে নাচগান আবৃত্তির সংমিশ্রণে বিচিত্রানুষ্ঠান, 'একস্ট্রাভ্যাগাঞ্জা', 'প্যাণ্টোমাইম' (নির্বাক অভিনয় বা নাটক) ও 'বারলেস্ক' প্রভৃতির সঙ্গে অনেক ব্যাপারে সাদৃশ্য দেখিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তা বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে এবং বিশ শতকে এসে দেখা গেল ফার্স হচ্ছে শারীরিক ক্রিয়ামুখ্য কমেডিরই এক প্রাথমিক রূপ।[৩]

সে যাই হোক, ফার্সে ঘটনাসন্ধি বা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে কোনো রকম উচ্চস্তরের নাটকীয় কলাকৌশল প্রত্যাশিত নয়। এতে টাইপ চরিত্রই থাকবে এবং ঘটনার

১. Oxford Companion to English Literature

২. Farce generally means low Comedy intended solely to provoke laughter through gestures, buffonery, action or situation, as opposed to Comedy of character or manners.—D. O. W. L. Edtd. by J. T. Shipley, P. 157.

৩. Farce during the 19th and 20th C. has thus, in effect, resumed its original status as elemental Comedy of Physical action.—D. O. W. L., P. 157.

বাহ্য বৈশিষ্ট্য থেকে হাস্যরস সৃষ্ট হবে। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কমেডি যে ভাবে স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে, তাতে বেশ বোঝা যায়, এ হল কমেডিরই একটা স্থূল ও নিম্নমানের রূপ। সেইজন্য কেউ একে Exaggerated Comedy, অতিরঞ্জিত বা Low Comedy বা নিম্নস্তরের কমেডিও বলেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রেষ্ঠ কমেডির একেবারে বিপরীত প্রান্তবাসী হল ফার্স। চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা ও বহির্গত ঘটনার পরিবর্তে গভীরতর কিছুর ইঙ্গিত থাকে শ্রেষ্ঠ কমেডিতে। আর এইখানেই ফার্সের সঙ্গে কমেডির মূল পার্থক্য। ঠিক একই কারণে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিও মেলোড্রামা থেকে স্বতন্ত্র। অধ্যাপক নিকল তাই স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "It is, then some inner quality—the stressing of the spiritual as opposed to the merely physical—that makes tragedy out of melodrama and comedy out of farce." অদ্ভুত ঘটনা ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে সংক্ষিপ্ত আয়তনে ফার্স স্থূল হাসোর সৃষ্টি করে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রচুর প্রহসন লিখিত হয়েছে। ভারতীয় আলংকারিকগণ এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। ইংরেজি ফার্সের প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রহসন' শব্দের প্রয়োগ দীর্ঘকালের। কিন্তু এই প্রয়োগ যথার্থ কিনা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সংস্কৃত 'দৃশ্য-শ্রব্য-কাব্য'-এর অন্তর্গত দশরূপক-এর অন্যতম হল প্রহসন। আচার্য ভরত,[১] ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ প্রহসনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন; টীকাকারেরা এর বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। ভরত প্রহসনকে শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ বা মিশ্র এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ 'বিকৃত' প্রহসন নামে এর আরও একটি বিভাগ করেছেন। ভরতের মতে শুদ্ধ প্রহসনে শৈব সন্ন্যাসী, তপস্বী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বেদবিৎ শ্রোত্রিয় ও বিপ্র—এই সব উচ্চস্তরের চরিত্রই প্রধান, তবে নীচপাত্রও থাকতে পারে। এ-সব চরিত্র এবং তাদের অশোভন ও অসংগত আচরণের মধ্য দিয়ে অঙ্গী হাস্যরস সৃষ্ট হয়। কিন্তু এ প্রহসনে এদের ভাষা ও আচারকে বিকৃত করা চলবে না। আর সংকীর্ণ প্রহসনের চরিত্র হবে বিট-চেট, বেশ্যা-বন্ধকী কিংবা ধূর্ত-নপুংসক। এখানে সর্বদা নীচ পাত্র থাকবে এবং এদের উচ্ছৃঙ্খল বেশ, ভাষা ও আচরণ হাস্যরস সৃষ্টি করবে। বিশ্বনাথ বলেছেন, প্রহসনের বিষয়বস্তু হবে কবি-কল্পিত। এ হল নিন্দনীয়ের নিন্দাখ্যান। তিনি বলেন, শুদ্ধ প্রহসনে তপস্বী, বিপ্র প্রভৃতির মধ্যে যিনি নায়ক হবেন তিনি 'ধৃষ্ট'। অভিনয়ে

---

১. ভগবত্তাপসভিক্ষুশ্রোত্রিয়-বিপ্রাদিহাসসংযুক্তম্।
নীচজনসম্প্রযুক্তং পরিহাসাভাষণপ্রায়ম্॥
অবিকৃতভাষাচারং বিশেষ হাস্যোপভাষয়াচিতপদম্।
নিয়তগতিবস্তুবিষয়ং শুদ্ধং জ্ঞেয়ং প্রহসনং তু॥
বেশ্যাচেটনপুংসকধূর্তবিটা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।
অনিভৃতবেষপরিচ্ছদচেষ্টাকরণাত্ত সংকীর্ণম্॥ (নাট্যশাস্ত্র ২০।১০৫-১০৯)

যার অঙ্গবিকৃতি তিনিই ধৃষ্ট[১] ধনঞ্জয়ের মতে। বিশ্বনাথ বলেন, যিনি প্রিয়তমার নিকট অপরাধ করেও নিঃশঙ্ক, প্রিয়তমার কাছে তিরস্কৃত হয়েও নির্লজ্জ এবং নিজের দোষ প্রিয়তমা জেনে ফেললেও যিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন, তিনিই ধৃষ্ট।[২] নায়ক ধৃষ্ট না হলে তা হয় সংকীর্ণ প্রহসন। বিশ্বনাথ বিকৃত প্রহসন সম্পর্কে বলেছেন যে এতে ভুজঙ্গ (বিট), চারণ (নট), ভট (যোদ্ধা) প্রভৃতির বেশভূষাকে অবলম্বন করে ষণ্ড (নপুংসক) কঞ্চুকী ও তাপসগণ অভিনয় করে। এরও অঙ্গীরস হাস্য। প্রহসনের আয়তন সর্বদা এক অঙ্কের, তবে মতান্তরে সংকীর্ণ প্রহসন দুই অঙ্কের হতে পারে।

রামচন্দ্র গুণচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণ' এ প্রহসন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ইঙ্গিত আছে—"কর্ষেণ হস্যতে যত্র ইতি প্রহসনম্"—অর্থাৎ যেখানে প্রকর্ষের সঙ্গে হাস্য উপভোগ করা যায়। সমাজের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিগণের অধঃপতন কিংবা সমাজের কোনো শ্রেণীর মানুষের নীচতা ও স্বার্থপরতায় সমাজ যখন কলুষিত বা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই প্রহসনের সৃষ্টি হয়। এর নায়ক কখনো উত্তম শ্রেণীর হন না। প্রহসনে হাস্যের স্বরূপ সম্পর্কে অভিনব গুপ্ত বলেন যে, এর হাস্যরস স্বভাবতই রঞ্জন-প্রধান অর্থাৎ তা চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে, কিন্তু কোনো স্থায়ী সুখ আনে না। 'নাট্যদর্পণে'-এ বলা হয়েছে যে বালক, স্ত্রীলোক ও মূর্খ প্রভৃতি যারা উচ্চচিন্তায় অক্ষম তারাই এর আনন্দ উপভোগ করে এবং অধম সামাজিকদের চিত্তবৃত্তিকে উন্নত করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। সংস্কৃত প্রহসনগুলিতে বিদ্রূপ আছে, তবে সংকীর্ণ প্রহসনে বিদ্রূপের সঙ্গে অশ্লীলতাও। শুদ্ধ প্রহসন কিন্তু বেশ উন্নত। 'মত্তবিলাসপ্রহসনম্' এবং ভগবদজ্জুকীয়ম্ এ দুটি এই শ্রেণীর বলে এদের হাস্যরস-সৃষ্টির কৌশল খুব উন্নত ধরনের। প্রথমটিতে কাপালিকের স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে উন্মত্ত আচরণ এবং কপট শাক্য-ভিক্ষুর সঙ্গে কলহ বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের প্রতি এতে কটাক্ষ আছে। কিন্তু কবি বোধায়নের লেখা দ্বিতীয়টি ঘটনানির্ভর। ভূসক্রমে বসন্তসেনার আত্মাগ্রহণ, যোগী ও বসন্তসেনার আত্মা দুটির দেহ-পরিবর্তন এবং দুজনের সংলাপে যে মজাদার ব্যাপার জমে উঠেছে তা অপরূপ। এখানে বিদ্রূপ নেই বললেই চলে। নিকল একে বলেছেন Farcical Comedy,[৩] নিছক প্রহসন বলতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। ভারতীয় আলংকারিক মতে এটি শুদ্ধ প্রহসন।

পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত আলংকারিকদের এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দুই দেশেরই আলংকারিক বা পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর ক্ষুদ্রায়তন নাট্যকে নিম্নমানের বলেছেন ও হাসি-সৃষ্টি যে এর প্রধান উদ্দেশ্য সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশ্চাত্যের

---

১. ব্যাজাদ্বৈকৃতো ধৃষ্টঃ (দশরূপক, ২।৭)

২. কৃত্যাগা আপি নিঃশঙ্কস্তিরস্কৃতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ, ৩য়)

৩. World Drama, p. 645.

নাট্যতাত্ত্বিকেরা সমাজ-সংশোধনের জন্যই ফার্স লিখিত হয়, একথা বলেন না। কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃতে যে সব সংকীর্ণ প্রহসন লিখিত হয়েছে সেগুলি বিদ্রূপাত্মক ও সমাজ সংশোধনমূলক—তথাপি সেগুলির অঙ্গীরস কিন্তু হাস্য। সংস্কৃতে 'শুদ্ধ প্রহসন' কিন্তু পুরোপুরি সমাজ সংশোধনমূলক নয়। একমাত্র শুদ্ধ প্রহসনের সঙ্গেই এক হিসেবে পাশ্চাত্যের নিছক হাস্যোদ্রেককর ফার্সের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু শুদ্ধ প্রহসন শিল্পরূপে যতখানি উন্নত, ফার্স তা নয়। আবার পাশ্চাত্যের ব্যঙ্গাত্মক কমেডির সঙ্গে সংকীর্ণ প্রহসনের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক কমেডি শিল্পরূপে যতখানি উন্নত, সংকীর্ণ প্রহসন তা নয়। তাছাড়া আয়তনের দিক থেকেও প্রহসন ও ফার্স সব সময় এক নয়। প্রহসন প্রায় সর্বদা এক অঙ্কের, কিন্তু ফার্স এক, দুই বা তিন অঙ্কেরও হতে পারে। প্রহসনের সংক্ষিপ্ততা ফার্সে সব সময় রক্ষা করা হয় না। এই সমস্ত কারণে বলা চলে যে প্রহসন ও ফার্স ঠিক এক শ্রেণীর রচনা নয়।[১] স্থূলভাবে আমরা দুই রচনাকে এক মনে করতে পারি।

সিদ্ধান্ত : আমাদের বাঙলা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত 'প্রহসন' শব্দটিই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত প্রহসনের আংশিক লক্ষণই বাঙলা 'প্রহসন' গুলিতে দেখা যায়। বাঙলা প্রহসনও সব সময়-এক অঙ্কে সীমিত নয়। শুদ্ধ প্রহসনের ধর্ম তাতে বিরলক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যের ফার্সের লক্ষণও তাতে সব সময় মেলে না। পাশ্চাত্যের ফার্স ও সংস্কৃত শুদ্ধ ও সংকীর্ণ প্রহসনের সব লক্ষণগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণবর্জনের সাহায্যে এবং তার সঙ্গে কখনো কখনো লোকনাট্য ও যাত্রার সঙের বৈশিষ্ট্যের একটা মোটামুটি সংস্কার মনে রেখে বাঙালী নাট্যকারদের এ অনেকখানি নূতন ধরনের রচনা। কোনো কোনো নাট্যকার ফরাসী ও ইংরেজি কমেডিরও কিছু কিছু লক্ষণ তাঁদের রচিত প্রহসনে যুক্ত করেছেন। 'প্রহসন' নামটি শ্রুতি-মধুর ও বহুকাল-প্রচলিত। পাশ্চাত্যের ট্রাজিডি, কমেডি, ট্রাজিকমেডি, মেলোড্রামা—নাটকের এই বিভিন্ন প্রকারকে যখন আমরা বাঙলাভাষায় গ্রহণ করেছি এবং এগুলির প্রতিশব্দ নিয়ে বিশেষ চিন্তা করি নি, তখন একমাত্র 'প্রহসন'কে গ্রহণ করে কি লাভ? বরং 'ফার্স' নামটি গৃহীত হলে বাঙলা নাট্যের বিভিন্ন শ্রেণীর নামের সঙ্গে একটা সমতা থাকে। অবশ্য বাঙলা হাস্যরসাত্মক সমস্ত সংক্ষিপ্ত নাট্যরচনাগুলিকে ফার্স বলাও ঠিক নয়। সেইজন্য ফার্সেরও একটা শ্রেণীবিভাগ করে না দিলে বাঙলা ফার্সগুলির পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। পাশ্চাত্যের ফার্সের লক্ষণ যেগুলিতে খুব বেশি রক্ষিত হয়েছে, সেগুলিকে আমরা শুদ্ধ ফার্স বলতে

---

১. অবশ্যক কীথ সংস্কৃত নাট্যে কমেডি, ফার্স, মনোলগ প্রভৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন—"It is amazing, however, that we find no serious effort to produce pure Comedy; the farce and the monologue may hover on the borders of that form; They certainly never attain it."—The Sanskrit Drama (Oxford University Press, Reprinted 1954, P. 354).

পারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' অমৃতলালের 'ডিস্‌মিস্', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'চোরের উপর বাটপাড়ি,' 'কৃপণের ধন,' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'—এগুলিকে মিশ্র ফার্স বলা যায়। অর্থাৎ এগুলি ফার্স হলেও উচ্চাঙ্গের কমেডির লক্ষণও এগুলিতে অনুপস্থিত নয়। অধ্যাপক নিকলের ভাষা গ্রহণ করলে এগুলিকে Farcical Comedy বলতে হয়। আর সমাজ সমালোচনাত্মক আক্রমণমুখ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ফার্সগুলিকে সামাজিক ফার্স বলা উচিত। বাঙলা ভাষায় এগুলিই সবচেয়ে বেশি লিখিত হয়েছে। দৃষ্টান্তের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যে সব ফার্সে ব্যক্তিগত আক্রমণই লক্ষ্য, সেগুলি আরো নিম্নস্তরের। এদের ব্যক্তি ব্যঙ্গাত্মক ফার্স বলা যেতে পারে। অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণ দু' একটি এই জাতের ফার্স লিখেছেন।

সুতরাং বাঙলা ফার্সকে আমরা ক. বিশুদ্ধ ফার্স খ. মিশ্র ফার্স গ. সামাজিক ফার্স ও ঘ. ব্যক্তি ব্যঙ্গাত্মক ফার্স—এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, এই শ্রেণীবিভাগ মনে রেখে বাঙলা ফার্সগুলির পরিচয় দিলে গোলযোগের সম্ভাবনা কম। আর আমাদের মতে মিশ্র ফার্সই সর্বাপেক্ষা উন্নত।

১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে টমাস অটওয়ে (Thomas Otway) একখানি ট্রাজিডি লিখে তার সঙ্গে একটি ফার্স 'The Cheats of Scapin' যুক্ত করে প্রথম ইংলণ্ডে ফার্সের পত্তন করেন। দু বছর পরে তিনিই লিখলেন, 'A Duke and No Duke'. প্রথম পত্তনের ১০ বছর পরে ফার্স ইংলণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। প্রথমদিকে প্রচলিত কমেডিগুলিকে ভেঙে ফার্স লেখা হত কিংবা ইতালীয় 'Commedia dell arte-এর সেগুলি ছিল নবতন রূপ। এডওয়ার্ড র‍্যাভেনস্‌করফ ইতালীয় আদর্শে অনেকগুলি এবং ফরাসী কমেডি ভেঙে কতকগুলি ফার্স লেখেন। ইতালীয় ও ফরাসী অভিনেতাদের অভিনয়-প্রেরণা ও মেলা-অনুষ্ঠানে পুতুলনাচের বহুকালাগত ঐতিহ্যের ব্যাপকতর প্রেরণা সম্মিলিতভাবে ফার্স উৎপত্তির হেতু। বাঙলা ফার্স প্রথমত বিদেশী ফার্সের ও সংস্কৃত প্রহসনের অনুবাদের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়। গেরাসিম লেবেডেবের 'কাল্পনিক সংবদল' ও সংস্কৃত 'হাস্যার্ণব'এর বঙ্গানুবাদই প্রথমদিকের ফার্স। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' ও আরো পরে মধুসূদন, রামনারায়ণ ও দীনবন্ধুর ফার্সগুলি প্রকাশিত হয়।

বাঙলা ফার্স:

বাংলা ভাষায় উদ্ভবকাল থেকে এ পর্যন্ত অজস্র ফার্স লিখিত হয়েছে। অধিকাংশই শিল্পের দিক থেকে উন্নত নয় এবং ফার্সের যে মূল উদ্দেশ্য হাস্যরস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের নানা দোষ-ত্রুটির সমালোচনা—সেখানেও নাট্যকারগণ সংযম ও শালীনতার

পরিচয় দিতে পারেন নি। উনবিংশ শতকে বাঙালীর নবজাগরণের কালে সমাজে নানা অবস্থা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, পুরাতন সমাজের নানা দোষ-ত্রুটিও যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য সমাজের বহু কিছু অনুকরণের একটা হাওয়া এসেছিল। এই সমস্ত-কিছুই ফার্স-রচয়িতৃগণের হাস্যরসের মধ্য দিয়ে আক্রমণের বিষয় হয়ে ওঠে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সপত্নীকলহ, সপত্নী-পুত্র-বিদ্বেষ, পুরোহিত শ্রেণীর মূর্খতা, লোভ, পরানুকরণ, মদ্যপান, বয়োজ্যেষ্ঠদের অবজ্ঞা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের প্রবণতা, নারী-প্রগতি, স্ত্রী-শিক্ষা, জমিদারশ্রেণীর ভণ্ডামি ও লাম্পট্য, বারবণিতাসঙ্গ, ব্রাহ্মবিদ্বেষ—প্রভৃতি বিষয় তাই বাংলা ফার্সের অন্তর্গত হয়েছে। আর হাস্যরস-সৃষ্টির জন্যে বাক্, বেশ, অঙ্গ ও চেষ্টা-বিকৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বাংলাভাষায় প্রথম সার্থক ফার্স-লেখক হিসেবে মধুসূদনের নাম করা যায়। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই দুখানি নাটিকায় একটিতে সমাজে একশ্রেণীর ইয়ং বেঙল সম্প্রদায়ের আচরণকে ও অন্যটিতে প্রাচীন সমাজের ভণ্ড জমিদারশ্রেণীর নীচতা, স্বার্থপরতা, রক্ষণশীলতা ও লাম্পট্যকে আক্রমণ করা হয়েছে। সুন্দর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে চমৎকার স্বাভাবিক সংলাপ ও চরিত্র-সৃষ্টির গুণে নাটিকা দুটি ঠিক ফার্সের মধ্যেই সীমিত থাকে নি—কমেডিরও কিছু কিছু লক্ষণে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' মিশ্র নাটক—একে পুরোপুরি প্রহসন বলা যায় না। কিন্তু তাঁর 'উভয়সঙ্কট', 'চক্ষুদান' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'—এই তিনখানি প্রহসন প্রকাশ-কালের দিক দিয়ে মধুসূদন পরবর্তী। এগুলিতে সপত্নীবিদ্বেষ, পুরুষের লাম্পট্য, বহু-বিবাহ প্রভৃতিকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে। পরিস্থিতি-সৃষ্টিতে নিপুণতা থাকলেও এগুলি মূলত ঘটনা-নির্ভর, চরিত্র-সৃষ্টিতে কোনো মনোযোগ নেই। তাই এগুলি সম্পূর্ণরূপেই ফার্স।

দীনবন্ধু মিত্রের ফার্সগুলি উচ্চাঙ্গের। তাই এগুলি মিশ্র-নাটকই হয়ে উঠেছে। তাঁর হাস্যরস হিউমার-রসসিক্ত। কোনো কোনো ফার্সে চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্য এবং সংলাপ-প্রয়োগে তিনি খুবই সাফল্যলাভ করেছেন। তাঁর 'সধবার একাদশী', 'জামাইবারিক', (অবশ্য এটিকে কমেডি বলাই সমীচীন) ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ফার্সের অন্তর্গত রচনা। 'সধবার একাদশী' এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে Satire ও Humour দুইই আছে, আর আছে কিছু কিছু সুন্দর চরিত্র। মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-আসক্তির কুফল প্রথমটিতে এবং দ্বিতীয়টিতে বৃদ্ধের বার্ধক্যকে গোপন রেখে যুবক সেজে তার তরুণী-বিবাহের প্রবণতা ও শেষ পরিণাম দেখানো হয়েছে।

বাংলা ফার্সের আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখি, সূচনা থেকেই কেউ কেউ মলিয়েরের ফার্সের অনুবাদের চেষ্টা করেছেন আবার কেউ কেউ তাঁর প্রভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন। গেরাসিম লেবেদেভ 'Love is the Best Doctor'-এর অনুবাদ দিয়েই অভিনয়ের পথ কেটে দিয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ দত্ত মলিয়েরের 'The Mock Doctor' অবলম্বনে

'যেমন রোগ তেমনি রোজা' নামক ফার্সটি লেখেন। ফার্স-রচনায় সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন মলিয়েরের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'এমন কর্ম আর করব না' (পরে এর অলীকবাবু নাম হয়) এবং 'হিতে বিপরীত' প্রকাশের পর মলিয়েরের অনুসরণে 'হঠাৎ নবাব' (লা বুর্জোয়া জাতিয়াম্) এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (ম্যারিয়াজ ফোর্সে) লিখিত হয়। সেকালের বাঙালী নাট্যকার তার সমাজ-মানসের প্রকৃত স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে মলিয়েরের রচনায় একটা আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন। মলিয়ের মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতিকে আক্রমণ করেছেন। ধর্মের নামে ভাণও তিনি পছন্দ করতেন না। অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তির ধাপ্পা দিয়ে প্রতিষ্ঠা-অর্জনকেও তিনি ক্ষমা করেন নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবলম্বন করে তিনি তাদের জীবনের ভুল-ত্রুটি, নীচতা, কদর্যতা, ভণ্ডামিকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর ফার্সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নয়, শ্রেণী-চরিত্রের হাস্যকর দিকটি তুলে ধরে সমাজ-সংশোধনের প্রয়াস আছে বলে তার আবেদন সীমিত নয়। নানা শ্রেণীর চরিত্রের ভিড়ে তাঁর ফার্স পরিপূর্ণ। মধুসূদন ও দীনবন্ধু সচেতনভাবে মলিয়েরকে অবশ্য অনুসরণ করেন নি। তথাপি তাঁদের রচনায় মলিয়েরের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা কঠিন নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে সচেতনভাবে মলিয়ের অনুসরণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মৌলিক নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এ নারী-স্বাধীনতা, মদ্যপান ও ব্রাহ্ম-সমাজের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা আছে। মলিয়েরের মতো তাঁর প্রহসনে ব্যক্তিজীবনের উৎকেন্দ্রিকতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আক্রমণের বিষয় হয়েছে। তাঁর 'অলীকবাবু', 'হিতে বিপরীত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ফার্স।

এর পরই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফার্স রচয়িতা হলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। তৎকালীন সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দোষ-ত্রুটিগুলিকে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাতে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে অনেকেই রক্ষণশীল প্রগতি-বিরোধী নাট্যকার বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সমকালে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রচুর ফার্স লিখেছেন। সবগুলি সমান উৎকর্ষলাভ না করলেও কতকগুলিতে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। সার্থক সংলাপসৃষ্টির কৌশল ও হাস্যরস-সৃষ্টির নানা উপায় তাঁর জানা ছিল। বাঙালীজীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্টই ছিল; কিন্তু যে উদার নির্লিপ্ত দৃষ্টি ব্যঙ্গরস-রসিকের থাকলে আক্রমণাত্মক রচনাও হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপভোগ্য হয়—অমৃতলালের তা ছিল না। অমৃতলালে ব্যঙ্গের আঘাত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। বর্তমানের গলদ ও ত্রুটিকে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের উজ্জ্বল-চিত্রের দিকে তিনি অঙ্গুলি-সংকেত করতে পারেন নি। 'একাকার,' 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'বাবু', 'বাহবাবাতিক', 'ডিসমিস', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'ব্যাপিকা-বিদায়' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বিশেষ ক্ষেত্রে খুব কৃতিত্ব অর্জন করতে না পারলেও তিনি

কতকগুলি ফার্স লিখেছিলেন। অমৃতলাল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল এদের দুজনের রচনাতেই মলিয়েরের প্রভাব আছে। তাঁর 'আনন্দবিদায়'-এ অযথা, রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত 'পুনর্জন্ম' ফার্সটি উচ্চাঙ্গের, কিন্তু একখানি ইংরেজি পুস্তকে থেকে এর কাহিনী অংশ গৃহীত—তাঁর কৃতিত্ব এই কাহিনীকে তিনি বাঙালী পরিবেশে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ একেবারেই নেই। তাঁর 'কল্কিঅবতার', 'বিরহ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সুখী-পরিবার'ও ফার্স—তবে এর মধ্যে 'বিরহ' অনেকখানি মধুর—আক্রমণের কোনো জ্বালা নেই।

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি পঞ্চরঙ্গজাতীয় ফার্স লিখলেও এ শ্রেণীর রচনায় তাঁর কোনো কৃতিত্ব নেই। 'য্যায়সা কি ত্যায়সা','বেল্লিকবাজার', 'আবু হোসেন' প্রভৃতি তাঁর ফার্স। এছাড়া রাজকৃষ্ণ রায়ের 'টাটকা' টোট্‌কা, 'লোভেন্দ্রগবেন্দ্র', 'জুজু', বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমি' ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন', 'যুগমাহাত্ম্য', 'বেজায় রগড়', অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'থিয়েটার', 'কাজেরখতম', 'চাবুক', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর পর রবীন্দ্রনাথের প্রহসন। সেগুলি একটু ভিন্ন জাতের ও আস্বাদের। তাঁর পরবর্তী যুগেও বিভিন্ন নাট্যকারদের হাতে ফার্স-রচনার ধারা অব্যাহত আছে।

ট্রাজি-কমেডি :

হাসি এবং কান্না, বিষাদ ও আনন্দ জীবনের নিত্য সহচর। পরস্পর বিপরীত এই দুয়ের ব্যবধান উৎপত্তির দিক থেকে কিন্তু খুব বেশী নয়। একটুখানি কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি হাসির কারণ, কিন্তু ঐ পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেই চোখে জল আসে। জীবনে কান্না ও বিষাদের তীব্রতা হ্রাস পেলেই হাসি ও আনন্দের রাজ্য শুরু হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে-প্রতিভা ট্রাজিডির মতো ভয়াবহ, গুরুগম্ভীর ও বেদনাদায়ক কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে, সেই একই প্রতিভা লঘু-তরল আনন্দোচ্ছল কমেডিও সৃষ্টি করতে পারে।[১] তাই যদি হয়, তাহলে ট্রাজিডির মধ্যে কমিক উপাদান বা কমেডির মধ্যে ট্রাজিক-উপাদানের মিশ্রণ কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্রাজিডিতে মহৎ ও অভিজাত চরিত্রই থাকবে, গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ থাকবে এবং অনুকম্পা ও ভয় ভাবের আধিক্য থেকে দর্শককে তা মুক্ত করবে; আর কমেডিতে সাধারণ মানুষ ও তাদের প্রসঙ্গ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হবে হাস্যরস। কিন্তু এমনভাবে ট্রাজিডি ও কমেডির রাজ্যকে পৃথক করে রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকে অভিজাত ও মহৎ চরিত্র থাকলেও দুটি

১. "The genius of Comedy, was the same with that of tragedy, and that the true artist in tragedy was an artist in Comedy also." Plato Symposium.

মেষপালক চাকরই ঘটনাধারায় জট পাকিয়েছে,—একথা অস্বীকার করা যায় কি? অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিতে দেবতা ও মানুষ, শহরবাসী ও কৃষক মিশে গেছে, জন্তু ও মেঘ কথা কয়ে উঠেছে। ইউরিপিডিসের নাটকে ট্রাজিডি ও কমেডির মিশ্রণ স্বেচ্ছাকৃতভাবেই হয়েছে। আধুনিক সমালোচক তাঁর 'Alcestis' ও 'Ion'কে ট্রাজি-কমেডি ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করতে পারেন নি।[১]

আমরা জানি, রেনেশাঁস যুগে ইতালীর নাট্যতাত্ত্বিকেরা ট্রাজিডির সুখ-সমাপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কোনো গুরুগম্ভীর নাটকের পরিণামকে সুখদায়ক করার অর্থই হল নায়ককে আসন্ন মহাসর্বনাশ থেকে রক্ষা করা মাত্র। কমেডিতে এই ধরনের বিপর্যয় ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ষোড়শ শতক থেকেই তাই ট্রাজি-কমেডি সৃষ্টির অনুকূলে জোর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং একে, একটি স্বতন্ত্র নাট্যশ্রেণীরূপে স্বীকৃতিও জানানো হল। নাট্যকার পিয়েরি কর্নেই এর 'The Cid' নামক নাটকটিকে ফরাসী অ্যাকাডেমি ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাজি-কমেডি বলে রায়ও দিলেন।[২]

এখন এই ট্রাজি-কমেডি বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং এর বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলিই বা কি সে সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে হবে। অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থে ট্রাজি-কমেডি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাব। নিকল বলেছেন, ট্রাজিডিতে নাট্যকার তাঁর মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনভাবে কমেডির উপাদান মিশ্রিত করতে পারেন।

ক. প্রথমত ট্রাজিক চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করার জন্যে এখানে কমিক উপাদান হাসির তরঙ্গে আমাদের আন্দোলিত করে না। 'ম্যাকবেথ' নাটকে পোর্টার দৃশ্যে কমিক উপাদান আছে। কিন্তু এ-উপাদান দুর্গের মধ্যে ঘটমান ক্রিয়াকে আরো ভয়ঙ্কর করে তোলে। ঘটনাকে লঘু না করে এই কৌতুককর দৃশ্য ট্রাজিডিকে আরো গম্ভীর করে তুলেছে। 'হ্যামলেট'এ কবর খনন-কারীদের কমিক-ভূমিকাও এই শ্রেণীর। (বাঙলানাটকে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে কাঙালী ও জগমণির ভূমিকা স্মরণীয়।)

খ. কখনো কখনো ট্রাজিডিতে কমিক-উপাদান সংযোজিত হয় রুদ্ধশ্বাস বেদনাময় ট্রাজিক আবহাওয়ার মাঝখানে একটুখানি স্বস্তির অবসর-সৃষ্টির জন্য। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এ চাকরের দৃশ্য ও মারকিউটিওর দৃশ্য এই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। (আমাদের বাঙলা নাটকে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'তে ধনদাসের ভূমিকা।)

---

১. "The Play (Alcestes) is pure tragi-comedy like the Ion."
—Greek Tragedy : H. D. F. Kitto. Chap XI, pp 311. Edn. 1976.

২. The Opinions of French Academy, 1638.

গ. ট্রাজিডির মূল বৃত্তের সমান্তরাল এবং কখনো বা মূল বৃত্ত-নিরপেক্ষ একটি কমিক বৃত্ত সৃষ্টি করা। (শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকে নির্মল-হৈমর কাহিনী।)

কিন্তু এই তিন ভাবে কমিক উপাদান ট্রাজিডিতে থাকলেও কখনো এগুলি ট্রাজিডির মূল সুরকে ক্ষুণ্ণ করে না।[১] ট্রাজিডি ও কমেডির মিশ্রণ কিভাবে হতে পারে, সেকথা নিকল ভালোভাবেই বলেছেন, কিন্তু এগুলো তো ট্রাজিডির মূল সুরকে বেসুরো করে না, ট্রাজিডি ট্রাজিডিই থাকে। এগুলি তো 'ট্রাজি-কমেডি' শ্রেণীর নাটক নয়। তাহলে ট্রাজি-কমেডি কোন্‌গুলি? কাকে ট্রাজি-কমেডি বলব—এ প্রশ্নের উত্তর নিকল দেন নি। তবে তিনি তিনশ্রেণীর ট্রাজি-কমেডি হতে পারে বলে জানিয়েছেন এবং তাদের এইরকম শ্রেণীবিভাগ করেছেন।[২]

ক. ট্রাজি-কমেডি—যেখানে ট্রাজিক ও কমিক উপাদান প্রায় সমান সমান। দৃষ্টান্ত—The Changeling.

খ. ট্রাজি-কমেডি—যেখানে একটি কমিক উপকাহিনী মূল ট্রাজিক কাহিনীর অধীন। দৃষ্টান্ত—The English Traveller.

গ. ট্রাজি-কমেডি—যেখানে কমিক কাহিনীই মুখ্য এবং ট্রাজিক উপাদান বা উপকাহিনী তার অধীন। দৃষ্টান্ত—The Winter's Tale, Much Ado About Nothing.

এই শ্রেণীবিভাগের পূর্বে নিকল আরও একটি কথা বলেছেন, তা উদ্ধারযোগ্য। "If we confine tragi-comedy to those plays where true tragic elements run parallel to true comic elements, we my be able to frame a very rough classification of the majority of plays—"[৩] অর্থাৎ যেখানে যথার্থ ট্রাজিক উপাদান ও যথার্থ কমিক উপাদান কোনো নাটকে সমান্তরালভাবে প্রবহমান তাকেই ট্রাজি-কমেডি বলা ভালো। বোঝা যায়, নিকল ট্রাজি-কমেডি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। ট্রাজিক ও কমিক উপাদানের মিশ্রণে তিন রকম ট্রাজি-কমেডি কেমন হতে পারে 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণীতে তা দেখাবার তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর 'খ' শ্রেণীটি কি করে এই পর্যায়ভুক্ত হয়, তা বোঝা যায় না। ট্রাজিডিতে কমিক-উপাদানের তিনভাবে অবস্থানের কথা যা তিনি পূর্বে বলেছেন 'খ' শ্রেণীটি তো তারই অন্তর্গত। মূল ট্রাজিক কাহিনীর অধীন হলে কমিক

---

১. "The true tragic spirit is a jeolous muse, and will have none other near her throne".—The Theory of Drama—A Nicoll, pp. 233.

২. Ibid pp. 186-87.

৩. Ibid pp. 186

উপাদান যদি ট্রাজি-কমেডি সৃষ্টি করে, তাহলে বুঝতে হবে ট্রাজি-কমেডির পরিণামরূপ বলে কিছু নেই—তা মিকলের কথায় ট্রাজিডি বা কমেডির যে-কোনো একটি গোত্রের দিকে অভিব্যক্ত করে। মোটকথা মিকলের ট্রাজি-কমেডি সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা আমাদের আশ্বস্ত করে না—বরং বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে এবং নাটকে এই বিশেষ শ্রেণীটির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত হই।

সিদ্ধান্ত :

ট্রাজি-কমেডি সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে এটা ট্রাজিডি ও কমেডির মিশ্রণ-জাত রচনা। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ট্রাজিক বৃত্ত ও একটি সম্পূর্ণ কমিক বৃত্তকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে দিলেই ট্রাজি-কমেডি হবে না। একথা মনে করাও ঠিক নয় যে এ হল প্রকৃত-পক্ষে ট্রাজিক রচনা, শুধু লঘুভাবের কিছু কমিক উপাদান মিশিয়ে তার ট্রাজিকমূল্যকে খর্ব করা হয়েছে মাত্র। এ ট্রাজিডিও নয়, কমেডিও নয়—এ এক স্বতন্ত্র প্রজাতি। কিন্তু ট্রাজিডি ও কমেডির উপাদানের যে মিশ্রণ এতে হয়, তার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য, ট্রাজিডি দেখার আনন্দ ও কমেডি দেখার আনন্দের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-সৃষ্টি করা—যাতে দর্শকেরা ট্রাজিক বেদনার আতিশয্য এবং কমিক আমোদের প্রাবল্য থেকে মুক্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ ট্রাজিডির অনুকম্পা ও ভয়ের প্রাবল্য যেমন সে এখানে বোধ করবে না, তেমনি কমেডির হাস্যভাবের অতিশায়নেও সে মেতে উঠবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন্ মূলভাব তার মনকে অধিকার করবে? নাট্যঘটনাতে ট্রাজি-কমেডি ট্রাজিডির ঘটনা ও কমেডির ঘটনাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে এবং বৃত্তটি যাতে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার জন্যে যে-ভাবে ঐ দুই ঘটনা মিশ্রণের প্রয়োজন তারও চেষ্টা করা হবে; কিন্তু দর্শকের মনে ট্রাজি-কমেডি একটিমাত্র ভাবই জাগ্রত করবে, তা হল নাট্যঘটনার অন্তর্গত ট্রাজিক বেদনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতি-জনিত একটা তৃপ্তি বা স্বস্তির ভাব। একেই একজন সমালোচক বলেছেন, যে ট্রাজি-কমেডি "Purges souls of the ill effect of melancholy".[১] অর্থাৎ ট্রাজি-কমেডির মধ্যে কাহিনীটি দুয়ের মিশ্রণ-জাত হলেও একটিমাত্র কাহিনীতে পরিণত হবে এবং কাহিনীতে নায়ক বা নায়িকার জীবনে ঘোরতর দুর্ভাবনা নেমে এলেও বা চরমতম দুর্দিন ঘনিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত সেই ট্রাজিক বেদনাকে দূরীভূত করতে হবে। সেই বিপদজাল থেকে মুক্ত করে নায়ক-নায়িকাদের এমন একটি স্থানে এনে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে ট্রাজি-কমেডি দর্শকের মনে নাট্যঘটনার ট্রাজিক সুরটি মিলিয়ে দেয়। মোট কথা এ হল মূলত কমেডি, তবে কমিক-

১. এই সমালোচক আরও বলেছেন যে ট্রাজিডির "Purpose is to purge with delight the sadness of the audience." Compendium of Tragicomic Poetry : Giovanni Battista Guarini 1599.

কমেডি নয়। শুদ্ধ কমেডি এবং ট্রাজিক ঘটনা বা কাহিনীর সঙ্গে সংযোগে নাটকে এ বিশিষ্টতা লাভ করে এবং তখন দুয়ের সমন্বয়ে এ এক নূতন ধরনের প্রজাতি হয়ে ওঠে।

শেক্সপীয়ারের 'The Winter's Tale', 'The Merchant of Venice' ও 'The Tempest' এ শ্রেণীর রচনা।

সপ্তদশ শতকে ফ্লেমন্ট ও ফ্লেচার এই জাতের রচনাকে ইংলণ্ডে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের লেখা 'Philaster' নামক নাটকটিকে তাঁরা শুধু ট্রাজি-কমেডিই বলেন নি, এর সংজ্ঞা নির্দেশও করেছিলেন। নাটকটির বিষয়বস্তুর একটু পরিচয় না দিলে তাঁরা যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তার অর্থ বোঝা যাবে না। যুবক ফিলেস্টার যে সুন্দরী তরুণীটির প্রতি আসক্ত ছিলেন, তার প্রতি এক উচ্চ পদস্থ অথচ নীচ ব্যক্তির লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। তাই ফিলেস্টারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ঐ পদস্থ ব্যক্তি। তরুণীটির কিন্তু গভীর আকর্ষণ ছিল ফিলেস্টারের প্রতি। তাই পুরুষের ছদ্মবেশে তার অভিসার চলতে লাগল, ফলে তাদের দুজনের জীবনেই ঘনিয়ে এল দুর্যোগের রাত্রি—কিন্তু সর্বজয়ী প্রেম শেষ পর্যন্ত তাদের পরিত্রাণ করল এবং ফিলেস্টার তরুণীটিকে লাভ করলেন। এই নাটকটিকে নাট্যকারদ্বয় বলেছেন, "It wants death which is enough to make it no tragedy; yet brings some nearer to it which is enough to make it no comedy."[১]

এখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু সংঘটিত হয়নি, ফলে এ ট্রাজিডি হয়নি। আবার এ নাটকে ফিলেস্টার ও ঐ তরুণীটি যে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়েছিল তাতেই এ কমেডি হয় নি। এ হল ট্রাজি-কমেডি। শেক্সপীয়রের 'উইনটার্স টেল'এ লিওনটেস স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছর পরে সেই স্ত্রী জীবিত হয়ে তাঁকে মার্জনা করেন। মৃত্যুদণ্ড ও তার পরবর্তী ঘটনায় স্বামীর অনুতাপের মধ্যে ট্রাজিক সুর এবং পরিশেষে মিলনের মধ্যে ঐ ট্রাজিক সুর একেবারে মিলিয়ে গেছে। বাঙলানাটকে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী ও দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'-কে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। পদ্মাবতীর সুখময় জীবনে ঘোরতর অন্ধকার দেখা দিয়েছিল, কিন্তু অন্তিমে যখন ইন্দ্রনীলের সঙ্গে তাঁর আবার মিলন ঘটল, তখন সেই বেদনার রেশ লেশমাত্র দর্শকমনে থাকে না। 'নবীন-তপস্বিনী'তে বড় রানীর নিরুদ্দেশ হওয়া ও তাঁর মৃত্যু সংবাদে ট্রাজিক যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, পরিশেষে রানী ও পুত্রের সঙ্গে রাজার মিলনে সেই ট্রাজিক সুর মিলিয়ে গিয়ে তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় দর্শকের মন ভরে ওঠে।

---

১. Masters of the World : John Gassner-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত pp. 248.

ইংল্যাণ্ডে ট্রাজি-কমেডির উদ্ভবকালে যেরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাতে একে রোমান্টিক কমেডিরই ট্রাজিক-উপাদানযুক্ত এক নবতম রূপ বলেই মনে হয়। আর এখনো এর ঘটনা-ধারায় কমিক-কমেডির অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বা হাস্যরসের অতিরঞ্জন ছিল না। ধীরে ধীরে দেখা গেছে, তা গুরুগম্ভীর কমেডির আধারকে আশ্রয় করে ট্রাজিক উপাদানকে স্বাঙ্গীকৃত করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটিতে অমলের নিদ্রামগ্ন হওয়ার অর্থ মৃত্যু নয়। অসীমের সঙ্গে সীমার স্পর্শে তা অমলের মুক্তির নামান্তর। এই মুক্তি পীড়িত অমলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে ট্রাজিক সুরকে ঘনীভূত করেছিল তাকে একেবারে ফিকে করে দেয়। একটা তৃপ্তির রেশই বড় হয়ে ওঠে। 'রক্তকরবী' নাটকে নিজের সহজ স্বাভাবিক সত্তাকে হারিয়ে রাজার জীবনে ট্রাজিডি, কিন্তু রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে (সে মৃত্যুর যখন বিশেষ এক তাৎপর্য আছে) তাঁর মোহমুক্তি—রঞ্জনকে ফিরে পাওয়ায় পরিপূর্ণতা। তাই 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' গুরুগম্ভীর ট্রাজি-কমেডি।

সবশেষে আমরা বলব যে ট্রাজি-কমেডি শ্রেণীর রচনা ট্রাজিডি ও কমেডির মিশ্রণে সৃষ্ট হলেও তা দুয়ের সহযোগে জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপার কিছু নয়। এখানেও নাট্যকারকে একটি পরিকল্পনা স্থির করে নিয়ে দুই ভিন্ন উপাদানকে এককভাবে সমন্বয় করতে হয় যাতে তা ট্রাজিডিও হয় না, অবিমিশ্র কমেডিও হয় না, হয় একটি নূতন প্রজাতি—যেমন দুই ভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক সংযোগে দুই বস্তু থেকে পৃথক এক তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়।

আমাদের এই আলোচনা থেকে আরও একটি সত্য উদ্ঘাটিত হল যে, ইংলণ্ডেই ট্রাজি-কমেডির প্রথম উদ্ভব নয়। ইতালীয় নাট্যতাত্ত্বিক জিরাল্ডি সিনটিও, কস্টেল ভেট্রো, প্রমুখ ব্যক্তিরা এই প্রজাতিটির সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছিলেন। ইউরিপিডিসের নাটকে এর দৃষ্টান্ত পূর্ব থেকেই আভাসিত—কিন্তু তাকে এই নামে অভিহিত করলেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনাও করলেন জি. ডি. গুয়ারিনী। কর্নেই-এর 'The Cid'কে আখ্যাত করা হল এই নামে ফরাসী অ্যাকাডেমি কর্তৃক—তারপর ইংলণ্ডে এর সৃষ্টি, প্রসার ও সমৃদ্ধি। ড্রাইডেন নিছক আত্মাভিমানবশতই বলেছেন ট্রাজি-কমেডির প্রথম জন্ম তাঁর দেশ ইংল্যাণ্ড[১]—প্রাচীনেরা এর সন্ধানও রাখতেন না—তাঁর এ উক্তিও ঠিক নয়।

---

১. "We have invented, increased and perfected a more pleasant way of writing for the stage, than was ever known to the ancients or moderns of any nation, which is tragi-comedy."—An Essay on Dramatic Poesy : 1668—John Dryden, pp. 329.

ভাবপ্রবণতামুখ্য কমেডি (Sentimental Comedy) বা নাটক :[১]

সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব হয় যাকে ট্র্যাজিডি বা কমেডি কোনো নামেই অভিহিত করা চলে না। যদিও কেউ কেউ একে ভাবপ্রবণতামুখ্য বা সেন্টিমেণ্টাল কমেডি বলে আখ্যাত করেছেন। ষোড়শ শতকের শেষে এই শ্রেণীটির উৎপত্তি হলেও ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে এর বিবর্তন ঘটেছে এবং পরে নাটকের অন্য রূপের সঙ্গে এ মিশে গেছে ও তারপর আবার বিকাশ হয়েছে। যাই হোক, নানা সময়ে এর রূপের ঘন ঘন পরিবর্তন হয়েছে। মোটামুটি এই বিবর্তনের তিনটি ধাপ লক্ষণীয়। ক. একেবারে প্রথম দিকে আচরণমূলক কমেডির (Comedy of manners) রূপের আড়ালে এ ছিল প্রচ্ছন্ন—শুধুমাত্র কমেডির শেষ অঙ্কে আকস্মিকভাবে চরিত্রের মধ্যে গুরুতর কোনো পরিবর্তন বা বৃত্তের মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা হত। দৃষ্টান্ত Cibber-এর 'Love's Last Shipt'. এর নায়ক আচরণমূলক কমেডিরই মতো, শুধু শেষদিকে গিয়ে দেখা দিয়েছে তার মধ্যে অনুতাপ ও নতুনভাবে জীবনযাপনের ইচ্ছা। খ. অষ্টাদশ শতকে এই ধরনের কমেডির ধারা শুকিয়ে এল, এবং যথার্থ ভাবপ্রবণতামুখ্য নাটক লেখা হতে লাগল। দৃষ্টান্ত জোসেফ রিচার্ডসনের 'The Fugitive'. এতে পিতা তাঁর কন্যাকে বিশেষ একজনের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান—এই sentimental মূল কাহিনীর চারপাশে হাস্যরসাত্মক আরও কতকগুলো উপকাহিনীর সৃষ্টি করা হয়েছে। গ. আর এই সেন্টিমেণ্টাল কমেডি থেকে আরও পরে দেখা দিল সমস্যামূলক (Problem) নাটক। যেমন আধুনিককালে ইবসেনের 'A Doll's House' এবং বার্ণার্ড শ-এর 'Candida'. অধ্যাপক নিকল সেণ্টিমেণ্টাল কমেডি নামটি গ্রহণের পক্ষপাতী নন। বরং এই শ্রেণীর নাটককে তিনি প্রথম দুই স্তরে নীতিমূলক এবং তৃতীয় স্তরে সমস্যামূলক বলতে চান।

সেন্টিমেণ্টাল নাটককে Diderot বলেছিলেন গুরুগম্ভীর কমেডি (Serious Comedy)। এই শ্রেণীর নাটকে জীবনের দুঃখদুর্গতি বা বেঁচে থাকার যন্ত্রণার কথা যেমন বলা হয় না, তেমনি হাসি-তামাসাকেও এতে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। মানুষের মহৎগুণ ও কর্তব্যের ওপরেই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বুমারশেই (Beaumarchais) ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'An Essay on Serious Drama' নাম দিয়ে এর ওপর একটি সুপ্রবন্ধ রচনা করলেন। তিনি জানালেন, এ শ্রেণীর নাটকের অস্তিত্ব আছে এবং এ হল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক। দর্শক এ নাটক দেখতে আগ্রহী হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে

১. এই বিশেষ শ্রেণীর বিস্তৃত আলোচনার জন্য A. Nicoll-এর The Theory of Drama pp. 233-38 দ্রষ্টব্য।

এতে গভীর নৈতিক আবেদনও সৃষ্টি করা হয়।[১] গোল্ডস্মিথও 'A comparison between Laughing and Sentimental Comedy' নামক প্রবন্ধে জানালেন যে সাধারণ মানুষের দোষের পরিবর্তে গুণগুলি এবং মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির বদলে তার দুঃখ-দুর্দশার কথা এই ধরনের কমেডিতে বলা হয়।[২]

সেন্টিমেণ্টাল কমেডিকে কমেডি না বলে যদি সেন্টিমেণ্টাল নাটক বলে মনে করা যায়, তাহলে দেখি প্রথমত এ ট্রাজিডি নয়, কারণ ট্রাজিডির মতো এর পরিণতি বিষাদান্ত তো নয়ই, উপরন্তু গুরুগম্ভীর বিষয়কে এ নাটকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যাতে ট্রাজিডির মতো আমরা বিস্ময়ে আলোড়িত হই না।

তাছাড়া যে-রূপে ধীরে ধীরে সে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে একে কমেডিও ঠিক আর বলা যায় না। শুধুমাত্র হাস্যরসাত্মক উপকাহিনী দিয়ে এখন আর এর মূল বৃত্তকে ঘিরে রাখা হয় না বা তার পাশাপাশিও তা অবস্থান করে না। অর্থাৎ উপকাহিনী থাকলেও তা হাস্যরসের প্রয়োজন আসে না। তাছাড়া এগুলি রচনার পশ্চাতে নাট্যকারের গভীর, দার্শনিক বা নৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে। তাহলে এখানে কি করা হয়? এ জাতের নাটকে মানুষের কর্তব্যের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঠিক এ রকম সমস্যার ওপর ট্রাজিডি বা কমেডি গুরুত্ব আরোপ করে না। আরও পরবর্তী সময়ে যে সমস্যামূলক নাটক এরই সূত্র ধরে এল, সেখানেও সমস্যা আছে, এখানেও আছে। কিন্তু এখানে সমস্যা যেমন আছে, তার সমাধানের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু আধুনিক সমস্যামূলক নাটকে সমস্যাটা আরও জটিল চিন্তায় রূপ নিয়েছে এবং জীবনকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণে দেখে সমস্যা সমাধানের দিকটা বর্জন করেছে।

Serious Comedy[৩] নামটি ফরাসী সমালোচক দিদেরো দিয়েছেন। তাঁর সমকালীন বুমারশেই এই নাটকটিকে একটু পরিবর্তিত আকারে 'Serious drama'

---

১. The Serious Drama exists, that it is a good kind of drama, that it affords a lively interest, a moral appeal direct and profound, and that it can be expressed only in one style, that of nature Ibid, pp. 236.

২. Ibid pp. 237.

৩. সমগ্রভাবে নাটককে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে দিদেরো বলেছিলেন, "Here then—is the entire range of the dramatic scale: Happy Comedy, whose subject is ridicule and vice, Serious Comedy, whose subject is virtue and the duties of the man; that Tragedy whose subject may be our domestic misfortunes and that Tragedy whose subject is public catastrophes and misfortunes of the great". On Dramatic Poetry 1758. Denis Diderot.

বলেছিলেন।[১] এই Serious Dramaই হল 'ড্রেম'।[২] আর এই Serious Drama বা Drame থেকেই আধুনিক সমাধানহীন সমস্যামূলক নাটকের উদ্ভব। আমাদের বাঙলা নাটকে সেণ্টিমেণ্টাল কমেডি না থাকলেও সিরিয়াস কমেডি আছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে প্রচুর সমস্যামূলক নাটক এবং কিছু সমাধানহীন সমস্যামূলক নাটকও লেখা হয়েছে।

---

১. "The essence of Serious Drama is to offer (all things equal) a more immediate interest and a more direct moral lesson than heroic Tragedy and a deeper meaning than pleasant comedy." An Essay on Serious Drama : (Pierre Augustin Caron) Beaumarchais. 1767.

২. Drame সম্পর্কে এই অধ্যায়েই আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রাজিডি ও তার নানা রূপ

ট্রাজিডির উদ্ভব-কথা :

গ্রীসের অতি-প্রাচীন দেবতা ডায়োনিসাসের[১] শীতকালীন ও বসন্তকালীন উৎসব থেকে যথাক্রমে কমেডি ও ট্রাজিডির উদ্ভব। বিচিত্র দেবতা এই ডায়োনিসাস। তিনি সুরার দেবতা, শস্যের দেবতা ও উর্বরাশক্তিরও দেবতা। ইনি ছাগরূপী বা বৃষরূপী। বসন্তকালে নূতন বছরের শুরুতে গ্রীসের গ্রামাঞ্চলে যখন আঙুর ফল পেকে উঠত, তখনই এঁর উৎসব হত। ফলের রস ভক্তদের মত্ত করে রাখত। দেবস্থানে ছাগবলি দেওয়া হত। নাচ-গান-ভোজ ও ফূর্তির মধ্য দিয়ে উৎসবের দিনটি অতিবাহিত হত। এই উৎসব ধীরে ধীরে গ্রীকদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। গ্রামের সমস্ত লোকজন শোভাযাত্রা সহকারে দেবতার কাছে উপস্থিত হয়ে ছাগবলি দেওয়ার পর কিছু সংখ্যক ভক্ত নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে গান গাইত, তার নাম 'ডিথিরাম্ব'। নর্তকদের বলা হত কোরাস। ডিথিরাম্ব গানে ডায়োনিসাসের মহিমা কীর্তিত হত। ডিথিরাম্ব শব্দের অর্থ 'দ্বিদ্বারম্' অর্থাৎ দুটি দরজা। ডায়োনিসাসের জন্ম দুবার,—একবার মাতৃগর্ভ থেকে, আর একবার জিউসের উরু থেকে। এই দেবতার জন্মকাহিনী ও প্রশস্তিই ছিল ঐ গানের উপজীব্য।

'ট্রাজিডি' শব্দটি গ্রীক। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ছাগ-গীতি (goat-song)। ডায়োনিসাসের উৎসবে ছাগ বলি দেওয়া হত বলে এবং প্রতিযোগিতায় কৃতী ব্যক্তিকে ছাগ উপহার দেওয়া হত বলে ছাগরূপী দেবতার কথা-আশ্রয়ী গান 'গোট সং' বা 'tragoedia' নামে আখ্যাত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ডায়োনিসাসের একদল বন্য ও কামার্ত অনুচর থাকত, এদের নিম্নাংশ ছিল ছাগের মতো। এদের Satyr বা ছাগ বলা হত। ডিথিরাম্ব যারা গাইত তারাও Satyrদের মতো সাজসজ্জা করত। Satyr বা ছাগের গানই ট্রাজিডি কথাটির জন্ম দিয়েছে। ট্রাজিডি শব্দটির ইতিহাস পাওয়া গেল, কিন্তু এর মধ্যে অনুকম্পা ও ভয় কিভাবে মূল ভাব হয়ে দাঁড়াল সে সম্পর্কেও নানা পণ্ডিতের নানা মত।

গ্রীক উপকথায় আছে যে, দেবরাজ জিউস তাঁর কন্যা পারসিফোনীর গর্ভে এক পুত্রের জনক হন—তার নাম জাগ্রেউস। জিউসপত্নী হেরা পুত্রটিকে হত্যার জন্যে টিটানদের প্ররোচিত করেন। সন্তানকে রক্ষার জন্যে জিউস প্রথমে তাকে ছাগ ও

১. ডায়োনিসাসের পূজা-পদ্ধতির ব্যাপার, উৎসব, ও গ্রীক নাটকের উদ্ভব-ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে জর্জ টমসনের লেখা "এইস্কিলাস ও এথেন্স" এবং জিওয়ের লেখা *"Origin of Greek Tragedy"* দ্রষ্টব্য।

পরে বৃষে পরিণত করেন। টিটানগণ শিশুটির সন্ধান পায় এবং কৌশলে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিন্ন করে একটি পাত্রে রান্না করে খেয়ে ফেলে। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে দেবী এথিনা শিশুটির হৃৎপিণ্ডটি রক্ষা করেন ও জিউসের হাতে তুলে দেন। জিউস তাঁর প্রেমিকা থীবসের রাজকন্যা সেমিলিসকে তা দিলে সেমিলিসের গর্ভসঞ্চার হয়। ফলে নূতন করে জাগরেউসের দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। এই দ্বিতীয় জন্মের পর তাঁর নাম হয় ডায়োনিসাস। জাগরেউসের জন্ম ও মৃত্যু-কাহিনীতে যথেষ্ট কারুণ্য ও ভীষণতা আছে—আবার তাঁর পুনর্জন্মের মধ্যে আছে আনন্দ।

গ্রীসে আরিঅনই ট্রাজিক-রীতির প্রথম প্রবর্তক। ডায়োনিসাসের উৎসব-উপলক্ষে যে 'ডিথিরাম্ব-গান' তার কিছু ইনি পরিবর্তন সাধন করেন। আয়োনীয়নদের দেবতা ডায়োনিসাস ও ডোরীয়দের সূর্যদেবতা অ্যাপোলো এই দুই দেবতার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও —এঁদের মধ্যে সমন্বয় করে ইনি ডিথিরাম্বকে কতকটা নাট্যপালার উপযোগী করেন। কিন্তু পরে ডিথিরাম্বের আরও রূপ-পরিবর্তন হয়—এটি দুভাগে—গীতিমূলক ও নাট্যমূলক অংশে বিভক্ত হয়। নাট্যমূলক অংশে সংলাপ প্রবর্তিত হয়। তখন এ হয়ে পড়ে নাটগীত। ধীরে ধীরে এল কাহিনী বা এপিসোড। ডিথিরাম্বকে এইভাবে উন্নত করলেন 'থেসপিস্'। ইনি কোরাস-বহির্ভূত এক নটের অভিনয় প্রবর্তন করেন। তাঁর সমকালে গ্রীসে যে কথকতা প্রচলিত ছিল, তারও আদর্শ তিনি মনে রেখেছিলেন। শুধু ডায়োনিসাস নয়, গ্রীক পৌরাণিক বীরদের চরিতকথা নিয়ে ষষ্ঠ শতকের নট থেসপিস পালাগানও লিখেছিলেন। এতে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকত; মূল গায়ক গান গাইতেন, আর সহকারী গানের মধ্য দিয়েই উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। মূল গায়কের কাছে থাকত কতকগুলো মুখোস, ভূমিকা অনুযায়ী সেগুলির মধ্যে যেটি উপযুক্ত তিনি পরতেন। থেস্পিসের পর খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে আসেন লেসাস। তিনি আরও কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তারপর একে একে দেখা দিলেন, এইস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস। এঁদের সাধনায় গ্রীক ট্রাজিডি সর্বোত্তম রূপ লাভ করল। বিশ্বখ্যাত এই সব নাট্যকারদের পরিচয় যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

ট্রাজিডি ও তার বিভিন্ন দিক ঃ

ট্রাজিডি মানবজীবনের এক শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কাহিনী—জীবনের মহা সর্বনাশের এক মর্মান্তিক ইতিবৃত্ত। জীবনপথ-পরিক্রমায় মানুষকে পরিবার, সমাজ, প্রাকৃতিক শক্তি ও অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলতে হয়। কিন্তু সব সময় এ সামঞ্জস্য সম্ভব হয় না। মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি কখনও কখনও এমনই বিদ্রোহ করে বসে যে পরিবার বা সমাজের কোনো একটি নীতি বা আদর্শের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে। কখনো বা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক জীবনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় কিংবা জীবনের চারপাশে মহাশূন্যতার শ্মশান সৃষ্টি করে। আবার কখনো অতিপ্রাকৃত দৈব শক্তির প্ররোচনায়, নিয়তির ক্রূর চক্রান্তে জীবনের চরমতম বিপত্তি ঘনিয়ে আসে। প্রাকৃতিক

শক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধেও মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়, বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, কঠোর আত্মিক সংগ্রাম করে—যদিও এ শক্তির ওপর তার কোনো হাত নেই। যে-ভাবেই হোক, জীবনের সঙ্গে পরিপার্শ্বের জীবন-সম্পৃক্ত পরিবেষ্টনীর সামঞ্জস্য না হলেই জীবনের আকাশ অন্ধকার হতে থাকে—প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার এক সংগ্রামক্ষেত্র হয়ে ওঠে জীবন। আর এ সংগ্রামে মানুষ যখন জয়ী হয় না, পদে পদে বিপর্যয় ও দুর্গতির রাজ্যে নামতে থাকে তখন ক্রমশ ঐ অন্ধকার ঘনীভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত চরমতম বেদনার মূল্যে হয় তাকে জীবন সমর্পণ করতে হয়—কিংবা ব্যথার দুর্বিষহ বোঝা বহন করে চলতে হয় আমরণ। মানুষের এই বিনাশের, মহা বিনিপাতের বা বিপত্তির বীজ তার অন্তরের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, আবার তা বাইরে থেকেও তার করাল-দংষ্ট্রার আঘাত হানতে পারে। দৈবের বিরূপতায় বা নিজ প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ও চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ প্রবণতার একমুখিনতায় মানুষের এই যে দুঃখ-দুর্দশা-বরণের কাহিনী—এরই নাম ট্রাজিডি।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে নানা দার্শনিক, সাহিত্যিক ও নাট্যশাস্ত্রী এই ট্রাজিডির স্বরূপ জানবার চেষ্টা করে আসছেন—সংজ্ঞার বন্ধনে তার প্রকৃতি নির্দেশ করতে চাইছেন। নানা দিক থেকে এর স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে। উপরে ট্রাজিডির যে সামান্য- পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতে অবশ্যই মনে হবে ট্রাজিডি অল্প-বিস্তর নৈরাশ্যকেই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ট্রাজিডি কখনও নীতিগত শৃঙ্খলা বা ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারাতে বলে না অন্তত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ট্র্যাজিডি। বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে ট্রাজিডি নিদারুণ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরে বটে এবং ঈশ্বরের বিধি-বিধান যে রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় তার বিশেষ ধরনের শ্লেষের মধ্য দিয়েও তা ব্যঞ্জিত হয়। যে দুঃখ, যে ব্যথা মানুষ এখানে পায়, তা প্রাপ্য নয়, একথাও তার প্রকৃতিতে গোপন থাকে না। কিন্তু তবু তার বিনাশ ও বিপত্তির মূলে তার নিজের কিছু মাত্র দায়িত্ব নেই—একথাটা বলতে সে দ্বিধাগ্রস্ত। ভগবানকে ভালবাসা আর সেবা করাই যদি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য মনে করা যায় তাহলে মানুষের জীবনে ট্রাজিডি কোথায়? কিন্তু এমন শান্তভাবে সব মানুষ ভগবৎ-প্রেমিকরূপে দ্বন্দ্বহীন শান্ত জীবন বরণ করতে পারে না। নিজের প্রবৃত্তিই তাকে বিদ্রোহী ও দম্ভী করে তোলে—অন্তত গ্রীক ট্রাজিডিতে গর্বিত মানুষের উন্নত শিরই লক্ষ্য করা যায়। ট্রাজিডি নায়কের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়, তার ভাবাবেগ গুমরে মরে, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে সে ভাগ্য বা প্রতিকূল শক্তিকে মেনে নেয় অথবা দর্শক অন্তত একটা বোঝাপড়া করে। এই হল ট্রাজিডি! এ ট্রাজিডির সংজ্ঞা অ্যারিস্টটল থেকেই শুরু করা যাক।

"A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts

of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions." [১]

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার কয়েকটি শব্দের অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। পণ্ডিতেরা তাঁর সংজ্ঞার 'Imitation', 'Action', 'Complete', 'Pity', 'Catharsis, শব্দগুলি ঠিক কি বোঝাচ্ছে, তা নিয়ে এখনও তর্ক করে চলেছেন। তথাপি তিনি যা বলেছেন, তার থেকে আমরা ট্রাজিডির এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি।

ক. ট্রাজিডি হল কোনও গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ।

খ. ট্রাজিডির যে ঘটনা, তা হবে একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

গ. এর যে ভাষা তাতে থাকবে আনন্দদায়ক ছন্দ ও গান।

ঘ. এর প্রকাশ-ভঙ্গিমা হবে উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বলিত, নাটকীয় এবং কখনই তা বর্ণনাত্মক হবে না।

ঙ. ট্রাজিডি এমন ঘটনাকে রূপায়িত করবে যাতে Pity ও fear অর্থাৎ অনুকম্পা ও ভয় দর্শকচিত্তে জাগ্রত হয়।

চ. আর এর লক্ষ্য হবে অনুকম্পা ও ভয়ের আবেগ-বাহুল্য থেকে চিত্তের মুক্তি।

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞাটির থেকে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হল, সেগুলির আরও কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। তিনি যখন বলেন, ট্রাজিডি গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ, তখন বুঝতে হবে যে সে ঘটনা জীবনের কোনো লঘু তরল দিকের উপস্থাপনা নয়—এমন দিকের কথা যাতে দর্শকচিত্তে অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত হয়। আর এ ধরনের ঘটনা তাঁর মতে তিনশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘটতে পারে—শত্রু, মিত্র ও এ দুয়ের মাঝামাঝি শ্রেণীর মানুষ। দুই শত্রুর মধ্যে এ ঘটনা ঘটলে তা ভীষণ ও ভীতিপ্রদ হলেও অনুকম্পা দাবী করতে পারে না। শত্রু বা মিত্রকে বাদ দিয়ে যদি এ ঘটনা কোনো নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটে, তখনো তা ঠিক ট্রাজিডির বিষয় নয়। কিন্তু যখন মিত্র বা প্রিয়জনদের মধ্যে এ ঘটনা দেখা দেয়, তখনই প্রকৃত ট্রাজিডি। ভ্রাতা যদি ভ্রাতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, পুত্র যদি পিতা বা মাতাকে হত্যা করে, স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে হৃদয়হীন ব্যবহার করে তখন তো সান্ত্বনাহীন ট্রাজিডি। তাছাড়া অ্যারিস্টটল আরও মনে করেন যে, নায়কচরিত্রের খ্যাতি বা সামাজিক ও বংশগত মর্যাদাও তার জীবনের ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ (serious) করে।

অ্যারিস্টটল বলেছেন ট্রাজিডির ঘটনা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নির্দিষ্ট আয়তনের ও একটি মাত্রই। এই একটি মাত্র ঘটনা হবে আদি-মধ্য-অন্ত্যসমন্বিত, কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ট্রাজিডি প্রকাশিত হবে যে ভাষায় তাতে থাকবে ছন্দ ও গান, অর্থাৎ তার কোনো অংশ ছন্দে ও কোনো অংশ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হবে—বর্ণনা বা বিবৃতির সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলবে না—উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে চলমান জীবন-

১. *Poetics* Aristotle tr. By Water P. 35.

ঘটনাকে করে তুলতে হবে ক্রিয়াশীল। অনুকম্পা ও ভীতি ছাড়া অন্য কোনো ভাবকে ট্রাজিডিতে প্রধান করা চলবে না। আর এর উদ্দেশ্য হবে ক্যাথারসিস বা ভাববিমোক্ষণ বা বিশুদ্ধিকরণ। এই শব্দটির কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। বুচার সাহেব ট্রাজিডি-সংজ্ঞার অনুবাদে শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে অনুকম্পা ও ভীতি-জনিত যে ভাবাবেগের আধিক্য তা থেকে ট্রাজিডি দর্শকচিত্তকে মুক্ত করে ও চিত্তের মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। ফলে তারা আনন্দিত হয়। বিষয়টি নিয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। এই হল অ্যারিস্টটল-প্রদত্ত ট্রাজিডির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা। কিন্তু মনে রাখতে হয়, তিনি শুধু ট্রাজিডির সংজ্ঞা দেন নি। ট্রাজিডি-তত্ত্ব সম্পর্কে দৃষ্টান্ত সংযোগে তিনি নানা সূক্ষ্ম-গভীর আলোচনা করেছেন। তাঁর সংজ্ঞা ও আলোচনাই পরবর্তীকালে ট্রাজিডি-তত্ত্ব সম্পর্কিত নানা চিন্তার জনক। এখানে আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা সমালোচকের দেওয়া ট্রাজিডির সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) ট্রাজিডি সম্পর্কে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন, তা অ্যারিস্টটলের বক্তব্য থেকে অনেকখানি পৃথক। দ্বন্দ্বকেই তিনি ট্রাজিডির প্রাণ বলে মনে করেন। দুঃখের কাহিনী তাঁর মতে ট্রাজিডি নয়—যদি তা নাটকীয় দ্বন্দ্বাত্মক পরিণাম লাভ না করে। তিনি বলেন ট্রাজিডির দ্বন্দ্ব সত্যের সঙ্গে মিথ্যার বা ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্ব নয়। ভালোর সঙ্গে ভালোর, সত্যের সঙ্গে সত্যের, ন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়েরই—অর্থাৎ দুই নৈতিক সমস্যারই দ্বন্দ্ব।[১] নায়ক যাকে ভালো মনে করে তা আংশিক ভালো বা সত্য, যদিও সে নিজে তাকে 'absolute' ভালো বলেই মনে করে। এক সত্য বা ভালো যে দাবী করে, অন্য সত্য বা দাবীর সঙ্গে তার মিল হয় না—ফলে বিরোধ দেখা দেয়। নায়কের আত্মা পরস্পর-বিরোধী ভালো বা সত্যের বা ন্যায়ের দাবী মেটাতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জীবনে দেখা দেয় ট্রাজিডি। কিন্তু বেদনায় দ্বন্দ্ব-কাতর আত্মা স্থির থাকে না—ভারসাম্য রক্ষার জন্যে নিরন্তর তাকে চেষ্টা করতে হয়। দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ দাবীর মধ্যে নায়ক যে ভাবেই হোক সমন্বয় করবে অথবা কোনও এক দাবীকে বর্জন করবে। মোট কথা দ্বন্দ্বের সমাধান চাই। আর এই সমাধান বোধ (Feeling of reconciliation) থেকেই সনাতন ন্যায়বোধ (Eternal justice) এর উপলব্ধি এবং তার ফলেই ট্রাজিডির আনন্দ। অ্যারিস্টটল নায়কের পতনের জন্য hamartia বা তার চারিত্রিক কোনো ত্রুটি বা বিচার-ভ্রান্তি দায়ী একথা বলেও তার দোষ হয় কি পরিমাণ, তা বলেন নি। হেগেল নায়কের এই ত্রুটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিলেন। 'অ্যান্টিগোন' নাটকটিকে তিনি শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি বলে মনে করেছেন—কারণ এতে নৈতিক সমস্যা সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে আছে। ক্রেয়ন ও অ্যান্টিগোন এ নাটকে যে নৈতিক আনুগত্য দেখিয়েছে, এক হিসেবে তা

১. "Every tragedy does show, so Bradley argued "a self division and self-waste of spirit" (*Lectures on Poetry*).

ঠিক। কিন্তু দুজনেই যে নৈতিক আনুগত্যকে চরম বলে মনে করেছে, সেইখানেই তাদের ভুল। তাই তাদের দাবী আংশিক সত্য—আর তাদের জীবনে শোচনীয়তা এসেছে অংশকে সম্পূর্ণ মনে করার মানবিক ব্যর্থতা থেকে। হেগেলের ধারণা এই উপলব্ধি পাঠক বা দর্শকের মনেই আসবে, নায়কের মনে নাও আসতে পারে। অ্যান্টিগোন মৃত্যুবরণ করেছিল, কিন্তু সে যে 'absolute ideal' এর পরিবর্তে 'limited ideal' কে গ্রহণ করেছিল, এ বোধ তার হয় নি।

বিখ্যাত শেক্সপীয়র সমালোচক অধ্যাপক ব্র্যাড্‌লে তাঁর 'Hegel's theory of Tragedy' নামক প্রবন্ধে ট্রাজিডি সম্পর্কে হেগেলের মত ও নিজের বক্তব্য বলেছেন। হেগেলের বক্তব্যকেই অপেক্ষাকৃত নরম সুরে এবং তার সঙ্গে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা যুক্ত করে লিরিকের সংজ্ঞায় তিনি ট্রাজিডিকে বুঝিয়েছেন। হেগেলের সুরে তিনি বলেছেন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নায়কের জীবনে যে ভাগ্যবিপর্যয় বা দৈব দুর্বিপাক তাই হল ট্রাজিডির বিষয়। ট্রাজিডির ঘটনা করুণ ও ভয়ঙ্কর হবে, কিন্তু তা হবে মনুষ্যসৃষ্ট ও কতক পরিমাণে দুঃখভোগীর নিজস্ব সৃষ্টি—যে দুঃখ একান্তভাবে অন্তরে, অথচ বাইরে যার অভিব্যক্তি নেই, তাও ট্রাজিডির বিষয়। তাঁর মতে সব ট্রাজিডিতে নৈতিক সমস্যা থাকে না—তবে 'a self division ও 'self waste of spirit' থাকবেই। হেগেলের তত্ত্বকেই সম্প্রসারিত করে তাঁর উক্তি—"The typical and essential conflict to be found in tragedy is not, that of good against good, but rather a conflict within the self; any spiritual conflict involving spiritual waste is tragic."[১][২] ট্রাজিডিতে দ্বন্দ্বের সমাধান সম্পর্কে হেগেল যা বলেছেন, ব্র্যাডলে তা অবশ্য গ্রহণ করেন নি। সনাতন ন্যায়বোধের মধ্যে পরিণামে সমস্ত দ্বন্দ্ব মিলিয়ে যায় হেগেলের এই উক্তির প্রতিবাদে তিনি জানিয়েছেন যে তা কখনো ঘটে না। অনেক সময়ে নায়কের মন দ্বিধাবিভক্ত থেকেই যায়—বেদনার উপশম একেবারেই হয় না। আবার কখনো কখনো এমনভাবে সমাধান ঘটে যে বেদনার সঙ্গে নায়ক ন্যায়ের মর্যাদা তো অবনত মস্তকে রক্ষা করেই, উপরন্তু তার শেষ আচরণ মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। ট্রাজিডির সমাপ্তিও তাঁর মতে দু'রকমের ক. সমন্বয়-পরিণাম খ. বিপত্তি-পরিণাম (catastrophe). প্রথমটি হল নায়কের সঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষের একটা

১. "Primitive tragedy, then consists in this, that within a collosion of this kind both sides of the contradiction, if taken by themselves, are justified."—(*Dramatic Poetry*, 1818-1829). G.W.F. Hegel. The *Philosophy of Fine Art*-এ হেগেল বলেছেন, "The characteristic struggle in tragedy is between rival ethical claims : good is set up against good, and the choice is not between good and evil, but between one good and another". কিংবা "The good chosen by the hero is only a Partial good though the hero treats it as though it were an absolute good." *Literary Criticism : A short History* : William K. Wimsatt JR. and Cleanth Brooks. Edn 1964. pp 557.

২. Ibid pp. 559.

রফা ও মিলন—কিন্তু তা আপাত মিলন বা সন্ধি—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আরও মর্মান্তিক ও ক্ষণিকের স্তম্ভিত আর্তনাদ। আর দ্বিতীয়টি হল বিভক্ত আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিদারুণ প্রয়াস কিন্তু পরিণামে দুর্গতি।

বিশ শতকের রোজার ফ্রাইও 'Romance and Tragedy' (1922) গ্রন্থে মোটামুটিভাবে হেগেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্রাজিডিকে বুঝিয়েছেন। সর্বজনীন নৈতিক শৃঙ্খলার ওপরেই তাঁর মতে ট্রাজিডির ভিত্তি। নায়কের পতন সাময়িকভাবে সেই শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে—দর্শক বা পাঠক আঘাত পায়—একটা নৈতিক অস্বস্তিবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মিলিয়ে যায়। নায়কের পতনই নৈতিক শৃঙ্খলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাই তিনি বলেন—"The tragic writer must stress the ultimate stability of the moral order."[১] জোসেফ উড্‌ক্রাচ (Woodkrutch)-এর আলোচনাতেও হেগেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'The Modern Temper' (1928) নামক গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন যে মানুষের মহত্ত্বের ওপর আস্থা না থাকলে ভাল ট্রাজিডি লেখা যায় না। ট্রাজিডি লেখকের ভগবানে বিশ্বাসের দরকার নেই, কিন্তু মানুষের ওপর বিশ্বাস থাকতেই হবে। এখন যে ভাল ট্রাজিডির জন্ম হচ্ছে না তার কারণ মানুষের শক্তি ও মহত্ত্ব-সম্ভাবনা সম্পর্কে নাট্যকারদের অনাস্থা।

উনিশ শতকের জার্মান নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক এ. ডাবলিউ. শ্লেগেল বলেছিলেন নায়কের দুর্বহ সহ্যশক্তি এক হিসেবে তার আত্মপ্রতিষ্ঠারই[২] কাহিনী—দৈবশক্তির বিরুদ্ধে বোঝাপড়া করার মধ্যে, ভাগ্যের প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যেই নায়কের গর্ব। তিনি ট্রাজিডিতে গর্বিত মানুষের মহিমা লক্ষ্য করেছিলেন।

বেদনাবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উনিশ শতকে ট্রাজিডি সম্পর্কে নূতন কথা শুনিয়েছিলেন। 'The world as will and Idea' (1818) গ্রন্থে তিনি হেগেলের ধারণাকে মানলেন না। তাঁর মতে ট্রাজিডির মধ্যেই আমরা সংসারের প্রকৃত রূপ দেখি। এখানে নিরন্তর হানাহানি, মর্মান্তিক দুঃখকষ্ট, শয়তানের অট্টহাস্য ও নিয়তির হৃদয়হীনতা। শ্রেষ্ঠ মহৎ-প্রাণ ব্যক্তি ট্রাজিডিতে বহু দুঃখকষ্ট ও দ্বন্দ্বের শেষে বৃথা আশা-আকাঙ্ক্ষা বা অভিমান-অহংকার ত্যাগ করে শেষে জীবনকেও সমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণেই আছে ট্রাজিডির আনন্দ। তিনি বলেছেন, "Tragedy gives us an insight into the heart of the mystery, into the nature of the evil,

১— "The fall of the hero momentarily disturbs the moral qualm (order); the auditor or the reader is shocked···In genuine tragedy, however that qualm is overcome; the very fall of the hero confirms the moral order which it had at first shock seemed to call in question". *Literary Criticism*: W.K. Wimsatt, JR. and C. Brooks, pp. 559.

২. The world as will and Idea. 1818 তে তিনি বলেছেন, ট্রাজিডিতে "The noblest men, after long conflict and suffering atlast renounce the ends they have so keenly followed and all the pleasures of life for ever." Ibid

which is the nature of reality and hence of the 'will'[১]. শোপেনহাওয়ারের মতে জীবনে ট্রাজিডি তিনটি পথে আসতে পারে।

ক. মানুষের নিজের অতিরিক্ত শয়তানির ফলে তাঁর জীবনে ট্রাজিডি দেখা দিতে পারে, দৃষ্টান্ত—ইয়াগো, রিচার্ড তৃতীয়।

খ. অন্ধ ও ক্রূর ভাগ্যের চক্রান্তে দৃষ্টান্ত—রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট,

গ. মানবচরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সংঘর্ষে দৃষ্টান্ত— গেটের ক্ল্যাভিগো ও কতকটা হ্যামলেট।

দার্শনিক নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০) 'Birth of Tragedy' গ্রন্থে ট্রাজিডির স্বরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ডায়োনোসিয়ান ও অ্যাপোলোনিয়ান শিল্পের মূলদেশে ফিরে না গেলে তাঁর মতে ট্রাজিডিকে বোঝা যাবে না। গ্রীসের ডায়োনিসাস দেবতাকে আশ্রয় করে করুণ গান আর অ্যাপোলোকে কেন্দ্র করে দুঃখজয়ী, মৃত্যুজয়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সৌন্দর্যের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। ট্রাজিডি হল দুঃখ ও দুঃখজয়েরই কাহিনী। ডায়োনেসীয় দুঃখবেদনা অ্যাপোলীয় আনন্দে বিলীন হয়ে যায় ট্রাজিডিতে। তাঁর মতে ট্রাজিডি মূলত 'Musical'. "It was the greatest of the arts because it involved a "harmonization" of the greatest possible tensions."[১]

আধুনিক কালের আমেরিকান নাট্যতাত্ত্বিক জোসেফ উডক্রাচ তাঁর The Modern Temper নামক গ্রন্থের The Tragic Fallacy (1929)-এর আলোচনায় বলেছেন ট্রাজিডি মহৎ মানুষের জীবন-ঘটনার রূপায়ণ সব সময় নাও হতে পারে, কিন্তু মহৎ ঘটনারই যে তা রূপায়ণ এতে কোনো সন্দেহ নেই। ট্রাজিডি হতাশার গান নয়, বরং হতাশা-জয়েরই গাথা। (Tragedy is essentially an expression not of despair; but of the triumph over despair and of confidence in the value of human life.) ট্রাজিডির কাহিনী যত ভয়ঙ্করই হোক, তা জীবনের ওপরে বিশ্বাসেরই অঙ্গীকার-পত্র—যদি স্বর্গে ভগবান নাও থাকেন, অন্তত মর্ত্যে তাঁরই মানুষ বর্তমান—এরই ঘোষণাপত্র। বাহ্যতঃ যদিও ট্রাজিডির অন্তিমে মানুষের দুর্ভাগ্যের দিকটি বড় হয়ে ওঠে, ভালো মানুষ চিরতরে বিদায় নেয়, এবং সবচেয়ে সুন্দর বস্তুটি প্রথমেই ধ্বংস হয়ে যায়—তবুও আমরা হতাশ হই না। আনন্দের সঙ্গেই বাইরের পরাজয়কে বরণ করে নিই আমরা, ভিতরের জয়ের বিনিময়ে। প্রেমের অবিনশ্বর মহিমা ঘোষণা করেই জুলিয়েটের মৃত্যু, আত্মার গরিমা তুলে ধরার পরেই ওথেলোর নিজের হাতেই বুকে ছুরিকাঘাত। এমনিভাবে ট্রাজিডি নিজের পথেই অন্তিমে দুঃখ নয়, সুখের আস্বাদন এনে দেয়। (It must reach its own happy end in its own way).

ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্ণার্ড শ প্রমুখ নাট্যকারদের হাতে যে ট্রাজিডি সৃষ্টি হল

১. *Literary Criticism: A Short History* Chap. 25: W. K Wimsatt. J. R. and C. Brooks, First Edition 1957 গ্রন্থে উদ্ধৃত p. 567.

তাদের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবসেন ও মেটারলিঙ্কের ট্রাজিডিগুলি আমাদের এই ধারণাই দেয় যে ট্রাজিডি কিছু হানাহানি বা রক্তপাতের ব্যাপার নয়—নিকলের কথায় এগুলি পুরোপুরি যুগোপযোগী এবং এখানে মৃত্যু ট্রাজিক কিছু নয় এবং এখানে নায়কের অন্তরের মহিমাই মুখ্য, বাইরের আপাত মহত্ত্ব নয়—(Where apparent greatness is dimmed by an inner greatness.)[১] বার্ণার্ড শয়ের মতে নাটক ভাবাবেগের ব্যাপার নয়। অমীমাংসিত আদর্শ বা নৈতিক সমস্যারই সংঘাত থেকে নাটকের জন্ম। কোনো রকম নিষ্পত্তি এখানে বড় হয়ে ওঠে না—বড় হল বন্ধনপীড়িত, সমগ্র জ্বালায় জর্জরিত মানুষের রূপটি।[২] সমাধানহীনতাই ট্রাজিডি নাটকের গৌরব।

ট্রাজিডি সম্পর্কিত নানা মনীষী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অভিমত আলোচনা করে দেখা গেল যে ট্রাজিডি জীবনেরই এক বিশেষ রূপ। জীবনের মূলীভূত তত্ত্বের সঙ্গে অন্বিত এই ট্রাজিডির স্বরূপসন্ধানে তাই দীর্ঘকাল ধরে নাট্য বিশেষজ্ঞদের এমন আগ্রহ। আমরা নাট্যের অন্তর্গত জীবনের এই গূঢ়-গভীর বিশেষ রূপটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে চাই। এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে অন্তত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা অপরিহার্য।

ক. ট্রাজিডির নায়ক
খ. ট্রাজিডির ভাব বা আত্মা
গ. ক্যাথারসিস তত্ত্ব
ঘ. ট্রাজিডির আনন্দতত্ত্ব
ঙ. ট্রাজিডির সমাপ্তি
চ. ট্রাজিডির বিভিন্ন শ্রেণী ও তার পরিচয়।

ট্রাজিডির নায়ক :

নাটকের নায়ক আমরা তাকেই বলব, যাকে কেন্দ্র করে নাটকের নাট্যবেগ উৎসারিত, যার মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্য রূপায়িত এবং যার সংগ্রামী শক্তির ওপর আমাদের গভীর সহানুভূতি।[৩] যাকে কেন্দ্র করে নাট্যঘটনার পরিণামমুখী অগ্রগতি, যাকে আশ্রয় করে নাটকের অঙ্গীরস অভিব্যক্ত, যার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের জীবনদর্শন, প্রকাশিত সেই হল নায়ক। ট্রাজিডির আত্মা ও উদ্দেশ্য যাকে আশ্রয় করে রূপ লাভ করে—সেই হল নায়ক-চরিত্র। নাটকের কর্মসম্পাদন ও তার ফলভাগীও হল সে। ট্রাজিডিতে নায়ক চরিত্রের মহত্ত্ব ও আকর্ষণী শক্তি অন্যান্য সকল চরিত্রের চেয়ে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

১. *World Drama* : A Nicoll p. 641

২. "In the new plays, the drama arises through a conflict of unsettled ideas"... the conflict is not between clear right and wrong" আলোচনাটাই বড় হয়ে ওঠে এখানে। The Technical Novelty in Ibsen's Plays, 1913.

৩. The man in whom is centered the force with which the receptor sympathizes, in the struggle of a novel or play. (*D.O.W.L.* Edtd. J.T. Shipley pp. 207)

একটি চরিত্র এমন প্রাধান্য সাধারণত কমেডিতে পায় না। ট্রাজিডিতে একটি বা দুটি চরিত্রের ওপরই সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রীভূত থাকে। সবচেয়ে প্রধান বা নায়ক চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে সাধারণতঃ ট্রাজিডির নামকরণও করা হয়। ট্রাজিডিতে নায়ক চরিত্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা সর্বাধিক।

অ্যারিস্টটল ট্রাজিডির নায়কের কথায় বলেছেন যে এর নায়ক হবে অতিশয় খ্যাতিমান, সমৃদ্ধিশালী বা বংশমর্যাদার অধিকারী। (highly renowned and prosperous) সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের অসাধারণ ব্যক্তি হবেন নায়ক। (Persons who are above the common level) অ্যারিস্টটল নায়কের যে বংশ-মহিমা ও ঐশ্বর্যের দাবি করেছেন, পরবর্তীকালের নাটকে বহুক্ষেত্রেই তা রক্ষা করা হয় নি। যুগের পরিবর্তনে, সমাজ-মানসের বিবর্তনে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক চেতনার জাগরণে সাধারণ সামাজিক মানুষের মূল্য স্বীকৃতি পেয়েছে। সেইজন্য সামাজিক ও পারিবারিক ট্রাজিডি সৃষ্টির কালে নায়কের ঐ বংশকৌলীন্য বা আভিজাত্য আর রইল না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে গ্রীক নাটকের ইডিপাশ, প্রমীথিয়াস, অরিস্টিস কিংবা শেক্সপীয়রের ওথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ লীয়রকে একালে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। গ্রীক পুরাণের অসামান্য বীর্যবান চরিত্র, শেক্সপীয়রের আমলের অসাধারণ ঐতিহাসিক পুরুষ বা যুগধর্মে কোনো বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র আধুনিককালে দুর্লভ। তথাপি ট্রাজিডি নায়কের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী এমন হওয়া চাই, যাতে তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে—ভীতি, অনুকম্পা ও বিস্ময়-ভাব-উদ্বোধের কারণ হয়। আর ট্রাজিডির এই অপরিহার্য শর্ত পালন করতে গেলে তার নায়ককে কিছু বিশেষত্ব দান করতেই হবে। আর এই বিশেষত্ব চরিত্রটিকে একেবারে সাধারণ স্তর থেকে কতকটা উর্ধ্বে তুলে ধরে। কিন্তু এই বিশেষত্বের জন্যে নায়ক যে-গৌরব আধুনিককালের নাটকে লাভ করে, তাতে অধ্যাপক নিকল সন্তুষ্ট নন। তাই তিনি পারিবারিক নাটকের নায়কের কথা ভেবে ট্রাজিডি-সৃষ্টি সম্পর্কে হতাশ হয়েছেন।

অ্যারিস্টটল অতিশয় ভালো বা অতিশয় মন্দ চরিত্রের নায়কত্বের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর অভিমত হল এই দুই জাতের নায়কের সমৃদ্ধির রাজ্য থেকে সর্বনাশের শ্মশানে পতনে দর্শকচিত্তে অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত হয় না। অতিমন্দের ভাগ্যবিপর্যয়ে নীতিবোধ তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু অনুকম্পা বা ভয় জাগে না। অতি সজ্জনের পতনে আঘাত লাগে, কিন্তু ঐ দুই ভাব জাগ্রত হয় না। তাই তিনি বলেন যে এ দুয়ের মাঝামাঝি এমন চরিত্রকে নায়ক করা উচিত যে অতিশয় ভালো বা অতিশয় মন্দ নয়। "There remains then, the character between these two extremes—that of a man who is not eminently good and just, yet whose misfortune is brought about not by vice or depravity, but by some error or frailty."[১] অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজিডির নায়ক পরমোৎকর্ষের আদর্শ নিশ্চয়ই হবে না, কিন্তু

১. *Poetics, Aristotle, Chap. XIII.*

তার মধ্যে উন্নত চরিত্রের লক্ষণ কিছু থাকবেই। আর সে চরিত্র অজ্ঞানতাবশত অথবা মানবিক দুর্বলতাবশত কিছু ভুল-ভ্রান্তি করবেই। আর এরই ফলে ঘটবে তার বিপর্যয়। তার বিপর্যয়ের জন্যে কোনো পাপকর্ম বা চরিত্রগত দোষ দায়ী হবে না—চরিত্রগত দুর্বলতা চারিত্রিক দোষ নয়।[১]

অজ্ঞতাবশত ভুলের ফলে যে নায়ক অন্যায় করে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল সফোক্লিসের ইডিপাশ নাটকের ইডিপাশ চরিত্রের কথা বলেছেন। ইনি নিজের অজ্ঞাতেই পিতৃহত্যা করেছেন এবং নিজ মাতাকে বিবাহ করে তাঁর গর্ভে পুত্র-কন্যার জনক হয়েছেন। এ ধরনের নায়ক কিন্তু শেক্সপীয়রের নয়। অনেক পরে সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে বিউমণ্ট (Beaumont) ও ফ্লেচারের (Fletcher) এর ট্রাজিকমিডিতে অনেকখানি এই জাতের নায়কের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। রেস্টোরেশন যুগের দু' একখানি নাটকেও অনেকখানি এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নায়ক দেখা গেছে। আবার যে নায়ক ইচ্ছে করেই অন্যায় করে, তার দৃষ্টান্তও অ্যারিস্টটল দিয়েছেন। ইউরিপিডিসের 'হিপ্পোলাইটাস' (Hippolytus) নাটকের ফেড্রা (Phaedra) চরিত্র বা 'মিডিয়া' নাটকের Medea চরিত্র এর দৃষ্টান্ত। এই শেষোক্ত নাটকটিতে প্রেমিকের ওপর প্রেমিকার ভয়াবহ প্রতিশোধমূলক ঘটনা আছে। আরগোনটের রাজপুত্র জাসন কলখিসের রাজকন্যা মিডিয়াকে চিরকাল ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যের আইন অনুযায়ী কোনো বিদেশিনীকে বিবাহ করার তাঁর উপায় ছিল না।

তাই দুজনে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে থাকেন ও মিডিয়ার গর্ভে দুটি সন্তানও জন্মে। কিন্তু ক্রমে মিডিয়ার ব্যবহারে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে জাসন করিন্থের রাজা ক্রেয়োনের কন্যাকে বিবাহ করলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিডিয়া ভয়াবহ এক প্রতিশোধ নেন। নববধূকে বরণ করবার জন্য তিনি তাঁকে এমন একটি পোষাক দিলেন, যা ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নববধূ প্রাণ হারালেন। কন্যাকে রক্ষা করতে গিয়ে পিতা ভস্মীভূত হলেন এবং জাসনের চোখের সামনে সন্তান দুটিকে হত্যা করে মিডিয়া রথে উঠে পালিয়ে গেলেন। মিডিয়ার স্বেচ্ছাকৃত এই আচরণ নিশ্চয়ই অন্যায়। শেক্সপীয়র ও এলিজাবেথীয় যুগের অনেক নাট্যকার এই আদর্শে নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। ম্যাকবেথ পুরোপুরি এই জাতেরই নায়ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ জাতের নায়ক সৃষ্টি করে সেই নাট্যকারই সাফল্যলাভ করবেন যিনি নায়কের মনে ঐ ভয়াবহ কাজটির বা কাজগুলির প্রতি বিরূপতা বা অনুষ্ঠিত কাজের জন্যে অনুতাপও দেখাতে পারবেন। রোমান্টিক নাটকে সাধারণত কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর চরিত্রের পরিবর্তন দেখানো হয়, —যেমন ম্যাকবেথ। আর ক্লাসিক্যাল নাটকে কাজটি অনুষ্ঠানের পূর্বে বা ঠিক অব্যবহিত পরেই নায়কের মনে ঘৃণা দেখানো হয় যেমন এইস্কালাসের অরিষ্টিস। এই পালার দ্বিতীয়

১. Ideal hero.র কথায় অ্যারিস্টটল বলেন, "A man not pre-eminently virtuous and just whose misfortune, however, is brought upon him not by vice and depravity, but by some error (hamartia) or frailty, *Poetics* Chap. 11.

খণ্ডে অরিষ্টিস তার মাতা ক্লাইটোমেনেস্ট্রা ও প্রণয়ী এইগিসথুসকে হত্যা করার পূর্বে ও পরে যথেষ্ট আত্মগ্লানি অনুভব করেছে। সজ্ঞানে মাতৃহত্যা করেও প্রায় উন্মাদ অবস্থায় সে বিভীষিকা দর্শন করেছে। যেখানে নায়ক চরিত্রে ঐ ভয়ঙ্কর অন্যায় আচরণের জন্যে কোনো রকম ভয়, ঘৃণা বা অনুতাপ দেখানো হয় না, সেখানে ট্রাজিডিও নিম্নস্তরের হয়। যদি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের আরঙ্গজীবকে নায়ক মনে করি, তাহলে তিনিও এই শ্রেণীর।

এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নির্দোষ চরিত্রের কথাও আসে। সম্পূর্ণ নির্দোষ নায়ককে অ্যারিস্টটল ট্রাজিডির অনুপযুক্ত মনে করতেন। এ শ্রেণীর নায়কের শোচনীয় পরিণাম দর্শকের মনে অনুকম্পা জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু ভয় নয় এবং তাঁর জন্যে যে দুঃখ বা বেদনাবোধ তাও খাঁটি ট্রাজিক নয়। রেনেশাঁস যুগের কস্টেলভেট্রো ও রোস্‌সি এই জাতের নায়কের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এঁদের মতে সাধু-সন্ত শ্রেণীর মানুষও ট্রাজিডির নায়ক হতে পারেন। নাট্যতাত্ত্বিক ডঃ স্মার্ট 'গসপেলস্'-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐ দাবিকে পরবর্তীকালে সমর্থন করেছিলেন। সাধু-সন্তদের কথা বাদ দিয়েও আমরা বলতে পারি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ চরিত্র বিরলক্ষেত্রেই ট্রাজিডির নায়ক হতে পারে। তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি বা সাধারণ মানবিক দুর্বলতার জন্যে নয়—তা ঘটে অদৃষ্টের চক্রান্তে সম্পূর্ণ বাইরে থেকে—শেক্সপীয়রের 'রোমিও' চরিত্র এর দৃষ্টান্ত।

আর এক ধরনের নায়কের কথা বলা যায়। এই শ্রেণীর নায়কেরা একটি প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করে, যার সঙ্গে তুলনায় নিজেদের শক্তি কম। এখানে নায়কের মানবিক দুর্বলতাকে অন্যায় বলা যায় না। হ্যামলেটের জীবনে যে ট্রাজিডি তা তার ব্যক্তিত্ব থেকেই উদ্ভূত; তার দ্বিধা ও বিলম্বই তার সর্বনাশের কারণ। বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কোনোক্রমেই হ্যামলেটকে শয়তান বলা চলে না। মার্লোর ডঃ ফস্টাস' এর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তার পতনের কারণ ঠিকই, কিন্তু মানবিক শক্তির সঙ্গে অতিমানবিক শক্তির সংঘর্ষের ওপরই এ নাটকের ট্রাজিডির ভিত্তি স্থাপিত। এখানেও নায়কের জীবনের শোচনীয়তার জন্যে তার মানবিক দুর্বলতাই (Frailty)—জ্ঞানপিপাসা বা অসীমের জন্যে কাঙালপণাই দায়ী। অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে তার নিজ শক্তি পরাভূত হয়েছে।

রেস্টোরেশন যুগের 'হিরোয়িক ট্রাজিডি'গুলির কথা মনে রেখে অধ্যাপক নিকল দুই আদর্শের মধ্যে দোলাচলচিত্ত এক শ্রেণীর নায়কের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে নায়কের জীবনে একদিকে প্রবৃত্তির বেগ ও অন্যদিকে কর্তব্যবোধ—এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নায়ক চরিত্রে এখানে ভুল-ভ্রান্তি বা সাধারণ মানবিক দুর্বলতা থাকতে পারে—তার পতন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কোনো কর্মের ফলও হতে পারে। কিন্তু ঐ দুই আদর্শের সংঘাতটাই এখানে বড় হয়ে ওঠে। রাসিনের ট্রাজিডিগুলি ও ড্রাইডেনের হিরোয়িক ট্রাজিডি এর দৃষ্টান্তস্থল। নায়কের দোষ-ত্রুটিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

আরও একজাতের নায়ক আছে যে পাপ-জীবনকে বরণ করতে বাধ্য হয়, তার নিজের কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটির জন্য নয়—বাধ্য হয় তার বিরুদ্ধ একটা প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে। আর এই পাপাচরণের মধ্যেও নায়ক পবিত্রচেতাই থাকে—দৃষ্টান্ত শীলারের "The Robber" নাটকটি। কিংবা কখনো কখনো দেখা যায় ট্রাজিডির নায়ক নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই কোনো একটা অন্যায় কাজ করে বসে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের বা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের রাম সমাজ-নীতিকে মান্য করতে গিয়ে শূদ্ররাজকে হত্যা করেছেন, সীতা অকলঙ্ক জেনেও তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নায়ক ঃ

সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার দিক থেকে সাধারণত ট্রাজিডি নাটকে নায়কের দু'রকম ভূমিকা। কোথাও নায়ক উদ্যমশীল, কর্মতৎপর ও অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় আবার কোথাও সে নিষ্ক্রিয়। কখনো নায়ক অতিরিক্ত কর্মতৎপর হয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে ও শেষ পর্যন্ত একটা পরিণাম লাভ করছে। আবার কখনো নায়ক তার নিজস্ব প্রকৃতির জন্যে কিংবা কোনো আদর্শে অবিচল থাকার জন্যে বিরুদ্ধ শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করছে, চক্রান্তের চাপে দলিত হচ্ছে ও মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করছে। প্রথম প্রকারের নায়ক হল সক্রিয় এবং সে আদ্যন্ত নাটকের ঘটনাধারাকে সচল করে রাখে। এইস্কালাসের অরিষ্টিস, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান প্রভৃতি চরিত্র এর দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় প্রকারের নায়ককে নিষ্ক্রিয় বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কর্মতৎপর বা উদ্যোগী না হলেও একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়। তাদের শারীরিক ক্রিয়া নাটকে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু তাদের মনোরাজ্যে যে আলোড়ন চলে এবং দুঃখবরণের মধ্যে তাদের যে রূপ ফুটে ওঠে, তাতে তাদের মানসিক ও আত্মিক সক্রিয়তা প্রকাশ পায়। শেক্সপীয়রের লীয়র এই জাতের নায়ক। নাটকের প্রথম অঙ্কেই শুধু লীয়র কর্মতৎপর। এরা অ্যারিস্টটলের কথায় ভয়ঙ্কর কোনো কিছু করে না বটে, কিন্তু; **'they had suffered something terrible'**. বাকি অঙ্কগুলিতে আছে শুধু তার ভাবাবেগমূলক উক্তি ও মর্মদাহী যন্ত্রণা। অধ্যাপক সমালোচক ব্র্যাড্‌লির কথায় যদিও তিনি **'More sinned against than sinning'** তথাপি তিনিই 'কিংলীয়র' নাটকের নায়ক। আপাতত নিষ্ক্রিয় (passive) মনে হলেও তাঁর মানস-সংঘাত ও হাহাকারই তাঁর ক্রিয়াশীলতার আর এক রূপ। মধুসূদনের ভীমসিংহ, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শেক্সপীয়র যেভাবে লীয়রের মানস-আলোড়নকে ব্যক্ত করেছেন, মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের পন্থা অবশ্যই তার সঙ্গে তুলনীয় নয়, তথাপি এঁদের নায়ক একই গোত্রের।

দ্বৈতনায়ক ঃ

অধ্যাপক নিকল ট্রাজিডিতে দুজন নায়কের অস্তিত্বকেও স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এলিজাবেথীয় যুগের কিছু কিছু নাটকে নায়ক একজন নয়, দুজন। আর

এ সব নাটকে ট্রাজিক-বোধ জাগে ঐ দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ থেকে। তিনি 'ওথেলো' নাটকের ওথেলো ও ইয়াগোকে, জুলিয়াস সীজার নাটকের সীজার ও ব্রুটাসকে 'দি অরফ্যান' নাটকের পলিডোর ও ক্যাস্টালিওকে নায়ক বলেছেন। নিকল মনে করেন, ট্রাজিডির নায়ক নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে, নাট্যবৃত্তকে অগ্রগতি দান করে এবং নাটকে সে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে দেখা দেয়। নায়ক সম্পর্কে নিকলের এই উক্তি খুবই সারগর্ভ এবং বহু নাটকের নায়ক-বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর এ উক্তির সত্যতা লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আমরা মনে করি নিকল তাঁর **The Theory of Drama** গ্রন্থের **'The tragic hero'**র আলোচনার গোড়াতেই নায়কের গুরুত্ব সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন, তার মূল্য আরও বেশি। তিনি বলেছেন, নায়ককে আশ্রয় করেই নাট্যকার ট্রাজিডির উদ্দেশ্য ও আত্মাটিকে প্রকাশ করেন এবং **'It is the hero who gives significance and tone to a tragedy'**. তিনি যখন ওথেলো নাটকের দুজন নায়কের কথা বলেন, তখন তাঁর নিজেরই দেওয়া এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা মনে রেখেছিলেন বলে মনে হয় না। 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগো চরিত্র যতই সক্রিয় হোক, এ চরিত্রকে আশ্রয় করে নাটকে ট্রাজিডির উদ্দেশ্য এবং ট্রাজিক বোধ প্রকাশ পায় নি। ওথেলোর জীবনে ট্রাজিডি সংঘটনে ইয়াগোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও মূল ট্রাজিক-বোধের সে আলম্বন নয়। নিকলের ঐ শেষের কথাগুলি মনে রাখলে ইয়াগোর তুলনায় তথাকথিত নিষ্ক্রিয় ওথেলোকেই নায়ক বলতে হবে—ইয়াগোকে নয়। নিকলের **'aim', 'spirit' "tone', significance'** প্রভৃতি শব্দগুলি অনেকখানি 'সাহিত্যদর্পণ'কারের নায়ক-বিচারের অনুগামী। নিজের দেওয়া এই সূত্রকে তিনি যদি ধীরভাবে ওথেলোর নায়ক-বিচারে প্রয়োগ করতেন, তাহলে দ্বিনায়ক সমস্যার জটিলতার আবর্তে তিনি পতিত হতেন না। মোট কথা নাটক বস্তুনিষ্ঠ রচনা হলেও এবং নাট্যকার নির্লিপ্ত থাকলেও দেখতে হবে ট্রাজিডি নাটকে নাট্যকারের প্রতিপাদ্য কি এবং তাঁর লক্ষ্য কি? কোন্ চরিত্রের আশ্রয়ে নাট্যকার সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছেন? নাটকে আপাতনিষ্ক্রিয় চরিত্রের ভূমিকা কিরূপ, সমস্ত ঘটনার ফলভাগী কে, তিনি **'more acted upon than acting'** হলেও তাঁর প্রতিপক্ষের প্রধান চরিত্রটি কে? সাধারণত প্রতিপক্ষের এই প্রধান চরিত্রটি অধিকতর সক্রিয় হয়ে নায়ক-নির্ধারণে বিভ্রান্তি ঘটায়। জীবনের যে ট্রাজিক বোধটিকে ফুটিয়ে তুলে নাট্যকার হতাশা, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মানবিক মহত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করেন, তার আলম্বন কোন্ চরিত্রটি তাই অনুসন্ধান করতে হবে। আর এক্ষেত্রেই নায়ক-নির্ধারণের অসুবিধা দূর হতে পারে বহুলাংশে। এই সূত্র প্রয়োগ করেই বলা যায় অ্যান্টিগোন নাটকের ক্রিয়োন সক্রিয় চরিত্র হলেও অ্যান্টিগোনই নায়িকা। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্তই নায়ক। মনে রাখা উচিত, নাট্যকারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ চরিত্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্ত হতে পারে না। অনেক সময় তত্ত্বের দিক থেকে নাটকের দুটি চরিত্র একই হতে পারে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের একই তত্ত্বের দুই দিক দেখানো হয়েছে মনে করা যায়। জীবনে মানুষ যা চায় ও না পেলে যা মানুষের হয়—এ দুটো দিক দুই-চরিত্রে রূপায়িত। এখানে নায়ক-সমস্যা মনকে পীড়িত করতে পারে এবং যুগ্মভাবে দুজনেই নায়কত্বের দাবী করতে পারেন। কিন্তু আরও নানা যুক্তিতে এই মহাকাব্যেও দুজনকেই নায়ক বলা যায় না—রাবণই নায়ক, মেঘনাদ তার অঙ্গ। অঙ্গী রাবণকে ছাড়িয়ে মেঘনাদরূপ অঙ্গ নায়কত্বের দাবি করতে পারে না। যাই হোক, এখানে রাবণ ও মেঘনাদ দুই চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক বলে দুই নায়কের কথা মনে আসা স্বাভাবিক, কারণ কবির প্রতিপাদ্য বিষয় দুই চরিত্রকে অবলম্বন করেই। কিন্তু নাটকে যেখানে নায়ক ও প্রতিনায়কে আদর্শগত ব্যবধান দুস্তর, সেখানে দুজনকেই নায়ক মনে করা চলে না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে নাট্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয় যেখানে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ চরিত্রের মধ্যে কাকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত তা স্পষ্ট হচ্ছে না, মনে হচ্ছে দুই ভিন্ন আদর্শই নাট্যকারের অভিপ্রেত হতে পারে এবং দুই চরিত্রই সমফলভোগী দুজনেরই পরিণাম এক এবং দুজনের প্রতি দর্শকদের একই বোধ, তাহলে শুধু সেই ক্ষেত্রেই দ্বিনায়কের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে। 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে সীজার ও ব্রুটাস এ দুজনকে এই সূত্রে নায়ক হয়তো বলা চলে।

নায়কবিহীন ট্রাজিডি ঃ

অধ্যাপক নিকল কিছু কিছু ট্রাজিডির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেগুলিতে কোনো নায়ক বা নায়িকা নেই। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি গলস্‌ওয়ার্দির Strife, Justice এবং মিঃ ও ক্যাসির 'Silver Tassie'র উল্লেখ করেছেন। এই ট্রাজিডিগুলি নিশ্চয়ই ট্রাজিক-বোধ জাগ্রত করে—অথচ এগুলির মধ্যে এমন কোনো প্রধান চরিত্র নেই যারা দর্শকচিত্তকে অধিকার করে নায়ক-আখ্যা লাভ করতে পারে। এ সমস্ত নাটকে এমন কোনো নায়ক চরিত্র নেই যাদের পরিবেশের জালে জড়িত হতে দেখে বা বিরুদ্ধ শক্তির কাছে বিপর্যস্ত হতে দেখে আমরা ট্রাজিক-বোধ লাভ করি। একটু গভীরভাবে নিবিষ্ট হলেই কিন্তু বোঝা যায় এ সব নাটকের একটি বা দুটি চরিত্র প্রতীকধর্মী বা মানবতার অংশ। আসল কথা যে-নাটকে নায়কের নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না—সে একটা শ্রেণীর মুখপাত্র এবং তার পতন বা শোচনীয় পরিণাম একটা শ্রেণীর পরিণাম, সেখানেই নাটক প্রকৃতপক্ষে নায়কহীন। এই ধরনের নাটকে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধও ঘনিয়ে ওঠে এবং এক এক পক্ষের এক বা একাধিক প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র থাকে। এখানে প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রগুলির নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না—তাদের সমস্ত কিছুই শ্রেণীব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। যেখানে একজন প্রতিনিধি-চরিত্র সেখানে তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ যাতে আকৃষ্ট না হয়, নাট্যকারের সেদিকে দৃষ্টি থাকে। শ্রেণীর প্রতিনিধি শ্রেণী-চরিত্র হারিয়ে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলে,

তা ট্রাজিডির নায়ক হয়ে যাবে। আধুনিককালের নাট্যকারেরা ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিমহিমাকে চাপা দিয়ে সমগ্রভাবে জন-মহিমাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। আর সেইজন্যই এ ধরনের নাটক রচিত হচ্ছে। নিকলের কথায় আব্রাহাম লিঙ্কন প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি শেক্সপীয়রের হেনরী ও রিচার্ডের মতো কখনই নন। **'He is a force symbolized in a man'**। এই প্রসঙ্গে আমাদের বাঙলা নাটকে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর নবীন মাধব-এর কথা বলা যায়। তিনি অত্যাচারিত মানুষেরই প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে নায়কোচিত গৌরব তেমন নেই। এ নাটকের যে ট্রাজিডি তা অনেকখানি একটা গোষ্ঠীরই ট্রাজিডি। 'বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকও এই অর্থে নায়কহীন। সমগ্র চাষী সমাজ—যাদের প্রতিনিধি কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল বরকত আলি নায়কত্ব দাবি করছে। দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'তরঙ্গ', 'মশাল' এবং উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটকও নায়কহীন।

নারী-নায়িকা ঃ পুরুষকে নায়ক করে ট্রাজিডি লেখা বেশি হলেও নারীকে নায়িকা করেও ট্রাজিডি লেখা হয়েছে। গ্রীক ট্রাজিডিগুলির মধ্যেও আমরা ইলেকট্রা, অ্যান্টিগোন, মিডিয়া প্রভৃতি অনেক নায়িকা চরিত্র পাই। রেস্টোরেশন যুগের মাঝামাঝি সময়ে **Banks** এবং অষ্টাদশ শতকে **Rowe** প্রমুখ নাট্যকারেরা অনেক **She-tragedy** লিখেছেন। কিন্তু ট্রাজিডিতে নায়িকা যেখানে নারী সেখানে তার কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার? যেহেতু ট্রাজিডির পরিবেশ গম্ভীর এবং সেখানে দৃঢ়তা ও কঠোরতা প্রত্যাশিত, সেইজন্য সেখানে প্রধান চরিত্ররূপে নারীকে উপস্থাপিত করলে তার মধ্যে পুরুষ-সুলভ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে। ইফিগেনিয়া, মিডিয়া লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতি নারীচরিত্রে মেজাজে ও প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সংকল্পসিদ্ধির জন্য এমন কিছু কঠোরতা আছে, যাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে স্ত্রী-সুলভ (feminine) বলা চলে না। শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডিতে নারী-সুলভ কোমল উপাদানের স্থান কম। এর অর্থ এই নয় যে কোনো ট্রাজিডিতেই কোমলপ্রাণা নারী স্থান পাবে না। শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডিতে কোমলস্বভাব নারী থাকতে পারে, তারা নাটকের প্লটের বা বৃত্তের অগ্রগতিতে সাহায্য করে না—কিন্তু নায়কের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তারা থাকবে কিন্তু নায়িকারূপে নয়; যেমন ডেসডিমোনা ও ওফেলিয়া আছে। বাংলা কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহের স্ত্রী অহল্যা দেবী, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের অপর্ণা, প্রফুল্ল নাটকের জ্ঞানদা। নায়িকারূপে উপস্থাপিত করতে গেলে নারীচরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখাতে হবে। **Passive heroine** নিয়ে ট্রাজিডি লেখা চলে না, একথাও নিকল বলেন নি। নায়িকা নিষ্ক্রিয় হলেও তার চিত্তে যদি গভীর আলোড়ন দেখা দেয় এবং যদি সে বিপর্যয়ের সমস্ত ফল বহন করতে পারে পুরুষের মতই, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই নায়িকা বলতে তাঁর আপত্তি হবে না। নূরজাহান নাটকের নূরজাহান নারী-নায়িকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ নায়িকা অতিশয় সক্রিয়। গিরিশচন্দ্রের 'জনা'ও অনেকখানি এই পরিকল্পনায় রচিত।

ট্রাজিডির ভাব ঃ মানবজীবনে আছে একটা নিদারুণ অক্ষমতা, নিরতিশয় অসহায়তা—অনিবার্য এক ভ্রান্তিপ্রবণতার বীজ। বাইরের কোনো অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই হোক, কিংবা নিজের কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই হোক, বা পরিপার্শ্বের প্রতিকূলতার ফলেই হোক—জীবনে যখন এই মর্মবিদারী দুঃসহ দুঃখের অন্ধকার নেমে আসে এবং শত চেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েও যখন মানুষ তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে উঠতে পারে না, তখনই দেখা দেয় ট্রাজিডি। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীর বুকে মানবজীবন যেন একটি কম্পমান দীপশিখা। কখন কোন্ পথে সর্বনাশের দমকা হাওয়ায় সে দীপ নিভে যাবে তার ঠিক নেই। এই সান্ত্বনাহীন দুঃখ বা রক্তরঞ্জিত ব্যথার সম্ভাবনা আছে সকল মানুষেরই মধ্যে। তাই অপরের দুঃখ ও বেদনার প্রতি আমাদের এমন নিবিড় সহানুভূতি। মানবজীবনের এই যে এক অপরিহার্য ট্রাজিডি এর প্রকৃত স্বরূপ কি? একখানি উৎকৃষ্ট ট্রাজিডির অভিনয় দেখে আমাদের চিত্তের প্রতিক্রিয়া কি? আমরা কোন্ বা কোন্ কোন্ ভাবে উদ্বুদ্ধ হই? ভারতীয় আলংকারিক-পরিভাষায় এর অঙ্গীরস কি? ট্রাজিডির স্থায়িভাব কি? অন্যান্য ব্যাভিচারী ভাবের দ্বারা এখানে স্থায়িভাব কি পুষ্ট হয়? মানুষের সীমাহীন দুঃখ ও মর্মান্তিক যাতনার চিত্র আমাদের আনন্দ দেয় কেন? সে-আনন্দেরই বা স্বরূপ কি?—এই সব প্রশ্নের উত্তর না পেলে ট্রাজিডি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে না।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল শুধুমাত্র গ্রীক ট্রাজিডিগুলির ওপর নির্ভর করে এ সব প্রশ্নের যা জবাব দিয়েছিলেন, তাঁর মূল্য আজিও কতখানি তা ভেবে দেখা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে যাঁরা নূতন কথা বলতে চেয়েছেন তাঁদের বক্তব্যও জানতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হবে। 'Poetics' গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল ট্রাজিডির মূল ভাবের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কখনো 'Pity and fear' কখনো 'Fear and pity', কখনো Pity or fear আবার কখনো Fear বা pity শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি 'অনুকম্পা' ও 'ভীতি' এই দুই ভাবকে কখনো ট্রাজিডির স্থায়িভাব বলেছেন, আবার কখনো এদের মধ্যে যে-কোনো একটিকেই স্থায়িভাব বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ট্রাজিডির ভাব একটি কি দুটি এ বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হতে পারেন নি। কিন্তু গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ট্রাজিডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই 'Pity and fear' অর্থাৎ 'অনুকম্পা ও ভীতি' এ দুই ভাবকেই স্থায়িভাব বলেছেন। সুতরাং অ্যারিস্টটল দুটি ভাবকেই ট্রাজিডির মুখ্য ভাব মনে করেছিলেন, এরূপ অনুমান করাই যথার্থ। ট্রাজিডি বিশেষে কখনো দুয়েরই সমপ্রাধান্য, কখনো বা একটির অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য থাকতে পারে। খুব সম্ভবত প্রাধান্যের ভেদেই তিনি গ্রন্থের অন্যান্য পরিচ্ছেদে Pity or fear কিংবা 'fear or Pity' এর প্রয়োগ করে থাকবেন। সে যাই হোক, ট্রাজিডি দেখে অনুকম্পা ও ভীতি কেন দর্শকচিত্তে জাগ্রত হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন, Pity is occasioned by undeserved

misfortune, and fear by that of one like ourselves. অর্থাৎ ট্রাজিডি নায়কের জীবনের বিপর্যয় বা শোচনীয় পরিণামকে অনুচিত বলে যখন বোধ হয় তখনই জাগে অনুকম্পা। আর ঐ শোচনীয় পরিণামগ্রস্ত নায়কটিকে যখন আমাদের মতো একজন মানুষ মনে করা হয়, তখনই দর্শকচিত্তে জাগে ভয়। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে আরও ব্যাখ্যা করে আমরা বলতে চাই যে, নায়কের বিপত্তি-পরিণামে দর্শকের বিচারশীল মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার বিপর্যয়কে কখনই ন্যায্য বলে মনে করতে পারে না। নায়কের অনুচিত পরিণামে এক অদৃশ্য রহস্যময় অশুভ শক্তির ওপর দর্শক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে নায়কের জন্যে তার সমস্ত চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে—নায়কের অবস্থাই দর্শক লাভ করে বসে। ফলে জাগে অনুকম্পা (অনু= সহিত, কম্প্ =কাঁপা বা বিচলিত হওয়া)। এই অনুকম্পা সহানুভূতিরই নামান্তর। অ্যারিস্টটলের 'Pity' শব্দটিকে আমরা বাঙলা 'অনুকম্পা' শব্দেই প্রকাশ করতে চাই। দয়া, কৃপা বা করুণা বলতে চাইনে। পরদুঃখ অর্থাৎ নায়কের দুঃখ-দুর্গতি দূরীকরণের প্রবৃত্তি থেকে আসে 'দয়া'। 'কৃপা' হল এক ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি। পরদুঃখের বা যন্ত্রণার আতিশয্যে চিত্তের বিগলিত অবস্থার নাম 'করুণা'। এতে নায়কের দুর্গতি ও পরিণতি দর্শকের বুকে বেদনার জগদ্দল পাথররূপে চেপে বসে। চোখের জলে নায়কের কোনো মহিমা বা গৌরবের দিকটি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু অনুকম্পায় চিত্ত বিচলিত হলেও নায়কের এ শাস্তি যে অন্যায়, এ যে তার প্রাপ্য নয়—এই ক্ষোভের দিকটিও একটি ক্ষীণসূত্রে উঁকি দেয়—ফলে নায়ক-চরিত্রের মাহাত্ম্য খর্বীকৃত হয় না। অ্যারিস্টটল ভীতি জাগ্রত হওয়ার মূলে যে কারণটির ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তিনি বলেন যে ট্রাজিডি-নায়ক আমাদেরই মতো একজন মানুষ—এই বোধ থেকে ভয় জাগ্রত হয়। কিন্তু শুধু এটুকু বললে মনে করা চলে এই বোধ থেকে অনুকম্পাও জাগে। কারণ আমাদেরই মতো নায়কটি মানুষ বলেই তার দুর্গতিতে আমাদের সহানুভূতি। কিন্তু অ্যারিস্টটল খুব সম্ভবত বলতে চেয়েছেন আত্মস্বার্থের কথা ভেবেই জাগে ভীতি; অর্থাৎ যে বিপর্যয় নায়কের জীবনে দেখা দিয়েছে, সে আমাদেরই মতো মানুষ বলে ঐ বিপর্যয় আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। নিজের কথা ভেবেই দর্শক তখন ভয় পায়। এখানে দর্শকের আর বিচারশীল মন কাজ করে না। দেখা যাচ্ছে, একই নায়কের শোচনীয় জীবন-পরিণাম দুই ভাব-উদ্বোধের কারণ। অনুকম্পা জাগছে নায়কের পরিণামের কথা ভাবতে গিয়ে আর ভয় জাগছে দর্শকের নিজের কথা ভাবতে গিয়ে। ট্রাজিডি-দর্শকের সামনেই নায়ক রঙ্গমঞ্চে সর্বক্ষণ সেই তার চিত্ত অধিকার করে রেখেছে। অন্তিমে তার পরিণামে দর্শকের অনুকম্পা তারই জন্যে। নায়কের পরিণাম-দৃশ্য দেখার ফলে দর্শকের চিত্তে ভয় জাগলেও ভয়ের সঙ্গে আত্মচিন্তা জড়িত—আত্মচিন্তাই ভয়ের জনক। ভয় নায়কের জন্যে ততখানি নয়, যতখানি নিজের জন্যে। তাহলে এমনও বলা যায় যে নায়কের জীবনের বিরুদ্ধ প্রচণ্ড এক মহা অশুভ শক্তি ও তার ক্রিয়ার দিকে চেয়েই অ্যারিস্টটলের এই দুই ভাব-পরিকল্পনা। যে শক্তির অসঙ্গত প্রয়োগের ফল জাগায় অনুকম্পা নায়কের প্রতি,

তাই নিজের জন্য করে তোলে দর্শককে ভীত। যদি মনে করা যায় যে আত্মগত যে ভয় তা রঙ্গমঞ্চের মায়াঘোরবেষ্টিত জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে আনলেই জাগে, তাহলে অনুকম্পাই হয়ে ওঠে মূলভাব ; আর ভয় হবে তার আনুষঙ্গিক। কিন্তু ট্রাজিডি দর্শনের অব্যবহিত ফল ও তার বেশ কিছু পরবর্তী মানসিক অবস্থা—এমনভাবে দর্শকমনের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা চলে না। একই নায়কের ওপর অশুভ শক্তির ক্রিয়ায় একই নায়ক 'আলম্বন বিভাব' রূপে শেষ পর্যন্ত অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত করে। অ্যারিস্টটলের **Pity** ও **fear** কে আমরা যেভাবে বুঝেছি, তার ব্যাখ্যা দিলাম।

অ্যারিষ্টটলের পর দীর্ঘকাল তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রায় সকল নাট্যতাত্ত্বিক গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে হেগেল সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত মানতে চাইলেন না। শুধু হেগেল নয়, তাঁর পরে সোপেন হাওয়ার, নীৎসে প্রমুখ দার্শনিকগণও ট্রাজিডির মূল ভাব সম্পর্কে নূতন কথা বললেন। হেগেল বললেন ট্রাজিডিতে দ্বন্দ্ব থাকবেই। এখানে যে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে তাদের কারো দাবী অন্যায্য নয়। এখানকার দ্বন্দ্ব শুভ-অশুভের নয়। দুই নৈতিক সমস্যার দ্বন্দ্ব—এক ভালো ও আর এক ভালোর মধ্যেই নির্বাচন। ট্রাজিডি নায়কের আত্মা ঐ দুই দাবীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারলেই জীবনে আসে ট্রাজিডি। কিন্তু হেগেলের মতে নায়ককে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হতেই হবে—সমন্বয়ের রাজ্যে পৌছতেই হবে। এই সমন্বয়ের রাজ্য হল শাশ্বত বিচার-বোধের রাজ্য। এই শাশ্বত বিচার-বোধ (**Sense of eternal justice**) এর ভাবই ট্রাজিডির মূল ভাব। হেগেল আরও মনে করেন, ট্রাজিডি নায়ক যেহেতু অসাধারণ ব্যক্তি ; সেইজন্যে তার জন্যে শোক বা বেদনা-অনুভব অর্থহীন।

The World as Will and Idea (1818) গ্রন্থে সোপেন হাওয়ার হেগেলের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করলেন না। এক যুক্তিহীন অন্ধ শক্তির হাতে মানুষকে তিনি ক্রীড়নক বলে মনে করলেন। জীবন অনন্ত দুঃখময়। জীবন ও জগতের প্রতি কোনোরূপ মমত্বের অর্থ হয় না। ট্রাজিডি দেখে মানুষ জীবনের এই প্রকৃত রূপটি সম্পর্কে সচেতন হয়। একটা বৈরাগ্যের শান্ত ভাবই চিত্তকে অধিকার করে বসে। এই **Resignation** বা আত্মসমর্পণের শান্ত ভাবই সোপেন হাওয়ারের মতে ট্রাজিডির মূল ভাব। **The Birth of Tragedy** (1872) গ্রন্থে দার্শনিক নীৎসে সোপেন হাওয়ারের 'শান্ত চিত্তাবস্থা (**Serene contemplation**) এর কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি ট্রাজিডির মধ্যে জীবনের মহিমা ও নিষ্ফলতার সংঘাত দেখেছেন। তিনি মনে করেন মানুষের ব্যক্তিত্ব সমস্ত দুঃখের মূল। ট্রাজিডিতে এই ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট (**Self annihilation**) হয় এবং মানুষ আদিম হয়ে উঠে। (**Man must lose his petty civic identity and become elemental man**"[১])। এই ব্যক্তিত্ব-লোপের যে মানসিক সুখাবস্থা তাই হল ট্রাজিডির স্থায়িভাব।

১. *Literary Criticism : A Short History* : By William K Wimsatt JR. and Cleanth Brooks. 1937 chap. 25. The tragedy and comedy : The Internal focus : গ্রন্থে উদ্ধৃত।

বিশ শতকেও ট্রাজিডির মূল ভাব নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও মূল্যবান আলোচনা অধ্যাপক নিকলের। তিনি ট্রাজিডির মূল ভাব রূপে অ্যারিস্টটলের 'Pity ও 'fear' কে কিছুতেই গ্রহণ করতে চাইলেন না। তাঁর বক্তব্য হল, ট্রাজিডিতে ভয়ের প্রসঙ্গ বারংবার এলেও ভয় কখনো এর দর্শকের স্থায়িভাব হতে পারে না। তিনি মনে করেন অ্যারিস্টটলের দুটি গ্রীক শব্দ ইংরেজি অনুবাদে pity ও fear রূপে গৃহীত হলেও তিনি কোন্ অর্থে এ দুয়ের প্রয়োগ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। তিনি বলেন ট্রাজিডি চোখের জল ফেলার জিনিস নয়। ভাবাবেগ যেমন নিম্নস্তরের ব্যাপার, তেমনি নাট্যশিল্পে Pathos-এর স্থানও নিম্নে। Pity ও Pathos শব্দ দুটির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তাই এ দুয়ের কোনোটিকেই ট্রাজিডির মূল ভাব বলা যায় না। প্রমিথীয়াস বা অরিষ্টিসের জন্যে আমরা চোখের জল ফেলতে পারি না। মহত্ত্বে, ব্যক্তিত্বে ও চরিত্র-সমুন্নতিতে তারা আমাদের অনেক ঊর্ধ্বে। ওথেলোর প্রতি করুণা প্রকাশ করা চলে না—সে আমাদের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত এক শক্তি, সম্ভবত আদিম কিন্তু সুদৃঢ় ও সমুন্নত। হেগেলের সুরে তিনি তাই জানালেন এই সব মহিমান্বিত ব্যক্তিদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কোনো অর্থ হয় না। আমাদের থেকে নিম্নস্তরের জন্তু বা মানুষের প্রতিই Pity বা করুণা দেখানো চলে। তাই তিনি বলেন ট্রাজিডির যথার্থ লক্ষ্য Pity ভাব জাগ্রত করা নয়—কিন্তু ভীতিমিশ্রিত একটা সম্ভ্রমবোধ বা বিস্ময় ভাব (feeling of awe) যা সমুন্নত মহনীয়তা বা চমৎকারিত্বের সামিল।[১] আর এই ভাবের মানদণ্ডেই নিকল আধুনিক কালের ট্রাজিডিগুলিকে highest tragic art বা শ্রেষ্ঠ ট্রাজিক-শিল্প বলতে দ্বিধাগ্রস্ত।

সিদ্ধান্ত ঃ অ্যারিস্টটল পরবর্তী দার্শনিকদের অভিমত ও অধ্যাপক নিকলের অভিমতের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে এখন আমাদের বক্তব্য বলা যেতে পারে। দার্শনিক হেগেল, শোপেন হাওয়ার ও নীৎসে এঁরা কেউই ট্রাজিডির মূল ভাবকে অ্যারিস্টটল কথিত Pity ও fear রূপে স্বীকার করেন নি। বলা বাহুল্য দার্শনিকগণ তাঁদের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ দর্শন চিন্তার অনুগামীরূপে বিষয়টি দেখেছেন। এঁদের দর্শন-ভাবনায় পুরোপুরি মগ্ন হতে পারলে এবং এঁদের দর্শনকে সত্যরূপে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস তিনি এঁদের বক্তব্যকে মূল্যবান বলে মনে করবেন। অবশ্য একই দর্শকের পক্ষে বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল দার্শনিকের বক্তব্যকে সমান সত্য রূপে গ্রহণ করা অসম্ভব। তথাপি এঁদের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এমনও মনে করা যায় না। কোনে কোনো নাটকের ক্ষেত্রে এক একজন দার্শনিকের বক্তব্য অত্যন্ত যথার্থ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেক সার্থক ট্রাজিডির ক্ষেত্রেই তাঁদের অভিমত গ্রাহ্য হতে পারে না।

১. "Tragedy then we may say, has for its aim not the arousing of pity but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur". *The Theory of Drama*, pp. 122.

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করি, সফোক্লিসের 'রাজা ইডিপাস' নাটকের (১ম পালা) সেই অন্তিম-পরিণাম—যেখানে তিনি নিজের অজ্ঞতাবশত পিতৃহত্যা ও মাতৃগমনের সত্যতাকে জেনেছেন,—জেনেছেন মাতৃগর্ভেই তিনি দুইপুত্র ও দুই কন্যার জনক হয়েছেন। দৈববাণীর অমোঘতায় অনুতাপে, লজ্জায় ও বেদনায় উন্মাদ হয়ে রাজা ইডিপাস নিজের প্রতি শাস্তিস্বরূপ চক্ষু উৎপাটন করে পুত্রকন্যাদের নিকট থেকে শেষ বিদায় যখন নিচ্ছেন, তখন হেগেলের কথায় আমাদের চিত্তে শাশ্বত-বিচারবোধের কোনো ভাব জেগে ওঠে কি? অথবা সোপেন হাওয়ারের কথায় জগৎ ও জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্বের প্রমাণ পেয়ে আমরা কি বৈরাগ্যের ভাবে উদ্বুদ্ধ হই? খানিকটা যে হই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। নীৎসের কথায় এখানে ব্যক্তিত্ব-লোপের কোন্ সুখ-ভাব আমাদের আশ্বস্ত করে? মোট কথা একটি নাটকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল হেগেল বা নীৎসের মত গ্রহণ করা যাচ্ছে না—কিন্তু সোপেন হাওয়ারের মত আংশিকভাবে গ্রাহ্য।

অধ্যাপক নিকলের বক্তব্যকে আমরা আমাদের দেবী কালিকার মূর্তির দৃষ্টান্তে বুঝে নিতে পারি। কালিকার ভয়ঙ্করী মূর্তিতে একদিকে ভয়, অন্যদিকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ও বিস্ময়ভাব আমাদের চিত্তে জাগ্রত হয়। সুতরাং নিকল যা সিদ্ধান্ত করেছেন, তাতেও ট্রাজিডির মূল ভাব কোনো একটি বিশেষ-ভাব নয়। আমরা সাধারণত বলে থাকি যে বিস্ময় ভাবই (sense of wonder) নিকলের মতে ট্রাজিডির মূল ভাব, তা কিন্তু সত্য নয়। নিকলের সমস্ত বক্তব্যের শেষে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে তিনি ট্রাজিডির মূল ভাবের মধ্যে ভয়, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়কে স্থান দিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি রচয়িতা শেক্সপীয়রও দৃশ্যবিশেষে বা নাটকের অংশবিশেষে করুণাকেও বর্জন করেন নি—এ ইঙ্গিতও করেছেন। তাই এ কথা স্পষ্টই বলা যায় যে অধ্যাপক নিকল ট্রাজিডির মূল ভাবকে মিশ্র-ভাবই বলতে চেয়েছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ আমরাও বিশ্বাস করি শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি-দর্শনে একই সঙ্গে কতকগুলি ভাব জাগ্রত হয়। ট্রাজিক অনুভূতি দর্শকের এক মিশ্র অনুভূতি। ট্রাজিডি-নায়কের পরিণাম দেখে নিশ্চয়ই আমরা বেদনা বোধ করি। তার জীবনবোধের গভীরতা, সহন-শক্তি কিংবা বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামী মনোভাব আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে। আর তার পরিণামের কথা ভেবে আমরা নিজেদের কথা ভেবে আতঙ্কিতও হই। একদিকে বিশ্ববিধান ও সংসার নাট্য ও অন্যদিকে মানুষের ভূমিকা—এতে একটা রহস্য-ময়তার বোধও যেমন আছে, তেমনি আছে খানিকটা বৈরাগ্যও। তাই অনুকম্পা, ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, রহস্যময়তা বা দুর্জ্ঞেয়তা বোধ এবং বৈরাগ্য সব কিছু মিলে ট্রাজিডির অভিনয় দর্শকের চিত্তে একটা মিশ্র ভাবের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যে এ জিনিস নেই, ভারতীয় জীবনে ঐ মিশ্র-বোধের অভিজ্ঞতা কেমন হয়, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। তাই এখানে ভারতীয় আলংকারিকদের রসবাদের সূত্রটি পুরোপুরি প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। এই রসবাদে একটি মাত্র মূলভাব, তার সহকারী ব্যভিচারী-

ভাবগুলির দ্বারা পুষ্ট হয়ে একটিমাত্র রসে পর্যাবসান লাভ করে। এখানে অনুকম্পার সূত্র ধরে বেদনা বা শোকভাবকে মূলভাব মনে করলে অন্য ভাবগুলি হয়ে পড়বে সহকারী। আর সেক্ষেত্রে করুণ-রসকেই ট্রাজিডির মূল রস বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে। কিন্তু আমরা মনে করি ট্রাজিডিতে অন্য ভাবগুলি সহকারী বা ব্যভিচারী নয়। সবগুলিরই গুরুত্ব আছে। কোন্‌টির গুরুত্ব কত, সে হিসেব করা চলে না। ট্রাজিডি-দর্শনকালে দর্শকের মনের মধ্যে সব ভাবগুলি উদ্রিক্ত হয়ে এমনভাবে মিশে যায় যে পার্থক্য করা যায় না। তাই ট্রাজিডির ক্ষেত্রে রস-পরিণামের কথা চিন্তা করতে গেলে ভারতীয় আলংকারিক পন্থায় গেলে চলবে না। মনে করতে হবে ঐ সমস্ত মিশ্রভাবের এক অপরূপ সমন্বয়ে ট্রাজিডি এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করে। অলংকার শাস্ত্রে তার সন্ধান না পাওয়া গেলেও একে মূল একটি মিশ্রভাবের পরিণামী মিশ্ররসই মনে করতে হবে। আর এ রসও হবে নিত্য আনন্দের হেতু। যাঁরা মিশ্ররসকে সইতে পারবেন না তাঁরা মিশ্রভাবের পরবর্তী পর্যায়ে না গেলেই পারেন। কিন্তু এই মিশ্রভাবকে অস্বীকার করলে চলবে না—এই হল আমাদের অভিমত।

ক্যাথারসিস :

অ্যারিস্টটল ট্রাজিডির সংজ্ঞাদান-কালে বহু বিতর্কিত 'Catharsis' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে ট্রাজিডি ঘটনার দ্বারা **Pity** ও **fear** ভাবকে দর্শকচিত্তে জাগ্রত করে এবং যার ফলে অনুকম্পা ও ভয় ভাবের 'ক্যাথারসিস' সম্পন্ন হয়—অর্থাৎ ভাব-বিমোক্ষণ হয়। কিভাবে এই বিমোক্ষণ হয় এবং তার ফলে কি হয়—এ সম্বন্ধে তিনি কিছু ব্যাখ্যা করে বলেন নি। পরবর্তীকালে তাই শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। গিলাবার্ট মারি, অধ্যাপক নিকল প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'Catharsis' শব্দটিকে 'Katharsis' এই বানানে লিখেছেন এবং এর আক্ষরিক অর্থ হল বিশুদ্ধীকরণ বা ভাব-বিমোক্ষণ। অ্যারিস্টটল কোন্ অর্থে এর প্রয়োগ করেছিলেন তা 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে স্পষ্ট নয়। যাই হোক, সাহিত্যকে যাঁরা সমাজকল্যাণের সঙ্গে অন্বিত করে দেখতে চান, তাঁরা শব্দটির গুরুত্বের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রেনেশাঁস যুগে ইতালীতে রবারতেল্লি (Robertelli) মনে করেছিলেন যে ট্রাজিডি দেখে আমরা ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত হই ও কণ্টকময় জীবনপথে চলার প্রেরণা পাই—এই অর্থেই অ্যারিস্টটল **Katharsis** শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন[১]। এই শতকেরই ইতালীয় সমালোচক জিরাল্ডি সিন্থিও মনে করেছিলেন 'ক্যাথারসিস' শব্দটি **Pity** ও **fear** কে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে এ দুয়ের অনুরূপ ভাবসমূহকে।[২] অষ্টাদশ শতকের জার্মান নাট্যসমালোচক ও নাট্যকার লেসিঙ তাঁর **Hamburgische Dramaturgie** (1769) এ বলেছিলেন, জীবনে আমাদের সামঞ্জস্যের

১. *The Theory of Drama* : A Nicoll এর গ্রন্থে উদ্ধৃত P. 123
২. ঐ ঐ ঐ P. 123

অভাব থাকে ; কারো প্রকৃতিতে **Pity** ও **fear** বেশী মাত্রায় থাকে, আবার কারো খুবই কম। ট্রাজিডি দর্শকের চিত্তে এ দুয়ের মধ্যে একটা সমতা এনে দেয়। ফলে দর্শকচিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাঁর মতে ক্যাথারসিস শব্দের এই হল তাৎপর্য।

কিন্তু আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেছেন 'ক্যাথারসিস' শব্দটি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত এবং অ্যারিস্টটল সেই বিশেষ শাস্ত্রের শব্দটি একটি উদ্দেশ্য নিয়েই প্রয়োগ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে খুব মূল্যবান আলোচনা করেছেন এফ. এল. লুকাস। তিনি **'Tragedy in relation to Aristotle's Poetics'** (1927) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে অ্যারিস্টটল একেবারে আধুনিক ধারণা অনুযায়ীই 'ক্যাথারসিস' শব্দটিকে অবদমিত আবেগ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। আর এর দ্বারা তিনি গুরু প্লেটোর মতকে খণ্ডন করেন। প্লেটোর মতে কাব্য মানুষের আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে আত্মদমনে অসমর্থ মৃগী বা বায়ুরোগগ্রস্ত করে তোলে। কিন্তু অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হল যে মাঝে মাঝে ঐ অনুভূতিগুলিকে বের করে দিয়ে কাব্য মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, তাকে অধিকতর আবেগপ্রবণ হতে দেয় না। অ্যারিষ্টটলের **'Katharsis'** শব্দটির ব্যাখ্যা দিলেও লুকাস নিজে কিন্তু ট্রাজিডির উদ্দেশ্য যে 'ক্যাথারসিস' তা স্বীকার করেন নি।

অধ্যাপক ডাবলিউ. এম. ডিকসন বিষয়টি নিয়ে সূক্ষ্ম-গভীর আলোচনা করেছেন। **'Politics'** ও **'Problem'** গ্রন্থে অ্যারিস্টটল শারীরিক ও মানসিক নানা ব্যাধি ও তাদের চিকিৎসার কথা বলেছেন বলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে তিনি **'Katharsis'** কে বোঝাতে চেয়েছেন বলে তাঁর ধারণা। দেহের বাত, পিত্ত, কফ প্রভৃতি ধাতুগুলি কুপিত হলেই দেখা দেয় শারীরিক ব্যাধি। রোগ-নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজন হয় কুপিত ধাতুগুলির মোচন। মানসিক রোগ-নিরাময়ের জন্যে মানসিক আবেগ-মোচন আবশ্যক। ক্যাথারসিস হল মোচনের সাহায্যে মানসিক আবেগগুলির মধ্যে সমতারক্ষা।

অধ্যাপক নিকল কোনোপ্রকার নীতি ঘেঁষা মতবাদ গ্রহণ করতে চান নি। তিনি বলেছেন কোনোরূপ মানসিক ঔষধ-সেবনের জন্যে আমরা ট্রাজিডি নাটক দেখি না। অভিনয় দর্শনকালে **Katharsis** বা **Purgation** (বিশুদ্ধি-করণ) এর প্রভাবও আমরা অনুভব করি কিনা সন্দেহ। তিনি তাই অ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিস-তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছেন।

অধ্যাপক টমসন[১] 'ক্যাথারসিস'-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গ্রীক ট্রাজিডির জন্মকথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রীকভাবনার অনুগামী। তিনি বলেছেন যে প্রাচীনকালে গ্রীসে মৃগীরোগকে এক পবিত্র ব্যাধি বলে মনে করা হত। ভূত বা দেবতা রোগীর দেহে প্রবেশ করলেই দেখা দিত এই রোগ আর মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে ওঝা তাদের বিতাড়িত করলেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠত। গ্রীসে ডায়োনিসাস দেবতার পূজানুষ্ঠানে

১. জর্জ টমসন : এইস্কিলাস ও এথেন্স

দেবতা নিজেই ভক্তদের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে দিতেন। দেবতা ভক্তদের দেহে ভর করতেন রোগের মাধ্যমে, আবার ছেড়ে দিয়ে তাদের সুস্থ করতেন। টমসন মনে করেন, দেবতার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই অ্যারিস্টটল 'Katharsis' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ট্রাজিডির উদ্দেশ্য Pity ও fear এর মধ্য দিয়ে 'Katharsis'. গ্রীসের পূজানুষ্ঠানে দেবতা যে ভাবে ঐ মৃগীরোগ ছড়িয়ে আবেগ-মোচন করতেন, তা ছিল খুব কষ্টকর পদ্ধতি, কারণ এ রোগগ্রস্ত মানুষ সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিদারুণ কষ্ট পায়। কিন্তু নাটকের অভিনয়ে কষ্টকর মূর্চ্ছাও হত না, অথচ অভিনয় দেখে সকলেরই আবেগমোচন ঘটত। তাই টমসন মনে করেন অবদমিত আবেগ মোক্ষণের একটি উপায় হল ট্রাজিডি। সুতরাং খুব সঙ্গতভাবেই তিনি Katharsis শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

সমালোচক গিলবার্ট মারেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন "At any rate the Dionysus ritual itself was a Katharmos or Katharsis—a purification of the community from the taints and poisons of the past year, the old contagion of sin and death" [১]

সিদ্ধান্ত ঃ দেখা গেল, 'Catharsis' শব্দটির অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ। অ্যারিস্টটল নিজে এর স্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করে যান নি বলেই নানাজনে এর নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাব্য মানুষকে ভাবপ্রবণ করে তুলে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে বলে কবিদের বিরুদ্ধে প্লেটো অভিযোগ এনেছিলেন। অ্যারিষ্টটল প্লেটোর মতবাদকে খণ্ডন করতে চাইবেন—এটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁর বক্তব্য হচ্ছে অনুকম্পা ও ভয়-ভাবকে ট্রাজিডি দর্শকের চিত্তে জাগ্রত করে এই দুই ভাবের আধিক্য থেকে তাকে মুক্ত করে। এর ফলে তার মানস-স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। অধ্যাপক টমসন সাহেব যা বলেছেন এবং গ্রীক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ গিলবার্ট মারে যা বলেছেন, তাতেও দেখি যে গ্রীক ট্রাজিডির জন্মকথার সঙ্গে তাঁদের Catharsis-এর ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। অ্যারিস্টটল নিজেও গ্রীক ট্রাজিডির উদ্ভব-ইতিবৃত্ত ভালোভাবেই জানতেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তিনি অতিরিক্ত ভাবের প্রাবল্য থেকে চিত্তকে মুক্ত করার অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এখন অ্যারিস্টটলের যুগ অতিক্রান্ত হলেও তাঁর বক্তব্যকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ঐ মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিত তাঁরও অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু অসুবিধে হয় দুটি দিকে এই Catharsis কে বুঝতে। দর্শক ভাব-মোক্ষণের জন্যে ট্রাজিডি দেখে, না ভাব-উদ্বোধের জন্যে দেখে? মনে হয় যাতে চিত্তে ভাব জাগ্রত হয়, তারই জন্যে দর্শক ট্রাজিডি-অভিনয় দেখে। দর্শকের চিত্তের প্রচ্ছন্ন ভাবকে ট্রাজিডি আরও বাড়িয়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মতো ধীরে ধীরে তার মধ্যে সমতা আনে—এটা একটা কষ্টকর কল্পনা। দ্বিতীয়ত ট্রাজিডি যে মানুষের পরাজয় কাহিনী নয় তার আপাত পরাজয়ের মধ্যেও যে

১. Preface: *The Art of Poetry*—Aristotle p. 16.

গরিমা, যে মর্যাদাবোধ আমাদের চিত্তকে অধিকার করে অ্যারিস্টটলের Catharsis শব্দকে চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে দেখলে তার কারণও বোধগম্য হয় না।[১] ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য অ্যারিস্টটলের Catharsis কে শৈল্পিক আনন্দ অর্থে গ্রহণ করে এই সমস্যা এড়াতে চেয়েছেন।[২] তাঁর আলোচনা মূল্যবান। কিন্তু আশ্বাসজনক কিনা সন্দেহ।

ট্রাজিডির আনন্দ :

ট্রাজিডি মানবজীবনের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্গতির বেদনাদায়ক কাহিনী। এই ট্রাজিডি দর্শন করে দর্শক কি ধরনের আনন্দ পায়, স্বভাবতই সে প্রশ্ন মনে ওঠে। ট্রাজিডিতে ব্যথা আছে, ভয় আছে, বিস্ময় আছে। এ সকলের সমবায়ে ট্রাজিডি দর্শকচিত্তে একটি মিশ্র অনুভূতি জাগ্রত করে। ট্রাজিডি নাটকটি যদি সার্থক হয়, তাহলে সার্থক-সৃষ্টি উপভোগের আনন্দ তা দান করবেই। কারণ সার্থক সৃষ্টি —উপভোগের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরই উপলব্ধি করি—আমাদের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। আর আত্মোপলব্ধি যে নিত্য আনন্দকর।

ভারতীয় আলংকারিদের রসবাদের ব্যাখ্যায় সব স্থায়িভাবের পরিণামী রস আনন্দময় চৈতন্যের আস্বাদন। তাঁদের রসবাদের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তার আলোকে ট্রাজিডি নাটকে ভাবের রস-পরিণামকে উপলব্ধি করলে কেন এ শ্রেণীর নাটক আনন্দ দেয়, কিভাবে তা আমরা পাই ও সে আনন্দ কি ধরনের তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। আলংকারিক বিশ্বনাথ শোক-ভাবের রসে পর্যাবসানের যে উপায় নির্দেশ করেছেন, তা এক হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর বক্তব্য লৌকিক জগতে যে ঘটনা দুঃখজনক, কাব্যের জগতে তা নিত্য আনন্দদায়ক। লৌকিক জগতের বেদনাদায়ক শোকভাব—বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের সংযোগে (ভরতের সূত্রানুযায়ী) যখন করুণ-রস-পরিণতি লাভ করে, তখন তা অলৌকিক কাব্যজগতের ব্যাপার। আর অলৌকিকের সংস্রবে বাস্তব জগতের বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হয়। অ্যারিস্টটল কথিত ট্রাজিডির স্থায়িভাব 'Pity' কেন আনন্দদায়ক তার উত্তর এতে মিলবে।

হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥ (৩/৯ সাহিত্য দর্পণ)

এর অর্থ—লৌকিক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে শোকহর্ষাদির হেতুসমূহ থেকে, পৃথিবীতে লৌকিক শোকহর্ষাদির উৎপত্তি হয়ে থাকে। কাব্যজগতের সহিত সংশ্লেষহেতু এই শোকহর্ষাদির কারণসমূহ আলৌকিক বিভাবত্ব প্রাপ্ত হয় ও তা থেকে সুখোৎপত্তি

১. "Tragedy gives man a pride and an assurance, an inner song against despair." *D.O.W.L.* Edtd J.T. Shipley p. 50.

২. নাট্যতত্ত্বমীমাংসা: পৃঃ ২৯৯-৩০৯।

ঘটে। এতে কি ক্ষতি? ট্রাজিডির মূল ভাবকে আমরা বলেছি মিশ্র, তার মিশ্র-রস পরিণামও আনন্দকর।

খাঁটি শৈল্পিক দৃষ্টিতেই ভারতীয় আলংকারিকদের এই ব্যাখ্যা। কিন্তু ট্রাজিডির আনন্দ-সম্পর্কে প্রতীচ্যে অ্যারিস্টটল থেকে বিশ শতকের নাট্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নানা আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের আলোচনায় মতপার্থক্যও যথেষ্ট। এঁদের কয়েকজনের অভিমত লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রথমেই অ্যারিস্টটল। তিনি বলেছেন যে ট্রাজিডি গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুসরণ। "And it is natural for all to delight in works of imitation."[১] অর্থাৎ এটা খুবই স্বাভাবিক যে অনুকৃত বিষয় সকলের কাছে আনন্দদায়ক। "লৌকিক জগতে যে ঘটনা বেদনাবহ কিন্তু শিল্পের জগতে তা অনুকৃত হতে দেখে আমরা আনন্দ পাই।"[২] তাছাড়া তিনি আরও একটি কথা বলেছেন যে কোনো কিছুকে জানার মধ্যেও গভীর আনন্দ আছে। (To be learning something is the greatest of pleasures)[৩]। সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের জগতে আনন্দ দু' রকমের—একটি বস্তুর অনুকরণ দেখে; আর একটি অনুকৃত বিষয়টিকে জেনে। তিনি বলেছেন ট্রাজিডিতে শোক ও ভয়-ভাব জাগ্রত হয় দর্শকের চিত্তে। এই দুই ভাব যথাযথ অনুকৃত হলেই দর্শক আনন্দ পাবে—আবার নাট্যবিষয়টিকে নট-নটী কর্তৃক অনুকরণের মধ্য দিয়ে জেনেও আনন্দ পাবে। ট্রাজিডিতে সব রকম আনন্দ দাবী করা চলে না, এর থেকে যে ধরনের আনন্দ প্রাপ্য, তাই শুধু দাবী করতে পারি। অ্যারিস্টটলের বক্তব্যে বস্তু বা ভাবকে অনুকৃত হতে দেখার আনন্দ অর্থাৎ সৃষ্টিকে উপভোগের আনন্দ মূলত শৈল্পিক আনন্দ এবং তাকে জানার আনন্দ বলতে জ্ঞানের আনন্দও বোঝাচ্ছে। 'ক্যাথারসিস' শব্দটি তিনি প্রয়োগ করলেও তা ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু 'ক্যাথারসিস' অর্থে যদি অবদমিত ভাবের মোক্ষণ, কিংবা নৈতিক বিশুদ্ধি বা মানস-শান্তি বোঝায়, তাহলে আনন্দের সঙ্গে তার একটা যোগ ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে ট্রাজিডির আনন্দকে নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক না বলে উপায় নেই। ক্যাথারসিস শব্দটিকে ট্রাজিডির আনন্দের ব্যাখ্যায় টেনে না আনলে বুঝতে হবে অ্যারিস্টটল এ আনন্দকে মূলত শৈল্পিক ও কতকটা জ্ঞানের আনন্দ বলেছেন।

ষোড়শ শতকের রেনেশাঁস যুগের ইতালীয় নাট্যসমালোচকগণ ট্রাজিডির আনন্দকে বিশুদ্ধ শিল্প-সম্ভোগের আনন্দ বলে মনে করেন নি একমাত্র মিন্টুর্নো ছাড়া। তাঁরা প্রায় সকলেই 'ক্যাথারসিস' শব্দটির ওপর গুরুত্ব দিয়ে ট্রাজিডির আনন্দকে নীতিবোধ চরিতার্থতার আনন্দ বা ভাবমোক্ষণজনিত মানসিক স্বস্তির আনন্দ বলতে চেয়েছেন।

---

১. 'Poetics' এর tr. Bywater. Chap 4. p. 29.
২. *Ibid* ঐ ঐ ঐ
৩. *Ibid* ঐ ঐ ঐ

অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক রুশো 'Letter Sur les' Spectacles'এ ট্রাজিডির আনন্দের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখে আমরা এক ধরনের আনন্দ বা সুখ লাভ করি। মানুষের মনে রয়েছে পরশ্রীকাতরতা বা পরের অমঙ্গল-কামনা। এই কামনা চরিতার্থতার আনন্দ দেয় ট্রাজিডি—একেই বলা হয় 'Malevolence তত্ত্ব।[১] দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন এ আনন্দ সনাতন ন্যায়বোধের আনন্দ। ট্রাজিডিতে নায়কের জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব একটি উচ্চতর সমন্বয়ের রাজ্যে মিলিয়ে যায়। এখানকার দ্বন্দ্ব সৎ-অসতের বা ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব নয়—এক সত্যের সঙ্গে আর এক সত্যের বা এক ন্যায়ের সঙ্গে আর এক ন্যায়েরই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব সমাধান-জনিত Eternal justice-এর আনন্দই ট্রাজিডি দেয়।[২]

উনিশ শতকের দার্শনিক সোপেন হাওয়ার এর মতে অজ্ঞাত, অদৃশ্য, উচ্চতর কোনও এক Sublime-এর বোধই ট্রাজিডির আনন্দ।[৩] ট্রাজিডিতে গুরু-গম্ভীর ও বিষাদঘন শোচনীয় জীবনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সকল মানুষ অস্পষ্ট ভাবে ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সচেতনভাবে জীবনের নিরর্থকতা উপলব্ধি করেন। কামনা-বাসনার ভয়ঙ্কর সংঘাত ও মানুষের সঙ্গে এক অদৃশ্য শক্তির প্রচণ্ড সংঘাতের শেষে সমস্ত কিছুর ওপর গম্ভীর অন্ধকার নেমে আসার পূর্বেই আসে একটা শান্তির ভাব। এ ট্রাজিডিতে নায়ক বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর নিজের অহমিকা-অভিমানকে বর্জন করে শেষে জীবনকেও সমর্পণ করে—এই আত্মসমর্পণের (resignation) আনন্দই ট্রাজিডি থেকে পাওয়া যায়।[৩]

অসামান্য পণ্ডিত এ. ডাবলিউ শ্লেগেল বলেছেন যে উৎকৃষ্ট ট্রাজিডিতে হয় মানুষের মর্যাদাবোধ (dignity of man) কিংবা বাস্তব জগতে বিশৃঙ্খল ঘটনাধারার ঊর্ধ্বে আরও কোনো একটি উচ্চতর শৃঙ্খলাডোরের আভাস পাওয়ার আনন্দ অথবা একই সঙ্গে দুয়েরই আনন্দ বিস্ময়করভাবে আমরা লাভ করি।[৪]

আবার ফ্রেডারিক শীলার বলেছেন যে জগতের বুকে রয়েছে উচ্চতর নীতি-শৃঙ্খলা। এই নীতির প্রতি আনুগত্যের জন্যেই আমরা আনন্দ পাই না, যে তা লঙ্ঘন করে তার শাস্তিতেও আনন্দ পাই। নীতির দিক থেকে অনুতাপ এমনকি নৈরাশ্যের মধ্যেও একটা মহত্ত্ব আছে। নৈতিক শৃঙ্খলাকে রক্ষার জন্যে যখন কোনো মহৎ ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করে অথবা নীতি-লঙ্ঘনের জন্যে কোনো অপরাধী আত্মহত্যা করে—উভয় ক্ষেত্রেই 'our respect for the moral law is raised to the highest power." সুতরাং ট্রাজিডি নায়কের বেদনা, হতাশা ও শোচনীয়তার মধ্য দিয়ে নীতির জয় ঘোষণা লক্ষ্য করেই আমরা আনন্দ পাই।[৫]

---

১. *Theory of Drama* : A Nicoll. ২. *Literary Criticism* : W. K. Wimsatt and Cleanth Brooks. pp. 557. ৩. Our pleasure in tragedy belongs, not to the sense of the beautiful, but to that of the sublime; nay it is the highest grade of this feeling. *The World as Will and Idea* : 1818 Chap III. ৪. *Lectures on Dramatic Art and Literature* ; Chap V. ৫. We find pleasure not only in obedience to morality, but in the punishment given to its infraction. Friedrich Schiller—On the Cause of the pleasure We Derive From Tragic Objects—1791.

আই. এ. রিচার্ডস বলেছেন যে ট্রাজিডিতে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি ভাব Pity ও fear-এর চমৎকার সমন্বয় ঘটে। "Pity the impulse to approach, and Terror, the impulse 'to retreat' brought into 'a reconciliation which they find nowhere else'[১] এই Pity ও fear-এর সমন্বয়ের ফলে যে আবেদনের সৃষ্টি হয় তার নাম 'ক্যাথারসিস'—আর তাতেই আনন্দ।

বিশ শতকের এফ. এল. লুকাস তাঁর 'ট্রাজিডি' গ্রন্থের Emotional effect of tragedy নামক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল ট্রাজিডি জীবনের সত্যরূপকে অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখায়। জীবনের প্রকৃত রূপ ও তার প্রকাশসৌন্দর্যই আমাদের আনন্দ দেয়।

এ. এইচ. থর্নডাইকও জানালেন ট্রাজিডিতে ভাবমোক্ষণের আনন্দ, সহমর্মিতা-জনিত আত্মপ্রসাদের আনন্দ, শৈল্পিক আনন্দ ও অনন্তের আভাস সব কিছু মিশে থাকে।[২]

এবার অধ্যাপক নিকলের মন্তব্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি বললেন ট্রাজিডিতে দুঃখজনক ঘটনা দেখে আমরা যে আনন্দ পাই তার সবচেয়ে প্রধান ও বড় কারণ হল যে এতে যেসব চরিত্র থাকে তাদের সমুন্নত মহিমা ও বীরোচিত ঐশ্বর্য আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে হ্যামলেটের সততা ও আত্মার সৌরভই আমাদের আনন্দ দেয়। প্রতিবেশের চাপে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ্যামলেটকেই দেখতে চাই, কারণ আমরা জানি তার মহিমা ও অন্তঃপ্রকৃতির মাধুর্য সমস্ত অশুভ শক্তি ও মৃত্যুর ওপর জয়ী হবে। কিন্তু একথা বলেও অধ্যাপক 'Tragic Relief' নাম দিয়ে ট্রাজিডির আনন্দতত্ত্বের নানা কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাত কারণগুলি এইভাবে নির্দেশ করা চলে।

ক. 'ক্যাথারসিস তত্ত্ব' গ্রহণযোগ্য বলে তিনি মনে না করলেও এফ. এল. লুকাস অ্যারিস্টটলের এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে কথা বলেছেন তা স্বীকার করেছেন। লুকাসের মতে ক্যাথারসিস হল অবদমিত কামনা-বাসনার মুক্তি। এই উক্তির মধ্যে কতকটা সত্য আছে বলে নিকল মনে করেন এবং এতে যে এক ধরনের আনন্দ পাওয়া যায়, তা তিনি অস্বীকার করেন নি।

খ. পূর্বেই বলা হয়েছে চরিত্রের অসামান্য মহিমা ও বীরোচিত ঐশ্বর্য ট্রাজিডিতে আনন্দলাভের প্রধান কারণ।

গ. ট্রাজিডির মধ্যে যে বিশ্ব-জনীনতাবোধ আছে তা মানুষকে অনন্তের ব্যঞ্জনা দেয়—আর এর ফলেও আমরা আনন্দ পাই।

ঘ. ট্রাজিডির কাহিনীকে কবিত্বের সাহায্যে (যেমন গ্রীক ও এলিজাবেথান

---

১. *Tragedy :* By Clifford Leech. (General Editor : John D. Jump.) Chap 5 The Sense of Balance গ্রন্থে উদ্ধৃত P. 56.

২. *Tragedy :* A. H. Thorndike.

ট্রাজিডি) উপস্থাপিত করলে দুঃখজনক ঘটনার ব্যথা ক্ষণিকের জন্য তিরোহিত হয় ও আমরা আনন্দ পাই।

ঙ. **The feeling of nobility** বা মহিমাবোধের সঙ্গে নৈতিক বোধের আছে একটি গূঢ় সংযোগ। ট্রাজিডিতে নায়কের মহিমা আমাদের নৈতিক বোধকে তৃপ্ত করে বলেও আনন্দ জাগে।

চ. ট্রাজিডিতে সোপেন হাওয়ার কথিত অহমিকা, অভিমান-বর্জন ও আত্মসমর্পণের আনন্দও কতকটা সমর্থনযোগ্য।

ছ. সর্বশেষ কথা হল, যে ট্রাজিডিতে কেন আনন্দ পাওয়া তার কোনো একটি উত্তরই যথেষ্ট নয়। অভিনয় দেখার সময়ে আমাদের সমস্ত সত্তা গভীরভাবে আন্দোলিত হয় এবং একটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সঞ্চারী ভাব আমাদের চিত্তকে এমনভাবে অধিকার করে যে মহিমা ও ব্যর্থতার কথা, কামনার জয় ও নিয়তির আধিপত্য—সব কিছু একাকার হয়ে যায়; অথচ এমন একটা সুসমঞ্জস শিল্পরূপ জেগে ওঠে চিত্তে যার কোনো রকম নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

আমাদের রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় দর্শন ও রসবাদ চিন্তার প্রভাবে ট্রাজিডির আনন্দতত্ত্বকে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ট্রাজিডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি'। ট্রাজিডিতে গভীর সহানুভূতির সূত্রে আমরা নায়কের সঙ্গে একাত্ম হই—তখন তার দুঃখ আর আমাদের দুঃখ অভিন্ন হয়। এই দুঃখই হল তাঁর মতে আনন্দ। তাই তিনি বলেছেন, "দুঃখ অপ্রিয় নয়; সাহিত্যই তার প্রমাণ। যা কিছু আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি, তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতেই আনন্দ।....দুঃখের অনুভূতি আমাদের সবচেয়ে বেশী চেতিয়ে রাখে।"

সিদ্ধান্ত ঃ ট্রাজিডির আনন্দতত্ত্ব নিয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে যে সব আলোচনা হয়েছে, মোটামুটিভাবে তার পরিচয় দেওয়া হল। আলোচনার সূচনাতেই আমরা ভারতীয় রসবাদের আলোকে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছি। এই আলোকে অথবা এরই প্রভাবজাত রবীন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণে ট্রাজিডির আনন্দকে দেখলে কোনো রকম জটিলতা উপস্থিত হয় না। একথা ঠিক যে ভারতীয় রসবাদ বা রবীন্দ্রীয় মতবাদে শুধুই ট্রাজিডি নয় যে কোনো প্রকার রসোত্তীর্ণ রচনাই আত্মসাক্ষাৎকার বলে তা আনন্দের হেতু। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রসাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে যে আনন্দ তা 'সহৃদয়' দর্শক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। নাটক যখন এক মিশ্র চারুকলা এবং যখন এর দর্শকেরা ভিন্ন রুচির ও সংখ্যায় অসংখ্য, তখন রসবাদের আলোকে আনন্দ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়তো সব সময় নিরাপদ নয়। তাছাড়া ট্রাজিডির বোধ এক মিশ্র অনুভূতি।—পাশ্চাত্যেও ভাব-সংবেদনার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—রসের ওপর নয়। সুতরাং ট্রাজিডির আনন্দও নানা ব্যাপারের মিশ্রণজাত বা বহুবিধ কারণের ফলে—এই মতবাদ সাধারণ দর্শকদের কথা বিবেচনা করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। অতএব ট্রাজিডির আনন্দ শুধু বিশুদ্ধ শিল্প সম্ভোগের আনন্দ নয়।

নানা কারণেই এ আনন্দ লভ্য। সহৃদয়-দর্শকচিত্তে রসোদ্রেকের ফলে যে আনন্দ, তাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সাধারণ-দর্শকেরাও যে এতে আনন্দ পায়, সে কথা বুঝতে গেলে ভারতীয় রসবাদের আলোকে দেখলে এর আনন্দতত্ত্বকে বোঝা যায় না।

ট্রাজিডির সমাপ্তি ঃ

ট্রাজিডি নাটকের সমাপ্তি বিয়োগান্ত হয়, বিষাদান্ত হয়, আবার ক্ষেত্র-বিশেষে মিলনান্তও হতে পারে। গ্রীক নাটকের অন্তিমে অনেক সময় নায়কের মৃত্যু দেখানো হয়েছে, কিন্তু সব নাটকে তা হয় নি। শেক্সপীয়রের ট্রাজিডিতে মৃত্যুই নায়কের পরিণাম। কিন্তু আধুনিককালের নাটকে মৃত্যুকেই ট্রাজিডির পরিণাম-দৃশ্য সব সময় মনে করা হয় নি। বেঁচে থেকেও মানুষ মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে। সুতরাং ট্রাজিডির উপসংহারে মৃত্যু থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। দর্শকচিত্তে সহানুভূতি, ভয় ও বিস্ময়কে জাগ্রত করতে পারলেই হল। কিন্তু ট্রাজিডির উপসংহার মিলনান্ত হতে পারে কিনা বা হওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে নানা নাট্যতত্ত্ববিদ্ চিন্তা করেছেন। গ্রীক ট্রাজিডির কতকগুলির উপসংহার ঠিক যাকে 'unhappy ending' বলে তা নয়। অ্যারিস্টটল কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্পষ্টভাবেই তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন যে 'unhappy ending' হল অর্থাৎ অশুভ উপসংহারই হল ট্রাজিডির যথার্থ সমাপ্তি।

চতুর্দশ শতকের ইতালীয় মহাকবি দান্তে ট্রাজিডির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে ট্রাজিডির সূচনা হবে প্রশংসনীয় ও শান্ত, কিন্তু তার উপসংহার হবে বীভৎস ও ভয়ানক্।[১]

রেনেশাঁশ যুগের কস্টেলভেট্রো বলেছিলেন কমেডি ও ট্রাজিডি দুয়েরই উপসংহার আনন্দজনক বা দুঃখজনক হতে পারে। তবে কমেডির আনন্দ বা দুঃখের সঙ্গে ট্রাজিডির আনন্দ বা দুঃখের পার্থক্য আছে। যেখানে নায়ক কিংবা তার প্রিয়জন আসন্ন মৃত্যু বা বিপত্তির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যায় সেখানেই ট্রাজিডির সমাপ্তি আনন্দজনক হয়।[২]

সপ্তদশ শতকে ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই এর লেখা 'The Cid' নামক নাটকটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তার 'সমাপ্তি' নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক হয়। নাটকটির সমাপ্তি বিয়োগান্ত তো নয়ই—বিষাদান্ত হয়েও মিলনান্ত। ফরাসী একাডেমি একে ট্রাজি-কমিডি বলে ঘোষণা করেছিল।[৩]

১. "Tragedy in its beginning is admirable and quiet, in its ending or catastrophe foul and horrible;" Letter to the Lord Can Grande Della Scala 1318—Dante Alighieri (1265—1321).

২. Therefore, the happy conclusion of tragedy consists in and restricts itself to the preservation of self, or of a loved one, from death or from a sorrowful life or from the loss of kinship—*On Aristotle's Poetics*: (1570). Lodovico Castelvetro (1505-1571).

৩. "The (Observer) states that the author had all the fewer justifications for including so many in The Cid in that, the plot being tragicomic, there was no need for them referring to what he had just said about tragicomic plots...." *The Opinions of French Academy* 1638.

অষ্টাদশ শতকে এডিসন, ভলতেয়ার প্রমুখ সমালোচকেরা মোটের ওপর বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত পরিণতির কথা বললেও মিলনান্ত উপসংহারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের হেগেলও ট্রাজিডির উপসংহার যে বিয়োগান্ত নাও হতে পারে এবং সে-রকম ট্রাজিডিকে স্বীকৃতি জানানো উচিত বলে মনে করেছিলেন।[১]

কিন্তু বিশ শতকের বিখ্যাত শেক্সপীয়র সমালোচক এ. সি. ব্রাডলি ট্রাজিডির মিলনান্ত উপসংহারের সম্ভাব্যতা মেনে নিয়েছেন। 'Oxford Lectures on Poetry' গ্রন্থে তিনি হেগেলের ট্রাজিডি সম্পর্কিত বক্তব্যের উল্লেখ করে বলেছেন, 'Sometimes it can end the conflict peacefully and the tragedy closes with a solution.' অর্থাৎ কখনো-কখনো ট্রাজিডি নাটকের দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হতে পারে এবং তার একটা সমাধান লক্ষণীয় হতে পারে।

অধ্যাপক অ্যালারডাইস নিকল তাঁর গ্রন্থের 'ট্রাজি-কমিডি' অধ্যায়ে ট্রাজিডির মিলনান্ত উপসংহারকে প্রশংসা করতে পারেন নি। ইতালীয় সমালোচকেরা ও পরে ফরাসী সমালোচকেরা ট্রাজিডির সুখ-পরিণামকে যে অনুমোদন করেছেন সে তথ্য উল্লেখ করেও তিনি নিজে ট্রাজিডির শুভ পরিণামকে সানন্দে গ্রহণ করেন নি। তাই তিনি বলেছেন, 'The true tragic spirit is a jealous muse, and will have none other near her throne'[২] অর্থাৎ যথার্থ ট্রাজিক আত্মাটি একজন ঈর্ষান্বিতা দেবী, যিনি তাঁর সিংহাসনের নিকটে আর কারও অবস্থান সহ্য করেন না।

সিদ্ধান্ত ও সুখ-পরিণাম ট্রাজিডি ঃ

ট্রাজিডির সমাপ্তি সম্পর্কে নানা নাট্যশাস্ত্রীর মন্তব্যের কথা বলা হল। দেখা গেল অনেকেই ট্রাজিডির মিলনান্ত উপসংহার সমর্থন করেন না, কিন্তু কেউ কেউ সমর্থন করেন। ইউরিপিডিসের অধিকাংশ নাটকে 'unhappy ending' আছে বলে তার প্রশংসা করে একদা অ্যারিস্টটল বলেছিলেন—"It is, as we have said is the right line to take."[৩] অর্থাৎ ট্রাজিডির অশুভ-সমাপ্তিই তাঁর মতে যথার্থ উপসংহার। অ্যারিস্টটলের সমকালে গ্রীক নাটকে সর্বত্র unhappy ending না থাকলেও তিনি এ-শ্রেণীর নাটকের প্রশংসা করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে ট্রাজিডির যে বিবর্তন ঘটেছে, তাতে বহু নাটকেই মিলনান্ত উপসংহার লক্ষ্য করা গেছে। আর মিলনান্ত উপসংহার আছে বলে নাটক অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায় নি। আমাদের বক্তব্য হল যথার্থ ট্রাজিডিতে যদি মিলনান্ত-পরিণাম দেখা যায়, তা হলে তা কখনই প্রকৃত ও স্থায়ী মিলন নয়—সেই ক্ষণিকের আপাত মিলনের মধ্যে ট্রাজিডির যে মর্মান্তিক বেদনা, নায়কের যে মহাসর্বনাশ ও মর্মভেদী আর্তনাদ তা কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না—নায়ককে

১. ট্রাজিডিতে ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক ঘটনা থাকলেও হেগেল মনে করেন, "A melancholy conclusion is by no means indispensably necessary"—*Lectures on Dramatic Artand Literature* : A. W. Schlegel.

২. *The Theory of Drama* : A Nicoll.

৩. *Poetics* : Aristotle. tr. By water pp. 51.

সুখ ও শান্তির স্থায়ী আনন্দ দেয় না। কখনো অন্তিমের মিলন আংশিকভাবে তীব্রতম বেদনাবহ মহাসর্বনাশের কালো বস্ত্রখণ্ডে একটুখানি পাড় বুনে দেয়; কখনো বা তা কবির কথায় 'ক্ষণপ্রভা বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে বাঁধিতে'। এই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ করে, তাহলেই ট্রাজিডির মিলনান্ত-পরিণাম সমর্থনযোগ্য। ট্রাজি-কমিডি গোত্রের নাটকেও মিলনান্ত পরিণাম থাকে। কিন্তু এখানে সমাপ্তির সুখকর ব্যাপারই সমগ্র নাটকের মধ্যে মুখ্য স্থান লাভ করে এবং নাটকের মধ্যে পূর্বে নায়কের জীবনে যে দুর্গতি বা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল কিংবা যা ঘটেছিল, মিলনের আনন্দে তা সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে যায়। ব্যথা বেদনার দিকটি দর্শক-মনে বড় হয়ে ওঠে না। কিন্তু প্রকৃত ট্রাজিডিতে আপাত-মিলনের মাঝখানে ব্যথার রাগিণী নিরন্তর বাজতে থাকে। আমাদের মনে হয় ট্রাজিডির উপসংহার নিয়ে বিব্রত হওয়া উচিত নয়। **Tragic Impression** বা ট্রাজিক-বোধটাই বড় কথা। নাটক বিয়োগান্ত, বিষাদান্ত বা মিলনান্ত যাই হোক্ না কেন, তা যদি ট্রাজিকবোধকে জাগ্রত করে তোলে—তাহলে তা ট্রাজিডিই। ট্রাজি-কমিডিতে এই ট্রাজিক-বোধটি নাটকের শেষে জাগে না—সেখানে কমেডির বোধটিই প্রধান হয়ে ওঠে—সেইটিই সমগ্র নাটকের ফলশ্রুতি।

এই আলোচনা থেকেই সহজেই অনুমান করা চলে যে ট্রাজিডির মূল সুরকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাট্যকার যদি পরিণতিতে নায়ক-প্রতিনায়কের মিলন দেখান বা পরিণামকে সুখসূচক করেন তাহলে তাকে সুখ-পরিণাম ট্রাজিডি বলতে হবে। এখানে মিলন বা সুখ গভীরতর অর্থে বেদনা বা দুঃখেরই নামান্তর। দার্শনিক হেগেল[১], প্রসিদ্ধ শেক্সপীয়র সমালোচক ব্রাডলি প্রমুখ ব্যক্তি ট্রাজিডির এই সুখ-পরিণামকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। খুব জোর দিয়েই ট্রাজিডি নাটকে কমিক উপাদানের মিশ্রণ বা সুখ-পরিণামী ট্রাজিডি নাটক সম্পর্কে নিকল বলেছেন—**Tragedy in itself demands, first, that any comic interfusion should be in spiritual accord with the tragic tone".**[২] দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে সাজাহানের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আরঙ্গজীব। তারই জন্যে তাঁর জীবনের শোচনীয় মর্মান্ত-বিদারী পরিণাম। কিন্তু নাটকের শেষে সাজাহান তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী পুত্র আরঙ্গজীবকে ক্ষমা করেছেন। তাঁর অনুরোধে কন্যা জাহানারাও তাকে মার্জনা করেছেন। এ মার্জনা সাজাহানের চার পুত্রের জন্যে চারভাগে বিভক্ত পিতৃসত্তার এক ভাগের ক্ষমা। তাও আবার ক্ষণিকের জন্য একদিনের জন্যও নয়। ক্ষমার দৃশ্যে দারার কন্যা জহরার অভিসম্পাত সেই ক্ষণিকের স্বস্তিকেও অস্থির করে তুলেছে। তাই এ মিলন বা এ মার্জনা নাটকের ট্রাজিক আত্মাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। এই হল সুখ-পরিণাম ট্রাজিডি।

১. "From another point of view, however, we may see the tragic issue also merely in the light of the effect of unhappy circumstances and external accidents, which might have brought about, quite as readily, a different result and a happy conclusion"—*Dramatic Poetry*. (1818—1829).

২. *The Theory of Drama* : A Nicoll pp. 233.

ট্রাজিডির শ্রেণী :

বহুকাল পূর্বে অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ট্রাজিডির প্রধান চারটি রূপের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ক. কমপ্লেক্স ট্রাজিডি—যা ঘটনার বৈপরীত্য ও প্রত্যভিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। (Depending entirely on Reversal of situation and Recognition)

খ. প্যাথেটিক ট্রাজিডি—যার উদ্দেশ্য কারুণ্য জাগানো। দৃষ্টান্ত Ajaxes ও Ixions বাইওয়াটারের অনুবাদে একেই বলা হয়েছে 'ট্রাজিডি অব সাফারিঙ'

গ. এথিক্যাল ট্রাজিডি—যেখানে উদ্দেশ্য নৈতিক (Where motives are ethical) দৃষ্টান্ত, 'The Phthistides' ও 'Peleus' নাটক। বাইওয়াটারের অনুবাদে একে বলা হয়েছে ট্রাজিডি অব ক্যারেকটার।

ঘ. সিম্পল ট্রাজিডি—এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল কোনো মন্তব্য করেন নি। শুধু বলেছেন দৃশ্যসর্বস্ব ট্রাজিডির কথা বাদ দেওয়া হল, যেমন 'Phoroides' ও 'Prometheus' নাটকের দৃশ্যাবলি। বাইওয়াটার কিন্তু সিম্পল ট্রাজিডির কথা বলেন নি; তিনি 'দৃশ্য ট্রাজিডি'র (tragedy of spectacle) কথা উল্লেখ করে 'Phoroides' ও 'Prometheus' এরই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অনুবাদক বুচারই একে সিম্পল ট্রাজিডি বলেছেন।

অ্যারিস্টটল ট্রাজিডির যে শ্রেণীভাগ করেছেন, তা ঘটনা, ভাব, নীতি ও দৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে। অবশ্য তিনি বলেছেন যে কোনো নাট্যকারেরই কোনো একটি বিষয়কে মুখ্য না করাই উচিত—সব কটি উপাদানের প্রয়োগ করার দিকেই নাট্যকারদের দৃষ্টি দিতে হবে। অ্যারিস্টটলের মতে ঐ চার শ্রেণীর ট্রাজিডির মধ্যে ঘটনার বৈপরীত্য বা প্রত্যভিজ্ঞান-সম্বলিত কমপ্লেক্স ট্রাজিডিই সার্থক ও শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি। এ শ্রেণীর ট্রাজিডিতে বিস্ময়কর উপাদান যথেষ্ট থাকে। মোট কথা যদি বুচারের অনুবাদ অনুসরণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কমপ্লেক্স ও সিম্পল ট্রাজিডিই ঘটনার গঠন-ভিত্তিতে কল্পিত; এখানে ঘটনার গঠন-ভিত্তি বলতে ঘটনাসর্বস্বতা বোঝাচ্ছে না। অ্যারিস্টটলের মতে যেহেতু ঘটনা বা বৃত্তই নাটকের প্রাণ, সেইজন্যই ঘটনা-সজ্জাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ শ্রেণী-বিভাজন স্বাভাবিক। প্যাথেটিক ট্রাজিডিতে কারুণ্য বা চোখের জলের মাত্রাই বেশী—বুচারের অনুবাদ বলা হয়েছে এ শ্রেণীর নাটকের উদ্দেশ্য Passion বা ভাবাবেগ জাগ্রত করা। মোট কথা এ বিভাগটি ভাব-উদ্বোধনের ভিত্তিতেই কল্পিত। Pathetic Tragedy তে বিস্ময় (element of wonder) ও ভয়ের (fear) ভাবটি কম এবং করুণার (pity) মাত্রাই বেশী। নায়ক-নায়িকার দুর্ভাগ্যজনিত শোচনীয় অবস্থার চিত্র এতে দেখানো হয়—কিন্তু দ্বন্দ্বের দিকটিতে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। Ethical বা নৈতিক ট্রাজিডির কথা ভাবা হয়েছে নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে। অ্যারিস্টটল যাকে শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি বলেছেন অর্থাৎ Complex ট্রাজিডিতে ঘটনার বৈপরীত্য বা প্রত্যভিজ্ঞান থাকার জন্য কাহিনীতে কৌতূহল ও জটিলতা সৃষ্টি হয়—নায়ক বিপদের মধ্যে পতিত হয়ে বিপদ-মুক্তির চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তার প্রয়াস ব্যর্থ হয় ও পরিণাম মর্মান্তিক

হয়ে ওঠে। বিস্ময়-ভাব এ শ্রেণীর কাহিনীকে বিশিষ্টতা দেয়। নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বও এতে লক্ষ্য করা যায়।

অ্যারিস্টটল যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তাতে স্পষ্টভাবে মেলোড্রামা বা 'হরর ট্রাজিডি'র কোনো উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে যা বলেছেন, তাতে এই দুই শ্রেণীর নাটকের আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, ভয় ও শোকভাব শুধুমাত্র দৃশ্যের সাহায্যেই বা চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমেও সৃষ্টি করা যায়; কিন্তু মূল বৃত্তের গঠন ও ঘটনার অভ্যন্তর থেকেই ঐ সমস্ত ভাবকে জাগ্রত করতে হবে। শুধুমাত্র চমকপ্রদ ঘটনা সৃষ্টির দ্বারা এই ধরনের ভাব জাগানোর চেষ্টা নিম্নস্তরের শৈল্পিক প্রক্রিয়া এবং তা বাইরের সাহায্যের ওপরই নির্ভরশীল। "**Those, however, who make use of the spectacle to put before us that which is merely monstrous and not productive of fear, are wholly out of touch with Tragedy**'[১] অর্থাৎ যে সব নাট্যকার চমকপ্রদ ঘটনা-সৃষ্টির দ্বারা বা নিছক দৃশ্যাত্মক ঘটনার দ্বারা ভয়-ভাব জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে শুধু একটা কুৎসিত বীভৎস-ভাব জাগিয়ে তোলেন, তাঁরা ট্রাজিডির কিছুই জানেন না। অ্যারিস্টটলের এই উক্তি বহু পরবর্তীকালে উদ্ভূত মেলোড্রামা ও 'হরর ট্রাজিডি'র বৈশিষ্ট্যকে অনেকখানি আভাসিত করছে।

অ্যারিস্টটলের পরেই সপ্তদশ শতকের জন ড্রাইডেনের কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি 'ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা' নাটকের ভূমিকায় ট্রাজিডি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে মূলত অ্যারিস্টটলের প্রধান সূত্রগুলির সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। এই আলোচনাতেই তিনি ট্রাজিডির তিনটি প্রকার নির্দেশ করেছিলেন[২]—ক. বিস্ময়মূখ্য, খ. ভয়মূখ্য ও গ. শোকমূখ্য।

অষ্টাদশ শতকে বুমারশেই (**Beaumarchais**) তাঁর **Essai sur le genre dramatique serioux (1767)**-এ বলেছেন ট্রাজিডির দুই শ্রেণী—ক. নিয়তিমূখ্য ট্রাজিডি (**Tragedy of Destiny**) ও খ. বীরত্বমূলক ট্রাজিডি, (**Heroic tragedy**) 'সিরিয়াস ড্রামা'র তিনটি ভাগ কল্পনা করতে গিয়ে তিনি ট্রাজি-কমিডি, বুর্জোয়া ট্রাজিডি ও টিয়ারফুল কমেডির কথা ইঙ্গিত করেছিলেন। এখানেও তিনি 'বুর্জোয়া ট্রাজিডি' নামে ট্রাজিডির একটি নতুন শ্রেণী কল্পনা করেছিলেন। এতে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকেই নায়ক করা হবে।

উনিশ শতকের শেষে মোল্টন তাঁর **The Ancient Classical Drama—A study in Literary Evolution.** (1898) গ্রন্থে ট্রাজিডিকে **Classical** ও **Romantic** এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যে সব ট্রাজিডি লিখিত হয়েছিল সেগুলিকে ক্লাসিক্যাল ও শেক্সপীয়র রচিত ট্রাজিডিগুলিকে রোমান্টিক আখ্যা দিয়েছিলেন।

১. *Poetics*. Aristotle, tr. Bywater pp. 52.

২. Selections, From *The Works of John Dryden*, Vol V, edited by Slr Walter Scott.

বিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ নাট্যতত্ত্ববিদ সি. ই. ভগান (C. E. Vaughan) তাঁর 'Types of tragic Drama' গ্রন্থে (1924) ট্রাজিডির শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি ট্রাজিডির দুই প্রধান শ্রেণী ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক ট্রাজিডি সম্পর্কে মোল্টনের সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃতিদান করে বললেন যে, ক্লাসিক্যাল নাটকের মধ্যে শুধুই গ্রীক লাতিন ট্রাজিডিই নয়—আধুনিক ইতালীয়, ফরাসী ও জার্মানিক অনেক ট্রাজিডি স্থান পাবে। রোমান্টিক ট্রাজিডির মধ্যেও তেমনি লোপ ডি ভেগা, ক্যালডেরন, গেটে, শিলার, হুগো প্রভৃতির ট্রাজিডি অন্তর্গত হবে। ব্রাউনিঙের নাটক, মেতারলিঙ্কের নাটক, ইবসেনের নাটক প্রভৃতির জন্য তিনি পৃথক পৃথক শ্রেণী কল্পনা করেছেন।

অধ্যাপক নিকল তাঁর **The Theory of Drama** গ্রন্থে ট্রাজিডির যে শ্রেণী-বিভাগ করেছেন, মোটামুটিভাবে তা বেশ নির্ভরযোগ্য। **Types of Tragedy** নাম দিয়ে ট্রাজিডি অধ্যায়ে তিনি এ বিষয়ে অতি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর বিভাজন এইরূপ : ক. কোরাস ও ঐক্য-মুখ্য গ্রীক ট্রাজিডি খ. এলিজাবেথান ট্রাজিডি গ. হিরোয়িক ট্রাজিডি বা বীর্যব্যঞ্জক ট্রাজিডি ঘ. হরর ট্রাজিডি বা ভয়ঙ্কর ট্রাজিডি ও ঙ. ডোমেস্টিক ট্রাজিডি বা পারিবারিক ট্রাজিডি।

ট্রাজিডির বিবর্তন : গ্রীক ট্রাজিডি

সুদূর অতীতে গ্রীসেই ট্রাজিডির উদ্ভব এবং সেখানেই এর গৌরবময় সমৃদ্ধি। তিনজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার—এইস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের হাতে ট্রাজিডি নাটকের ধীর ও অসামান্য পরিণতি। অবশ্য এঁদেরও পূর্বে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এটিকোর অন্তর্গত ইকোরিয়ার অধিবাসী থেসপিসই (Thespis) সর্বপ্রথম ডায়োনিসাসের কাহিনীকে প্রথম নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। পঞ্চাশজনের একদল গায়ক (কোরাস) ডায়োনিসাস্ দেবতার উৎসবে গানের সাহায্যে তাঁর মহিমা কীর্তন করত প্রতিযোগিতার আসরে। এরই নাম ডিথিরাম্ব (Dithyramb)। এই কোরাস গীত বিশিষ্টতা লাভ করে ও সংলাপের রূপ নেয়। থেসপিস কোরাস-গায়কের সঙ্গে নূতন একটি পাত্র সংযুক্ত করেন। ফলে, সংলাপযুক্ত নাটকের সূচনা হয়। গ্রীসের ঐ তিন প্রধান নাট্যকারদের পূর্বে নাটকের যে রূপ ছিল তা গীতাত্মক। তার প্রমাণ কিছু না মিললেও অনুমান করা হয়েছে যে, সে-যুগ ছিল লিরিক্যাল ট্রাজিডির যুগ।[১] থেসপিসের নাটক ও এইস্কিলাসের প্রথম দিকের রচনা এই যুগের অন্তর্গত।

থেসপিসের পরই এলেন এইস্কিলাস (Aeschylus, ৫২৫—৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ) এথেন্সের নিকটে এলেউসিসের একটি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। ৯০ খানি নাটকের তিনি রচয়িতা হলেও মাত্র ৭ খানিই রক্ষিত হয়েছে। এগুলি হল, Supplices, Persae, Septem, Prometheus Vinctus, Agamemnon, Choephori ও Eumenides.

১. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য *Greek Tragedy* : H. D. F. Kitto Chap I দ্রষ্টব্য।

তিনটি পর্বে সমাপ্ত ট্রাজিডি নাটকের প্রথম পর্ব হল 'Supplices'—অন্য দুইপর্ব মেলেনি। দানায়ুস ও ঈজিস্টাস দুই সহোদর। ঈজিস্টাসের পুত্রেরা দানায়ুসের মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, ও তাদের জোর করে বিবাহ করতে চাইলে পিতার সঙ্গে তারা সাগরপারের অপর এক রাজার কাছে আশ্রয় নেয় এবং ঐ রাজা কীভাবে এইসব মেয়েদের রক্ষা করেন কামার্ত ঈজিস্টাসের পুত্রদের হাত থেকে, তারই কাহিনী এতে বিবৃত। 'Persae' নামক ঐতিহাসিক নাটকটিতে পারস্যরাজ জারাকসেনের গ্রীক অভিযান, শোচনীয় পরাজয় ও পারস্যের নরনারীর করুণতম বিপত্তির কথা বিবৃত হয়েছে। পিতৃভূমির অধিকার নিয়ে ইডিপাসের দুই পুত্রের বিরোধ, যুদ্ধ এবং পিতৃ-অভিশাপে দুজনেরই মৃত্যুকাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'Septem'-এ। 'Agamemnon', 'Choephori' ও 'Eumenides'এ একই পালার কাহিনীকে তিনটি পর্বে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে ভ্রাতৃবধূ ও শ্যালিকা হেলেনকে উদ্ধারের জন্যে অ্যাগামেম্‌নন ট্রয় অভিযানে যান। অউলিস নামক স্থানে জাহাজ আটকে পড়লে কন্যা ইউজেনিয়াকে দেবতা আর্টিমিসের কাছে বলি দেন। ফলে স্ত্রী ক্লাইটোমেনেস্ট্রা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন ও প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠেন। এগুইসথাসের সাহায্যে ট্রয় থেকে স্বামী ফিরে এলে তাঁকে তিনি হত্যা করেন। দ্বিতীয়টিতে অ্যাগামেমনের পুত্র অরিষ্টিস মাতার ঐ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ও তাঁর উপপতি এগুইসথাসকে হত্যা করেন। আর শেষ পর্বে মাতৃহন্তা অরিষ্টিসের পেছনে 'ফিউরিজ' কিভাবে ধাওয়া করেছে ও পীড়ন করেছে এবং শেষে অনুতাপের মধ্য দিয়ে অ্যাপেলো দেবতার অনুগ্রহে অরিষ্টিস কিভাবে রক্ষা পেয়েছে, তারই কাহিনী আছে। আর Prometheus Vinctus বা প্রোমিথীউস বাউণ্ডে এ অনমনীয় বীর প্রমিথীউস জিউসের স্বৈরাচারকে কিছুতেই মেনে না নেওয়ায় পর্বতের ওপর তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে কিরকম অকথ্য অত্যাচার তার ওপর চালানো হয়েছিল, তারই কথা বিবৃত।

প্রাচীন ট্রাজিক-জগতের সার্থক রূপকার এইস্কিলাস। অসামান্য তাঁর কল্পনাশক্তি। ভাবজগৎ ও জড়জগৎকে তিনি করে তুলেছেন প্রাণবন্ত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি গ্রীক ভাস্কর্যের মতো খোদাই করা সুস্পষ্ট ও জীবন্ত। ঔদ্ধত্যের প্রতি ঘৃণা আর ন্যায়ের প্রতি তাঁর স্পষ্ট পক্ষপাত। গভীর ধর্মপ্রাণ নাট্যকার মহাসংকটের মুখে জীবনের গুরুতর নৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। অতুলনীয় তাঁর স্টাইল।[১]

এইস্কিলাসের পরেই সফোক্লিস (Sophocles)। এথেন্সের কাছে কলোনাসে তাঁর জন্ম। তিনি প্রায় ১০০খানি নাটক রচনা করলেও মাত্র কয়েকখানিই আমাদের হাতে এসেছে। 'Ajax', 'Antigone', 'Electra', 'Oedipus' 'Tyrannus', 'Philoctetes', 'Oedipus Coloneus'—এইগুলিই হল তাঁর রচিত ট্রাজিডি। নাটকে

১. "None can depict like him the splendour of war, the din of battle, the lone majesty of mountains and above all the mighty of elemental forces, the rock-hurling Titans and the thunders of Zeus."—*Greek Literature* : H. J. W. Tillyard.

তৃতীয় অভিনেতা যুক্ত করে নাট্যক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলার কৃতিত্ব তাঁরই। এইস্কিলাসের তুলনায় তাঁর নাটকে কোরাসের গুরুত্ব কিছু কম। ট্রাজিডি-সৃষ্টির আঙ্গিকগত কলাকৌশলে সফোক্লিসই শ্রেষ্ঠ। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি নিখুঁত ও সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর সংলাপ পরিমিত ও অতিসূক্ষ্ম ভারসহ। তর্কে, যুক্তিতে, বিবৃতিতে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। এইস্কিলাসের মতো কবিত্ব না থাকলেও সফোক্লিসের রচনায় গীতিকবিতার মৃদু ও স্নিগ্ধ সৌরভ আছে। ট্রাজিক আইরণি বা নাট্যশ্লেষ প্রয়োগে তিনি খুবই নিপুণ।[১]

তাঁর রচিত দু' একটি নাটকের একটু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। একিলিসের মৃত্যুর পর তাঁর বর্ম কাকে দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন দেখা দিল। বীর অ্যাজাক্সকে না দিয়ে তা দেওয়া হল অডেসেউসকে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অ্যাজাকস, অ্যাগামেম্ননন মেনেলাস ও অডেসেউসকে হত্যা করতে অগ্রসর হলেন। তখন দেবী এথেনা তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটান এবং ভুলক্রমে তিনি কতকগুলি গোরু-বাছুরকে হত্যা করে বসেন। পরে অনুতাপে তিনি আত্মহত্যা করেন। এই কাহিনী নিয়ে অ্যাজাক্স নাটক।

রাজা ইডিপাসের কন্যা অ্যান্টিগোন ও তাঁর প্রতিপক্ষ ক্রিয়োনের ট্রাজিক কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে 'অ্যান্টিগোন' নাটকে। ইডিপাসের দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে পোলিনাইসাস বাইরের রাজাদের সাহায্য নিয়ে এটিয়েকেসের রাজ্য থিবি আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু বরণ করেন। নূতন রাজা ক্রেয়োন পোলিনাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে দিতে চাইলেন না। কিন্তু অ্যান্টিগোন দৈব বিধান রক্ষা করার জন্যে এবং ভ্রাতার প্রতি ভালোবাসায় সে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ক্রেয়নের পুত্র হেইমনের গভীর আকর্ষণ ছিল অ্যান্টিগোনের প্রতি। প্রণয়িনীর মুক্তি প্রার্থনা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। শেষে একজন অন্ধ, ক্রেয়নকে ধর্মের ভয় দেখালে তিনি অ্যান্টিগোনকে মুক্তি দেন, কিন্তু তখন আর তাঁকে রক্ষা করার সময় নেই। অ্যান্টিগোন মারা গেলেন, সেই সঙ্গে হেইমনও। তারপর ক্রেয়োনের স্ত্রী। বেঁচে রইলেন শুধু ক্রেয়োনই। 'ইলেক্ট্রা' নাটকে অ্যাগামেম্ননের কন্যা ইলেক্ট্রা ভ্রাতা অরিষ্টিসের সহযোগে মাতৃহত্যা করে কিভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে, তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 'কলোনায় ইডিপাস' নাটকে রাজা ইডিপাসের শোচনীয় জীবন-পরিণামের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রাজা 'ইডিপাস' নাটকে রাজার অজ্ঞতাবশত পিতৃহত্যা, মাতৃগমন, সন্তান-উৎপাদন ও শেষে সব কিছু জানতে পেরে মর্মান্তিক অনুতাপ ও শাস্তি গ্রহণের কাহিনী আছে।

সফোক্লিস, এইস্কিলাসের মতো ধর্মপ্রাণ বা নীতিপ্রিয় ছিলেন না। চরিত্রচিত্রণের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী।[২] ট্রাজিক-বোধটিও ছিল তাঁর খুব গভীর। কল্যাণকর

১. "He is the most Attic of the tragedians, if not the greatest, yet certainly the most perfect." : *Greek Literature* : H. J. W. Tillyard.

২. The Aeschylean universe is one of august moral laws, infringement of which brings certain doom; the Sophoclean is one in which wrongdoing does indeed work out its punishment, but disaster comes too, without justification; at the most with "contributary negligence". *Greek Tragedy*—F. D. F. Kitto, pp 148, 1976.

নীতির শাসন এইস্কিলাসের জগতে। সেই নীতি থেকে ভ্রষ্ট হলেই জীবনে আসবে দুর্গতি। সফোক্লিসের জগতে মানুষ অন্যায় কিছু করলে সেই অন্যায়ই তার শাস্তি বিধান করে, কিন্তু তার জন্যে যে চরম শোচনীয়তা আসে তা যে সুবিচার-সম্মত নয় —এই কথাটাও উচ্চারিত হয়েছে সেখানে।

ইউরিপিডিস (**Euripides**) প্রথম রিয়ালিস্ট ও আধুনিক নাট্যকাররূপে খ্যাত। সালামিসে তাঁর জন্ম। তিনি প্রায় ৯২ খানি নাটক লেখেন। সমকালে গ্রীসে তিনি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারলেও পরবর্তীকালে তিনি খুবই সমাদৃত হয়েছেন। তাঁর নাটকের কতকগুলি দৃশ্যের করুণরস তাঁর গীতিকাব্যের সহজ সৌন্দর্য ও জীবন-সত্যের প্রতি বিচারশীল দৃষ্টি নাট্যকার হিসেবে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। কোরাসকে অত্যন্ত শিথিলভাবে প্রয়োগ করে তিনি তার গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছেন। দর্শকদের লক্ষ্য করে নাটকে তিনি 'প্রোলোগের' ব্যবহার করেছেন। কুসংস্কারকে তিনি আক্রমণ করেছেন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যুদ্ধলিপ্সাকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। তাই ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। তাঁর মাত্র ১৭ খানি নাটক রক্ষিত হয়েছে। **'Suppliant' 'women', 'Alcestis', 'Medea', 'Hippolytus', 'Trojan women', 'Andromache' Hecuba** প্রভৃতি। তাঁর নাটকের মধ্যে কয়েকখানির একটু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

'Alcestis'-কে ঠিক ট্রাজিডি বলা যায় না। ট্রাজি-কমিডিধর্মী নাটক। থেসালির রাজা এডসিটাস জানতে পারেন, তাঁর বদলে কেউ যমালয়ে গেলে তিনি প্রাণে রক্ষা পাবেন। কেউ যেতে রাজী হল না, শেষে তাঁর স্ত্রী অ্যালসেসটিস সেখানে গেলেন। বীর হারকিউলিস এসে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অ্যালসেসটিসকে উদ্ধার করেন। 'মিডিয়া' ইউরিপিডিসের শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি। নারীপুরুষের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, ঈর্ষাবশত প্রেমিকা নারীর মারাত্মক আচরণ ও তার মর্মান্তিক পরিণাম এতে দেখানো হয়েছে। 'হিপ্‌পোলিটাস'এ নারীর অতৃপ্ত প্রেমের শোচনীয় ট্রাজিডি। এথেন্সের রাজা থিসিউসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ফেইডা রাজার প্রথম পক্ষের সন্তান হিপ্‌পোলিটাসের প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু পুত্র, রানীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে রাজার কাছে হিপ্‌পোলিটাসের বিরুদ্ধে তিনি মিথ্যা অভিযোগ আনেন। ফলে রাজকুমার রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে আত্মহত্যা করেন—এ সংবাদ শুনে রানীও প্রাণত্যাগ করেন। নির্দোষ নায়িকার দৃষ্টান্ত হিসেবে ইউরিপিডিসের 'ট্রোজান উইমেন'-এর কথা উল্লেখ করা হয়। ট্রয়ের পতনের পর, যখন সমস্ত যোদ্ধা নিহত, তখন ট্রয়ের বা ট্রোজান নারীগণ অসহায়ভাবে ক্রন্দন ও হাহাকার করতে থাকে। অ্যাগামেম্‌নের ভোগের সামগ্রী হিসেবে প্রায়াম-কন্যা ক্যাসেণ্ড্রাকে দেওয়া হল, আর একটি কন্যাকে এফিলিসের কবরে সমাহিত করার নির্দেশ দেওয়া হল। হেক্টরের শিশুপুত্রকে প্রাসাদচূড়া থেকে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হল। নগরীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। সন্ত্রান্ত নারীদের বলপূর্বক জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হল। হাকুবা, ক্যাসাণ্ড্রা ও অ্যাণ্ড্রোমেকির কাতর ক্রন্দনে নাটকটি পূর্ণ।

ইউরিপিডিসের সংশয়বাদ, প্রচলিত ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, মতবাদের উদারতা, নারীসুলভ কোমলতা প্রভৃতি তাঁর নাট্যচিন্তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এইস্কিলাস ও সফোক্লিসের থেকে তাঁর ট্রাজিডি-সম্পর্কে বোধ ভিন্ন। ব্যক্তির জীবনের একটি ট্রাজিক ঘটনাকে তিনি ব্যক্তি-চরিত্রের অংশ বলে মনে করেন নি। তিনি আরও সূক্ষ্মভাবে মনে করেছিলেন মানুষের সাধারণ মানবিক প্রকৃতির মধ্যেই একটা মারাত্মক উপাদান থাকে যা দুঃখ-দুর্গতির কারণ। আর এই দুঃখ-দুর্গতিতে দোষী মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে, আবার নাও পারে। **He saw tragic action not as part of the character of the individual, leading to the downfall of the individual, but, in a more abstract way, as a disastrous element in our common human nature which leads to suffering, in which the guilty person may share or not.**[১]

সাধারণভাবে গ্রীক নাটককে আমরা ক্লাসিক্যাল নাটক বলে থাকি। ঐক্যনীতি অর্থাৎ ঘটনা, স্থান ও কালগত ঐক্য নাটকগুলিতে যথাসম্ভব রক্ষিত হয়েছে। বিশেষত ঘটনা-ঐক্য ও কাল-ঐক্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল সতর্ক। উপকাহিনীযুক্ত কাহিনী বা দুই কাহিনীর পর্যায়ক্রমে সমাবেশ, হাস্য ও করুণরসের একই নাটকে সঙ্কীর-প্রয়াস যতদূর সম্ভব গ্রীক নাটকে বর্জিত হয়েছে। একটা শৃঙ্খলা, সংহতি ও নাটকের গঠন-সৌষ্ঠব বিশেষভাবে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোরাস প্রাথমিক যুগে গ্রীক নাটকের এক অপরিহার্য উপাদান ছিল বটে, কিন্তু পরে তার মূল্য হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোরাসের কিছু স্থায়ী মূল্যও আছে, যা অস্বীকার করা চলে না। একটা লিরিক আবহাওয়া ট্রাজেডি-নাটকের অনুকূল বলে কোরাসকে একেবারে গুরুত্বহীন বলা যায় না! তাছাড়া কোরাসের মধ্য দিয়ে সেই আদিম যুগের সারল্য ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগসূত্রের একটা পরিচয়ও ধরা পড়ত। তাই আধুনিক কালের নাটকে আবার নূতন করে কোরাসকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। শেক্সপীয়র 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা' নাটকে **Enaborus** চরিত্রে, লীয়রের **Fool** চরিত্রে, হ্যামলেটের **Horatio** চরিত্রে কোরাসেরই ছায়া আর একভাবে পড়েছে।

গ্রীক নাটকের অভিনয়ের সেই দিনগুলি কবে শেষ হয়ে গেছে। ত্রিশ হাজার দর্শকের সামনে গুরুভার পোষাক আর উঁচু জুতো পরে বিশালদেহ অভিনেতৃগণ একদা যেভাবে কণ্ঠস্বরের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে জমাট নাট্যঘটনার রসকে ঘনীভূত করে তুলতেন—প্রবলতম উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দর্শক পাত্র-পাত্রীদের জীবনরঙ্গমঞ্চের শেষ পর্যায়টুকু দেখবার জন্যে যেভাবে অধীর হয়ে থাকতেন, তা আজ আমরা অনুমানই করতে পারি।

---

১. *Greek Tragedy* : H. D. F. Kitto. pp 250 Edn. 1976.

বাঙলা নাটক ও গ্রীক ট্রাজিডি :

সমস্ত গ্রীক ট্রাজিডিগুলির কথা মনে রেখে বলা যায় যে, নিয়তির প্রতিকূলতায় জীবনে সেখানে ট্রাজিডি সংঘটিত হলেও সর্বক্ষেত্রেই নিয়তি মূল কারণ হয় নি। যেখানে নিয়তিই ট্রাজিডির মূল কারণ, সেখানে চরিত্রের দায়িত্বও যে অনেকখানি একথাও বলা হয়েছে। নিয়তিমুখ্য গ্রীক নাটকগুলিতে নিয়তি খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর নয়। মানুষের জীবনের যাবতীয় ঘটনাকে দেবতা-নিরপেক্ষ ঘটনা বলে কখনোই তাঁরা মনে করেন নি —একথা স্বীকার করেও বলা যায় তাঁদের রচিত কিছু কিছু ট্রাজিডিতে ট্রাজিডি ঘটেছে দৈবশক্তির প্রতিকূলতায় নয়, ব্যক্তির স্বভাবধর্মের জন্যে কিংবা রিপুর প্রাবল্যে কোনো সামাজিক কারণে।

আমাদের বাঙলা নাটকে ট্রাজিডি সংঘটনের পশ্চাতে দৈবের প্ররোচনাকে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন অবিমিশ্রভাবেই, আবার কেউ কেউ দৈবশক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করেছেন। মধুসূদনের ট্রাজিক-বোধটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় দৈবশক্তির চক্রান্তকে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' গুরুগম্ভীর ট্রাজিকমিডি হলেও শর্মিষ্ঠা-যযাতির জীবনে শুক্রাচার্যের অভিশাপে যে ট্রাজিডি দেখা দিয়েছিল, তা দেবযানীর ক্ষোভ ও অভিমানের ফল হলেও একে দৈবশক্তিরই ক্রিয়া মনে করা চলে। পদ্মাবতীর ভাগ্যবিড়ম্বনার মূলেও দৈবের চক্রান্ত। 'কৃষ্ণকুমারী'তে কৃষ্ণার মৃত্যুদণ্ড বিধানের নির্দেশ যে-ভাবে এসেছে, তাও দৈব চক্রান্তেরই যেন প্ররোচনা। 'মায়াকানন' তো আদ্যন্ত দৈবশক্তির লীলাক্ষেত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকটির ট্রাজিডি গ্রীক ট্রাজিডির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইউরিপিডিসের 'Iphigenia at Aulis'-এর প্রভাব এর ওপর যথেষ্ট। নিয়তির নির্মম পরিহাসের লীলা দেখা যায় এখানে ভৈরবাচার্যের জীবনে। আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলিতে গ্রীক নাটকের Nemesis-এর কথা মনে না এলেও দৈবের অপ্রতিরোধ্য লীলার কথা আছে। শেষ পর্যন্ত বাঙলা পৌরাণিক নাটকের কিছু কিছু চরিত্রে ট্রাজিক-বোধটি নষ্ট হয়ে গেলেও যে পন্থায় তা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, তাতে দৈবের ভূমিকা গুরুতর। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের জনার জীবনে, ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণের কর্ণের জীবনে, আলমগীরের জীবনে এই ধরনের ট্রাজিডিই এসেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে সমাজনীতির বিরুদ্ধেই রাম-সীতার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব তাঁদের মানস জগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নাটকের শেষ দিকে রামসীতার মিলন যখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল তখন আবার পরীক্ষার প্রশ্নে উত্তীর্ণ হয়ে সীতা যখন পাতাল প্রবেশ করল, তখন রাম-সীতার এই চিরবিচ্ছেদের মূলে মনে হয় যেন নিয়তিরই গূঢ় ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে সুপ্রিয়ের মৃত্যু, 'বিসর্জনে' জয়সিংহের মৃত্যু, 'রাজা ও রানী'তে কুমারের মৃত্যু—এ সকলের পশ্চাতেও দৈবের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রেরই হাত আছে বলে বোধ হয়।

এলিজাবেথীয় যুগের ট্রাজিডি ঃ এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম পর্বে নাট্যকারদের মনে মধ্যযুগীয় নৈতিক চেতনা ও ষোড়শ শতকীয় রেনেশাঁস-উত্তর মানবিক চেতনা দুয়ের মিশ্র প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। এ সময়ে ট্রাজিডি সম্পর্কে ধারণাটিকে এই ভাবে সূত্রাকারে বলা যায়। ক. ট্রাজিডি কোনো মহৎ ব্যক্তির পতন। খ. হোরেস ও সেনেকার প্রভাবে ধারণা হল, নাটক হবে পাঁচ অঙ্কের। গ. নাটক লেখা হবে পদ্যে। ঘ নাটকে নীতি থাকবে—গ্রীক নাটকে এ উপাদানটির ওপর বরাবর গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তাছাড়া এলিজাবেথীয় যুগে রোমান্টিক নাট্যকাররা ক্লাসিক নাট্যকারদের পৃথক বলে ঘোষণা করলেন। ক্লাসিকের দল ঐক্যবিধির ওপর জোর দিয়েছিলেন, রোমান্টিক দল তা মানতে চাইলেন না। ক্লাসিকের দল ট্র্যাজিকমিডিকে 'সংকর সৃষ্টি' বলে নিন্দা করলেন; কিন্তু রোমান্টিক দল **Mystery Play**-র মধ্যে দুঃখ ও আনন্দের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত তুলে এর প্রশংসা করলেন। ক্লাসিক নাট্যকারগণ হোরেসকে অনুসরণ করে নাটকে শোভনতা ও অলংকারপূর্ণ উক্তি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রোমান্টিক গোষ্ঠী ঘটনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ট্রাজিডিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে চাইলেন। ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম সেনেকার নাটকের অনুবাদ হয় এবং এই বছর থেকেই সেখানে ক্লাসিক্যাল নাটকের সূত্রপাত। **Sackville** ও **Norton**-এর **Gorboduc** ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে অভিনীত হল। সেনেকার অনুসরণে অনেকখানি লেখা **Gorboduc** হল প্রথম-ইংরেজি ট্রাজিডি। দেশীয় পুরাণ-ইতিহাস থেকে এর বিষয়বস্তু গৃহীত; এতে ঐক্যবিধিও অনেকখানি উপেক্ষিত। ঠিক ক্লাসিক্যাল একে বলা যায় না। মধ্যযুগীয় আদর্শের নীতিও এতে আছে। এই আদর্শ সামনে রেখে এই যুগের প্রথম দিকে **Edward** 'Damon and Pithias' লেখেন, এবং **Preston** 'Jombises' লেখেন। এসব নাটকে **Morality**-র ঐতিহ্য অনেকখানি অক্ষুণ্ণ থাকলেও নূতন যুগের লক্ষণও অনুপস্থিত নয়। এই সঙ্গে এই সময়ে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে গম্ভীর রসাত্মক নাটক লেখাও চলতে থাকে। ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে নীতিকথা প্রচারিত হল; কিন্তু ঐক্যবিধি রক্ষা করা গেল না—এবং সব সময় ট্রাজিকধর্মী চরিত্রও হল না; ফলে ট্রাজিকমিডির রচনার পথই উন্মুক্ত হল। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেশপ্রীতির সুর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ফুটে উঠতে থাকল। এই সব নানা জাতের নাটকের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রকৃত ঐক্যমূলক জাতীয় নাটক লেখার একটা সংগ্রাম যেন নাট্যকারদের মধ্যে চলতে লাগল। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, জাতীয় নাটকের অভ্যুদয় ঘটবে দেশীয় ঐতিহ্য ও অপর ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের ফলে। দেশীয় উপাদান, বৈচিত্র্য ও আনন্দদান করবে, আর ক্লাসিক উপাদান ঐক্য ও আকৃতিগম সুষমা দান করবে।

লিলি ও গ্রীন রোমান্টিক নায়কদের নিয়ে এলেন নাটকের আঙিনায়। শেক্সপীয়র প্রথম জীবনে এদের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ সময় লণ্ডনের আকাশ-বাতাস নূতন নাটকের জন্যে উন্মুখ—পেশাদার নটের দিকে দৃষ্টি পড়ল সকলের। দর্শকরাও সর্বস্তরের মানুষ। রেনেশাঁসের ফলে সমস্ত মানুষের মনেই বিপুল উদ্দীপনা। নূতন মানবতার

প্রেরণা এনে দিয়েছে এই রেনেশাঁস। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের বদল হয়েছে। কাব্যিক ছন্দে নাটক শোনবার জন্য দর্শকদের অধীর প্রতীক্ষা।

মার্লো ঃ এই পটভূমিকায় এলেন ক্রিস্টোফার মার্লো। মাকিয়াভিলির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'Tambarlain', 'Dr Faustus' ও 'The Jews of Malta' উপহার দিলেন। নাটকগুলিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট এবং পরবর্তীকালে ঠিক এই পথে কেউ অগ্রসর হন নি। তাঁর নায়কেরা সব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখর থেকে দুঃখের গহ্বরে পতনের মধ্যযুগীয় আদর্শ এখন পরিবর্তিত হল—ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় হল। Tambarlain রাজা হলেও কৃষক থেকে নিজ যোগ্যতায় রাজা হয়েছেন। Barabus সাধারণ ঋণদাতা মাত্র। Faustus একজন সাধারণ ডাক্তার। তাছাড়া আরও একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করবার। নীতিকথার প্রশ্নটি মার্লো মানলেন না। এখানে সমস্ত কৌতূহল নায়কচরিত্রের ব্যক্তিত্বকে ঘিরেই। এই হিসেবে তৈমুরলঙ্গ শ্রেষ্ঠ চরিত্র। ফাউস্টাস অসীম শক্তিমান। মাল্টার জুও অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাঁর আরও দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ক. এমন Blank verse-এর সার্থক প্রয়োগ তাঁর পূর্বে আর কোনও নাট্যকার করতে পারেন নি। খ. তৈমুরলঙ্গ ও Barabas-এ অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকলেও ডঃ ফস্টাসের মধ্যে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি করেছেন। মার্লোর ত্রুটি যে নেই তা নয়। তাঁর Tambarlain ঠিক নাটক নয়। একটি মানুষের ভাগ্যের এক অর্ধমহাকাব্যিক রূপকে তুলে ধরার জন্যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র। মার্লোর নাট্যগঠনও শিথিল। নায়কের সেখানে একচ্ছত্র প্রাধান্য। অন্য চরিত্রগুলি অত্যন্ত ম্লান। তাছাড়া, নারীচরিত্র একেবারেই বিরল তাঁর নাটকে, যে কয়েকটি আছে তারাও ব্যক্তিত্ববর্জিত।

শেক্সপীয়র ঃ মার্লোর পরেই শেক্সপীয়র। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরকালের চিরনূতন নাট্যকার। তাঁর জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। শেক্সপীরীয় ট্রাজিডি বলতে প্রধানত 'ওথেলো' 'হ্যামলেট' ও 'কিং লীয়র' এই চারটে নাটকই বুঝি। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের ভাগ্যের ও বাইরের, পরিবেশের চাপে সৃষ্ট ট্রাজিডি। সেনেকা, মার্লো ও দেশীয় ইংরেজি নাটক থেকে উপাদান নিয়ে এগুলি লিখিত। প্রত্যেক ট্রাজিডির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করবার মতো। ওথেলো প্রধানত ষড়যন্ত্রমূলক। লীয়র নিষ্ক্রিয় চরিত্রের ট্রাজিডি। হ্যামলেট সকলের থেকে পৃথক এক বিশেষ ধরনের চরিত্র। আর একজন দুজন ব্যক্তিকে নায়ক করে লেখা ম্যাকবেথ। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে বাইরের ও ভিতরের ট্রাজিডি আছে। বাইরের ঘটনা কখনো ভিতরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত—কখনো তা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে—খুন, হত্যা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভিতরের ট্রাজিডি শান্ত ও গভীর। বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির অথবা চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুভূতির দ্বন্দ্বে তা অপরূপ। হ্যামলেটে প্রতিহিংসাবৃত্তি ও প্রেমের সঙ্গে নৈতিক দ্বিধার, ওথেলোতে অতিতীব্র আবেগময় প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার, লীয়রে অহমিকার সঙ্গে কোমলতর বৃত্তির, ম্যাকবেথে উচ্চাশার সঙ্গে বিবেকজাত অনুভূতির দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। শেক্সপীয়রের ট্রাজিডির আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে অধ্যাপক নিকল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ক. অলৌকিক শক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া।

খ. পরিবেশের সঙ্গে নায়কের একটা বিশেষ সম্পর্ক।

হ্যামলেট ও ম্যাকবেথে অলৌকিক উপাদান জটিল আকারে উপস্থাপিত এবং তা খুবই শিথিলভাবে আছে ওথেলোতে। শেক্সপীয়রের নায়কেরা এমন একটি পরিবেশের মধ্যে দণ্ডায়মান যে একাকী ভাগ্যের সঙ্গে তারা সংগ্রাম করতে পারছে না। ধার্মিক ও প্রেমিক হ্যামলেট জগৎটাকে ঠিক নিজের মতো করে নিতে ব্যর্থ হল। বুদ্ধিহীন আবেগপ্রবণ ওথেলো সুচতুর ও শঠ ইয়াগোকে বুঝতে পারল না। আত্মাভিমানী গর্বিত ও অদূরদর্শী লীয়র স্বার্থপর ও দুষ্ট কন্যাদের চাটুকারিতায় তাঁর প্রতি যথার্থ ভক্তিমতী কর্ডেলিয়াকে ভুল বুঝল। অতিরিক্ত উচ্চাশাপরায়ণ আবেগপ্রবণ দুর্বল ম্যাকবেথ স্ত্রীর দ্বারা ও ডাইনীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সর্বনাশ ডেকে আনল। ওথেলোকে ইয়াগোর পাশে, লীয়রকে দুই বিপরীতধর্মী কন্যাদের মাঝখানে ও ম্যাকবেথকে ডাইনী ও স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। সকল নায়ক চরিত্রই এমন এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে তারা পারে নি।

বীরত্বমূলক (Heroic) ট্রাজিডি :

রেস্টোরেশন যুগে জন ড্রাইডেন এই শ্রেণীর ট্রাজিডির সূচনা করলেন। শেক্সপীয়ারের ট্রাজিডির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলির অতিরঞ্জিত রূপ হিরোয়িক ট্রাজিডিতে বা বীরত্বমূলক ট্রাজিডিতে ফুটে উঠল। শুধুমাত্র নায়কের সঙ্গে তার পরিপার্শ্বের মারাত্মক সম্পর্কটি এতে রইল না। এখানেও ভিতর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব থাকল। ভিতরের দ্বন্দ্বটি হল সাধারণত প্রেমের সঙ্গে বুদ্ধির বা কর্তব্যের—এখানেও অতিপ্রাকৃত উপাদান বর্জিত হল না। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হয়। মার্লোর নাটকে যে মহনীয়তার ধারণা তা এখানেও থাকে। কিন্তু নায়ক চরিত্রের গুণগুলিকে মহনীয় করে তোলার জন্যে যে ধরনের মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার, তা নাট্যকারদের অনেকেরই ছিল না। তাঁরা এমন নায়ক সৃষ্টি করতেন যার অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তি কখনো কখনো হাস্যকর হত। নায়কচরিত্রের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাও মোটেই আশ্বস্ত করে না। তাঁরা মনে করতেন যে, মহান নায়ক প্রেমের জন্যে সর্বত্যাগী। তার দৃশ্য দেখে দর্শক বিস্মিত হবে ও প্রশংসা করবে। কিন্তু এটা ভুল।

নিকল বলেন, 'The conflict of love and honour was its staple theme'[১]. The Royal Martyr (1669), The Conquest of Granada by Spaniards, (1670), Aureng-Zebe (1675) প্রভৃতি তাঁর এ শ্রেণীর প্রসিদ্ধ নাটক। কিন্তু এই ধরনের নাটক জনপ্রিয় হয় নি। এর ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ড্রাইডেন অন্য ধরনের নাটক পরে লিখেছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন

১. *World Drama :* A Nicoll. p. 338

লাভের ফলে সেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। এই যুগের নামই রেস্টোরেশন যুগ এবং এ যুগের ফসলই 'হিরোইক' নাটক।[১]

ভয়ঙ্কর ট্রাজিডি (Horror Tragedy)

ওয়েবস্টার ও ফোর্ডের প্রচেষ্টায় 'ভয়ঙ্কর ট্রাজিডি' নামে একটি নূতন শ্রেণী বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় হরর ট্রাজিডির সঙ্গে কমেডি অব ইন্‌ট্রিগ্‌ বা ষড়যন্ত্রমূলক কমেডির মিল আছে। কারণ এই উভয়ক্ষেত্রেই দর্শকদের কাছে চরিত্রের মাধ্যমে আবেদন সৃষ্টি করা হয় না—হয় ঘটনার সাহায্যে।

অধ্যাপক নিকল এই ট্রাজিডির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক. রঙ্গমঞ্চে চরিত্রের মাধ্যমে নয়, ঘটনার মাধ্যমেই এতে আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা হয়। খ. এতে ভয়-ভাবের উপাদান বেশী থাকে। গ. এতে বাহ্য উপাদানগুলির ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং মঞ্চে উত্তেজনা সৃষ্টি করার দিকেও জোর দেওয়া হয়। ঘ. এ নাটকে কতকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, তবে তা মুখ্য হবে না। বৃত্তের ক্রমবিকাশের দিকেই দর্শকের এখানে দৃষ্টি থাকে। ঙ. এ শ্রেণীর নাটকে নায়ক চরিত্রের প্রতি ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ বিরলক্ষেত্রেই জাগ্রত হয় তার প্রত্যক্ষ সংলাপ থেকে। জন ওয়েবস্টারের 'The Dutchess of Mulfi,' জন ফোর্ডের 'The Broken Heart', (1629) সাইরিল টার্নিয়ারের 'The Atheist's Tragedy'—প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এই ধরনের ট্রাজিডি। অধ্যাপক নিকল এ জাতের ট্রাজিডিকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী বলতে চান না।

পারিবারিক ট্রাজিডি (Domestic Tragedy)

অন্য সব রকম ট্রাজিডির চেয়ে এই শ্রেণীর ট্রাজিডির একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। কোনো একটি উপাদানের ওপর যে এ নাটক গুরুত্ব দেয়, তা নয়—আসলে এর বিষয়বস্তু ও রসের জন্যই এর স্বাতন্ত্র্য। এ নাটক বিকাশের দিক থেকে প্রধানত দুটি দিকে যাত্রা করতে পারে। প্রথমত যথার্থ ট্রাজিডির রূপেই এর বিকাশ হতে পারে। অথবা সেন্টিমেন্টাল নাটকে এ নেমে যেতে পারে। অধ্যাপক নিকল এ ট্রাজিডিকে উচ্চমূল্য দিতে চান না। ট্রাজিডিতে নায়কের যে আভিজাত্য, যে সমুন্নত মহিমা থাকে বলে তিনি মনে করেন, গার্হস্থ্য বা পারিবারিক নাটকে তা থাকে না—সেইজন্য তিনি একে উচ্চশ্রেণীর ট্রাজিডি মনে করেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ ট্রাজিডি প্রচুর লেখা হয়েছে এবং জনগণের সমর্থনও লাভ করেছে।

১. ড্রাইডেন তাঁর An Essay of Heroique Plays (1672) নামক প্রবন্ধে এই শ্রেণীর নাটকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছিলেন, যে এ ধরনের নাটক লেখার প্রথম প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন Sir William D' Avenant-এর কাছ থেকে। তিনি বলেন, "An heroic play ought to be an imitation, in little of an heroic poem and consequently that love and valour ought to be the subject of it".

১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে যখন 'Arden of Feversham' নাটকটি বের হল তখন দর্শক দেখল যে, এতে কোনো রাজ্যের পতন-কাহিনীর পরিবর্তে আছে একটি নারী আলস কর্তৃক তার স্বামী মিঃ আর্ডেনকে হত্যা করার কাহিনী। পারিবারিক ঘটনাকে ট্রাজিডির বিষয় করে নাটক লেখার এই হাওয়া স্পেনেও প্রবাহিত হল। একজন অজ্ঞাত নাট্যকার কর্তৃক রচিত উক্ত নাটকটি ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম পারিবারিক ট্রাজিডি। টমাস ডেক্কার ও টমাস-হে উডও এ শ্রেণীর নাটক লিখেছিলেন। টমাস হে উডের 'A woman killed with Kindness' (1603), ও 'The English Traveller' (1627) প্রসিদ্ধ পারিবারিক ট্রাজিডি। হে উডের প্রথম নাটকটিতে দাম্পত্যজীবনে সুখী এক সঙ্গতিপন্ন দম্পতির কাহিনী আছে। স্বামী ফ্র্যাঙ্কফোর্ডের বাড়ীতে তার বন্ধু গ্রেনডল প্রায়ই আসত—ফলে সে বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়; প্রথমদিকে ফ্র্যাঙ্কফোর্ড বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু পরে তার মনে সন্দেহ প্রবলতর হল যেদিন দুজনকে মিলিত অবস্থায় দেখল। কিন্তু স্বামী তাদের হত্যা করল না, বরং স্ত্রীর অপরাধকে সে নির্বুদ্ধিতা বলেই ভাবল। শাস্তি অবশ্য দিল, একটি প্রতিবাসীর বাড়ীতে স্ত্রীকে সে রাখল এবং কোনদিনই তার মুখদর্শন করবে না প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু স্ত্রী গুরুতরভাবে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামী তাকে দেখতে এল, পুরানো নাম ধরে ডাকল এবং তাকে বেদনাদায়ক বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বলল,—

"Both those last names I do restore Thee back,
And with this kiss I wed thee once again."

টমাস ডেকারও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে অবলম্বন করে ও কবিত্ব-সৌরভে পূর্ণ করে এই জাতের নাটক লিখেছিলেন। তাঁর Old Fortunatus (1599) The Shoemaker's Holiday' উল্লেখযোগ্য নাটক।

যাই হোক, দেখা গেল, এলিজাবেথান যুগেই 'Arden of Faversham' ও 'A woman killed with kindness' দিয়েই পারিবারিক ট্রাজিডি লেখার সূচনা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে Aaron Hill-এর 'The Fatal Extravagance' (1721) এ মধ্যবিত্ত ইংরেজ চরিত্রের ট্রাজিডি দেখানো হয়েছিল। এরপরই আসেন জর্জ লিলো। তাঁর 'The London Merchant' or 'The History of George Burnwell' (1731) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

নিকলবর্ণিত ট্রাজিডির প্রধান প্রধান শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া হল। এখন ট্রাজিডির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে যে নিউক্লাসিক্যাল ট্রাজিডি ও আধুনিক ট্রাজিডির কথা বলা হয়, সে সম্পর্কে দু' চার কথা বলা আবশ্যক।

নিউ ক্লাসিক্যাল ট্রাজিডি বা নব্য ক্লাসিক্যাল ট্রাজিডি :

রেস্টোরেশন যুগে ও অষ্টাদশ শতকে ফরাসী ক্লাসিক্যাল ট্রাজিডিগুলিকে আদর্শ নাটক হিসেবে গণ্য করা হত। অবশ্য ইংরেজী ভাষাভাষী জনগণের কাছে ফরাসী

ক্লাসিক্যাল নাটক খুব পরিচিত ছিল না। ভ্রাইডেন তো এ নাটকের নিন্দাই করেছিলেন। রোমান্টিক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কর্নেই ও রাসিন সম্পর্কে ধারণাও খুব উচ্চ ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফরাসীদের চোখে কর্নেই ও রাসিন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কর্নেই-এর নাটকে এককালে বাস্তবতা ও মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধির জন্যে প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি মনে করতেন, ট্রাজিডিতে বীরত্বপূর্ণ কামনার জয় ও সংকল্পের দৃঢ়তা থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় তার লক্ষ্য হয়। (admiration). 'Horace', 'Cinna' ও 'Polyeucte'ই তাঁর প্রসিদ্ধ ট্রাজিডি। তবে তাঁর ট্রাজিডি ভাবনায় রহস্য-বোধ ও চিন্তার গভীরতা নেই। তাই তাঁর সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন—"He Produced a series of melodramatic failures."[১] Horace (1640) নাটক তিনি আনুগত্যের সংঘাত দেখিয়েছেন। রোমে যুদ্ধ চলছে এবং এই পরিস্থিতিতেই দেশপ্রেমিক স্থিতধী হোরেসকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। হোরেসের স্ত্রী সেবিন শত্রুর দেশের মেয়ে; হোরেসের ভগ্নী ক্যামিল শত্রুপক্ষীয় এক সৈন্যের প্রতি আসক্ত। কোনো চরিত্রের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। হোরেসের ভগ্নী যখন নিজ দেশকে অভিসম্পাত দিল তখন হোরেস তাকে হত্যা করলেন। তাঁর ধারণা এই হত্যায় তিনি বিন্দুমাত্র অন্যায় করেন নি। সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে একটা গরিমা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তথাপি এর "very boldness is too strong for the temper of the age"[২] এর অন্তর্দ্বন্দ্বহীনতা দুর্বলতারই সূচক।

কর্নেই-এর 'Pompee" (1642), 'Heraclius' (1646), 'Sertorius' (1662) প্রভৃতিও একই ধরনের ট্রাজিডি। কর্নেই-এর ট্রাজিডিকে 'ট্রাজিডি অব সেন্টিমেন্ট' বলা হয়।

রাসিন যুগের প্রবণতাকে অনেকখানি ধরতে পেরেছিলেন। চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে ফরাসী ক্লাসিক্যাল নাটক-রচনায় রাসিন (1639—1699) ছিলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর "কাব্যিক ভাষার সৌন্দর্য, চরিত্রের মুখে যুগোচিত ভাষা, এপিগ্রাম প্রয়োগের নৈপুণ্য, চরিত্র-প্রকাশক পদ্য-ভাষা তাঁকে সমকালীন ফ্রান্সে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি যুগের প্রবণতা বুঝে প্রেমকেই ট্রাজিডির মূল উপজীব্য করেছিলেন—কর্নেই-এর ট্রাজিডিতে প্রেম মুখ্য স্থান পায় নি। যুগের ক্লাসিক্যাল প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে একটি বিশেষ রূপকল্পের সৃষ্টি রাসিনের সবচেয়ে বড় কাজ। যুক্তি বা কর্তব্যের ওপরে আবেগের জয় তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। সমাজবদ্ধ মানুষকে ঘিরে রাসিনের নাট্যচিন্তা মূলত সীমাবদ্ধ। আবেগ-বিশেষজ্ঞ রাসিনের প্রেম ও ঈর্ষা নিয়েই কারবার। নারীর দিকে তাঁর দৃষ্টি সমধিক—কর্নেই-এর ছিল পুরুষ-পক্ষপাত আর রাসিনের নারী তথা-নায়িকা-পক্ষপাত। অবশ্য দুজনেরই কোমল হৃদয়। 'Racine's spirit is essentially feminine, তাঁর 'Andromache' (1667), 'Britannicus

১. *The Spirit of Tragedy :* H. J. Muller.

২. *World Drama :* A Nicoll p.p. 305

(1669), 'Bajazet' (1672), 'Iphige'nie' (1674), 'Phe'dre' (1677) প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ ট্রাজিডি।[১] এগুলিতে সাধারণ ক্লাসিক্যাল গঠনরীতির অনুসরণ, যেমন, অবান্তর বিষয়-বর্জন, ঐক্যবিধি রক্ষা, অভিনেতাদের মঞ্চে গতিবিধির সংযম—প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাবে। তবুও ক্লাসিক্যাল বিষয়বস্তুকে যুগোচিত রূপ তিনি দিয়েছেন, একথা ভুললে চলবে না। তাঁর অ্যাণ্ড্রোমেকিতে মূলত চারটি প্রধান চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অরিষ্টি হারমিয়োনের প্রতি অনুরক্ত; হারমিয়োন আবার পায়রহুস (Pyrrhus)-এর প্রতি আসক্ত, পায়রহুস অ্যাণ্ড্রোমেকির প্রতি, অ্যাণ্ড্রোমেকি তাঁর মৃত স্বামী হেক্টরের প্রতি অনুরাগিণী। নামগুলিই শুধু তাদের গ্রীক; কিন্তু সাধারণ নরনারীর জীবন-চিত্র তাদের মধ্যে আদর্শায়িত। এই চারজনের প্রণয়-কাহিনী নাটকের পাঁচটি অঙ্কে আরোহ-অবরোহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মৃত পূর্বস্বামীর প্রতি গভীর আকর্ষণ ও জীবিত পুত্রের প্রতি ভালবাসা এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে অ্যাণ্ড্রোমেকির চরিত্র সজীব। হারমিয়োন-প্রেম ও ঘৃণা এই দুই বৃত্তির পার্থক্য করতে পারে নি—সে অরিষ্টিকে ভালবাসবে, না ঘৃণা করবে তার দ্বন্দ্বে জর্জরিতা। অরিষ্টি হারমিয়োনকে ভালবাসলেও জানে দৈব-প্রতিকূলতার সর্বনাশ আসন্ন; এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সে পীড়িত। এখানে বীর্যের জগৎ কোথায়? অ্যাণ্ড্রোমেকি আমাদের প্রশংসা অর্জন করে কিন্তু চরিত্রগুলি নিজেদের স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন—নিজেদের বেদনায় কাতর। আদিম জৈব আবেগের ধ্বংসাত্মক রূপটিকে এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে ইতালীতে নব্য ক্লাসিক্যাল শ্রেণীর নাটক লিখে আলফিয়েরি খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অত্যন্ত তীব্র ভাবাবেগকে সংযত ও সরলভাবে ট্রাজিডিতে প্রকাশ করা উচিত। গ্রীক পুরাণকথা থেকেই কাহিনী গ্রহণ করতে হবে—কারণ এতে সুযোগ ঘটে "artistic truth with moral truth, beauty with morality"র মিশ্রণের।[২] 'Cleopatra' (1775), 'Antigone' (1783), 'Oriste' (1776) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ট্রাজিডি। ক্লাসিক্যাল নাটকের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দীপনার অনুপ্রবেশও তাঁর নাটকে লক্ষণীয়।

আধুনিক ট্রাজিডি: এর পরই আধুনিক যুগের ট্রাজিডির কথা। এ যুগে বিশ্বরহস্যের অনেক কিছুই উদ্‌ঘাটিত হল। মানুষের চিরাগত মূল্যবোধ পরিবর্তিত হল। বিজ্ঞানের ও দর্শনের ক্রমোন্নতি মানুষের অনেক অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করল। বিশ্ব-সৃষ্টিতে মানুষ সর্বোত্তম এবং সমস্ত সৃষ্টির লক্ষ্য মানুষ—দীর্ঘকালের এই বিশ্বাসের ওপর বিজ্ঞান আঘাত হানল—একটি মাত্র অকিঞ্চিৎকর গ্রহের মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার মূল্যহীনতা চোখে পড়ল। প্রেমকে সে এখন মনে করছে যৌনচেতনারই একটু ঊর্ধ্বায়ন অথবা প্রজাতিরক্ষার একটা জৈব প্রেরণা মাত্র! কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতির আরও

১. *World Drama*: A Nicoll p.p. 309
২. *Ibid* ঐ p.p. 365

একটা দিক আছে। নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্ক্রিয়ায় মানুষের মহিমা ও গৌরবও প্রকাশ পেল। ফ্রয়েড-কথিত যে নির্জ্ঞান মনের স্তরের ওপর মানুষের কোনও হাত নেই, তা নতুনভাবেই মানুষের ট্র্যাজিক-দৃষ্টিকে জাগ্রত করল। নির্জ্ঞান মনের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের মহিমা তো ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা নয়। জোসেফ উড্ক্রাচ 'The Tragic Fallacy'-তে আধুনিক কালের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরে বললেন যে বর্তমান যুগে ট্রাজিডি রচিত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আধুনিক জ্ঞান ট্রাজিক বিশ্বাসকে নষ্ট করেছে। এ বিশ্ব প্রাণহীন জড়। মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে এর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। 'Man is a creature of reflexes and complexes'.—তার কোনো মহত্ত্বও নেই। বংশধারা ও পরিবেশই তার স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভগবান ও মানুষের মাহাত্ম্য আজ অবলুপ্ত। এই বাস্তব সত্যকে মনে রেখে বলতে হয় যে বর্তমানে ট্রাজিডির ক্ষেত্র সীমিত হয়েছে। তাই এখনকার ট্রাজিডিতে প্রধান চরিত্র সাধারণ বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তি। সাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা কোনো নাট্যকার বলছেন—কেউ বা অস্বাভাবিক স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির কথাও বলছেন। যে সব চরিত্র ঠিক অপ্রকৃতিস্থ নয়, তারাও অবচেতনসত্তার দাস। এদের কথা যতখানি করুণা জাগ্রত করে, ততখানি কিন্তু ভয় নয়। আধুনিক কালের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, সে মুক্ত নয়। সে সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ; অর্থনৈতিক প্রয়োজনের, শ্রেণীসচেতনতার, অজ্ঞাত কামনা বা অযৌক্তিক প্রবৃত্তির হাতের পুতুল সে। তাই এখনকার ট্রাজিডির নায়ক 'গিনিপিগ্'-এর মতো সমাজবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের একটা প্রদর্শনী-বিগ্রহ। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে গ্রীক ট্রাজিডি বা এলেজাবেথান ট্রাজিডি বা নব্য ক্লাসিক্যাল ট্রাজিডি থেকে আধুনিক ট্রাজিডি সম্পূর্ণ পৃথক। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার ফলে যে সব পরিবর্তন এসেছে আধুনিক নাট্যকারগণ তা উপেক্ষা করতে পারেন না। প্রাচীনকালে এখন আর ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু অল্প হলেও একালেও ট্রাজিডি লেখা হচ্ছে।

ইবসেন : আধুনিক কালের ভাবধারাকে যাঁরা নাটকে রূপ দিলেন, তাঁদের মধ্যে ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, হাউপ্টম্যান, চেকভ, ইলিয়ট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবসেনের মধ্যেই 'বুর্জোয়া ট্রাজিডি' পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। জার্মানে হেব্বেল নাট্যতত্ত্ব ও নাটক রচনার দ্বারা ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন—তাতে অগ্নিসংযোগ করে দিলেন নরওয়েবাসী ইবসেন। 'Ghosts' নাটকই নূতন যুগের, আধুনিক যুগের পত্তন করল। Brandes বলেছিলেন, 'The play made Ibsen the most modern of the moderns'. ইবসেনের 'Pillars of Society' (1877), 'A Doll's House' (1879), 'Ghosts' (1881). 'The Wild Duck' (1884), 'Rosmersholm' (1886) 'Hedda Gabler' (1890) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। এগুলির মধ্যে যে নাটকটির জন্যে তিনি 'আধুনিকোত্তম' আখ্যা পান, সেই 'Ghosts'এর কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। গ্রীক ট্রাজিডির ধাঁচে এটি লিখিত। গ্রীক নাটকে কোনো একটি অভিশাপ একটি পরিবারে দুই তিন পুরুষ ব্যাপী বহমান থাকত; এখানেও ইবসেন উত্তরাধিকার সূত্রে

লক্ষ অর্থাৎ বংশগত মারাত্মক একটি ব্যাধিকে সেইভাবে গ্রহণ করেছেন। এর নায়ক Oswald একজন সাধারণ যুবক—যুবকটির পিতা স্থানীয় সমাজের একজন ভদ্রস্বরূপ—তাঁর 'সিফিলিস' ব্যাধিটি পুত্রের মধ্যে সংক্রামিত হয়। পিতার অন্য নারীর সঙ্গেও যোগ ছিল। মাতা রক্ষণশীলা। স্বামীর প্রতিপত্তি ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে মুখ বুজে তাঁর গৃহেই দিন কাটাচ্ছেন। নাটক যখন শুরু হল, তখন Oswald-এর পিতা মারা গেছেন। এতদিন এই পরিবারে Oswald-এর মাতা Mrs Alving কৃত্রিম জীবন যাপন করেছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা হল স্বাধীনভাবে আনন্দের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করবেন—পুত্রটিকে তিনি তাঁর স্বামীর ঔরসজাত হলেও মনে করতেন একান্তভাবে তাঁরই। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল, 'সিফিলিস' রোগ তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি দেখতে পেলেন স্বভাবে ও চালচলনে পুত্র পিতার আদর্শই অনুসরণ করছে। অসুখের যন্ত্রণা পুত্র সইতে পারছে না। তাকে বিষ দিয়ে অর্থাৎ আফিঙ্ ইনজেকসন দিয়ে মেরে ফেলা হবে কিনা এই চিন্তা তাঁর মনে উদিত হল। পুত্র যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য বিষই গ্রহণ করতে চাইল। দ্বিতীয়বারে এই রোগের আক্রমণে পুত্রের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটলে, তার বাক্য বন্ধ হয়ে এল। মুমূর্ষু সন্তানের দিকে চেয়ে মাতা শুধু 'হা-পুত্র হা-পুত্র' করতে থাকলেন। মা এখন কি করবেন—পুত্রকে যন্ত্রণা-জর্জরিত হতে দেবেন, না বিষ দেবেন—এই প্রশ্নের উত্তর ইবসেন দেন নি। উইলিয়ম আর্চারের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং নাট্যকার ইবসেন বলেছিলেন—'I do not know. Each one must find that out for himself. I should never dream of deciding so delicate a question. But what is your opinion ?'[১]

স্ট্রিণ্ডবার্গ ও হাউপ্টম্যান : স্ট্রিণ্ডবার্গ ও হাউপ্টম্যানের মধ্যে দেখা গেল অতিবাস্তবধর্মী ট্রাজিডি রচনার প্রবণতা। ন্যাচারালিষ্টিক ট্রাজিডি দুজনের ঠিক এক ধরনের নয়। তবু দুজনে একই পথের পথিক। চরিত্রের অজ্ঞাত অবচেতন মনের প্রবণতার দিকে স্ট্রিণ্ডবার্গ গুরুত্ব দিলেন। 'মিস জুলিয়াতে' তিনি দেখালেন স্নায়বিক রোগগ্রস্তা একটি মেয়ের ট্রাজিডি। হাউপ্টম্যানের 'উইভার্স' নাটকের নায়ক একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি। এখানে যে ট্রাজিডি তার জন্য নিয়তি বা চরিত্রের কোনো দুর্বলতা দায়ী নয়, দায়ী হল হস্তচালিত তাঁতের, যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতা।

চেকভ : চেকভ নাটকের ক্ষেত্রে নিজস্বতা নিয়ে এলেন। চেকভের পরিণত ট্রাজিডিগুলির নায়ক সব সময় একটি গোষ্ঠী বা দল—ঐক্যবদ্ধ দল। জীবনের হতাশা, অবক্ষয় বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার চিত্র তিনি ট্রাজিডিগুলিতে দেখিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলির উচ্চাশা বা কামনার মধ্য দিয়ে তিনি বৃহত্তর কোনো কিছুর ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই সমৃদ্ধতর জীবন কামনা করে একটি মহত্তর জগতে। সকলেই প্রায় রাশিয়া যেতে চায়। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও তিনি দার্শনিক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন। যে মহৎ আত্মার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার, তাঁর নাটকের আত্মাও

১. *World Drama* : A Nicoll pp. 537.

সেইটি। প্রকৃতি মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, একথা বললেও মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তিনি মনে করতেন, আশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ দুইই মানুষের ক্ষতি করে। তিনি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবধর্মী (Realistic tragedy) ট্রাজিডি লেখক। ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তাপীড়িত হয়ে ওঠা, ক্রমশ হতাশ হয়ে ওঠা, শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্য —প্রভৃতির কথা বলতে তিনি খুব উৎসাহী। তাঁর Uncle Vanya বলেছিল, 'What shall I do with my life and love ?'—কিন্তু কোনো সন্তোষজনক উত্তর সে পায় নি। 'Three Sisters' নাটকটিতে তাঁর বিশেষত্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিন বোন একটি প্রদেশের বৈচিত্র্যহীন স্থানে গতানুগতিক জীবন যাপন করে। তাদের ভাই একটা গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে—ভাই এর বন্ধুরা সব আসে, গল্পগুজব করে চলে যায়—কয়েক বছর ধরে এই গতানুগতিক ধারা চলে। কিন্তু ঐ তিন বোনের মনে কোনও শান্তি নেই। তারা মস্কো যেতে চায়।—বারবার তাদের সেই মস্কো যাবার কামনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়—কিন্তু তারা ভাল করেই জানে যাওয়া তাদের হবে না। নাটকের শেষ অঙ্কে মঞ্চের বাইরে এক বোনের প্রণয়ী, একজনের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই এ নিহত হয়। —কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। একটি বোন যে ঐ প্রণয়ীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার কারণ সে তার মনের মানুষ নয়—সে 'nice man' বলে। কোথাও নাটকটির ট্রাজিক পরিণতিও নেই। নাটকের সূচনায় তিন বোনের মধ্যে যে হতাশা দেখা দিয়েছিল, নাটকের শেষে সে সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছিল মাত্র।

টি. এস. এলিয়ট কাব্যনাট্যের প্রধান উৎসাহী সমর্থক ও রচয়িতা। কিন্তু তিনি ট্রাজিডিও রচনা করেছেন। গ্রীক ট্রাজিডির মধ্যে নিহিত পৌরাণিক ও ধর্মীয় প্যাটার্নের সঙ্গে আধুনিকতার লক্ষণ যুক্ত করে এলিয়ট লিখেছেন কাব্যনাট্য-ট্রাজিডি। ট্রাজিডির ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে কবিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে ট্রাজিডির মূল্য তাৎপর্য লাভ করেছে। ভাষার সব রকম ঐশ্বর্য কবিত্বের মধ্য দিয়ে দেখানো সম্ভব হয়। তাঁর 'Murder in the Cathedral (1935) গ্রীক ধর্মীয় প্রতিবেশে লেখা হলেও আধুনিক লক্ষণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। গ্রীক, খ্রীস্টান ও আধুনিক উপাদান সহযোগে লেখা হয়েছে 'Family Reunion.' পাপ ও পাপযন্ত্রণা-ভোগের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধানই এ নাটকের মূল কথা। আবার নায়ক Harry-র আচরণ আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে দেখানো হয়েছে।

সার্ত্রে : Existentialist tragedy-র রূপ আমরা দেখতে পেলাম সার্ত্রের (Sartre)-এর মধ্যে। এই মতবাদে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অর্থহীন বিশ্বে সব থেকে অযৌক্তিক কথা হল মানুষ তার নিজ জীবনকে অর্থবান করবে। ভগবান বা প্রকৃতি কারুর দ্বারাই মানবিক মূল্য সমর্থিত হয় না। ব্যক্তি হল মুক্ত ও নিঃসঙ্গ। মানুষ যা করতে চলেছে, তার পূর্ণ দায়িত্ব একান্তভাবে তারই। মানুষ পরিবেশের দাস নয়। পরিবেশ তার ইচ্ছা বা কামনার পথে অন্তরায় হলেও সে পরিবেশকে দোষ দিতে পারে না—কারণ সে তার নিজের পছন্দমতো পথেই চলবে। ব্যক্তির এখানে স্বাধীনতা আছে, তবে তা 'dreadful freedom'. একজিস্টেনসিয়ালিস্টদের বা অস্তিবাদী-দের এই হল

মতবাদ। প্রকৃতপক্ষে সার্ত্রের নাটক এই মতবাদের আলোকেই লিখিত; এবং তা বাস্তবধর্মীও। রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর কতকগুলি নাটক খাঁটি বাস্তবধর্মী। আর কতকগুলিতে উৎকল্পনার (**Fantasy**) প্রাধান্য থাকলেও তারা রোমান্টিক নয়। সার্ত্রে বলেছেন, মানুষ সম্পর্কে সমগ্র সত্যকেই তিনি উপস্থাপিত করতে চলেছেন থিয়েটারে। তাঁর 'No Exit' 'The Flies' ও 'The Victors' প্রসিদ্ধ নাটক। এই তিনটি নাটকের মধ্যে 'The Flies'-এ অরিষ্টিস কাহিনী একজিসটেনসিয়ালিজমের আলোকে উপস্থাপিত। জিউস Flies ও Death-এর দেবতা। ইলেক্ট্রা ছাড়া আর সকলকেই তিনি দাস করে রেখেছেন। তিনি কাউকেই ভালবাসেন না। মানুষকে নশ্বর করে তিনি প্রথম পাপ করেছেন। মানুষ যে মুক্ত এই তিক্ত জ্ঞান তাঁর একটা গোপন ব্যথা। এই জ্ঞানের পথেই অরিষ্টিসের জয়যাত্রা। সে ভগবান বা অন্য কারো কথা শুনবে না—সে জানে ' **There is another path, my path**'. এইগিসথাস ও তার নিজ মাতাকে সে যখন বধ করে, তখন সে কাজ একান্তভাবে তার নিজেরই। মায়ের অভিসম্পাতের ফলে তার নিজ জীবনেও শোচনীয়তা আসে। যে নগরবাসীকে অরিষ্টিস মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিল, তারা তার রক্ত নিতে উদগ্রীব হল। ইলেক্ট্রা প্রথমত মাতৃ-হত্যায় খুশী হলেও পরে মাতৃহন্তা ভ্রাতা অরিষ্টিসের প্রতি ঘৃণায় বিরূপ হল। অরিষ্টিস এখন একান্তভাবেই একা। জিউস তাকে অনুতাপের আগুনে পোড়াতে থাকেন, বলেন 'বিশ্ব তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছে।' কিন্তু অরিষ্টিস অনুতপ্ত বা প্রত্যাখ্যাত হয় না। সে আবার বলে মানুষ তার নিজের পথ নিজেই দেখতে পাবে—যেহেতু ভগবান ও প্রকৃতি তার প্রতি বিরূপ—'**Human life begins on the far side of despair**'. নাটকটি যখন শেষ হচ্ছে, তখন দেখা গেল অরিষ্টিস একটি নূতন আলোর সন্ধান পেয়েছে—একটি নূতন জীবন—যেখানে "**The Furies shrieking and flinging themselves on him**" এ নাটকে '**a terror of Pity**'-ই জাগ্রত হয়।

'**No Exit**'-এ দুটি নারী ও একটি পুরুষ বিভিন্ন স্থান থেকে এসে হাজির হয়েছে একটি গুহায়। বুঝেছে তাদের অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কারণ পরে তারা জেনেছে ঐ গুহাটি নরক। মানুষটির ছিল পাপবোধ। তার থেকে মুক্তির চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে—একটি নারীকে অধিগত করার কামনাও ব্যর্থ হয়েছে। লোকটিকে এই প্রশ্ন চিরকাল বিব্রত করবে, সত্য সত্যই সে ভীরু কিনা। নাটকের শেষে সে আবিষ্কার করেছে যে তাদের তিনজনকেই থাকতে হবে—'**round and round in a vicious circle**'.

ও'নীল : আমেরিকার ও'নীল ও (Neill) বাস্তবধর্মী ট্রাজিডি লিখেছেন। তাঁর The '**Iceman Cometh**' তেমন সফল নয়। কিন্তু ত্রয়ী নাটক '**Mourning becomes Electra**'তে তিনি গ্রীক কিংবদন্তীকে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত করে চমৎকার রূপ দিয়েছেন।

বাঙলা ট্রাজিডি :

নিকল ট্রাজিডির যে শ্রেণী-বিভাগ করেছেন, আমাদের বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সেই আদর্শে শ্রেণীবিভাগ সমীচীন হবে না। তাই বাঙলা ট্রাজিডিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিন্যাস করা উচিত।

ক. ঐতিহাসিক ট্রাজিডি, খ. সামাজিক বা পারিবারিক ট্রাজিডি, গ. পৌরাণিক ট্রাজিডি, ঘ. সমস্যামূলক আধুনিক ট্রাজিডি।

পাশ্চাত্য ট্রাজিডি নাটকের সঙ্গে তুলনায় আমাদের বাঙলা ট্রাজিডির বিবর্তন-ইতিহাস যে অত্যন্ত অনুজ্জ্বল একথা স্বীকার করতেই হবে। এ বিষয়ে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। "যে জাতি আত্মকর্তৃত্বকে দৈবশক্তির অধীন করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত, যাহাদের মুখে মানুষ 'যন্ত্রারূঢ় হি মায়য়া' এই মন্ত্র অনুক্ষণ ধ্বনিত হয়, তাহাদের দেশে পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্বসর্বস্ব, দুই বিরোধী ইচ্ছাশক্তির প্রবল দ্বন্দ্বে আলোড়িত, মনোবিকারের সহিত দৈবের ক্রূরতার সহযোগিতায় প্রহেলিকাময়, ট্রাজিডির উদ্ভব স্বাভাবিক নহে।"[১]

এই ত্রুটির কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, বাঙালী নাট্যকারগণ নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করতে গিয়ে ট্রাজিডি নাটকও বেশ কিছু লিখেছেন। পাশ্চাত্যের ট্রাজিডি আদর্শে সেগুলি বিচার করলে নানা দোষ-ত্রুটি হয়তো লক্ষ্যও করা যাবে। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও তার স্বভাবধর্মের কথা স্মরণে রেখে যদি পাশ্চাত্য ট্রাজিডি-বিচারের কঠোর আদর্শকে কতকটা শিথিলভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে আমাদের নাট্যকারদের ওপর সুবিচার করা সম্ভব। গ্রীক ট্রাজিডির দৈব-শক্তিকে আমাদের নাট্যকারগণ কিভাবে গ্রহণ করে ট্রাজিডি-রচনার চেষ্টা করেছেন, পূর্বে বলেছি। শেক্সপীয়রের ট্রাজিডি-রচনার আদর্শকে আমাদের নাট্যকারেরা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বৃত্ত সৃষ্টি করে বৃত্তের বিভিন্ন পর্বের মধ্য দিয়ে সেই দ্বন্দ্বের ক্রমাগ্রগতি ও অন্তিম পরিণাম দেখাতে তাঁরা উৎসাহ বোধ করেছেন। সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সকল শ্রেণীর নাটকেই ট্রাজিডি-সৃষ্টির প্রয়াস আছে। শেক্সপীয়রের ট্রাজিডি-পরিকল্পনার একটা বড় কথা হল যে, সেখানে নিয়তির বা দৈবশক্তিকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয় নি—বড় স্থান দেওয়া হয়েছে চরিত্রকে—চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের ওপর। চরিত্র-বিশেষের ট্রাজিডি ঘটে চরিত্রের কোনো একটা প্রবৃত্তির মারাত্মক একদেশদর্শিতার (onesidedness) জন্যে বা বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘর্ষের জন্যে। চরিত্রই ব্যক্তি-বিশেষের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। শেক্সপীয়রের এই আদর্শের প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে বিক্রম-চরিত্রের কামনার আতিশয্য ও তজ্জনিত রানী-সুমিত্রাকে একান্তরূপে লাভ করে ভোগ করার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

১. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, (ডঃ বৈদ্যনাথ শীল) গ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয়। পৃঃ ২৫

গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের স্বনামের প্রতি লোভ, অভিমান ও নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসহীনতাই মূলত তার ট্রাজিডির কারণ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের সাজাহানের অতিরিক্ত পুত্রবাৎসল্য, বা মনাময়ী নূরজাহানের অতিরিক্ত উচ্চাশা, 'পরপার'-এ বিশ্বেশ্বরের অতিপ্রবল সেন্টিমেন্ট, 'সীতা' নাটকে সমাজের দাবি ও অন্তরের দাবির প্রবলতম সংঘাত, যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' নাটকে রাক্ষস রাবণ ও ব্রাহ্মণ রাবণ —তথা দেহ-আত্মার প্রবল সংঘর্ষ, বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে মধুসূদনের অপরিমেয় উচ্চাশা ও মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসার সংঘাত—প্রভৃতি অনেক ট্রাজিডিতেই শেক্সপীয়ারের আদর্শ অনুসৃত। বাঙলা নাটকে বীরত্বমূলক (Heroic) ট্রাজিডির কোনো ধারা লক্ষণীয় নয়। ভয়ঙ্কর ট্রাজিডির পৃথক শ্রেণী-বিভাগ বাঙলা নাটকে করা যায় না। কোনো দৃশ্য বিশেষে বাঙলা নাটকে ভয়-ভাব-প্রধান হলেও সমগ্র নাটকে তা প্রধান নয়। মার্লোর 'ফস্টাস'-এর আদর্শে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অনেকখানি নাদির শাহ চরিত্রের ট্রাজিডি দেখাতে চেয়েছেন 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে। গণ-নাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের কাল থেকে সমস্যামূলক গোষ্ঠীর ট্রাজিডি, বা কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের ট্রাজিডি দেখানোরও চেষ্টা হয়েছে।

মেলোড্রামা (Melodrama) :

মেলোড্রামাকে বাঙলা ভাষায় কেউ কেউ অতি-নাটক বলেছেন। কিন্তু এই নামটি এখনো সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া মেলোড্রামার সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'অতিনাটক' শব্দটিতে ব্যঞ্জিত হয় না। সেইজন্যে ট্রাজিডি, কমেডি, ফার্সের মতো আমরা 'মেলোড্রামা' শব্দটিকে গ্রহণের পক্ষপাতী।

Melos শব্দটির অর্থ হল গান। গ্রীক Song ও ফ্রেঞ্চ drame এ দুটি শব্দ মিলেই Melodrameর সৃষ্টি।[১] মেলোড্রামা বলতে তাই গানে-ভরা বা গীতিময় নাটকই আক্ষরিক অর্থে বোঝায়। মূলত কিন্তু সঙ্গীতসহযোগে অলঙ্কৃত ও আবৃত্তিযোগ্য কোনো কিছুকেই এ বোঝাত।[২] ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে অপেরার উৎপত্তি, বিকাশ ও সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল ইতালীতে। অপেরাকেই তখন ইতালীতে বলা হত মেলোড্রামা। প্রায় এক শতাব্দী ধরে সেখানে অপেরার প্রতিশব্দ ছিল মেলোড্রামা।

ইতালীতে উদ্ভূত মেলোড্রামা শব্দটি ফ্রান্স ও জার্মানীতে অপেরার প্রতিশব্দ রূপে প্রথম দিকে গৃহীত হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে শব্দটির কিছু অর্থ পরিবর্তন হয়। জার্মানীতে তখন অপেরার যে অংশটুকু বাদ্যযন্ত্রসহকারে (অর্কেস্ট্রা) কথিত হত, তারই নাম হল মেলোড্রামা। আর ফ্রান্সে গানের সাহায্যে নির্বাক চরিত্রের ভাবাবেগ

১. (Gr. Song+Fr drame)=Melodrama : *D. O. W. L.*—Edtd. J. T. Shipley pp. 266.

২. "Originally a piece of declamation accompanied by music". *Ibid* pp. 266.

প্রকাশের যে পদ্ধতি, তাকেই বলা হল মেলোড্রামা। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংলণ্ডেও মেলোড্রামা জনপ্রিয় হয়ে উঠল ফ্রান্স ও জার্মানীর সমকালীন থিয়েটারের প্রভাবে।

অধ্যাপক নিকল বলেছেন যে, মেলোড্রামা হল মূলত এক ধরনের গুরুগম্ভীর নাটক যাতে বেশ কিছু গীতিকবিতা থাকত এবং যা অনেকখানি ছিল অপেরার সগোত্র। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে অপেরার প্রভাবে মেলোড্রামা অধিকতর উত্তেজনাময় ঘটনা-পরিবেষণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং উনিশ শতকে এর একটা বিশিষ্ট রূপ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তখন মেলোড্রামা হল এমন এক শ্রেণীর জনপ্রিয় নাটক, যা মাঝে মাঝে কমিক-দৃশ্যের দ্বারা খণ্ডিত, আদ্যন্ত প্রাসঙ্গিক গীতিযুক্ত, গুরুগম্ভীর এক উত্তেজনাময় নাট্যকাহিনী।[১] ফার্সের সঙ্গে সাদৃশ্যের আলোচনায় মেলোড্রামার আরও কতকগুলি লক্ষণের দিকে সমালোচক নিকল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য সূত্রাকারে বলা যেতে পারে।

ক. গান, দৃশ্য ও ঘটনার গুরুত্ব এতে প্রাধান্য লাভ করে। (**Song, show and incident became the prevailing characteristics in it.**)

খ. ঘটনার ওপর এতে অনুচিত জোর দেওয়া হয়। (**Undue insistence upon incidents**).

গ. অন্তর্ভেদী বা গভীর চরিত্র-বিশ্লেষণ বা গভীর আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস এতে থাকে না। (**They have nothing or practically nothing that makes an inward appeal**).

ঘ. চরিত্রগুলিকে ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যদান করার কোনো প্রয়াস থাকে না। (**No attempt has been made to individualise the characters.**

ঙ. অতিরঞ্জিত উপাদান যথেষ্ট থাকে। (**consists in the element of exaggeration**)

চ. এতে দর্শকদের মনে ক্রমান্বয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় এবং আগাগোড়া অভিনয়টি হয় নাটকেপনাপূর্ণ। (**series of thrills and theatrical**)

ফার্স যেমন কমেডির তুলনায় নিম্নমানের রচনা ও অভিনয়, তেমনি ট্রাজিডির তুলনায় মেলোড্রামাও নিম্নমানের। ভিতরের ভাবগভীরতা বা আত্মিক ধর্মই ট্রাজিডিকে মেলোড্রামা থেকে স্বতন্ত্র করে।[২] মেলোড্রামা ট্রাজিডির এক অনভিজাত জ্ঞাতি (**Plebian relative**)। এতে উদ্দেশ্য-গভীরতা (**Depth of purpose**) বা সাহিত্যিক লাবণ্য সঞ্চারের (**Literary grace**) কোনো চেষ্টা থাকে না বলে চরিত্রগুলিও সাধারণতঃ শ্রেণী-চরিত্র হয়ে ওঠে। সংলাপের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

১. *World Drama* : A Nicoll, pp. 436.

২. **It is, then some inner quality—the stressing of spiritual as opposed to the merely physical—that makes tragedy out of melodrama and comedy out of farce : A. Nicoll. *The Theory of Drama* p. 89.**

ট্রাজিডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নিয়ে সমালোচক রবার্ট, বি হেইলম্যানও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে অনেক সময় অসুবিধে হয় বলে তাঁর বক্তব্যও মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন, মেলোড্রামা হল আকস্মিক দুর্বিপাকমূলক সাহিত্য (Literature of disaster)। এখানে নায়কের জীবনে যে দুর্ভোগ দেখা দেয়, তা আসে সম্পূর্ণভাবে বাইরে থেকে, কিন্তু ট্রাজিডিতে তা আসে ভিতর থেকে। মেলোড্রামায় মানুষই দুর্ঘটনার শিকার ; কিন্তু ট্রাজিডিতে মানুষ নিজেকে অথবা অপরকে দুর্ঘটনার শিকার করে। মেলোড্রামায় মানুষের নৈতিক গুণ একেবারেই গৌণ, কিন্তু ট্রাজিডিতে তা মুখ্য এবং নাট্যঘটনার উৎস।[১] মেলোড্রামাতে মানুষ সমগ্র (essentially whole) কিন্তু মহৎ নয় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। ট্রাজিডিতে মানুষ কিন্তু বিভক্ত, এখানে দ্বন্দ্ব শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও। মেলোড্রামায় দ্বন্দ্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের বা মানুষের সঙ্গে কোনো বস্তুর মধ্যেই সীমিত। মানুষের শক্তি বা দুর্বলতা একটাকেই বড় করে তোলা হয় এখানে। কিন্তু ট্রাজিডিতে একসঙ্গে মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা দুইই দেখানো হয়। মেলোড্রামার নায়ক জয়ী অথবা পরাস্ত। কিন্তু ট্রাজিডিতে নায়ক পরাজয়ের মধ্যেও জয়ী। মেলোড্রামার নায়ক নিরীহ, শান্ত অথবা দোষী, কিন্তু ট্রাজিডিতে সে একই সঙ্গে নিরীহ ও দোষী। তাছাড়া আরও মনে রাখতে হবে যে, মেলোড্রামায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় এবং এর ঘটনার যে পরিণাম দেখানো হয় তার মধ্যে ঘটনাগত কার্যকারণ যোগ থাকে না—উত্তেজনাময় ঘটনা বা পরিস্থিতি সৃজনের জন্যে নাট্যকারের খেয়াল খুশীর প্রাধান্য থাকে। এর ঘটনায় যত গাম্ভীর্যই থাক, উত্তেজনায় যতই আমাদের মাতিয়ে তুলুক, ভাবিয়ে তুলতে পারে না কিছুতেই। তাই এও যেন নাট্যকারের এক খেলা।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, সার্থক ট্রাজিডি লেখা ব্যর্থ হলেই কি মেলোড্রামার সৃষ্টি হয় ?[২] এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ট্রাজিডি লেখা ব্যর্থ হলেও মেলোড্রামা হতে পারে। আবার মেলোড্রামা রচনার অভিপ্রায় নিয়েও তা লেখা যেতে পারে।

আরও একটি কথা। অনেক ট্রাজিডিতে দৃশ্য বিশেষে বা কোনো চরিত্রের আচরণে, সংলাপে বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে মেলোড্রামার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডিতেও এ লক্ষণ আছে। আকস্মিক উত্তেজনাকর, অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনা সেই সব স্থানে থাকলেও তা মেলোড্রামা হবে না। সেই অংশগুলিই হবে মেলোড্রামাটিক, কিন্তু সমগ্র নাটক মেলোড্রামা আখ্যা পাবে না যদি ট্রাজিডির ভাব-

১. In disaster, what happens comes from without, in tragedy, from within. In disaster, we are victims, in tragedy, we make victims of ourselves or others. In disaster, our moral quality is secondary ; in tragedy, it is primary, the very source of action. : *Perspectives on Drama* : Edtd. J. D. Colderwood and H. E. Toliver. p.p. 154.

২. *Understanding Drama* : Brooks and Hillman.

গভীরতা অক্ষুণ্ণ থাকে। 'হ্যামলেটে'—এ জিনিস আছে। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান' এবং 'রাজা ও রানী'তেও আছে।

মেলোড্রামার সমাপ্তি বিষাদান্ত হবে, না মিলনান্ত হবে, এ নিয়েও প্রশ্ন তোলা চলে। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে প্রায় বিশ বছর ধরে যে-সব মেলোড্রামা লেখা হয়েছিল সেগুলি প্রায় সবই ছিল মিলনান্ত। কিন্তু উনিশ শতকে যে সমস্ত মেলোড্রামা লিখিত হয় তার অধিকাংশ বিষাদান্ত। ট্রাজিডির অনভিজাত জ্ঞাতি যদি একে বলতে হয় এবং যদি ট্রাজিডি লেখার চেষ্টার ব্যর্থতা থেকে এর উদ্ভবকে মেনে নিই, তাহলে বিষাদান্ত উপসংহারই মেলোড্রামার সমীচীন। আর গান? তাও বোধ হয় এর আর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

সিদ্ধান্ত :

আমাদের এই আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, মেলোড্রামার সংজ্ঞা অল্প কথায় দেওয়া কঠিন। এর নানা লক্ষণ। অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষের কথা মনে রেখেও আমরা এই রকম একটা সংজ্ঞা দিতে পারি। মেলোড্রামা হল উত্তেজনাময় ঘটনামুখ্য, কৃত্রিম দ্বন্দ্বগর্ভ, শ্রেণীচরিত্রপ্রধান, জয় অথবা পরাজয় নির্দেশক আপাতগুরু বিষাদান্ত বা মিলনান্ত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের নাটক।

অ্যারিস্টটল স্পষ্টভাবে 'মেলোড্রামা' নামে নাটকের কোনো শ্রেণী-বিভাগ করে যান নি। কিন্তু গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের কিছু কিছু নাটককে আধুনিক কালের সমালোচকেরা মেলোড্রামা আখ্যা দিতে চান।[১] তাঁর রচিত 'ইলেকট্রা', 'অরিষ্টিস', 'ইফেগেনিয়া ইন অউলিস', ও 'কোএনিসেই' নাটকগুলিতে মেলোড্রামার নানা লক্ষণ আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু মেলোড্রামার যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করেছি, তার কিছু কিছু এগুলিতে মিললেও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এ যে-রূপে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, তার সঙ্গে ইউরিপিডিসের উপরিউক্ত নাটকগুলির পুরোপুরি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না।

মেলোড্রামার রূপটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জার্মানির কোটজিবু (Kotzebue) ও ফ্রান্সের গিলবার্ট দ্য পিকসারিকোর্ট-এর কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী। কোটজিবুর উল্লেখযোগ্য রচনা হল **Misanthropy and Repentance** (1789), **Poverty and Nobleness of Mind** (1795), **Family Distress** (1798) প্রভৃতি। Pixere court-ও অনেকগুলি মেলোড্রামা লেখেন। তাঁর **The Dog of Montargis** (1816) বিখ্যাত রচনা। লণ্ডনে হলক্রফ্‌টের **A tale of Mystery** (1802), এম. জি. লুইসের **The Castle Spectre** (1797), জে. বি. বাকস্টোনের **The Lost Son** (1826), টম টেলার্সের **Still Waters Run Deep** (1855), হেনরি আর্থার জোনসের **The Silver King** (1882) প্রভৃতি মেলোড্রামার নাম উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনের জর্জ কোলম্যান দি

১. *Greek Tragedy* : H. D. F. Kitto, Chap XII. pp 330—369.

ইয়ংগারের লেখা 'The Iron Chest' নাটকটির বৃত্ত এইরূপ ; এর প্রধান চরিত্র এডওয়ার্ড মার্টিমার একটি নূতন অরণ্যের রক্ষক ছিল। সে একটি হত্যায় জড়িত হয়েও বিচারের পূর্বেই ছাড়া পেয়ে যায়। কিন্তু উইলফোর্ড নামে এক ব্যক্তি আবিষ্কার করে যে সেই প্রকৃতপক্ষে দোষী। চতুর মার্টিমার, উইলফোর্ডের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। নায়ক আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত একটি লোহার সিন্দুকে এমন একটি কাগজ পান যাতে প্রমাণিত হল মার্টিমার অপরাধী। এই বৃত্ত-বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় মেলোড্রামার ঘটনা কেমন উত্তেজনাকর।

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে মেলোড্রামা সৃষ্টির কোনো পরিবেশ গড়ে ওঠে নি—দর্শকেরা গীতিনাট্য চেয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের মেলোড্রামা নয়। তবে আমাদের এখানে তো অধিকাংশ ট্রাজিডিই সার্থকতা লাভ করে নি। এই সব অসার্থক ট্রাজিডিতে মেলোড্রামার প্রচুর লক্ষণ আছে। ঘটনার ওপর অনুচিত জোর দেওয়া, চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করা, ঘটনাগুলিকে বহু ক্ষেত্রে কার্যকারণসূত্রে যুক্ত না করা, নানা উত্তেজক দৃশ্য, ঘটনা বা সংলাপের দ্বারা দর্শকদের খুশী করার চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষণ বহু অসার্থক ট্রাজিডিতে দেখা যাবে। তবে চরিত্রগুলি এসব ক্ষেত্রে টাইপধর্মী কিন্তু সর্বত্র নয়। অসার্থক ট্রাজিডিগুলিকে মেলোড্রামা বললে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল', জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'সরোজিনী', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক মেলোড্রামার অন্তর্গত। কিন্তু তা বলা ঠিক হবে কি? এ বিষয়ে আমাদের কথা হল যে মেলোড্রামা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় অর্থাৎ তার যে-সমস্ত লক্ষণ আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি—সেই আলোকে দেখলে অসার্থক ট্রাজিডিগুলিকে সব সময় মেলোড্রামা বলা চলে না। মেলোড্রামাটিক দৃশ্য, ঘটনা বা চরিত্র-বাহুল্য ট্রাজিডির রসকে ক্ষুণ্ণ করে যে দিতে পারে তা জানি, কিন্তু মূলত ট্রাজিডি হিসেবে রচনা করার মানসিকতা থেকে যে নাটক লিখিত, তা ব্যর্থ হলে সর্বক্ষেত্রে মেলোড্রামার অন্যান্য লক্ষণগুলির দ্বারা তা আক্রান্ত হয় না। কাজেই খুব সীমিত ক্ষেত্রে মেলোড্রামার আদর্শ কতকটা শিথিল করলেই ব্যর্থ ট্রাজিডিগুলি মেলোড্রামা আখ্যা পেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন নাট্যরূপ

ক্লাসিক্যাল নাটক :

নাটকের গঠন বা রচনারীতির ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক কথা দুটির ব্যবহার প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। ক্লাসিক্যাল নাটক বলতে সাধারণত আমরা গ্রীক নাটকগুলিকে বুঝি। 'ক্লাসিক্যাল' শব্দটির বিবর্তনের একটু ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় শতকের একজন ল্যাটিন লেখক এওলাস জেলিয়াস (Aulus Gellius) Scripter Proletarius শব্দটির প্রতিশব্দরূপে Scripter Classicus শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। সেখানে 'classicus' শব্দটি মূষ্টিমেয় সুধী লোকেদের জন্য যিনি লেখেন, সেই অভিজাত লেখকের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে এর একটা ভুল অর্থ দাঁড়াল যে কলেজে অথবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্থায়িভাবে যে রচনা পড়ানো হবে কিংবা যাঁর রচনা পড়ানো হবে তিনি বা তাঁর লেখাই ক্লাসিক্যাল। মধ্যযুগে ও রেনেশাঁস যুগে ল্যাটিন ভাষায় শব্দটির এই অর্থ প্রাধান্য পেয়েছিল। গ্রীস ও রোমের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা এইরূপ স্থায়িভাবে পড়ানোর উপযুক্ত—এই ধারণা থেকে মনে করা হল যে, তাঁদের রচনাই ক্লাসিক্যাল ও তাঁরাই ক্লাসিক্যাল। কিন্তু দেখা গেল, জাতীয় সাহিত্যে কেউ কেউ গ্রাম্য ভাষাতেও মহৎ-রচনা লিখছেন। এঁদের লেখাকেও তখন ক্লাসিক্যাল না বলে উপায় রইল না। সুতরাং ঠিক করা হল প্রাচীন বা আধুনিক যাই হোক না কেন, যে রচনাতে সৌন্দর্যের চূড়ান্ত আদর্শ, অর্থাৎ সব কিছুর সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার চিরন্তন মান রক্ষিত হয়েছে তাই ক্লাসিক্যাল। ক্লাসিক্যাল সম্পর্কে এই ধারণা ব্যাবিটের সংজ্ঞাতেও লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, "Classical is everything that is representative of a class."[১] যাই হোক, এই দৃষ্টিকোণে গ্রীক সাহিত্য ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এবং গ্রীক নাটক ক্লাসিক্যাল নাটক। তাই এখন আমরা মনে করি যে অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকের গঠন ও রচনারীতি সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন সূত্রবদ্ধ করেছেন, সেগুলি যে-সব নাটকের আদর্শ, সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে ক্লাসিক্যাল নাটক। 'Poetics'-এ দেখি, আদি মধ্য ও অন্ত্য সমন্বিত বৃত্তরচনা, কার্যকারণসূত্রে ঘটনাংশগুলির মধ্যে সংযোগ ও ঘটনার একমুখীনতা রক্ষা, তিন ঐক্যের মধ্যে অন্তত ঘটনাগত ও কালগত ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা, কোরাস বা নিয়তির প্রাধান্য, এক বা একাধিক উপবৃত্ত (Subplot) এবং হাস্য ও করুণরসের মিশ্রণ বর্জন—প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গ্রীক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১. *D. O. W. L.*: Ed. J. T. Shipley. pp. 59.

পরবর্তীকালে ক্লাসিক্যাল উপাদান বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে অনেকেই চিন্তা করেছেন। ওয়াল্টার পেটার ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "Classical element is that quality of order in beauty which they possess indeed, in a permanent degree."[১] সুশৃঙ্খল স্থায়ী সৌন্দর্যকেই তিনি ক্লাসিক্যাল -এর মূল কথা বলেছেন। জার্মান নাট্যকার-সমালোচক শ্লেগেল ক্লাসিক সাহিত্যকে ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভাস্করের নির্মিত মূর্তির মধ্যে স্পষ্টতা, ঋজুতা ও সুসঙ্গতি যেমন থাকে, ক্লাসিক সাহিত্যেও তাই। বস্তুত রোমান্টিক-পন্থীদের কাছে আমরা ক্লাসিক্যালদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনি। তাঁরা বললেন ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম এই দুই শব্দকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে দেখা উচিত নয়। এ দুই হল মানবমনের অনমনীয় ও স্থায়ী ভঙ্গী—সুন্দরের রাজ্যে এ দুয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।

ক্লাসিক্যাল নাটক বলতে আমরা গ্রীক নাটকের আদর্শই অনুসন্ধান করি, কিন্তু মনে রাখতে হবে গ্রীসে যেমন ক্লাসিক্যাল নাটক লেখা হয়েছিল, তেমনি পরে তা রোমেও লেখা হয়েছিল এবং অনেক পরে এলিজাবেথান ও স্টুয়ার্ট যুগ পেরিয়ে এলে দেখা যাবে আরও অনেকে ক্লাসিক আদর্শে নাটক লিখেছিলেন। সুতরাং বলা চলে ক্লাসিক নাটকের দুটি প্রধান শ্রেণী—ক. প্রাচীন অথবা যথার্থ ক্লাসিক এবং খ. নব্য অথবা ছদ্ম ক্লাসিক। গ্রীসে এইস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস ট্রাজিডি রচনায় এবং অ্যারিস্টোফেনিস ও মিনাণ্ডার কমেডি রচনায় ক্লাসিক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

এঁদের পরে রোমে ট্রাজিডি রচনায় সেনেকা এবং কমেডি রচনায় প্লটাস ও টেরেন্স খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্রীক কমেডিগুলি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে বলে এর তিন প্রকার।

ক. প্রাচীন কমেডি (রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আক্রমণের কমেডি)

খ. মধ্যবর্তী কমেডি (সামাজিক জীবন ও আচরণের কমেডি)

গ. নূতন কমেডি (অনেকখানি আমাদের আধুনিককালের কমেডির সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত)

রোমে সেনেকার দশখানি ট্রাজিডি, প্লটাসের বিশখানি কমেডি ও টেরেন্সের ছয়খানি কমেডি পাওয়া গেছে। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয় আছে। রোমক কমেডিগুলির সাহায্যে আমরা গ্রীক নূতন কমেডিগুলির আদর্শ অনেকখানি অনুমান করতে পারি। কারণ গ্রীক নূতন কমেডিগুলির আদর্শ এগুলিতে বেশী অনুসৃত হয়েছে। তাছাড়া আধুনিককালের অনেক কমিডি রচনার পশ্চাতে রোমক কমিডির প্রেরণাও উপেক্ষা করা যায় না। আর রোমক ট্রাজিডিগুলির গুরুত্ব একদিকে থেকে খুব বেশি। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যে নব্য ক্লাসিক নাটকের পত্তন হয়েছিল, তার মূলে গ্রীক নাট্যকারদের আদর্শ নয়, সেনেকার আদর্শই ছিল লক্ষ্য। সেনেকার নাটকে ভয়ঙ্কর ও অতিপ্রাকৃত উপাদান যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘ উক্তি, অলংকৃত বাক্য এবং

১. *Appreciations.* Postscripts. 1889, pp. 202.

ঘটনার গ্রথগতিও এগুলিতে লক্ষণীয়। আর ট্রাজিডির এই আদর্শ ইতালীয় ও ফরাসী নাট্যকারগণ কর্তৃক নব্য ক্লাসিক নাটকে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা এই শ্রেণীর নাটক লিখেছিলেন। এঁরা হলেন কর্নেই, রাসিন, ভলতেয়ার এবং ইতালীয় কবি-নাট্যকার আলফিয়েরি। সমালোচক ভাবলিউ এইচ হাডসন ক্লাসিক নাটক ও নব্য ক্লাসিক নাটকের পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। ক. ক্লাসিক নাটকে রোমান্টিক প্রেমের চিত্র একেবারেই ছিল না—এই রোমান্টিক প্রণয়ের চিত্র নব্য ক্লাসিক নাটকে প্রধান স্থানলাভ করল। খ. সমবেত সঙ্গীত বা কোরাস যা ছিল ক্লাসিক নাটকের একটি বড় অঙ্গ, তা এখানে বর্জিত হল।[১] বিষয়বস্তু নির্বাচনে নব্য ক্লাসিসিস্টরা ক্লাসিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। নানা স্থান থেকে চরিত্র সংগৃহীত হলেও নব্য ক্লাসিক নাটকে অভিজাত শ্রেণীর অসাধারণ স্তরের মানুষই স্থান পেয়েছে।[২] নাটকের মধ্যে সর্বত্র একটা গম্ভীর সুর বজায় রাখার জন্যে ক্লাসিক নাটকের মতো এখানেও হাস্যকর কোনো কিছুর আমদানি করা হত না। পুরোপুরি ক্লাসিক-রীতিতে লেখা নাটক আধুনিককালে দুর্লভ। বাঙলা অধিকাংশ নাটকে রোমান্টিক রীতিই অনুসৃত। কোথাও বা উভয়ের মিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' অনেকখানি ক্লাসিক আদর্শে লিখিত।

রোমান্টিক নাটক :

রোমান্টিক নাটকের গঠনে ক্লাসিক নাটকের কঠোর বন্ধন নেই। তাই একই নাটকে করুণ ও হাস্যরসের সৃষ্টি, উপকাহিনীর সংযোগ, চরিত্রচিত্রণে প্রথানুগত্য অপেক্ষা অভিজ্ঞতার অনুসরণ, নানাধরনের বৈচিত্র্য-সৃজন, গঠনবন্ধে অপেক্ষাকৃত শৈথিল্য, একই রচনায় গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ, স্থানগত ও কালগত ঐক্যের প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি রোমান্টিক নাটকের লক্ষণ। রোমান্টিক নায়কের একটি বড় বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অস্বস্তি বা বেদনা বোধ করে সে, কখনো বা সে সমাজদ্রোহী। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে রোমান্টিক নাটক নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তি, গতিপ্রাণতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং কতকটা অস্পষ্টতার দিকে প্রবণতা দেখায়। 'রোমান্টিক' এই বিশেষণ পদটি থেকে রোমান্টিসিজম্ কথাটির সৃষ্টি। রোমান্টিক শব্দটি মূলত ফরাসী "রোমান্স" থেকে এসেছে যার অর্থ 'অভিনব' (Novel)। কিন্তু ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে শব্দটির ব্যবহার হতে থাকে যার অর্থ 'উদ্ভট' বা 'অবাস্তব'। অষ্টাদশ শতকে ঐ

১. "In structure it introduced a great change by dropping the chorus, though a survival of this is...to be detected in...many familiar figure in many new-classic plays, the confident, who has little or nothing to do with the action except as the alter ego of the hero or heroine to listen to their contentions and reply with sympathy and advice." *An Introduction to the Study of Literature.* p.p. 236.

২. "Tragedy in brief had to confine itself to 'great' themes and 'illustrious' persons" (*Ibid* p.p. 239).

অর্থের সঙ্গে রোমান্টিক শব্দটি কখনো কখনো একটা বিষণ্ণতার ভাবকেও ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এর ব্যবহার হয়েছে দু' একজনের হাতে; কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রুশোর ব্যবহারের পরে শব্দটির প্রয়োগ খুব প্রিয় হয়ে পড়ে এবং ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অ্যাকাডেমি' কর্তৃক শব্দটি স্বীকৃত হয়। ম্যাডাম ডি. স্টেইল ও এ. ডাবলিউ শ্লেগেলের প্রচেষ্টায় 'Romantique' শব্দটি সাহিত্যিক প্রবণতা বোঝাতে বহুলভাবে প্রযুক্ত হতে থাকল।[১] জার্মান সমালোচক ও নাট্যকার শ্লেগেল ক্লাসিক শব্দটির বিপরীত শব্দরূপে রোমান্টিক শব্দের প্রয়োগ করলেন। তিনি ক্লাসিক সাহিত্যকে যেমন ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তেমনি রোমান্টিক সাহিত্যকে তুলিত করলেন চিত্রকলার সঙ্গে। কোনো একটা চিত্রে আমরা যা দেখি, তা স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট নয়—চিত্রে চিত্রকর তার চারপাশের নিকট ও দূরের জিনিসগুলোকেও দেখিয়ে থাকেন। নানা রঙ ও রেখার সাহায্যে অনেক সূক্ষ্মভাবের ব্যঞ্জনা থাকে ঐ চিত্রের মধ্যে। সেইরকম রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যেও নানা ভাববৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা থাকে। এখানেও সবটা স্পষ্ট নয়, অনেকখানিই কল্পনার ওপর নির্ভর করতে হয়। মোট কথা, যা নভেল (অভিনব) যা রোমান্সের মতো, তাই যখন মূলত রোমান্টিক, তখন রোমান্সের সব লক্ষণ রোমান্টিক শব্দেও মিলবে। এইজন্য রোমান্সের কল্পনা, ভাবাবিষ্টতা, বিষণ্ণতা, বিস্ময়, রহস্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাবে। ওয়াল্টার পেটার রোমান্টিসিজমের লক্ষণ নির্ণয়ে বলেছিলেন, "Curiosity and the love of beauty."[২] অধ্যাপক হারফোর্ড বলেছেন, "strangeness added to beauty."[৩] দেখা যাচ্ছে, পেটার ও হারফোর্ড কৌতূহল, বিস্ময় ও সৌন্দর্যকেও রোমান্টিসিজমের ধর্ম বলছেন। ক্লাসিক সাহিত্যেও সৌন্দর্যের কথা আছে। মানসিক ও আত্মিক সৌন্দর্যের এক অমূর্ত স্থির মানের প্রতি আনুগত্য ও সন্ধান ক্লাসিক-সাহিত্যে; কিন্তু রোমান্টিক-সাহিত্যে কোনো স্থিরীকৃত মান নেই। আসল কথা, 'স্বাধীনতা' ও 'ভাবাবেগ' এই দুই বড় বৈশিষ্ট্য রোমান্টিক সাহিত্যের প্রাণ। 'স্বাধীনতার কথা বললেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহের ভাব এর অন্তর্গত হবে; আর বিদ্রোহ বললে সব রকম প্রথামুক্তি বা বন্ধনমুক্তিকে বাদ দেওয়া যাবে না। 'ভাবাবেগ' বললে প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা, অবচেতন মন এবং যে-সব মানবিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না, যেমন প্রাণশক্তি (Life force), স্বতোলব্ধ-জ্ঞান (Intuition), রহস্যময় আচরণ প্রভৃতিও এর অন্তর্গত হবে। ভাবাবেগ থাকলে কল্পনার প্রাধান্য থাকবে এবং তাতে সৌন্দর্যের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ হবে।[৪]

সে যাই হোক, রোমান্টিক ট্রাজিডি বলতে আমরা বুঝব সেই শ্রেণীর নাটককে যা ক্লাসিক নাটকের আদর্শকে উৎকটভাবে লঙ্ঘন করেছে এবং যাতে নাট্যকার স্বাধীন-

১. 'D. O. W. L.' অভিধানে পৃঃ ৩৫১-৫২ শব্দটির বিবর্তিত অর্থ লক্ষণীয়। ২. *Appreciations* (1739) গ্রন্থে পৃঃ ২৫১ ৩. The Age of Wordsworth. p.p. 5. ৪. "Among the many semantic accretions of the word romanticism two closely related ideas are the most fertile sources of implications: liberty and emotions." (*D. O. W. L.* pp. 353)

ভাবে এক বা একাধিক উপকাহিনী যুক্ত করে, নানা রসের মিশ্রণ ঘটিয়ে, স্থান ও কালের ঐক্য রক্ষা না করে ব্যক্তির এমন এক বিস্ময়কর অথচ করুণ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন যা রহস্যময় ও সুন্দর। কমেডিতে এ কাহিনীর চারপাশে একটা রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হয় এবং এর মূল উপজীব্য হয় প্রেম। তাছাড়া অন্যান্য লক্ষণ কতকটা ট্রাজিডির মতো—শুধু নায়কের গুরুত্ব ট্রাজিডির মতো নয়। ঘটনাগত ঐক্য-বন্ধন রোমান্টিক নাটকে শিথিল। অ্যারিস্টটল ঘটনাগত ঐক্য বলতে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত একটি মাত্র ঘটনাকে যেমন বুঝিয়েছেন, কিংবা নব্যক্লাসিকপন্থীরা যে ভাবে এই ঘটনাগত ঐক্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন, রোমান্টিক নাট্যকাররা তা মানেন নি। উপবৃত্ত যোজনার ব্যাপারে এবং ছোটখাটো চরিত্র ও ঘটনা সংযোগের ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন—এঁদের মতে নাট্যবৃত্তে জটিলতা সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন এবং এই জটিলতা বৃত্ত-ঐক্যের বিরোধী নয়। সমালোচকের কথায়, "Our romantic drama, then is habitually a drama of compound Plot."[১]

সাধারণত ক্লাসিক্যাল ট্রাজিডি চরিত্রধর্মে অভিজাত। খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবন-সংগ্রাম বা দুর্ভাগ্যের কাহিনীই এর মূল উপজীব্য। কিন্তু নব্যক্লাসিকদের পন্থায় রোমান্টিক নাট্যকার জীবনের চিত্র উপস্থাপিত করেন না। এঁরা নায়ককে সাধারণ মানুষ ও বস্তুজগতের মধ্যেই স্থাপন করেন। সংলাপে কবিত্ব থাকলেও এবং পদ্য ভাষা ব্যবহৃত হলেও লোকমুখের গদ্য ভাষারও সংমিশ্রণ (racy with colloquialism) লক্ষ্য করা যায়। নব্যক্লাসিক নাটক যেখানে পুরোপুরি ideal, সেখানে রোমান্টিক ট্রাজিডিতে আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়। রোমান্টিক নাটকেও অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা থাকে। নব্যক্লাসিক নাটকেও তা থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে দুয়ের যে পার্থক্য, তা সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন সমালোচক হাডসন। তিনি বলেছেন, নব্যক্লাসিক নাটকে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটনা রঙ্গমঞ্চের বাইরে ঘটে, চাঞ্চল্যকর ঘটনাও বিবৃতির সাহায্যে বলে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দর্শকদের দেখানো হয় না। এক্ষেত্রে হোরেসের সেই মূল্যবান নির্দেশটি "Let not Medea slay her children before the public."[২] নব্যক্লাসিক নাট্যকাররা মনে রাখেন। কিন্তু রোমান্টিক নাট্যকাররা সব কিছুই মঞ্চে দেখিয়ে থাকেন। নাট্যক্রিয়াকে ও গতিবেগকে সচল করে রাখার জন্য তাঁরা রঙ্গমঞ্চে হত্যা, আত্মহত্যা, যুদ্ধ, মৃত্যু সব কিছু দেখাতে চান।

রোমান্টিক নাটক এলিজাবেথীয় যুগে ও স্টুয়ার্ট যুগের নাট্যকারদের দ্বারা ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেক্সপীয়র এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর পরে জার্মানীতে লেসিঙ, গেটে ও শিলার এবং ফ্রান্সে আলেকজাণ্ডার ডুমা, ভিক্টর হুগো ও তাঁর সমসাময়িকগণ এবং স্পেনে লোপ ডি ভেগা ও ক্যালডেরন এই ধারাটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

১. *An Introduction to the Study of Literature*: W. H. Hudson. p.p 244.

২. হোরেসের আর্স পোয়েটিকার ১৮৫ পৃঃ (ইং অনুবাদ) থেকে উদ্ধৃত হাডসনের *An Introduction to the Study of Literature* গ্রন্থে প্রাপ্তব্য P. 245.

শেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্রাজিডি ও কমিডির আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক এবং তারও পরে কিছু কিছু রোমান্টিক নাটক লিখিত হয়েছে। শিল্পমূল্যে শেক্সপীয়রের সঙ্গে সেগুলি তুলনীয় না হলেও এ ধারায় নাটক রচিত হয়েছে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী', 'নবীন তপস্বিনী', 'কমলেকামিনী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী', গিরিশচন্দ্রের 'বাসর', ক্ষীরোদ প্রসাদের 'কিন্নরী', অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'ইরাণের রাণী', রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিরকুমারসভা' প্রভৃতি প্রচুর নাটক এ শ্রেণীর অন্তর্গত। রীতির দিক দিয়ে সাম্প্রতিক বাঙলা নাটক যেখানে প্রাচীন রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করে নতুন আঙ্গিকে রচিত হচ্ছে, সেখানেই তা রোমান্টিক। ভাবের দিক থেকে সব নাটক অবশ্য এই আখ্যা পেতে পারে না। আধুনিক বাস্তবতার যুগেও অল্প সংখ্যক এ ধরনের নাটক এখনো লিখিত হচ্ছে।

সাংকেতিক নাটক. প্রতীকী নাটক বা সংকেতমুখ্য রূপক নাটক :

রূপক, সাংকেতিক ও প্রতীক—এই তিনটি শব্দের সঙ্গে এখন আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। এক শ্রেণীর নাট্যকে বোঝানোর জন্যে Allegorical বা Symbolical শব্দ দুটির প্রয়োগ হয়। আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কিছু সংখ্যক নাটককেও রূপক নাট্য, সাংকেতিক নাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাট্য, প্রতীকী নাট্য, তত্ত্ব নাট্য প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি Allegory ও Symbolic শব্দ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা সূক্ষ্মভাবে মনে রেখে নাটকের শ্রেণীবিভাগ সব সময় করা হয় না। আর তার ফলে পাশ্চাত্যেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি এই ধরনের নাট্যশ্রেণীবিভাগে মত-বিভিন্নতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের একই নাটককে কেউ বলছেন রূপক, আবার কেউ বলছেন সাংকেতিক, আবার কেউ বলছেন রূপক-সাংকেতিক। এ-সব বিরোধ দূর করার জন্যে কেউ এগুলোকে তত্ত্ব নাটকও বলতে চেয়েছেন।[১] তাই এ শ্রেণীর নাটককে রূপক, সাংকেতিক বা প্রতীকী বলে চিহ্নিত করার আগে শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ এবং তাদের পার্থক্য ভালভাবে জানা দরকার।[২]

সংস্কৃত আলংকারিক ধনঞ্জয় যখন নাট্যকে "রূপ" নামে অভিহিত করেন, তখন তার অর্থ লক্ষ্য করবার মতো। নাট্য যেহেতু 'দৃশ্য', সেইজন্যই এর নাম 'রূপ'। আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেন, যেহেতু নাট্যের পাত্র-পাত্রীর রূপ নট-নটীতে আরোপিত হয়, সেইজন্যই এর নাম 'রূপক'। নাট্য দৃশ্য হওয়ার জন্য বা পাত্রপাত্রীর রূপ নট-নটীতে আরোপের জন্যই এর নাম রূপ বা রূপক। আরও একটু ব্যাপক অর্থে যে কোনো সাহিত্যসৃষ্টিই তো ভাবের রূপ-সৃষ্টি—ভাবেরই তো রূপক। কিন্তু 'রূপক'

১. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী তত্ত্বনাট্য পৃঃ ১৪৮

২. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রনাট্য-সমীক্ষা :—রূপক সাংকেতিক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শব্দটির এ অর্থ 'রূপক-নাটক' (Allegorical drama) বুঝতে আমরা গ্রহণ করি না। Oxford Companion to English Literature গ্রন্থে 'Allegory' শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "A figurative narrative or description, conveying a valid moral meaning"[১] অর্থাৎ রূপক হল এমন এক ধরনের বিশেষ আখ্যান বা বর্ণনা যার তলদেশে একটি নীতিপূর্ণ অর্থ আছে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে, রূপক হল এমন এক রূপ আলংকারিক প্রয়োগ যাতে বাইরের আখ্যানের অন্তরালে আরও একটি দ্বিতীয় অর্থ নিহিত থাকে। বলা বাহুল্য, এখানে বাইরের আখ্যানটি একেবারে গৌণ, আসল হল ঐ উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় অর্থটি। এখান থেকেই রূপকধর্মী রচনাকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এই জাতের রচনায় একটা কাহিনী থাকতে পারে আবার তা কোনো বর্ণনামূলক ঘটনাও হতে পারে। তবে তা নাটক হলে তাকে একটা কাহিনী বা কাহিনীর কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। এর ভিতরে ও বাইরে দুটি অর্থ নিয়ে কাহিনী প্রবাহিত হয় সমান্তরালভাবে এবং একটির সঙ্গে আর একটির যোগ ঐ সমান্তরাল রেখার ব্যবধান থাকার জন্য কোনো কোনো রূপক-রচনায় একেবারেই থাকেনা। আমাদের দেশের বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলি, বিদ্যাসাগরের কথামালার গল্পগুলি, ঈশপের গল্প, বেনিয়ানের 'Pilgrim's Progress', স্পেন্সারের 'Faery Queen', প্রভৃতি এই জাতের রূপক রচনা। মধ্যযুগের Morality Play "Everyman" এরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যে যে সিম্বলিক আন্দোলন দেখা দিল এবং তার ফলে যে কাব্য ও নাটকাদি রচিত হল, তা প্রকৃতপক্ষে ঐ ধরনের নীতিসর্বস্ব রূপক রচনা নয়। এখন থেকে 'সাংকেতিক' বা 'প্রতীকী' শব্দ Symbolic-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকল। পূর্বে যে রূপক-রচনার বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, বাইরের কাহিনীর মধ্য থেকে ভিতরের অর্থ বুঝতে হবে, কিন্তু খুব সহজেই তা বোঝা যায় না। একটুখানি মনঃসংযোগ, চিন্তা বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু আরও এক ধরনের রূপক-রচনা আছে, ইংরেজিতে তাকে Mixed Allegory বা মিশ্র রূপক বলা হয়েছে। এতে বাইরের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ভিতরের অর্থটিকে আভাসিত করার চেষ্টা হয়। আর এই চেষ্টার ফলে রূপকের মধ্যে সংকেতের অনুপ্রবেশ ঘটে। কোনো একটি বস্তু, ধ্বনি বা চরিত্রকে আশ্রয় করে ঐ গভীর অর্থটি সংকেতিত হয়। নাটকে এই ধরনের রীতি অবলম্বিত হলে বুঝতে হবে তা অবিমিশ্র নীতিগর্ভ রূপক নয়। তার মধ্যে আছে রূপক ও সংকেতের মিশ্রণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় অর্থটি যতই গভীর, অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য বা অরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞাপক হবে, রূপক রচনারীতিতে তত বেশী সংকেত-প্রয়োগ প্রাধান্য লাভ করবে। সুতরাং রূপক রচনারীতিও তিন প্রকার হতে পারে।- ক. এক জাতের রচনাতে সংকেত নেই, কিন্তু বাইরের অর্থের গভীরে ভিতরের নীতিতত্ত্ব আছে। খ. এক জাতের রচনায় সংকেত আছে, কিন্তু তা

১. Paul Harvey সম্পাদিত *Oxford Companion to English Literature : P. 9*

মুখ্য নয় এবং তারও গূঢ় উদ্দিষ্ট তত্ত্বকথা। গ. আর এক জাতের রূপক-রচনা হতে পারে, যাতে গুহাহিত পারমার্থিক অরূপ-তত্ত্বকথাই উদ্দিষ্ট এবং তাকে বোঝবার জন্য রূপকধর্মী রচনায় প্রচুর সংকেতের প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রূপক-নাট্য একালে খুব কম লিখিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রূপক-নাট্যই বেশী। এগুলির নাট্যরূপকে আমরা এইরূপ নাম দিতে পারি—ক. বিশুদ্ধ রূপক-নাট্য, খ. মিশ্র রূপক-নাট্য ও গ. সংকেতমুখ্য রূপক-নাটক। এই শেষোক্ত শ্রেণীর নাটককে সাংকেতিক বা প্রতীকী নাটকও বলা যেতে পারে, কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণরূপে রূপক-রীতি-বর্জিত নয়। তাই এদের রূপক-সাংকেতিক নামে অভিহিত করাই সমীচীন।

এখন সংকেত, সাংকেতিক বা প্রতীক—এই শব্দগুলির অর্থ একটু ভালোভাবে বোঝা যাক। সংস্কৃত 'সংক্ষেপ' শব্দটি থেকে 'সংকেত' এসেছে। যেখানে 'বলার অভাব'—অভিপ্রায়-প্রকাশক চেষ্টা—তা কখনো শব্দধ্বনির সাহায্যে কখনো ইশারায় বা ইঙ্গিতে। নাটকের ক্ষেত্রে সংকেত বা সাংকেতিক শব্দের অর্থ হল ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। কোনো একটি বস্তুর সাহায্যে বস্তুর অতীত কোনো গূঢ়, অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক কোনো কিছুর আভাস। এই ব্যঞ্জিত অর্থের প্রতীকরূপে বা সংকেতরূপে নাটকে কোনো একটি বস্তুকে দাঁড় করানো হয়। 'মুক্তধারা' নাটকে পথ, মুক্তধারা, ভৈরবমন্দির, 'ডাকঘর' নাটকে ডাকঘর, 'রক্তকরবী' নাটকে জাল, বাজপাখী, মরা ব্যাঙ, কুন্দফুলের মালা, রক্তকরবীগুচ্ছ, 'রাজা' নাটকে অন্ধকার গৃহ, মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড' বা নীলপাখী প্রভৃতি হচ্ছে সেই সংকেত বা প্রতীক। দেখা যাচ্ছে, রূপক রচনাতেও বাইরের অর্থটি গৌণ, উদ্দিষ্ট ভিতরের অর্থটি আসল। আবার সংকেত-প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সব বস্তু ব্যবহৃত হয়, তাদের আক্ষরিক অর্থ বা বাইরের রূপকে গৌণ করে উদ্দিষ্ট একটি গূঢ়-গভীর ভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এই ইঙ্গিত-ইশারাময় ভাবটিই আসল। সংকেতের বস্তুটিকে ঘিরে এই আসল ভাবটির নানা দিক দানা বাঁধবার চেষ্টা করে। কিন্তু আগাগোড়া কতকগুলি সংকেত দিয়ে একটি নাটক রচনা করা যায় না। একটি কাহিনীর (তা খুব সুগ্রথিত হওয়ার দরকার নেই) আশ্রয় অবশ্যই চাই। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের যে সব নাটকে সংকেতের অবিসংবাদী প্রাধান্য, সেগুলোতে প্রাধান্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা তাদের সাংকেতিক বা প্রতীকী বলতে পারি, কিন্তু তাতে রূপকেরও যে সংস্পর্শ আছে, একথা ভুললে চলবে না। আর এই সঙ্গেই আছে প্রচলিত নাটকের চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টিরও কতকটা বাস্তবতা। এই তিনের মিশ্রণ এগুলিতে।

কবি-নাট্যকার ডাবলিউ. বি. ইয়েটস্ রূপক ও সাংকেতিক রচনার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, ক. সংকেত হল অদৃশ্য বা অরূপসত্তার সম্ভাব্য রূপ; আর রূপক হল কোনো শরীরী বস্তুর বা পরিচিত তত্ত্বের সম্ভাব্য অনেক রূপের মধ্যে একটি রূপ। খ. সংকেত হল অনুভবের ব্যাপার; সংকেত যা কিছু ইঙ্গিত করে বা প্রকাশ করে তাই যথেষ্ট। অন্য কোনও পথে এসব সম্পূর্ণভাবে

এর আর ব্যঞ্জনা দেওয়া চলে না। কিন্তু রূপক হল অনুভবের নয় জ্ঞানের ব্যাপার, বুদ্ধির সাহায্যে তা বোধগম্য ; রূপক যা ব্যক্ত করে, তা অন্য কোনো পথে আরও ভালভাবে বলা যেতে পারে। গ. সংকেত হল আধ্যাত্মিক শিখার চারধারে একটি স্বচ্ছ আলো। আধ্যাত্মিক, নিগূঢ়, অবাঙ্‌মনসোগোচর তত্ত্বকে পরিস্ফুট করার জন্যই সংকেতের আলো।[১] ঘ. সংকেতে সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি—তা বুঝতে গেলে চিত্তের সহজ সংস্কার চাই ; কিন্তু রূপকের ব্যাপারটা আমোদের—তা বুঝতে সম্যক জ্ঞানই যথেষ্ট।

ইয়েট্‌সের[২] এই মূল্যবান বক্তব্য থেকে রূপক ও সাংকেতিক রচনার যে পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, সাংকেতিক রচনা আরও সূক্ষ্ম আরও গভীর ও ব্যঞ্জনাঢ্য। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ধারণা—অরূপ, অনন্তের বিষয়কে ইয়েটস্ সাংকেতিক রচনার উপজীব্য মনে করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের সকলেরই কিন্তু 'সংকেত' সম্পর্কে ধারণা এমন নয়। Oxford English Dictionary[৩]-তে সিম্বোলিস্ট-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে একদল ফরাসী কবি-গোষ্ঠীর নাম সিম্বোলিস্ট। এঁদের কাজ ছিল প্রত্যক্ষ নির্দেশের পরিবর্তে অপ্রত্যক্ষ ইশারার সাহায্যে তত্ত্ব বা ধারণাকে প্রকাশ করা এবং এঁরা "attached symbolic meaning to particular objects, words, sounds and etc."

ফ্রান্সের সিম্বোলিক কবিতার ভক্ত সমালোচক আর্থার সাইমন্স সিম্বোলিস্টদের আদর্শ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতেও দেখা যায় এঁরা কিছুই প্রমাণ করতে চান না, এঁদের কোনো তত্ত্ব-বিশ্বাসও নেই—কোনো কিছুর মীমাংসা বা সিদ্ধান্তও এঁদের নেই। শুধু একটা রহস্যময়তা সৃষ্টি বা ভাবের একটা আভাস ফুটিয়ে তোলাই এঁদের লক্ষ্য। সাইমন্স বলেন, "The doctrine of mysticism with which all the mystical literature has so much to do....presents us....with a theory of life which makes us familiar with mystery.....The final uncertainty remains."[৪] একজন বিশিষ্ট সমালোচকের কথায়, "অবিশ্বাসিগণের মনে ভয়ের, বিস্ময়ের অথবা কোন সৌন্দর্যের আবছায়া ফেলিয়া হেঁয়ালি সুখের 'সুরসুড়ি' দেওয়াই হইল সিম্বোলিস্টগণের প্রধান উদ্দেশ্য।"[৫] সুতরাং অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ছাড়াও অন্য কোনো কিছু

১. A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame, while allegory is one of many possible representation of an embodied thing or familiar principle—the one is revelation, the other an amusement....Symbolism said things, which could not be said so perfectly in any other way, needed but a right instinct for its understanding, while Allegory said things which could be said as well or better in another way and needed a right knowledge for its understanding. (*Ideas of Good and Evil*).

২. ডাবলিউ বি ইয়েট্‌সের *'Ideas and Evil'*. ৩. *Oxford English Dictionary*, P. 259.
৪. আর্থার সাইমন্সের *The Symbolic Movement* থেকে শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাঙ্ময়শ্রী' গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ: ৭১. ৫. ঐ বাঙ্ময়শ্রী—শশাঙ্কমোহন সেন; পৃ: ৭১.

তত্ত্বকথার আভাস-সাংকেতিক নাটকের বিষয় হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। এ নাটকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যে বীভৎস রূপ দেখানো হয়েছে—এবং যেভাবে ধনতান্ত্রিক রাজা স্বর্ণনেশায় স্বয়ংসৃষ্ট জালে বন্দী হয়ে আর্তনাদ করেছেন এবং যেভাবে নন্দিনীর সংস্পর্শে রঞ্জনের প্রাণদানের মধ্য দিয়ে রাজা তাঁর নিজ সত্তাকে ফিরে পেয়েছেন—তার সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ একেও তো রূপক-সাংকেতিক বা সংকেতমুখ্য রূপক নাটক বলতে হবে।

উনিশ শতকে অতিবাস্তবধর্মী (**Naturalism**) ও বাস্তবধর্মী মতবাদের প্রবলতম প্রতিক্রিয়ায় এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাংকেতিক আন্দোলনের উৎপত্তি। এই আন্দোলন সর্বপ্রথম ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল সেখানকার নব্য রোমান্টিক কবিরা যখন গতানুগতিক **Art for arts' sake** বা কলা-কৈবল্য-বাদী কবিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের সিম্বোলিস্ট বলে ঘোষণা করেন। আইরিশ কবি ইয়েটসের সঙ্গে তাঁরাও সংকেত-এর সাহায্যে চিত্তের মর্জিকে প্রকাশের জন্য চেষ্টা করতে থাকলেন।

তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপে তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। ছায়াময় কুয়াসাচ্ছন্ন রাজ্যে পাড়ি দেবার অধিকার তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন। অজানাকে জানবার ও জানাবার জন্যে তাঁরা আগ্রহী হলেন। বাহ্য কোনো পার্থিব ঘটনা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকলেন না। অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপারের পেছনে তাঁরা দৃষ্টি দিলেন—সংকেত ছাড়া তো তাকে ধরা ছোঁওয়া যায় না। তাই সংকেতকে আশ্রয় করতে হল তাঁদের। বেলজিয়ামে এই সময় একটি নূতন প্রতিভা—নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক দেখা দিলেন। নাট্যজগতে তিনি বিস্ময় ও স্বপ্নের পসরা নিয়ে এলেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি এলেন ফ্রান্সে ও সেখানকার বিখ্যাত কবি ম্যালার্মের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সিম্বোলিস্ট আন্দোলনে যোগ দিলেন। রহস্য ও অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটন-প্রয়াসী মেটারলিঙ্ক নাটকে এক নূতন রীতি নিয়ে এলেন। গতিহীন নাটক (**Motionless drama**) বা স্থিতিশীল থিয়েটার (**Static**) তিনি চাইলেন। তিনি দেখালেন, আমাদের বহু-পরিচিত জগতের অন্তরালে রয়েছে দুরধিগম্য অন্ধকার পুরী। মানুষের পরিচিত বাক্যে সেই পুরীর সংবাদ সবটা দেওয়া যায় না—অথচ সেই নীরব নিথর শান্ত জগতেই রয়েছে বিশ্বের চরমতম সত্য। এ জগতের অন্তরালবর্তী সেই গুহাহিত সত্য ও আনন্দের সন্ধানে মেটারলিঙ্কের 'তিলতিল' ও মিতিল নীলপাখীর পেছনে ধাওয়া করেছিল। জার্মানীর হাউপ্টম্যানের 'The sunken Bell' নাটকের হেনরিক পর্বতের চূড়ায় ঘণ্টা বাঁধতে গিয়ে জলাশয়ে হারিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারায়' ঝর্ণার ধারে কুড়িয়ে পাওয়া যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্রের বাঁধ ভাঙতে গিয়ে মুক্তধারায় চিরকালের জন্যে ভেসে গিয়েছিল। এখানে চরিত্রগুলোও যেমন, তেমনি ঐ নীলপাখী, ঐ Sunken Bell, ঐ মুক্তধারা—সবই সংকেত বা প্রতীক। ইংরেজি সাহিত্যে জেরোম, কে জেরোম, ইয়েট্স প্রমুখ সাংকেতিক সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ফ্রান্সে এডমণ্ড রস্টাণ্ড, আমেরিকায় পার্সি ম্যাকায়িও এ শ্রেণীর নাটক লিখেছিলেন।

রূপক নাটকেও একটি অস্পষ্ট ভাবকে পরিচিত কাহিনীর ছদ্মবেশে উপস্থাপিত করা হয়। সেই ভাবটি রূপকের আবরণে না বললে যে বলা চলে না তা নয়। কিন্তু সরাসরি উপস্থাপিত করার পথে নানা বাধা আসতে পারে। কখনো এ বাধা সামাজিক, কখনো ধর্মীয় আবার কখনো রাজনৈতিক। নানারূপ বাধা-ভীতির জন্যে অনেক সময় রূপক-রচয়িতা রূপকের আশ্রয় নেন। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে, যে ভিতরের বস্তু বা তত্ত্ব বা নীতিটিকে তিনি বলতে চাইছেন, তা অত্যন্ত নীরস কিংবা তা অমূর্ত এবং অস্পষ্ট, তখনো রূপকের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রূপক-নাট্যের ভিতরের অর্থটি যদি হয় কোনো অব্যক্ত ভাব বা তত্ত্ব, তাহলে আগাগোড়া সমান্তরালভাবে প্রবহমান বাহ্য কাহিনীর সাহায্যে তাকে রূপ দেওয়া অন্ততঃ নাটকে সম্ভব হয় না। তখন মাঝে মাঝে সংকেতেরও আশ্রয় নিতে হয়; আর সেইজন্যই রূপক নাটকে তখন সংকেতের মিশ্রণ ঘটে যায় এবং এই কারণেই নাটকটি দর্শন-কালে মাঝে মাঝে তার মূল অর্থ ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর নাটকে অর্থাৎ যেখানে রূপকের প্রাধান্য এবং মাঝে মাঝে সংকেতের প্রয়োগ, তাকে মিশ্র রূপক নাটক বলা উচিত। আবার যে নাটকে সংকেতের প্রাধান্য কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু ঘটনাংশে রূপক-সৃষ্টির প্রয়াস তাকে সংকেত মুখ্য রূপক নাটক বলা চলে। আমাদের বাংলা নাট্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর রূপক-সাংকেতিক নাট্যের যথার্থ প্রবর্তক এবং এ বিষয়ে অদ্বিতীয় শিল্পী। তাঁর 'রাজা' 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' সাধারণভাবে সংকেত বা প্রতীকমুখ্য রূপক নাটক। এবং সূক্ষ্মভাবে রূপক-সাংকেতিক নাটক।[১]

কাব্য-নাট্য

অতি আধুনিককালে পাশ্চাত্যে এবং তার অনেক পরে আমাদের বাঙলা নাটকে নতুন ক'রে কাব্যনাট্য রচনার দিকে কোনো কোনো নাট্যকার প্রবণতা দেখাচ্ছেন। কাব্যে বা কবিতায় নাটক রচনার ধারাটি অতি পুরাতন। প্রাচীন গ্রীক ট্রাজিডিগুলিতে কাব্য-সংলাপ নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিল। ষোড়শ শতকের জগৎবিখ্যাত মহাকবি শেক্সপীয়র কাব্যসংলাপকে আশ্রয় করে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃত নাটকে বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের ভাষা সুনির্দিষ্ট থাকলেও কাব্য-সংলাপের প্রয়োগ যথেষ্টই হয়েছে। আমাদের রবীন্দ্রনাথও নাটকে কাব্যসংলাপ ব্যবহার করে তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রতীচ্যে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত ট্রাজিডি নাটকের প্রধান বাহন ছিল কাব্যভাষা। সুতরাং নাটকে কবিতার প্রয়োগ কিছু নূতন ব্যাপার নয়। প্রাচীন গ্রীক ট্রাজিডি এবং

১. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রনাট্য-সমীক্ষা; রূপক সাংকেতিক' দ্রষ্টব্য।

বিশেষত এলেজাবেথান যুগের ট্রাজিডিগুলিকে সমালোচকেরা কাব্যনাট্য বলে অভিহিত করেছেন। গুরুগম্ভীর নাটকে চরিত্রের আবেগ-উচ্ছ্বসিত গভীরতম আন্তর-অনুভূতিকে রূপ দিতে গেলে গদ্যভাষার পরিবর্তে নাট্যকারগণ পদ্য-ভাষাকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। কাব্যিক ভাষায় হৃদয়ের সুরকে যতখানি উন্নত ও জোরালো করে তোলা যায় এবং এ ভাষায় বিশেষ রীতিতে সজ্জিত শব্দাবলী থেকে যে ধ্বনিতরঙ্গ তোলা সম্ভব হয়, তা গদ্যভাষার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে প্রাচীন যুগে ও রেনেশাঁস যুগের বহু নাট্যকার কাব্য-ট্রাজিডি (Verse Tragedy) রচনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তারপর অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় সমাজ-মানসে অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক চিন্তায় নানা পরিবর্তন দেখা দিল। যুক্তি ও গদ্যের যুগ এল। পুরো শতাব্দী জুড়ে মনন শক্তির প্রাবল্য ও গদ্যের একাধিপত্য চলল। নাটকেও পদ্য-ভাষার পরিবর্তে গদ্যভাষার চাহিদা দেখা দিল। তারও পরে এল অতি-বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকারদের যুগ—ইবসেন, বার্নার্ড শ, গলস্‌ওয়ার্দি, চেকভ প্রমুখ ব্যক্তিরা নাটকের আদর্শ ভাষারূপে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কথোপকথনের ভাষাকে স্বীকৃতি জানালেন। ভাষা নিয়ে এই অতি-বস্তুতান্ত্রিক (Naturalist) শিল্পীরা বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। ইবসেন প্রথম জীবনে কাব্য-নাটক লিখেও শেষে গদ্যের আশ্রয় নিয়ে ঘোষণা করলেন যে, মানুষের চিত্র অঙ্কন করাই তাঁর লক্ষ্য, সুতরাং "I would not make them speak the language of the gods"[১] হেলায় ফেলায় "The Admirable Baskerville"এ Blank verse-এর প্রয়োগ করে বার্নার্ড শ বিদ্রূপ করে বললেন যে, ভাল গদ্য লেখা খুব শক্ত বলে তিনি এ কাজ করেছেন কারণ তাঁর সময় ছিল না 'to write it in prose'. এইভাবে যখন নাটকে গদ্য ভাষা ব্যবহারের বা প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক ও বাস্তব সংলাপ-প্রয়োগের মাত্রা ছাড়িয়ে চলল, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় আবার নতুন করে কাব্যনাট্য লেখার প্রেরণা কেউ কেউ অনুভব করতে থাকলেন। ইয়েটস, টি. এস. এলিয়ট, ম্যাক্সওয়েল অ্যাণ্ডারসন, অস্কার-ওয়াইল্ড, অডেন, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, জন ড্রিঙ্কওয়াটার প্রমুখ কবি-নাট্যকারেরা কাব্যনাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কাব্যনাট্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সকলেরই চেষ্টা উল্লেখযোগ্য তবে এবিষয়ে সব থেকে বেশী সক্রিয় হয়ে টি এস. এলিয়ট নানা প্রবন্ধে কাব্য-নাটকের যুগোপযোগিতা, তাৎপর্য ও নাটকের একমাত্র বাহনরূপে পদ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন, "The human soul, in intense emotion, strives to express itself in verse. It is not for me, but for the neurologists, to discover why this is so the tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial ; if we want to get at the permanent and universal we tend to express ourselves in verse".[২]

টি. এস. এলিয়ট কাব্যনাট্যের পক্ষে যুক্তিই দেন নি, নিজেও এই শ্রেণীর নাটক লিখে

১. *Drama from Ibsen to Eliot* : Raymond Williams (Chatto & Windus) Introduction. p. 22.

২. একই গ্রন্থে টি. এস. এলিয়টের বক্তব্যটি উদ্ধৃত পৃঃ ২২।২.

গদ্যে লিখিত নাটকের থেকে সেগুলির উৎকর্ষ কোথায়, তা বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য[১] কি তা লক্ষ্য করা যাক।

ক. নাটকে আমরা গদ্য বা পদ্য যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন দুই-ই উপেয় বা লক্ষ্য নয় উপায় মাত্র।

খ. নাটকের কথা চিন্তা করতে গেলে তিনরকম ভাষার কথা মনে রাখতে হবে—গদ্য, পদ্য ও এ দুয়ের নিঃসর্তী দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষা।

গ. নাটকে কি গদ্য কি পদ্য উভয় ভাষাতেই স্টাইল ও ছন্দের অনুভব কখনো সচেতনভাবে হবে না। একই নাটকে তাই গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—কারণ দর্শক এ দুয়ের পার্থক্য সচেতনভাবেই করতে পারবেন।

ঘ. শেক্সপীয়রের নাটক বিশ্লেষণ করে এলিয়ট দেখালেন যে, নাটকে পদ্যের প্রয়োগ কিছু প্রথাগত ব্যাপার নয় বা কিছু অতিরিক্ত অলংকরণ নয়—পদ্য নাট্যরসকে ঘনীভূত করে।

ঙ. কাব্য-নাটকের বিষয়বস্তু অতীত পুরাণ বা ইতিহাস থেকেই যে গৃহীত হবে, তার কোনো মানে নেই। 'Family Reunion'-এ এলিয়ট দেখালেন সমসাময়িক জীবনের চিত্রও তাতে স্থান দেওয়া যেতে পারে

চ. ইবসেন ও চেকভের নাটকের এমন কিছু কিছু স্থান আছে, যা পদ্য ছাড়া ভাল ভাবে প্রকাশ করা যায় না—কিন্তু তাঁরা সে-সব ক্ষেত্রে গদ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকায় প্রকাশের দিক থেকে কিছু দুর্বলতা এসেছে। **'Moments of greatest intensity'**-কে প্রকাশ করতে গেলে **'Dramatic Poetry'**র প্রয়োজন। এই সব মুহূর্তে এমন অবস্থা হয় যে, একমাত্র সঙ্গীতই তাকে রূপ দিতে পারে।

ছ. শ্রেষ্ঠ কাব্য-নাট্যে মানবজীবনের ক্রিয়া ও কথাকে এমন শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে নাটকীয় ও সাঙ্গীতিক সুর যুগপৎ ফুটে ওঠে এবং শেক্সপীয়রের নাটকের কয়েকটিমাত্র দৃশ্যেই তা লক্ষণীয়।

জ. গদ্যেও খুব সীমিত ক্ষেত্রে কাব্য-নাটক রচনা করা যায়; তবে তা বড়ই শক্ত।

সিদ্ধান্ত : এলিয়টের কথা বলা হল। এখন সামগ্রিকভাবে বিষয়টি ভেবে দেখে এলিয়টের বক্তব্যের যাথার্থ-বিচার প্রয়োজন। একথা সত্য যে, উনিশ শতকের কিছুকাল পর্যন্ত গুরুগম্ভীর নাটক পদ্যেই লেখা হবে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ইবসেন, চেকভ প্রমুখ বাস্তববাদী নাট্যকারদের গদ্যে নাটক রচনায় অদ্ভুত সাফল্য পুরাতন ধারণাকে অনেকখানি বিপর্যস্ত করেছিল এবং তখন যে নবতর কাব্য-নাট্য লেখার প্রেরণা এল, তা পূর্ববর্তী ছন্দে লেখা প্রাচীন নাটক (**verse play**)-গুলিকে আরও জোরালোভাবে সমর্থন করল। ছন্দে রচিত প্রাচীন নাটকগুলোও আধুনিক সমালোচনায় **Poetic Drama** বা কাব্যনাটক রূপে অভিহিত হল। আর এলিয়টের সময় থেকে কাব্য-নাট্য একটা পৃথক শ্রেণীরূপে গণ্য হল।

---

১. ***Selected Prose*** : **T. S. Eliot (Penguin Books)**-এর **'Poetry and Drama'** প্রবন্ধটি থেকে তাঁর বক্তব্য সূত্রাকারে উপস্থাপিত।

ছন্দে লেখা প্রাচীন ট্রাজিডিগুলির (কি গ্রীক কি এলিজাবেথান যুগের) সাফল্যের মূলে ঐ কবিতাকে অন্যতম কারণরূপে বলা হল। যাঁরা আধুনিক যুগে কাব্য-নাট্য লিখতে থাকলেন তাঁরা বেশীর ভাগ কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবেই লিখছিলেন—রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক চেয়ে নয়। তবুও কাব্যনাট্য জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

কাব্য-নাট্য সম্পর্কে সব থেকে বড় কথা হল, কাব্যছন্দ এর বাইরের কোনো বস্তু নয়। ইচ্ছেমতো ছন্দের খোলস খুলে এ ধরনের নাটককে গদ্যে রূপ দেওয়া যাবে না। ছন্দ হবে এর অন্তর্নিহিত লাবণ্য। কাব্য-নাটকের ভাষাকে নাটকের যাবতীয় ব্যবহারিক ও শৈল্পিক দাবি মেটাতে হবে। নাটকের একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ভাষা কতো তীব্র, হৃদয়-ভাব-ব্যঞ্জক ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে, এই বিচার যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে, আদ্যন্ত নাটকটির মধ্যে কাব্যছন্দ অন্তর্নিহিত লাবণ্যের মতো থেকে মূল রসের পরিপোষক হয়েছে কিনা। শেক্সপীয়র ছন্দে নাটক লিখে যে এমন সফলতা লাভ করেছিলেন, তার মূল কারণ তাঁর লক্ষ্যের সঙ্গে ঐ ছন্দের নিবিড় একাত্মতা—একথা স্বীকার করেও বলতে হবে তিনি এলিজাবেথান যুগের Blank verse এর এমন একটি রূপকে গ্রহণ করেছিলেন, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ছিল। সাধারণ মানুষের কথাবার্তার সঙ্গে, তাদের ভাব-প্রকাশের সঙ্গে ঐ ছন্দের বিরোধ ছিল না। তাই ঐ ছন্দের আশ্রয়ে সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে তিনি বিশেষভাবে সক্ষম হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, বাক্যগুলিকে যখন কোনো ছন্দের অধীনে আনা হয়, তখন শব্দগুলি একটি বিশেষ নিয়মে সজ্জিত হয়ে ওঠে—এই ধরনের বিন্যস্ত শব্দগুলি লোকপ্রচলিত বুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং সামগ্রিকভাবে এর কাব্যিক আবেদন মূল নাটকীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়। এলিজাবেথান যুগের দর্শক অভিনয়-দর্শনের পূর্ব থেকেই জানতেন যে তাঁরা ছন্দে-রচিত নাটক দেখতে যাচ্ছেন; কিন্তু এলিয়ট বলেছেন যে, কাব্যনাটক দর্শনকালে দর্শকদের এ বোধ থাকা উচিত নয়। এলিয়টের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যাপক নিকল বলেছেন—"When poetic drama is made to 'enter into overt competition with prose drama' so that the hearers are, as it were, cheated into believing that no verse, is present at all, the very foundation of that poetic drama is destroyed."[১] এই সূত্রেই এলিয়টের আর একটি বক্তব্য—কাব্য-নাটকে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ একেবারেই চলবে না—এ সিদ্ধান্তও কিন্তু সমস্ত নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের সংস্কৃতে ছন্দে রচিত নাটকে মাঝে মাঝে পাত্র-পাত্রীদের সামাজিক তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগের নিদর্শন আছে এবং তা চিরকালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলেও গণ্য হয়েছে।

আরও একটি কথা ভাববার আছে। আধুনিক কালে কবিতার ভাষা যে রূপ দুরূহ হয়ে পড়েছে এবং মুক্তক ছন্দে যেভাবে তা লেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে

১. *'Perspectives on Drama'*—(J. L. Calderwood ও H. E. Toliver সম্পাদিত) গ্রন্থে নিকলের 'Dramatic Dialogue' প্রবন্ধ পৃ: ৩৩৪।

সাধারণ মানুষের পক্ষে কাব্য-নাটক বোঝাও কঠিন। শেক্সপীয়র যে সর্বজনবোধ্য ছন্দে নাটক লিখেছিলেন, ঠিক সেই ধরনের সুযোগ আধুনিককালের নাট্যকারগণ গ্রহণ করছেন না। কাব্যনাট্যকারদের তাই উপযুক্ত ছন্দ ও পরিচিত শব্দের সন্ধান করতে হবে। রূপক-অলংকার প্রয়োগের দ্বারা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী করে তোলা যায় এবং উপমার ঢিলেঢালা এলায়িত ভঙ্গীকে এখানে সংযত করা চলে। সার্থক চিত্রকল্পের প্রয়োগ-বিষয়েও সচেতন নাট্যকারদের হতে হবে। ছন্দের বন্ধনে নাট্যভাষাকে আবৃত করতে পারলে কাব্যের সূক্ষ্মতম কলাকৌশল দেখাবার সুযোগ কাব্য নাট্যকারগণ নিতে পারবেন। সুতরাং শিল্পগত মূল্যে এ শ্রেণীর নাটককে অনেকখানি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিরূপে গণ্য করা সম্ভব, যদি নাট্যকারেরা তার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও অবহিত থাকেন। বিশ্ববরেণ্য মহাকবি শেক্সপীয়রের কাব্যনাটকের সাফল্যের ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "The verse is adapted to the exigencies of the actor's speaking of the lines, the accentuation of vital words and phrases and the building up of emotional heightening"[১]

ইংল্যাণ্ডের টি. এস এলিয়টের 'Murder in the Cathedral' (1935), 'The Family Reunion' (1939), 'The Cocktail Party' (1949), ক্রিস্টোফার আইশারউডের সঙ্গে সহযোগিতায় ডাবলিউ এইচ অডেনের 'The Dog beneath the Skin', আমেরিকার মাক্সওয়েল অ্যাণ্ডারসনের 'Winterset' আর্চিবল্ড ম্যাকলীশের 'Panic' (1935), রেডিও নাটক 'The Fall of the City' (1937) 'Air Raid' (1938) ফ্রান্সের জুলস্ সুপার ভিয়েলের 'The Sleeping Beauty' (1931) স্পেনে এডুয়ার্ডো মারকুইনারের The Hidden Spring (1931) প্রভৃতি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদেরও পূর্বে আয়ার্লাণ্ডের কবি ইয়েট্স্, গর্ডন বটমলে, ল্যাসেলস্ অ্যাবারক্রম্বি প্রমুখ এই ধারার সূচনা করেছিলেন।

বাঙলা কাব্য-নাট্য : আমাদের বাংলা সাহিত্যে নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য—এই দুটি শব্দ প্রচলিত আছে; যে আলোচনা উপরে এতক্ষণ করা হল, তা কাব্যনাট্যের (Poetic Drama) কথা। কাব্যনাট্যে কাব্যের ছন্দ তো সংলাপে থাকবেই; তাছাড়া নাটকের যে সব বৈশিষ্ট্য—ক্রিয়াশীলতা, ঘটনাধারার পরিণামমুখী অগ্রগতি, উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দর্শককে আবিষ্ট করে রাখা—প্রভৃতিও তাতে থাকবে এবং কাব্যছন্দের সঙ্গে এই নাট্যগুণের চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। কাব্যের আকারে লিখিত হলেও মূলত এ নাটক। নাট্যগুণকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে উপায়স্বরূপ কাব্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নাট্যকাব্যে নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে যে সংলাপ—তাতে কাব্যগুণেরই আধিক্য—কাব্যের রসকে অভিব্যক্ত করার প্রয়োজনে এখানে নাটকীয় রূপ সহায়ক মাত্র।

---

১. গ্র্যানভল বার্কার (Granville-Barker)-এর On Dramatic Method (London 1931 pp 67—112) প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি করে 'The Nature of the Problem' প্রবন্ধে Moody. E Prior (*Perspectives on Drama*), p. 386.

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনা করার জন্যে উৎসাহী হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন এইটিই হবে নাটক রচনার যথার্থ বাহন। কিন্তু তিনি কার্যক্ষেত্রে এই পন্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ গৈরিশ ছন্দে অনেক নাটক লিখেছিলেন—কিন্তু সার্থক কাব্য-নাট্য লিখতে গেলে নাটকের যে নাট্যগুণ তা সব সময় তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তবুও তাঁর এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য দুইই রচনা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। তবুও তাঁর নাটকে কাব্যগুণের কিছু আধিক্য দেখা যায় নাট্যগুণের তুলনায়। অতি আধুনিককালে বাঙলা নাটকেও নতুন করে কাব্যনাট্য লেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে; স্পষ্টত এ আগ্রহ পাশ্চাত্যপ্রভাবজাত। পাশ্চাত্যের এই বহির্গত প্রেরণা থাকলেও কাব্যনাট্য লিখতে গেলে নাট্যকারকেও উদ্বুদ্ধ হতে হয় বিশেষভাবে। সুতরাং অন্তরের তাগিদও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। নানা সমস্যাজর্জর বর্তমান জীবনের গভীরে এখন নানা চিন্তা, নানা ভাব ও আকূতি—হৃদয়-দেশের সেই সব গভীরতম বোধকে প্রকাশ করতে দ্বন্দ্বাত্মক নাট্য—কাব্যনাট্য অনুপযোগী নয়। পঞ্চাশের দশকে বাঙলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য রচনার একটা তরঙ্গ ওঠে এবং আরও কয়েক বছর তার জের চলে। ধীরে ধীরে এ ধারা বয়ে চলেছে এখনো। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গিরিশংকর, কৃষ্ণধর, দিলীপ রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বার্ণিক রায়—প্রভৃতি নাট্যকার কাব্যনাটক লিখেছেন। প্রেমকে উপজীব্য করেই সাধারণত এগুলি লিখিত। তবে দেশবিভাগের পটভূমিকায় লেখা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পরবাসে খোঁজে সে স্বদেশ (১৯৭২) নাটকটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রেম কিন্তু এর মুখ্য বিষয় নয়। 'এপার বাঙলা ওপার বাঙলার লাঞ্ছিত মানুষ স্বার্থ-দুষ্ট বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে এখানে সোচ্চার।

বাস্তবধর্মী নাটক ও অতি বাস্তবধর্মী নাটক :

বস্তুতান্ত্রিক পথে নাটক রচনার নজির প্রাচীনকালেও দুর্লভ নয়। অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডি বা ইউরিপিডিসের ট্রাজিডির মধ্যে বাস্তবতার লক্ষণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু উনবিংশ শতকে সমাজমানসের বিবর্তনে যে অবস্থার উদ্ভব হল তাতে সাহিত্যে বাস্তবতা আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা দিল। এরই ফল বস্তুতান্ত্রিক নাটক। 'Mimesis' শব্দের অর্থাৎ 'অনুকরণ' শব্দের সংকীর্ণ অর্থকে গ্রহণ করে অনেক সাহিত্যিক ও তত্ত্বজ্ঞ সাহিত্যে বাস্তবের প্রতিফলনকে সমর্থন করলেন। এঁদের বক্তব্য হল নাটক যখন জীবনের ঘটনার অনুকরণ, তখন জীবনের ভাল-মন্দ, সুশ্রী-কুশ্রী—সব কিছুকেই এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে কাল্পনিকতা প্রশ্রয় না পায়। যা বা ঘটনা যেমনটি আছে, তাকে তেমনিভাবেই রূপ দিতে হবে। মধ্যযুগের এওলাস ডোনাটাসের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিও বাস্তবধর্মী নাট্যকারদের কম উৎসাহিত করে নি। এওলাস বলেছিলেন, নাটক হল জীবনের প্রতিলিপি, রীতিনীতির দর্পন, সত্যের

প্রতিচ্ছবি। (a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth."[১] বলা বাহুল্য, এঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে বিজ্ঞানচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনের ঘটনাকে দেখতে হবে। বাস্তবজীবনে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই কথা বলার ঢঙটিকে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। জীবনচিত্রকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্যে বৈজ্ঞানিকসুলভ ঐ দৃষ্টিকে সর্বদা সতর্ক রাখতে হবে; এ দৃষ্টি যতই স্বচ্ছ হবে, নাটকও ততই বাস্তব হবে এবং নাট্যকারের মানস-কল্পনা দ্বারা ঘটনা ও চরিত্র অনুরঞ্জিত হওয়ার সম্ভাবনাও তত কমে যাবে। রঙ্গমঞ্চে পরিচিত বাস্তবজগতের এমনই এক প্রতিরূপ সৃষ্টি করে তুলতে হবে যাতে অভিনীয়মান নাটকের চরিত্রগুলিকে দেখে এমিল জোলার কথায় মনে হবে, "They might not seem to 'play' but rather to 'live' before the spectators"[২] একান্ত পরিচিত জীবনকে কোনো অর্থেই বর্জন নয়, জীবনের কোনো আদর্শায়িত রূপ নয়, সমাজের উঁচুতলার মানুষদেরই শুধু কথা নয় সমগ্র সমাজের বিচিত্র মানুষের, অবহেলিত মুটে মজুর, মিস্ত্রী, কসাই, সর্বহারা, রিক্ত, নিঃস্ব, অস্পৃশ্য, উপদ্রুত নানা মানুষ, পতিতা প্রভৃতিদের জীবনকথা উপস্থাপনের জন্য তাঁরা আগ্রহী হলেন। বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকারদের এই বাস্তবতা-প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা আর একটি নূতন মতবাদের জন্ম দিয়েছে—ন্যাচারালিজম বা স্বভাববাদ। ১৮৬৮ থেকে এ ধারার সূচনা। এমিল জোলা সর্বপ্রথম তাঁর উপন্যাসকে এ নামে অভিহিত করেন ও নাটকেও এ রীতির প্রয়োগ করেন। ডারউইনের 'On the Origin of Species' গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে তিনি স্বভাববাদের ধারণা পেয়েছিলেন। এঁরা বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকারদের চেয়ে আরও একধাপ অগ্রসর। জার্মানীতে নাট্যকার ক্রিড রিশ্ হেবেলের বন্ধু হারম্যান হেট্নার তাঁর 'Das Moderne Drama'-তে ঘোষণা করছিলেন যে, স্বভাব বা প্রকৃতিবাদমূলক নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে গেলে 'Playwrights must strive atonce to concentrate on Psyobological truth and on a deep understanding of social forces."[৩] যন্ত্রসভ্যতার অতিরিক্ত উন্নতির ফলে মানুষ দেখল যন্ত্রের সীমাহীন শক্তির কাছে সে কত অসহায়,—বৈজ্ঞানিক চিন্তা মানুষকে জানিয়ে দিল যে মানুষ পরিবেশ ও অবস্থার দাস, তার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের তেমন মূল্য নেই। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্য কিছু থাকল না। এই অবস্থায় এক শ্রেণীর নাট্যকার দেখলেন যে, অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের চিত্রাঙ্কনই হবে একমাত্র পন্থা। প্রকৃতিবাদীদের আন্দোলন সচেতন ও সংগ্রামশীল। তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ভয়ঙ্কর ও কদর্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে উপস্থাপনের দিকে জোর দিলেন। শুধু তাই নয়, এঁরা আরও জানলেন যে বংশধারা, পরিবেশ ও প্রবৃত্তিজাত শক্তির হাতে মানুষ নিষ্ঠুরভাবে

১. *Theory of Drama* : A Nicoll-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত P. 24।
২. ঐ, ঐ pp. : 25.
৩. *World Drama* : A Nicoll P. P. : 52।

পুতুল মাত্র। তাই "The individual was to be exhibited as the Product puppet and victim of the inexorable forces of heredity, instinct and environment, for man was to be regarded as a wholly natural object subject to the natural processes".[১]

নরওয়েবাসী ইবসেন, জার্মানীর হাউপ্টম্যান, সুইডেনের স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি নাট্যকারদের অনেক নাটক স্বভাববাদমূলক। ফ্রয়েডের অবচেতন মনের কথা স্মরণে রেখে স্ট্রীণ্ডবার্গ চরিত্রের অজ্ঞাত আচরণের ওপর গুরুত্ব দিলেন। 'Miss Julia'-তে তিনি এক স্নায়বিক রোগগ্রস্তা তরুণীর জীবনের ট্রাজিডি দেখিয়েছেন। অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে বংশগত ধারা, প্রবৃত্তি ও পরিবেশ কিভাবে জুলিয়ার জীবনে অদৃষ্ট হয়ে তার জীবনকে ব্যর্থ করেছে তারই চিত্র তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। 'The Father' ও 'The Dance of Death' এ তিনি দেখিয়েছেন নর-নারীর সংগ্রাম। স্পষ্টভাবে নিজের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—The true naturalism is that which seeks out those points in life where the great conflicts occur, which loves to see that which cannot be seen everyday, rejoices in the battle of elemental powers, whether they may be called love or hatred, revolt or sociability"[২] হাউপ্টম্যানের ন্যাচারালিজ্‌ম একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'Weavers'-এর নায়ক এক শ্রেণী চরিত্র, দরিদ্র শ্রমিক—তার জীবনে ট্রাজিডি এল যন্ত্রশক্তির সঙ্গে মানুষী-শক্তির প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা থেকে। এ সব নাট্যকারেরা প্রচলিত ভাষারূপকে নাটকে স্থান দিতে চান না—তাঁরা "more interested in imitating natural speech"[৩] চেকভ, সিঙ্গ, পিরানদেল্লো, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি নাট্যকারগণও সচেতনভাবে নাটকে বাস্তবতা প্রবর্তন করেছেন। রেমণ্ড উইলিয়াম তাঁর 'Drama from Ibsen to Eliot' গ্রন্থে এঁদেরও ন্যাচারালিষ্টিক নাট্যকাররূপে অভিহিত করেছেন। আবার অধ্যাপক নিকল, গ্যাসনার প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ এঁদের বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকাররূপেই চিহ্নিত করতে চান। সে যাই হোক, এঁরাও জীবনের বাস্তব-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে অনেক নাটক লিখেছেন। ফ্রান্সে আলেকজাণ্ডার ডুমা, পল আরেঁ, জার্মানীতে হেবেল, রাশিয়াতে চেকভ, টুর্গেনিভ, আয়র্ল্যাণ্ডে সিঙ্গ, ইংলণ্ডে বার্ণার্ড শ প্রমুখ নাট্যকাররা এই পথেই অগ্রসর হলেন। এঁদের অনেকের নাটকে মননশীলতার প্রাধান্য এবং যুক্তি-তর্ক-বিচারের প্রবণতা দেখা গেল। শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শ্রমিক-শক্তির অভ্যুত্থান, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, গণ-বিপ্লব প্রভৃতি নানা বাস্তব সমস্যা এঁদের নাটকে রূপ পেল। নাট্যকারদের মধ্যে মতবাদ-প্রচারের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

১. গ্যাসনারের *Form and Idea in Modern Theatre* pp. 67.

২. জে মুলারের *'The Spirit of Tragedy'* গ্রন্থে Modern Tragedy-র আলোচনায় উদ্ধৃত।

৩. *Drama From Ibsen to Eliot* গ্রন্থে—Raymond Williams. P. 22.

আমাদের বাংলা নাটকে রবীন্দ্রপূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত যে বাস্তবতা লক্ষ্য করা গেছে, তার সঙ্গে উনিশ শতকীয় আন্দোলন জাত বাস্তবতার তুলনা ঠিক নয়। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'এ মধুসূদনের প্রহসনে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' বা কমেডিগুলিতে, গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে যে বাস্তবতা আছে—তা নাট্যকারদের অতিশয় সচেতন মনোভাবজাত নয়। তবুও সেগুলি বাস্তবধর্মী নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ, 'মুক্তধারা'য় যন্ত্রনির্ভর ধনতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা 'রক্তকরবী'তে বর্তমানকালের বাস্তব শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র আছে। কিন্তু যে ভাবে এদের উপস্থাপনা হয়েছে এবং যে ভাবে এর সমাধান দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের মিল নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবশ্য আমাদের নাট্যকারদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে দেখা গেছে এবং তাঁরা যথেষ্ট ভাল নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তার', মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' প্রভৃতি প্রচুর বাস্তব জীবনধর্মী নাটক লেখা হয়েছে। এগুলিকে অবশ্যই বাস্তবধর্মী নাটক বলা যায়, কিন্তু স্বভাববাদমূলক নাট্যপ্রবর্তনের আন্দোলন আমাদের দেশে কোথায় ?

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকই হোক আর প্রকৃতিবাদই হোক, মনে রাখতে হবে নাটকে বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ কখনই সৃষ্টি হয় না। ঘটনা, চরিত্র ও ভাষা অনুকরণের সময় নাট্যকারের বিশেষ পরিকল্পনা ও বিশেষ দৃষ্টিতে তা রূপান্তরিত হতে বাধ্য। সাহিত্যের এই তত্ত্বকথাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তথাপি নাট্যকারদের বাস্তবতার দিকে ঝোঁক যেখানে প্রবল, সেখানেই এ শ্রেণীর নাটক রচিত হতে পারে—কিন্তু দেখতে হবে তা কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে।

অভিব্যক্তিবাদী নাটক (Expressionistic Drama) :

অভিব্যক্তিবাদী নাটক জার্মানীতে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জন্ম ও বিকাশলাভ করে। বাস্তবধর্মী ও অতিবাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় এই মতবাদটির উদ্ভব ঘটেছিল। ইম্প্রেসনিজম (Impressionism) নামে একটি মতবাদ বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্সে উদ্ভূত হয়েছিল চিত্রে ও সঙ্গীতে। 'ইম্প্রেসনিজম' প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের অতি-আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা—নাটকের কোনো রূপ বা শৈলী নয়। অভিব্যক্তিবাদ ইম্প্রেসনিজমের অতি-আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বভাববাদের বা বাস্তবধর্মীয় (Naturalism) আত্যন্তিকতা কোনটিকেই স্বীকার করে না। এই বাদ অভিনয়কে একটি বিশেষ পদ্ধতি ও উপায়ে উপস্থাপিত করে। এঁরা জীবনের রূপকেই তুলে ধরেন। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর, যন্ত্রশিল্পের অতিরিক্ত প্রসারে জীবন নিরুপদ্রব রইল না। যুদ্ধান্তে বিপর্যস্ত জীবনে দেখা দিল নানা অশান্তি। যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মানুষ কখনো যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ল, কখনো বা নিদারুণ প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান তার অসন্তোষে চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যখন অনিশ্চয়তা,

তখন অভিব্যক্তিবাদীরা নিজেদের দৃষ্টিতে উপলব্ধ সত্যকে একটুখানি অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরতে চাইলেন। অতিবাস্তবধর্মী নাট্যকারদের মতো তাঁরা বস্তুকে তার যথাস্থিত রূপে দেখলেন না—অভিনয় প্রত্যক্ষ বাস্তবের অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত সত্য আছে (Inner reality) তাকে উদ্ঘাটন করাই এদের উদ্দেশ্য। তাই বিষণ্ণতা, বিচ্ছেদ-বেদনা, তিক্ততা বা মনো-বিশ্লেষণ এঁদের নাটকে বেশী লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ বা যন্ত্রসভ্যতার প্রতি এদের বক্রদৃষ্টি—প্রচলিত নীতির প্রতিও এঁদের শ্রদ্ধা নেই।

এ শ্রেণীর নাটকে নায়ক একজন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিচরিত্র নয়, শ্রেণীচরিত্র বা সাংকেতিক চরিত্র। এ নাটকের ঘটনা কাল্পনিক ও বিশৃঙ্খল—আকস্মিকতার লক্ষণও যথেষ্ট। এর ভাষায় উচ্ছ্বাসময় কবিত্ব ও অসংলগ্নতা এবং বাক্য বা শব্দের পৌনঃপুনিকতা। তাছাড়া অভিনয়কালে অভিনেতার বিশেষ সাজসজ্জা, মুখোস, কোরাস, আলোকসম্পাত ও দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এ শ্রেণীর নাটকে থাকে অঙ্কের পরিবর্তে ছোট ছোট দৃশ্য, সংলাপে প্রত্যেকটি ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চার্য, আলোকসম্পাতে যথেচ্ছ স্বাধীনতা এবং বহু চরিত্রকে উপস্থাপিত করে সমষ্টি-শক্তির আভাস কিংবা ব্যক্তিচরিত্রকে বহু চরিত্রের প্রতিনিধি করে সমষ্টি-শক্তির ব্যঞ্জনা। এক্সপ্রেসনিস্টরা অরূপবাদী নন। তাঁরা মনের ভাব-সত্যকে রূপ দিতে চান। বিষণ্ণতা, তিক্ততা, মনোবিশ্লেষণ গাম্ভীর্য প্রভৃতি নানা দিকেই তাঁদের প্রবণতা। বিদ্রোহাত্মক মন নিয়ে জীবনের অনেক কিছুকেই এঁরা আক্রমণ করেন। এঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি টাইপধর্মী এবং নাটক ভাব-নির্ভর নয় বুদ্ধি নির্ভর।

যখন জগতের নৈরাজ্যের দিকটি এ নাটকের অভিনয়ে দেখানো হয়, তখন দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যাখ্যামূলক বাস্তব ও উৎকাল্পনিক দৃশ্য বারবার উপস্থাপিত হয়। নব্য রোমান্টিকদের সঙ্গে এক্সপ্রেসনিস্টদের একটি পার্থক্য আছে। যন্ত্রসভ্যতার গ্লানিকর পরিবেশে বা তার অত্যাচারে নব্য রোমান্টিকরা পলায়নপর হন, অথবা তাকে বিস্মৃত হতে চান। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকার যন্ত্র দেখে উৎসাহিত হোন বা বিব্রত হোন (যখন যন্ত্র পীড়াকর), যন্ত্রের অস্তিত্বকে কখনো তাঁরা অস্বীকার করেন না এবং যন্ত্র-প্রভাবিত রাজ্য থেকে পলায়নও করেন না। যন্ত্রশিল্পে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে এঁরা স্বীকার করে নেন ও সাহসের সঙ্গে যন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়ার চিত্র দেখান। তাই অধ্যাপক নিকল বলেন, "The Expressionist often is a tortured, sometimes a desperate soul, but he does not wish to obnegate the world he lives in"[১]

ওয়ালটার হাসেনক্লেভারের লেখা Der Sohn বা The Son এই রীতির নাটক এবং এটি অভিনীত হয় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে।

জার্মানীতে এ শ্রেণীর নাটকের উৎপত্তি হলেও অন্যান্য দেশেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং নানাদেশে এ ধরনের নাটক লেখার প্রবণতা সেই সময়ে দেখা যায়। জার্মানীর কাইজারের 'Gas' (1920 দুই খণ্ড), 'From Morn to Midnight', পূর্ব ইউরোপের

১. *World Drama* (G. G. Harrap & Co. Ltd.) A Nicoll, P. 796

কারেল ক্যাপেকের R.U.R. (1921) পোল্যাণ্ডের ক্যারল রস্টওরোস্কির Charity (1920), সুইডেনের পার লাগের্কভিস্ট-এর 'The Last Man' (1917), ইংলণ্ডে জি. কে মুনরোর 'The Rumour', আমেরিকার হাওয়ার্ড লসনের 'The Processional' ইউজীন ও নীলের 'The Emperor Jones', 'The Henry Ape'—প্রভৃতি হল অভিব্যক্তিবাদী নাটকের দৃষ্টান্ত।

এর মধ্যে কাইজারের 'গ্যাস' নাটকে মুনাফা-উদ্দেশ্য প্রণোদিত যন্ত্রশিল্পের দ্বারা আধুনিক সভ্যতা কিভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে, তারই সাংকেতিক উপস্থাপনা। 'From Morn to Midnight'-এ বর্তমান সভ্যতার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও নিরর্থকতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং এই সভ্যতার যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ হৃত ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে কিরূপ ব্যর্থ হয় তারই কাহিনী আছে। ব্যাঙ্কের এক নগণ্য কেরাণী এর নায়ক—অবশ্যই এ একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কিছু টাকা সে আত্মসাৎ করেছে বিদেশের একটি অভিজাত মেয়েকে লাভ করার স্বপ্নে। কতকগুলি ভয়ঙ্কর ও অবাস্তব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তার নানা ধরনের অভিযান ও প্রয়াসের বিষয়টি দেখানো হয়েছে। কিন্তু তার মেয়েটিকে লাভ করার মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেছে—অর্থ-আত্মসাতের ব্যাপারটি পুলিশের গোচরে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা না করে পারে নি—"So ends the tragedy of a white-collar slave who tried to live like a man"[১]

এই একটিমাত্র নাটকের ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকেই বোঝা যায় এঁদের নাটক কি ধরনের। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী-দের প্রিয় এঁদের নাটক কিন্তু দীর্ঘজীবী হল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই অভিব্যক্তিবাদী নাটকের প্রবাহ অবলুপ্ত হল।

পৌরাণিক নাটক :

পৌরাণিক নাটক বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। যথার্থ পৌরাণিক নাটক উনবিংশ শতকে বাঙালী দর্শক সমাজের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। আর ঐ শতকের শেষদিকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নাট্যকারদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লিখিত হয়েছিল। নব্য হিন্দুধর্মের উত্থান বিনাশ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে বাঙালী দর্শক সমাজে পৌরাণিক নাটকের বিপুল চাহিদা দেখা দিয়েছিল—তারই ফল পৌরাণিক নাটক। সাধারণভাবে আমরা বুঝি, যে নাটকের বিষয়বস্তু বা বৃত্ত পুরাণ থেকে গৃহীত তাই হল পৌরাণিক নাটক। পুরাণ বলতে আমাদের প্রাচীন অর্বাচীন অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সবই বুঝতে হবে। কিন্তু প্রকৃত পৌরাণিক নাটকের এই সংজ্ঞা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। বাঙলা এমন নাটক আছে যেগুলির বিষয়বস্তু পুরাণ-বর্ণিত যেমন রামনারায়ণের 'রুক্মিণীহরণ', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'—কিন্তু এগুলিকে যথার্থ

১. *Masters of the Drama* : John Gassner. (Dover Publications, New York) P. 487.

পৌরাণিক নাটক-বলা যায় না। এ সব নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও পুরাণের যে বিশিষ্ট আবহাওয়া বা পুরাণের যে বিশেষ লক্ষণ তা এগুলিতে নেই। যথার্থ পৌরাণিক নাটকের এই বিশেষ লক্ষণগুলি কি? বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।—বায়ু, ৪.১২-১১.

অর্থাৎ যাতে সৃষ্টি (সর্গ), প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়কালে পূর্ব সৃষ্টি ধ্বংসের পর নূতন সৃষ্টির বিকাশ, 'বংশ' অর্থাৎ দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা, 'মন্বন্তর' অর্থাৎ মনুগণের শাসনকাল, বংশানুচরিত অর্থাৎ নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস—এই পাঁচটি লক্ষণ যাতে থাকে তাই হল পুরাণ। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ভাগবত প্রভৃতি আঠারখানি পুরাণের মধ্যে চার খানিতে বিষ্ণুর, দু'খানিতে ব্রহ্মার, দু'খানিতে রবির এবং বাকিগুলিতে শিবের মহিমা কীর্তিত। সুতরাং দেব-মহিমা-কীর্তনই পুরাণগুলির মূল কথা।

পৌরাণিক জগৎ এমন একটি রাজ্য যার সঙ্গে আমাদের বর্তমান বাস্তব জগতের মিল খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল। এ জগতের রাজকীয় ঐশ্বর্য, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, অতিপ্রাকৃত সংঘটন, একালের যুক্তিবাদী মানুষের কাছে রূপকথার রাজ্য বলে মনে হবে। এ জগতের মানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবদেবীদের এক অতি নিকট সম্পর্ক—মর্ত্যমানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবতাদের সংযোগ অনায়াসেই ঘটে থাকে। দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবধানও তেমন কিছু নয়—স্বর্গের দেবতারাই মর্ত্যের মানুষের জীবন-যাত্রাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। অভিশপ্ত হয়ে অনেক দেবতা নরদেহে মর্তে আসছেন—শাপান্তে আবার তাঁদের মুক্তি ঘটছে। দেবতারা কখনো বা সশরীরে মর্ত্যে আবির্ভূত হচ্ছেন—কখনো তাঁদের প্রতিনিধি স্বরূপ কাউকে অবতাররূপে কিংবা স্বয়ং ভগবান অবতারী রূপে মর্ত্যে লীলা দেখাচ্ছেন। এই সব দেবতাদের লীলা-মহিমার কথা, কিংবা দৈবশক্তিতে শক্তিমান মানুষের কথা যখন উপরি-উক্ত পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে নাট্যগুণান্বিত হয়ে ওঠে, তখনই তা প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিক নাটক। এ নাটকের অঙ্গীরস হবে 'ভক্তিরস'। দর্শকচিত্তেও ভক্তিরসোদ্রেক করা পৌরাণিক নাট্যকারের লক্ষ্য। দর্শক যদি অতিরিক্ত যুক্তিবাদী হন, অন্তরে যদি দৈবী-ভক্তি ও অবিচল বিশ্বাস না থাকে, তাহলে এ নাটক তার কাছে কোনো আবেদন সৃষ্টি করবে না। পৌরাণিক নাটকে যে বৃত্তটি থাকে, তার এক অংশে থাকে কোনো বিশিষ্ট দেবতার মহিমা খ্যাপন, আর অন্য অংশে থাকে কোনো দৈবশক্তিমান, অথবা দৈব-অভিশপ্ত মানুষের কথা। সাধারণত এই মানুষের কথা-সংবলিত মর্ত্যলোকের কাহিনীটিকে উদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে যুক্ত করে নাট্যবৃত্ত রচিত হয় এবং মর্ত্যবাসী মানুষের জীবন-চিত্রণে গুরুত্ব দিয়ে তাতে নাট্যরস সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গুরুত্ব যতই দেওয়া হোক—দেবতার শক্তি বা দেবতার লীলা—তা নাটকে নেপথ্যেই থাক আর প্রত্যক্ষভাবে যত নিষ্ক্রিয়ভাবেই থাক, তাই সমগ্র নাটকের নিয়ামক শক্তি। ধর্মপ্রাণ দর্শককে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করে চিত্তে ভক্তিরসের

সঙ্কার পৌরাণিক নাটকের মূল উদ্দেশ্য—সেইজন্য একে শুধু পৌরাণিক নাটক না বলে ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটক বলাই সঙ্গত। উনিশ শতকের শেষদিকে এ নাটকের সম্যক বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ভক্তিরস এ নাটকের মূল কথা হলে এতে নাটকীয়তা রক্ষা করা হবে কিভাবে? মর্ত্য-মানুষের জীবনে প্রথম দিকে উদ্দিষ্ট দেবতা সম্পর্কে একটা ভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেব-মানবের বিরোধ কল্পনা করা হয় এবং নাটকের বৃত্তে বহুদূর পর্যন্ত দ্বন্দ্বাত্মক রূপটিকে রক্ষা করা হয়। মোট কথা অভিশপ্ত দেবতা বা স্বর্গের দেবতার অংশভাক্ মর্ত্যমানুষকে ঘিরে নাট্যকারকে যত কিছু নাটকীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। পাশ্চাত্য আদর্শে পাঁচ অঙ্কে নাট্যবৃত্তটিকে রচনা করে এখানেও নাট্যকারকে কাহিনীর বীজবপন, অগ্রগতি, চূড়ান্ত রূপ, সুরের অবনয়ন ও উপসংহার দেখাতে হয়। কিন্তু এ নাটকের পরিণামে আমরা কি দেখি? স্বর্গের অভিশপ্ত মানুষটি হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরে দেবমহিমায় উচ্ছ্বসিত, অথবা তাঁর আপাতপরাজয়ের মধ্য দিয়ে পরম-প্রাপ্তির আনন্দে তিনি মুক্ত পুরুষ।

তাই প্রশ্ন ওঠে যথার্থ পৌরাণিক নাটকে ট্রাজিডি রস-সৃষ্টি সম্ভব কিনা। এ নাটকের পরিমণ্ডলে যখন দেবতার লীলা, মানুষের আপাত পরাজয় যখন মহামুক্তির নামান্তর তখন ট্রাজিক-বোধ দর্শকের মনে সৃষ্টি করা খুব কঠিন। মর্ত্যে মানুষ যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তা যদি ঐশী লীলার অন্তর্গত হয়, এবং পরম কল্যাণময় দেবতার রাজ্যে অশান্তি ও বেদনা যদি জীবের মোক্ষলাভের সোপান হয় তাহলে এখানে ট্রাজিডির রস ঘনীভূত হবে কিভাবে? তাছাড়া মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে—যে-সকলের সে ফলভোগ করে, সবই যদি তার কৃতকর্মের ফল বলে ধারণা করা হয়, তাহলে মানুষের দুঃখদুর্দশা ক্ষোভ এবং মনোবেদনার কারণ হলেও ট্রাজিক গভীরতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই একথা খুব সত্য যে, পৌরাণিক ধর্মমূলক ভক্তিরসাত্মক নাটকে পাশ্চাত্যের জীবনবাদপুষ্ট ট্রাজিক-বোধ জাগ্রত করা যায় না। এ-জাতীয় নাটকের অঙ্গীরস যদি ভক্তি হয়, তাহলে ট্রাজিডির ভয় ও অনুকম্পা ভাবোদ্রেকের পথে ভয়ানক ও করুণরস কিভাবে জাগ্রত হবে? তিনটি অঙ্গীরস একই নাটকে থাকা কি সম্ভব? বাঙলা সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর নারায়ণ' নাটকে কেউ কেউ এই ট্রাজিডি রস-সৃষ্টির সার্থকতা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে, পৌরাণিক ভক্তিরসাত্মক নাটকও ট্রাজিডি রূপে গণ্য হতে পারে। এ নাটকের অসামান্য বীর কর্ণ দৈবনিগৃহীত মানুষ। তিনি চান কৃষ্ণের নারায়ণত্বকে যাচাই করতে—আর তাঁর জন্যে তিনি অর্জুনের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ। নাট্যকার কর্ণের মানবিক সত্তাকে যথেষ্ট বড় করেছেন—এত বড় বীরের জীবনে অভিশাপরূপী নিয়তি যেভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করেছে, তাতে দর্শক তাঁর প্রতি ভয় ও করুণাবোধ যে না করে তা নয়—কিন্তু নাটকের মধ্যে ভক্তির পরিমণ্ডলটিও তুচ্ছ করা যায় না। কর্ণের জীবনের নিয়তিশয়

১. নাট্যতত্ত্বমীমাংসা : ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য পৃঃ ১৬৩

শূন্যতা পূর্ণতায় ভরে ওঠে যখন ভ্রাতারা তাঁকে জানায় প্রণাম, দ্রৌপদী স্বীকার করেন তাঁকে নরশ্রেষ্ঠ বলে আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

'অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি পরিপূর্ণ—
পরিপূর্ণ আমি।'

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে চরম অন্তিমে কর্ণ যখন নরনারায়ণরূপে স্বীকৃতি জানান—

"বাসুদেব—বাসুদেব
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর।
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ"

—তখন ট্রাজিডির ব্যথাদীর্ণ ঘনীভূত উত্তাপ ভক্তির স্নিগ্ধ বারিতে শীতল হয়ে আসে। আমাদের পৌরাণিক নাটক কতখানি ভক্তিরস-স্নিগ্ধ পরিবেশ ও কতখানি ট্রাজিডির সুরকে ফুটিয়ে তুলতে পারে তারই এক চরম পরীক্ষাস্থল। অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল নাটকটির অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে তাই মন্তব্য করেছেন,—"মৃত্যুর মধ্য দিয়াও নর-নারায়ণের প্রেম-পরিচয়ে কর্ণের শূন্য জীবন পূর্ণ হইয়া উঠে। ট্রাজিডির বেদনাকে ঢাকিয়া দিয়া মহামিলনের সুর বাজিয়া উঠে। সুতরাং ইহা ট্রাজিডিও নহে"।[১]

যাই হোক, আমরা দেখলাম পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে লেখা নাটক মাত্রেই যথার্থ পৌরাণিক নাটক নয়। গ্রীক ট্রাজিডি-নাটকের কাহিনীগুলি প্রধানত পুরাণ থেকেই গৃহীত; কিন্তু তাই বলে গ্রীক নাটকগুলিকে কেউ পৌরাণিক নাটক বলে না। পৌরাণিক নাটক বলে নাটকের কোনো শ্রেণীও সেখানে স্বীকৃত হয় নি। তথাপি গ্রীক পুরাণ (**Greek mythology**) থেকে নাট্যকারগণ যখন কাহিনী গ্রহণ করেছেন, তখন তাকে নাটকের উপযোগী এবং যুগোপযোগী পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। এই পরিবর্তনের সময় তাঁরা দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রতিবেশটিকে অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। গ্রীক দেবদেবীদের বিশেষত নিয়তির স্বেচ্ছাচারিতা ও মর্ত্যের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নিষ্ঠুরতাকে তাঁরা বিশ্ববিধানের অন্তর্গত করে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্বভাবের অতিরেক বা পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত পাপধারার সঙ্গে তাঁদের যোগটুকু দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের লঘুপাপে গুরুদণ্ডের দিকটি বড় করে তুললেও তাঁরা মানব-মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। তাই সেখানে "**Necessity rules ; Zeus is supreme because he wills what Necessety directs. He is also just. Pride and sin never go unpunished ; if the sinner escapes, the curse hangs over his house. But the guiltless do not suffer ; the curse slumbers until a fresh misdeed calls down the wrath of heaven.**"[২] আমাদের মতো ভক্তিরসের স্রোত গ্রীক পুরাণের কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায় না। দেবতার লীলারসে ও ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে আমরা মর্ত্য-ধৃত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বা দৈব-বিধানের প্রতি ক্ষুব্ধ অসন্তোষকে তেমন আমল দিতে পারি না। ফলে গ্রীক পুরাণের কাহিনী গ্রীক নাটকে

১. বাংলা সাহিত্যের ধারা : ডঃ বৈদ্যনাথ শীল পৃঃ ৪৩২।
২. *Greek Literature* ; H. J. W. Tillyard.

যে নাটকীয়তায় ভাস্বর হয়েছে, আমাদের ভক্তিরস-মুখ্য পৌরাণিক নাটকে তা হতে পারে নি।

পূর্বেই বলেছি, পুরাণের কাহিনী আশ্রয় করে লিখিত নাটক মাত্রই যথার্থ পৌরাণিক নাটক নয়। এতে পৌরাণিক একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে পুরাণের অন্তরঙ্গ লক্ষণগুলিকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি কাহিনীটি পুরাণ থেকে গৃহীত না হয়, অথচ তাতে যদি পৌরাণিক পরিমণ্ডলের অলৌকিকত্ব ও ভক্তিরস প্রধান হয়ে ওঠে (যেমন রামপ্রসাদ বা ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে লেখা নাটক) তাহলেও তাকে পৌরাণিক নাটক বলা যাবে না। কিংবা যদি এমন হয় যে, আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ যুক্তির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পুরাণের ভক্তিরসধারা ও অলৌকিক সংঘটনকে বর্জন করে নতুন দৃষ্টিকোণে পুরাণ-কথার নাট্যরূপ দিচ্ছেন, তাহলেও তাকে ভক্তিরসাত্মক যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা যাবে না—দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী', 'ভীষ্ম' ও 'সীতা' নাটক, মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সমস্ত নাটকে দেবমহিমা নয়—মর্ত্য-মানুষের সুখ-দুঃখানুভূতি যুগোচিত তাৎপর্য লাভ করেছে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও মন্মথ রায়ের ঐ সমস্ত নাটকে পুরাণ থেকে কাহিনী ও চরিত্র গৃহীত হয়েও যদি যথার্থ পৌরাণিক নাটক না হয়, তাহলে এদের কি বলা হবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, উনিশ শতকের মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যেমন পুরাণের কাহিনীকে যুগোচিত রূপ দিয়ে নবপুরাণ সৃষ্টি করেছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে—এঁরাও ঠিক সেই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তাই এঁদের নাটককে 'নব পৌরাণিক' নাটক বলাই সঙ্গত। আবার তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী', 'মালতীমাধব', 'সাবিত্রী-সত্যবান' হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ' রাম-নারায়ণের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'রুক্মিণীহরণ' প্রভৃতিতে পৌরাণিক পরিমণ্ডল বা পুরাণের বিশিষ্ট লক্ষণ নেই—নবপুরাণ-সৃষ্টিরও প্রয়াস নেই। অথচ পুরাণের কাহিনী এগুলিতে আছে। তাহলে এগুলির কি নাম দেওয়া যাবে? অবশ্য এগুলির মধ্যে অনেক নাটক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। মূল সংস্কৃত নাটকগুলি যখন পৌরাণিক নামে আখ্যাত নয়, তখন সেগুলিকে পৌরাণিক বলা সঙ্গত নয়। এগুলির মধ্যে পুরাণের বিষয় নিয়ে লেখা মৌলিক নাটকগুলিকে 'ছদ্ম পৌরাণিক' নাটক বলা উচিত। আমাদের বাঙলাভাষায় পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকে দীর্ঘকালের বিবর্তনে মাঝে মাঝে প্রকৃতি-বদল যে-রকম হয়েছে, তাতে তার শ্রেণী-বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই আমাদের শ্রেণী-বিভাগে এ নাটকের তিন শ্রেণী—ক. ছদ্ম পৌরাণিক, খ ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক ও গ. নব পৌরাণিক।

সামাজিক নাটক ঃ

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা ঘটনা, কিংবা পুরাণ-বর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রকে নিয়ে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি বাস্তব জগতের সামাজিক মানুষের জীবনকে আশ্রয় করে

প্রচুর নাটক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। নাটকের বিষয় যদি মানব জীবন হয়, তাহলে সে-জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না। সামাজিক মানুষ সমাজকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে জীবন-যাপন করতে পারে না। ঐতিহাসিক নাটকে ও ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের চরিত্রেও একটি বিশেষ সমাজের প্রেক্ষাপটে দণ্ডায়মান। কিন্তু এই দুই ধরনের নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে সমাজ-সমস্যাকে বড় করে দেখা হয় না। একটিতে ঐতিহাসিক রস ও অন্যটিতে ভক্তিরসকেই মুখ্য করে তোলা হয়। সুতরাং ইতিহাস ও পুরাণরাজ্যের প্রভাবের বাইরে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তির নানা সমস্যা, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে তার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবারের বহু সমস্যা প্রভৃতিকে নিয়ে যে নাটক কল্পিত হয়, তাকেই আমরা সামাজিক নাটক বলতে পারি।

সামাজিক শব্দটির মধ্যে অর্থ-ব্যাপকতা খুব বেশী। কোনো নাটকে সমাজের রূপটি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে ব্যক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রকাশিত, কোথাও বা একটা গোটা পরিবারকে আশ্রয় করে তার মধ্য দিয়ে বিকশিত, আবার কোথাও তা নানা স্তরের বা কোনো একটি স্তরের মানুষদের জীবনচিত্র উপস্থাপনে সীমাবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে সমাজের রূপটি কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। এই হিসেবে সামাজিক নাটককে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে সমাজের রীতি-নীতি বা আদর্শের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তাকে চলতেই হয়। সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি—সমাজের বিধি-নিষেধ একটি বিশেষ কালে মানুষের কল্যাণের জন্যে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে, ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখা দেওয়ায় চিরাগত সমাজ-বিধিকে অনেক সময় সে মেনে নিতে পারে না। এইখানেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কখনো অতিপ্রবলভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, তার স্বাধীন কামনা-বাসনাকে সমাজবিধি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে, কখনো নীরবে তার অশরীরী প্রভাব ব্যক্তির জীবনে ঘোরতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সমাজশক্তির রূপটি ব্যক্তির মনের গভীরে দৃঢ় আসন পেতে বসে ও তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিরোধ বাধায়। প্রথমটিতে সমাজ-শক্তির প্রতিনিধি কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে নাটকের নায়কের প্রত্যক্ষ বহির্সংঘাত—শেষেরটিতে মানস-সংঘাত। উভয়ক্ষেত্রে সমাজের রূপ বা সমাজশক্তিকে আমরা বিশেষভাবে অনুভব করতে পারি। এগুলি ব্যক্তিসমস্যামূলক সামাজিক নাটক। আবার কখনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বা তার নিজস্ব সমস্যার চেয়ে একটি পরিবারের সমস্যাই অনেক নাটকে প্রধান হয়ে উঠতে পারে; সমাজশক্তির মৃদু বা প্রবল প্রভাবের ফলে একটা পরিবার কি রূপ নিয়েছে, তার বিভিন্ন পাত্রপাত্রী চিরাগত সমাজশক্তিকে উপেক্ষা করে মোহময় নতুন সমাজের আদর্শকে অনুকরণের ফলে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে পরিবারের কর্তাকে বোঝাপড়া করতে হয়। এখানে নায়ক-প্রতিনায়ক একই পরিবারের অন্তর্গত এবং নিকটজন, আর তাদের আচরণ সমাজ-প্রভাবের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ফল। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবারের শোচনীয়

পরিণাম এখানে দেখানো হয়। এই ধরনের সামাজিক নাটককে পারিবারিক নাটক বলা উচিত।

আর এক ধরনের সামাজিক নাটক আছে যেখানে সমাজের নানাস্তরের মানুষের বা কোনো একটি বিশেষ স্তরের মানুষদের আচার-আচরণ, জীবনাদর্শ রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, তাদের জীবনের পরিচয় বা নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, কেরাণী, শিক্ষক, আদিবাসী নানা শ্রেণীর মানুষের—জীবন এখানে রূপায়িত। এ জীবন কখনো সমাজ-সমস্যা কেন্দ্রিক আবার কখনো ঐ বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের মানসিকতার জন্যে তা সমস্যা-কেন্দ্রিক নয়। কিন্তু তাই বলে সমাজ এখানে অনুপস্থিতও নয়। প্রথমটিকে সমস্যামূলক নাটক (**Problem drama**) ও দ্বিতীয়টিকে সাধারণভাবে সামাজিক নাটক বলা যেতে পারে। মোট কথা আলোচনার সুবিধের জন্যে সামাজিক নাটককে এই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. সাধারণ সামাজিক নাটক

খ. সমস্যামূলক সামাজিক নাটক

গ. ব্যক্তি-সমস্যামূলক সামাজিক নাটক

ঘ. পারিবারিক সামাজিক নাটক।

আধুনিক কালে মানুষ বেশী সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবন ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নানা চিন্তায়, নানা সমস্যায় ও মতবাদে জীবন জর্জরিত ও জটিল। সমাজরুচিত নীতি-আদর্শের সঙ্গে অনেকদিন থেকে মানুষের মোকাবিলা শুরু হলেও এখন তা অত্যন্ত বেশী। সেইজন্যে সামাজিক নাটকের চাহিদা এখন বেশী। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বা সুখ এখন জীবনে সহজলভ্য নয়। জিজ্ঞাসা, তর্ক, সংশয় বিদ্রোহাত্মক মনোভাবই চিন্তাশীল মানুষের জীবনে প্রধান হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, জাতিভেদ সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা, বাসস্থান-সমস্যা, নানা রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি বহু কিছুর ভাবনায় নাট্যকারগণ বিব্রত। পাশ্চাত্যের ইবসেন, বার্ণার্ড শ, গলস্‌ওয়ার্দি প্রমুখ নাট্যকারগণ এ সম্পর্কে বহু মূল্যবান নাটক লিখেছেন এবং এখনো আরও অনেকে এই ধরনের নাটক লিখে চলেছেন। যে সমস্যাটিকে নাট্যকার রূপ দিতে চান, বা যার প্রভাবটিকে তুলে ধরতে চান, তার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপটিকে স্পষ্ট করার দক্ষতায় এবং বস্তুতান্ত্রিক পথে সমস্ত কিছুর উপস্থাপন-নৈপুণ্যে এ নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। অধ্যাপক নিকল—মিনাণ্ডারের (**'Arbitration'** নামক প্রেম-মুখ্য কমেডিকে **Problem drama** বলেছেন। স্পেনের লোপ. ডি ভেগার **'Marriages of Conveniences'**-এ (1621) প্রেম ও অর্থের দ্বন্দ্বঘটিত কাহিনীতে অষ্টাদশ শতকের প্রেম বা সমস্যামূলক নাটকের আভাস লক্ষ্য করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকেও এ জাতের নাটক অনেক লেখা হয়েছে। বাস্তবধর্মী বা অতিবাস্তবধর্মী নাটকগুলি (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাও এক হিসেবে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের **Dumas Fils, Angier** উনিশ শতকের ফ্রান্সে

বারবনিতা-সমস্যা, জারজ সন্তান-সমস্যা লোভের ভয়াবহতার সমস্যা নিয়ে সামাজিক নাটক লেখেন। ইংলণ্ডে এ ধারাকে বহন করেছিলেন বার্ণার্ড শ, গলস্‌ওয়ার্দি, জন হ্যানকিন, গ্র্যানভিল বার্কার প্রমুখ নাট্যকারগণ।

বাঙলা সমস্যা-মূলক সামাজিক নাটক হল রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব (কৌলীন্য-প্রথার সমস্যা), নবনাটক, (বহু-বিবাহ সমস্যা), চক্ষুদান (লাম্পট্য সমস্যা), উভয়সঙ্কট (সপত্নী সমস্যা), মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা (লাম্পট্য ও মদ্যপান সমস্যা) উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ (বিধবা-বিবাহ সমস্যা) প্রভৃতি। অনাদৃত মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা ফুটে উঠেছে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ক্ষুধা, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন', সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাষ্টার' ইত্যাদি নাটকে। শিল্পীর দুঃখময় জীবনের চিত্র আছে মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' প্রভৃতি নাটকে। আঞ্চলিক জীবনের পীড়িত রূপ সলিল সেনের 'মৌচোর', মালিক-শ্রমিকের বিরোধ নিয়ে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার', 'ঘুম নেই', মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' প্রভৃতি। পারিবারিক সামাজিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' 'বলিদান', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। সাধারণ সামাজিক নাটক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ', 'চিরকুমার সভা, অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাষ্টার', যোগেশ চৌধুরীর 'পরিণীতা' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক নাটক :

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ইতিহাস' শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ আছে—অতীতকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের নাম ইতিহাস।[১] কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটিকে প্রয়োগ না করে একটি সংকীর্ণ অর্থে এর ব্যবহার হয়। এই অর্থে ইতিহাস হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ যুগের রাজা-রাজড়ার কাহিনী—রাষ্ট্রনৈতিক ইতিবৃত্ত, খ্যাতনামা পুরুষের রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহাদির কথা। 'ইতিহাস' শব্দের এই অর্থ মনে রেখে আমরা বলতে পারি, যে-নাটকের মূল কাহিনী, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনার সহযোগে যা মানবিকগুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্যে রসোত্তীর্ণ তাই হল ঐতিহাসিক নাটক।

'ঐতিহাসিক নাটক'—নামেই প্রকাশ তা একদিকে ইতিহাস ও অন্যদিকে নাটক। নাটকীয়তার পথে রস-সৃষ্টি ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষ্য, আর তা ইতিহাসের উপাদানকে আশ্রয় করেই। ইতিহাসের তথ্য—ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করতে হবে, কিন্তু তার অতিরিক্ত জীবনের রসরূপকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে—কবিকল্পনার সাহায্যে। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়, কারণ ঐতিহাসিক ও নাট্যকারের ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। অতীতে সংঘটিত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণী সত্যতার সঙ্গে চিত্রণ ঐতিহাসিকের কাজ। অ্যারিস্টটল্ বলেছেন 'History is based on facts'. ইতিহাসের তথ্যাতিরিক্ত কোনো কিছু বলার অধিকার তাঁর নেই—শুধু সমস্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ইতিহাস

কোনরূপ নিতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন বা সে সম্পর্কে কিছু অপক্ষপাত মন্তব্য করতে পারেন। কোনো রাজার বিশেষ নীতি বা যুদ্ধবিগ্রহের ফল সমাজের অগ্রগতির পথে সহায়ক কিনা—এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু সংকেত করতে পারেন। কিন্তু নাট্যকারের ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সৃজনশীল কল্পনাই তাঁর বিশেষ মূলধন। ঐতিহাসিক নাট্যকার সম্পর্কে বলা চলে যে ঐতিহাসিকের যেখানে যাত্রাশেষ—সেখানেই তাঁর যাত্রারম্ভ। ইতিহাসের শুষ্ক নীরস কঙ্কালময় কাঠামোতে স্বাধীন কল্পনার রশ্মিপাত ঘটিয়ে তিনি তাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে তোলেন। ইতিহাসের ঘটনা অসংলগ্ন—বিচ্ছিন্ন, একই কালে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পর্য থাকে না। কিন্তু ঐতিহাসিক নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনাগুলি নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সতর্ক হন। একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী, একটি বিশেষ ভাবের (idea) অভিমুখীন করে তিনি প্রয়োজন মতো ঘটনাবলী নির্বাচন করেন এবং তাদের মধ্যে সংযোগ ও ঐক্য রক্ষা করেন। এই ঐক্য জটিল হলেও কোনো ক্ষতি নেই।

মোট কথা, ইতিহাসবৃন্তে মানবজীবনের ফুল ফুটিয়ে তোলাই নাট্যকারের কাজ। ইতিহাসের একটি বিশেষ সীমিত রাজ্যে তাঁর বিচরণ হলেও তিনি নাটকের মূল পরিকল্পনার প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গ্রহণ-বর্জন করেন—প্রয়োজনমতো ছোটখাটো নূতন কল্পিত ঘটনা বা উপাখ্যানও তিনি যুক্ত করতে পারেন। দু'একটি অনৈতিহাসিক চরিত্র আমদানিরও তাঁর অধিকার আছে এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে সম্ভাব্য সত্যের তিনি ইঙ্গিত করতে পারেন। সর্বোপরি ইতিহাস ও মানব-জীবনের মধ্যে সম্পর্কটিকে অন্তরঙ্গ করে তুলতে হবে। সাহিত্য-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসে একটি বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতিই ঔপন্যাসিকের লোভ সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অথও ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন।" তাঁর এ উক্তি ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও সমান সত্য।

সমালোচক হাডসন বলেছেন, "For to be truly an historical drama, a work should not adhere to the literal truth of history in such a sort as to hinder proper dramatic life ; that is the laws of the drama are here paramount to the facts of history"[১] ইতিহাসের তথ্যকে পুরোপুরি অন্ধভাবে অনুসরণ করলে তা ইতিহাসই হবে, নাটক হবে না ; আবার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পদে পদে লঙ্ঘন করলে তা নাটকই হবে, ইতিহাসের সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকবে না। বহুকাল পূর্বে অ্যারিস্টটলও ঐতিহাসিক এবং কবির (নাট্যকারের) পার্থক্যটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন: "The poet and the historian differ not by writing in verse or prose ....The true difference is that one relates what has happened and the other what may happen. Poetry therefore is more

১. *An Introduction to the Study of Literature* : W. H. Hudson

philosophical and higher thing than history, for poetry tends to express the universal, and history the particular."[১] অর্থাৎ পদ্যে বা গদ্যে লেখার জন্যে কবি ও ঐতিহাসিকের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় না। এঁদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য হল যে, যে ঘটনা ঘটে গেছে ঐতিহাসিক তাই বর্ণনা করেন, আর কবি যা ঘটতে পারে তারই ইঙ্গিত দেন। কাব্য সেইজন্য ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশী দার্শনিক চিন্তাসম্পন্ন ও উচ্চতর বস্তু, কারণ কাব্য নির্বিশেষ সত্যকে প্রকাশ করে এবং ইতিহাস করে বিশেষ সত্যকে।

'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'তে ঐতিহাসিক-নাট্যকারের দায়িত্বের কথায় বলা হয়েছে—"His task is not to paint a copy of some contemporary or historical personage; but to conceive a particular kind of man, acting under the operation of particular circumstances. This conception growing and modifying itself with the progress of the action also invented by the dramatist will determine the totality of the character which he creates." অর্থাৎ সমসাময়িক অথবা ঐতিহাসিক কোনো পুরুষের অবিকল প্রতিচ্ছবি রচনা করা ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ নয়। কিন্তু এমন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে তাঁকে পরিকল্পনা বা ধারণা করে নিতে হয় যিনি একটি বিশেষ অবস্থার অনুগত হয়েই সক্রিয় থাকেন। এই ধারণা বা পরিকল্পনাটি নাটকের কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত ও অভিব্যক্ত হতে থাকে; পরিকল্পনাটি নাট্যকারের সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব আবিষ্কার এবং তা চরিত্রটির সমগ্রতাকেই প্রকাশ করে। 'The technique of the Drama' গ্রন্থে জার্মান সমালোচক জি ফ্রেতাগও সকল সার্থক নাটকের মূলে যে idea-র ইঙ্গিত করেছিলেন তার সঙ্গে ঐ 'পরিকল্পনা'র সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছিলেন নাটকের ঐ ভাবটিই প্রকৃত রস-কেন্দ্র, যার থেকে আরও অনেক স্বাধীন কল্পনা রশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়ে। "The idea works with a power similiar to the secret power of crystallization".

এই মূল কথাগুলি ছাড়াও ঐতিহাসিক নাট্যকারকে আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। যে কালের বা যে যুগের ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি নাটক লিখছেন, সেই যুগের সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ—এক কথায় যুগের সুর ও মেজাজকে (tone and the temper of the age) জীবন্ত করে তুলতে হয়।

আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। ঐতিহাসিক নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সাধারণ স্তরের মানুষ নন—বিশেষ করে প্রধান পাত্র-পাত্রীরা তো অসাধারণ স্তরের (above the common level)। ঐতিহাসিক প্রধান পুরুষের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বিরাট দেশ বা একটা জাতির ভাগ্য নিবিড়ভাবে যুক্ত—তাঁর ভাগ্যের উত্থান-পতন সমগ্র জাতির জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ঐতিহাসিক পুরুষ 'কালের সারথি। তাঁর কাহিনী যখন গীত হয়, তখন রুদ্রবীণার একটি তারে মূল রাগিণী বাজে এবং

১. *Poetics*: Aristotle, Chap. 9 tr. Butcher.

বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরুমোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র-গম্ভীর, একটা সুদূর-বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে। তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সুরের উদাত্ততা থাকে। ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের ভালবাসা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ঘৃণা সব কিছুই একটা উঁচু সুরে বাঁধা; তাদের ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং আত্মবিসর্জনও অসাধারণ স্তরের। বহু-জীবনের সংস্রব থাকায় তাদের আচরণে এই অসাধারণত্ব। ঐতিহাসিক নাটকে সুরের এই উদাত্ততা ও বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্যের জন্যে পাত্র-পাত্রীদের ভাষায় আভিজাত্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের উচ্চারিত বাক্য হয় অলংকৃত, আবেগ-দীপ্ত, ধ্বনি-গম্ভীর ও কৌলীন্যযুক্ত।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নাট্যকার ইতিহাসের অন্ধ-অনুকারী নন ঠিক; কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বাধীনতাও সীমাহীন হয়। সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে লঙ্ঘন করার তাঁর অধিকার নেই। কল্পনার স্থান এ নাটকে আছে, কিন্তু কল্পনা যেন কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় না দেয়। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-সত্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সম্ভাব্য জীবন-সত্যের ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন। ইতিহাসে চরিত্রের যে মানবিক পরিচয়টুকু সম্ভাব্য বলে মনে হয়, সেই অংশ নাট্যকার নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্টি করবেন। বলা বাহুল্য, ইতিহাস-আশ্রয়ী অনুমাননির্ভর এই মানবিক দিকটি উদ্ঘাটিত করে তোলার মধ্যেই নাট্যকারের আসল কৃতিত্ব। আবার এইখানেই নাট্যকারের প্রকৃত বিপদ। মানবিক পরিচয় উদ্ঘাটনে অতিরিক্ত মনোযোগ যদি চরিত্রটির ইতিহাস-পরিচয়কে উপেক্ষা করে, তাহলে কি হয় সে কথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বলেছেন,—"সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই বাক্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।"[১] ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যকে এখন সূত্রাকারে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

ক. মূল কাহিনী, ও প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক হবে।

খ. নাট্যকার ইতিহাসের অন্ধ দাসত্ব করবেন না। স্বাধীন সৃজনশীল কল্পনায় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে প্রয়োজনমতো বিশ্বাস্য মানবিক রূপ দেবেন। এর জন্যে অনৈতিহাসিক দু'একটি চরিত্র ও ঘটনা যুক্ত করা চলতে পারে।

গ. বহু ঘটনা ও উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে থাকে ইতিহাসে। এগুলি গ্রহণের সময় তিনি সতর্কভাবে নির্বাচন করবেন। নিজ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবশ্যিক ঘটনাগুলিকে তিনি সজ্জিত করবেন। ঘটনা-সন্নিবেশ এমন হবে যাতে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন ঘটনাগুলি একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়।

ঘ. নাট্যকারের মূল পরিকল্পনা বা ধারণাটি ইতিহাসের মূল-চরিত্রকে অবলম্বন করে রূপায়িত হবে। বাইরের ইতিহাস-পরিচয়ের আধারেই জীবনরস-পূর্ণ তাঁর সেই সমগ্র রূপের চিত্র অঙ্কন করতে হবে। ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতার

১. রবীন্দ্রনাথ—ঐতিহাসিক উপন্যাস:—'সাহিত্য' গ্রন্থ

মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য চাই। জীবনসম্পর্কিত তাঁর বোধ বা ধারণাটিকে মূল-চরিত্রের মধ্যে স্থাপন করে তিনি যখন পরিকল্পনাটি রচনা করবেন, তখন তা যাতে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-সত্যের বিরোধী না হয়, সেদিকে বিশেষ সতর্ক হতে হবে।

ঙ. যে যুগ ও কালের পরিচয় নাটকে স্থান পাচ্ছে, সেই যুগের রীতিনীতি, আচার-বিচার, সংস্কার, জীবনাদর্শ প্রভৃতিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

চ. ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি 'যে 'কালের সারথি', একথা মনে রেখে তাদের ক্রিয়া-কলাপ, ও পরিচয়ে অসাধারণত্বের ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাদের ভাষার আভিজাত্য ও আচরণের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে হবে।

ছ. ইতিহাসের দাবি ও নাট্যকারের দাবি—পরস্পর বিপরীত হলেও দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যত্নবান হতে হবে এবং মূলত নাট্যকারকে জীবনবোধের প্রেরণায় চালিত হতে হবে।

ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগে ক্রিস্টোফার মার্লোই সর্বপ্রথম **Edward II** নামক ঐতিহাসিক নাটকটি রচনা করেন—তারপর শেক্সপীয়র **Henry VI** কে তিনখণ্ডে লিখলেন—তারপর **Richard III, King John, Richard II** ও ফ্লেচারের সঙ্গে সহযোগিতায় **Henry VIII (1610)** লিখে ঐতিহাসিক নাটক রচনার ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উনিশ শতকে ইবসেনও কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক তাঁর নরওয়ের ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে লিখেছিলেন।

স্ট্রিণ্ডবার্গও **Gustav Vasa (1899), Erik XIV, The Saga of Folkungs (1899), Gustav Adolf (1900), Carl XII (1901), Gustav III (1903)**—প্রভৃতি কতকগুলি অসামান্য শক্তিশালী ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারা শুকিয়ে যায় নি। ফ্রান্সে আঁদ্রে জোসেটের **Elizabeth, The woman without a Husband (1935)**, পল রেনালের **The one and only Napoleon (1936)**, পল ডেমাসির **Tragedy of Alexander (1933)** উল্লেখযোগ্য নাটক। স্পেনে ম্যানুয়েল ও অ্যান্টানিও ম্যাচাডো,. ইতালীতে Giovanni Cavicchioli অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। ইংলণ্ডে ড্রিঙ্কওয়াটারের **Abraham Lincoln** ও বার্নার্ড শ এর 'সেণ্ট জোয়ান', গর্ডন ডেভিয়টের **Richard of Bordeaux (1932)**, অ্যালফ্রেড স্যাংস্টারের **The First Gentleman (1945)**, আমেরিকার-ম্যাক্সওয়েল অ্যাণ্ডারসনের **Elizabeth the Queen 1933, Valley Forge (1934), Journey to Gerusalem (1940), Key Largo (1939)**—প্রভৃতি এই শ্রেণীর স্মরণীয় নাটক।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদনের সময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক নাটক লিখিত হয়েছে। দিল্লী ও রাজপুতানার ইতিহাস বাঙালী নাট্যকারদের ওপর দীর্ঘকাল আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী,

শচীন সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, মন্মথ রায়, নিশিকান্ত বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ বহু ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। জাতীয় ভাবাবেগ, রোমান্সরস, দেশপ্রীতি বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের ওপর বিশেষভাবে প্রভাবশীল। মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের সংঘর্ষ ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে ঐতিহাসিক নাটকে দেখিয়ে বাঙালী নাট্যকারদের অনেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনোভাবকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কোথাও বা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের সঙ্গে মুসলমান নবাবদের সংঘর্ষ দেখিয়ে দেশপ্রীতির সুরকে উচ্ছ্বসিত করা হয়েছে। কেউ কেউ রোমান্সের রসে ইতিহাসের সত্যকে বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছেন। প্রচারধর্মিতা, কালানৌচিত্য দোষ, চমকপ্রদ ঘটনা যোজনার প্রতি মোহ ও সামগ্রিকভাবে বৃত্তে ঐক্যরক্ষার ব্যাপারে ঔদাসীন্য ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্থকতার পথে বাধা দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় উদ্দীপনা স্তিমিত হওয়ায় ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারাও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। আবার হয়তো কোনো শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের হাতে নূতন প্রেরণায় এ ধারা উজ্জীবিত হতে পারে। সে যাই হোক, যাঁরা এ ধারাকে দীর্ঘকাল পুষ্ট করে এসেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাটকগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী, গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী; দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত, রাণাপ্রতাপ, সাজাহান, নূরজাহান; ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর, অশোক, বাঙ্গালার মুসনদ; যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর দিগ্বিজয়ী; অপরেশচন্দ্রের অযোধ্যার বেগম; মন্মথ রায়ের অশোক, সাঁওতাল বিদ্রোহ; নিশিকান্ত বসুর বঙ্গে বর্গী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

একাঙ্ক নাটিকা ঃ

আধুনিক কালে একাঙ্ক নাটিকা বা একাঙ্কিকা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দৃশ্যকাব্য হিসেবে বিশ শতকে এর চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে; আবার শ্রব্যকাব্যরূপেও (**reading drama**)-এর সমাদর কিছু কম নয়। নাটকের এই বিশেষ রূপটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিন্তু তেমন স্বচ্ছ নয়। নামেই বোঝা যায় একাঙ্ক নাটিকায় অঙ্ক একটি মাত্রই থাকবে এবং এর ঘটনা স্বল্প আয়তনে সমাপ্তি-লাভ করবে। এ হল একাঙ্ক নাটিকার নিতান্তই বহির্লক্ষণগত কথা। তথাপি এ কথারও মূল্য আছে। এর আন্তরলক্ষণকে বুঝে নিতে না পারলে এর স্বরূপ স্পষ্ট হবে না। একাঙ্কিকায় জীবনেরই রূপ প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু অল্প আয়তনে জীবনের সামগ্রিক রূপ উপস্থাপিত করা যায় না। তাই এতে জীবনের খণ্ডরূপের মধ্য দিয়ে পূর্ণরূপের ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। জীবনের বিশেষ একটি গূঢ়-গভীর দিককে তুলে ধরে তারই সাহায্যে সমগ্রতার আভাস দেওয়াই এর কাজ। ঘটনাকে বহুশাখায়িত করার অবকাশ এখানে নেই, নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে চরিত্র-বিশ্লেষণে অতিরিক্ত মনঃসংযোগেরও এখানে সুযোগ নেই। অথচ কল্পনায় অনুভূত জীবন-

অভিজ্ঞতার একটি রূপকে জীবন্ত করে তুলতে হবে—জীবন-সমগ্রতার ইঙ্গিত দিতে হবে। এইজন্যে এর সংলাপকে করতে হয় তীব্র গতিময়, তীক্ষ্ণ, ঋজু ও ইঙ্গিতধর্মী। কয়েকটি, স্বল্পচরিত্রের বিশেষত একটি বা বড় জোর দুটি চরিত্রের দিকে এখানে নাট্যকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। অবান্তর ঘটনা বা দৃশ্যপটের বাহুল্যে একে ভারাক্রান্ত করা চলে না। একাঙ্ক নাটিকার সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত স্বল্পায়তন ঘটনার একটা একমুখী দ্রুত ধাবমানতা থাকে, একটা প্রবল গতিবেগ ঘটনাকে পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। অন্যান্য নাটকেও এই গতিবেগ অবশ্যই থাকে, কিন্তু একাঙ্কের মতো তা লক্ষণীয় নয়। অন্যান্য নাটকে যেমন ঘটনার আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, এখানে তা থাকলেও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। একাঙ্কিকার সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আধুনিক কালের ছোট গল্পের সঙ্গে এর নানা দিক থেকে সাদৃশ্য আছে। ছোট গল্পেও একটি মাত্র অভিজ্ঞতা-জাত জীবন-সত্যকে একটিমাত্র ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করে রূপ দেওয়া হয়। এখানেও স্বল্প আয়তনে ঘটনার বাহুল্য বা চরিত্র-সমাবেশের আধিক্য থাকে না। উদ্দেশ্যের একমুখিনতা ও আবেদন-সৃষ্টির এককতায় একাঙ্কিকার মতোই এ বিশিষ্ট।[১] আর এর আয়তন সংক্ষিপ্ত ও জীবনের খণ্ডাংশের মাধ্যমে অখণ্ড-জীবনের স্বাদ দেওয়া একাঙ্কিকার মতোই এর লক্ষ্য। ছোট গল্পে জীবনের বৈচিত্র্য বা জটিলতা দেখানো যায় না—কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সেখানে কতকগুলি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখি; অথচ সেইটুকুর মধ্যেই একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও আমাদের মনের মধ্যে গভীরতর স্বাক্ষর রেখে যায়। ঠিক এই ধরনের ব্যাপার একাঙ্কিকার ক্ষেত্রেও ঘটে।

একাঙ্ক নাটিকায় একটিমাত্র অঙ্ক অবশ্যই থাকবে; কিন্তু এতে দৃশ্য কয়টি থাকবে? একটিমাত্র দৃশ্যেই কি এর ঘটনাধারাকে সীমিত রাখতে হবে? অথবা অঙ্ক একটি রেখে একাধিক দৃশ্য এতে যুক্ত করা যাবে কি? বিষয়টি নিয়ে অনেকেই চিন্তা করেছেন। একাঙ্ক ফার্স অনেকে লিখেছেন এবং সেগুলিতে একাধিক দৃশ্য আছে। রামনারায়ণের 'উভয়সঙ্কট', গিরিশচন্দ্রের 'সভ্যতার পাণ্ডা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রভৃতি একাধিক দৃশ্য সংবলিত একাঙ্কের ফার্স। কিন্তু এগুলিতে ভাব-সমগ্রতা, তীব্র গতিবেগ, বিন্দুর মধ্য দিয়ে সিন্ধুর সংকেত, ও ঘটনা-সংহতি ঠিক একাঙ্কিকার মতো নয়। কিন্তু এ থেকে এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, একাধিক দৃশ্যযুক্ত হলেই একাঙ্ক নাটিকা হয় না। পাশ্চাত্যের জেকবের লেখা "The Monkey's Paw"; মেটারলিঙ্কের 'A Miracle of Saint Antony', জে. এম. ব্যারির 'The Will' প্রভৃতি একাধিক দৃশ্য সমন্বিত হয়েও শ্রেষ্ঠ One act plays-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক কালে আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও এ ধরনের একাঙ্কিকা অনেক লেখা হচ্ছে।

১. "Singleness of aim and singleness of effect are, therefore, the two great canons by which we have to try the value of a short story as a piece of art".—An Introduction to the study of Literature—W. H. Hudson P. 340.

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। একাঙ্ক নাটিকায় স্থান, কাল ও ঘটনাগত ঐক্য রক্ষা করার প্রয়োজন আছে কিনা। বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ ঐক্য রক্ষা করতে পারলে একাঙ্ক নাটিকার গঠন যেমন সুদৃঢ় হয় তেমনি এর লক্ষ্য, গতি ও আবেদন অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে। ঘটনা-ঐক্য (Unity of action) কিংবা ভাবগত ঐক্য (Unity of impression) সব নাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একাঙ্কিকায় এ ঐক্য তো অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। প্রশ্ন, স্থান-ও-কাল-ঐক্য নিয়ে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল নাট্যকারের স্থান ও কালগত ঐক্য যতদূর সম্ভব রক্ষার চেষ্টা করাই উচিত। একাঙ্কিকার আয়তনে নাট্যকারের সে সুযোগও অনেক বেশী। তবে আধুনিক কালে বহু সমস্যাপীড়িত, বহু চিন্তাদীর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসাকে রূপ দিতে গিয়ে অনেক নাট্যকার ঠিক স্থান ও কাল-ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছেন না। নাট্যআবেদন ও একাঙ্কিকার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে ঠিক রেখে যদি কোনো নাট্যকার একাধিক দৃশ্য-সংবলিত একাঙ্ক নাটিকা লেখেন, তাহলেও সেগুলি স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। তবে এ স্বাধীনতায় অতি-উৎসাহী হয়ে স্থানগত ও কালগত ঐক্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখা সমীচীন হবে না। তাই আমাদের বক্তব্য একাঙ্ক নাটিকার স্থান, কাল ও ঘটনা ঐক্যকে মান্য করেই নাট্যকারকে অগ্রসর হতে হবে।[১] তবে যে-ক্ষেত্রে জীবন-অভিজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণে স্থান-ও-কাল ঐক্যকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করা গেল না, অথচ এর অন্যান্য লক্ষণগুলি যতদূর সম্ভব উপস্থিত থেকে স্বল্পায়তনে ঘটনা-ঐক্য বা ভাবঐক্যকে সুন্দরভাবে রক্ষা করেছে—সেই সব নাটিকাও একাঙ্কিকারূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হলে তার সময়-সীমা কেমন হবে এ নিয়েও অনেক ভাবনা চলছে। সাধারণত এক ঘণ্টার মধ্যেই এর অভিনয় সমাপ্ত হয়ে থাকে। তার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় বিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা হওয়া উচিত। কেউ বা বলেছেন, চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই এর অভিনয় শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল যে, যেহেতু এ মিতায়তন এবং এর একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে, তখন এক ঘণ্টার মধ্যে এর অভিনয় সম্পন্ন করা দরকার। মিনিট দিয়ে অঙ্কের হিসেবে এর সময়-সীমা নির্দেশ করা ঠিক নয়।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একাঙ্কিকা আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও বৃহত্তম নাটকের এ কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নয়। এখানেও সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাষায় একটিমাত্র 'কার্য' থাকে ; আর এ কার্য বিশেষরূপে উপস্থাপিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বা বৃত্তের অন্তর্গত। এর যে ঘটনা বা কার্য তারও মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি, ও নির্বহন সন্ধি সবগুলি থাকারই কথা ; তবে কোনো কোনো একাঙ্কিকায় সবগুলি স্পষ্ট নয়, কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে কোথাও বা একটির সঙ্গে আর একটি আত্মগোপন করে থাকে। মোট কথা, পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে ঘটনার সূচনা, জটিলতা, চরম মুহূর্ত ও উপসংহার এ কয়টি এতে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

১. বিষয়টি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ও ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য—'একাঙ্ক-সঙ্কলন' গ্রন্থের ভূমিকায়।

একাঙ্কিকার নানা লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনার শেষে এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

একাঙ্ক নাটিকা হল এক অঙ্কের স্বল্পায়তন এমন একটি স্বল্প-চরিত্র-বিশিষ্ট নাটিকা যাতে কল্পনায় অনুভূত, কোনো একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিক বা জীবনের কোনো একটি গভীর ভাব নাটকীয় গতিবেগযুক্ত হয়ে দ্রুত চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি ক'রে দ্বন্দ্বাত্মক পথে দর্শকদের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চরম পরিণাম লাভ করে ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তে একটি সমগ্র কার্যের ব্যঞ্জনা দেয়।

প্রাচীন গ্রীস বা রোমে একাঙ্ক নাটিকা ছিল না। গ্রীক নাটকে কাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোরাস যোগসাধন করত বলে স্পষ্ট অঙ্ক-বিভাগ ছিল না। তথাপি পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন গ্রীক নাটকগুলিকে বর্তমানে যে-রূপে পাওয়া যায়, তারও একটা পূর্ব-ইতিহাস আছে। প্রাথমিকরূপে গ্রীক নাটকের বৃত্ত অতিশয় সংক্ষিপ্ত ছিল এবং একটি চরিত্র ও কোরাসের সহযোগেই তার আদি রূপটি বুঝে নিতে হয়। পরে গ্রীক নাটকের কাহিনী দীর্ঘ হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রের অনুপ্রবেশের ফলে তা বর্তমান রূপ নিয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গ্রীক নাটকে কাল-ঐক্য ও ঘটনা-ঐক্য ছিল এবং প্রাথমিক রূপে স্থান-ঐক্যও লঙ্ঘিত হয় নি। মোট কথা গ্রীক নাটকে যেখানে ঐ তিন ঐক্য রক্ষার দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি থাকত। গ্রীক নাটকে যেখানে এই তিন ঐক্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছে ও আয়তন সংক্ষিপ্ত, সেখানে একাঙ্ক নাটিকার আদর্শ অনেকখানি বর্তমান, এমন কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, শুধুমাত্র ঐক্য-বিধি মেনে সংক্ষিপ্ত আয়তনের নাট্যরচনা হলেই তা একাঙ্কিকা হয় না। একাঙ্ক নাটিকা লেখার অভিপ্রায় নিয়েই নাট্যকারকে এখানে অগ্রসর হতে হয়। তাছাড়া গ্রীক নাটকের প্রাথমিক রূপ সম্পর্কে আমরা অনুমানই করছি—ঠিক সেগুলি কি ধরনের ছিল, তা আমাদের জানা নেই। সুতরাং এ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে একাঙ্কের প্রচলন ছিল এবং সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রিগণ অঙ্কের দিক থেকে যে নাট্যের শ্রেণী-বিভাগে সচেতন ছিলেন, তা দেখা যায়। প্রহসন, ভাণ, বীথি ও ব্যায়োগ—সংস্কৃতের এই সমস্ত রূপক ও উপরূপকগুলি এক অঙ্কের। এদের মধ্যে প্রহসনের অঙ্গীরস হাস্য, বীথির শৃঙ্গার, ভাণের বীর ও শৃঙ্গার এবং ব্যায়োগে বীর, করুণ, রৌদ্র ও ভয়ানক এই চারটের মধ্যে যে কোনো একটি অঙ্গীরস হতে পারে। এগুলির প্রত্যেকটির আয়তন স্বল্প অর্থাৎ এক অঙ্কের। আবার এগুলিতে বর্ণিত 'কার্য' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ব্যায়োগে গর্ভ ও বিমর্ষ-সন্ধি থাকবে না অর্থাৎ ঘটনাধারার **climax** ও **falling action** থাকবে না—থাকবে শুধু **Exposition, Rising action** ও **catastrophe.** বলতে পারি নাট্যদ্বন্দ্বকে ব্যায়োগে অনেকখানি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে। 'ভাণ'-এ থাকবে শুধু মুখসন্ধি ও নির্বহণ-সন্ধি অর্থাৎ Exposition ও Catastrophe. Rising actionও থাকবে না। অর্থাৎ এতে দ্বন্দ্বকে আরও

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। প্রহসনে **Exposition** ও **Catastrophe** থাকবে, অন্য সন্ধি থাকবে না। বীথিতেও **Exposition** ও **Catastrophe** থাকবে।

দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতে একাঙ্ক নাটিকার গঠন-জটিলতা নেই, দ্বন্দ্বও খুব স্পষ্ট নয়, ঘটনাধারাও দীর্ঘ নয় এবং ভাবের রস-পরিণাম সুনির্দিষ্ট। প্রাচীন গ্রীক নাটকে একাঙ্ক নাটিকা সম্পর্কে এই সচেতনতাও লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত একাঙ্ক নাটিকায় সর্বত্র বীজবপন ও ফলাগমকে কোথাও উপেক্ষা করা হয় নি। তাই এর বৃত্ত সংক্ষিপ্ত হলেও যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একথাটি বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভাস-রচিত একাঙ্ক নাটিকাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে একটিমাত্র দৃশ্যে, একটিমাত্র ঘটনাকে একটি কালের সীমায় চমৎকার উপস্থাপনের প্রয়াস আছে।

সবদেশে সবকালেই দেখা যায় বড় নাটকের সঙ্গে ছোট্ট নাটকের বা নাটিকার প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে গ্রীসে Satyr Play নামক এক শ্রেণীর ছোট নাটিকার সৃষ্টি হয়। সেখানে গুরুগম্ভীর ট্রাজিডি নাটকের অভিনয় শেষে এই ধরনের হাল্কা নাটিকার অভিনয় হত। মধ্যযুগের শেষে ও রেনেশাঁসের প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে ক্ষুদ্রকায় ফার্স-জাতীয় নাটিকা ও ইণ্টারলুড শ্রেণীর নাটিকার অভিনয় হত; এগুলি এক অঙ্কের। অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প আয়াসে অভিনীত হতে পারে—এই প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে শুধু এগুলিই নয় 'মিষ্ট্রি', 'মর‍্যালিটি' ও 'মিরাক্‌ল-প্লে' এরও উদ্ভব হয়েছিল এর আগে। মধ্যযুগে মিষ্ট্রি ও মিরাক্‌ল প্লে, পঞ্চদশ শতকে মরালিটি প্লে এবং ষোড়শ শতকে ইণ্টারলুড-এর উদ্ভব হয়েছিল। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে এক শ্রেণীর অপেশাদার অভিনেতার দ্বারা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়তনে সংক্ষিপ্ত ফার্স-জাতীয় লোকনাট্যেরও অভিনয় হত। কিন্তু সপ্তদশ শতকে এই সমস্ত ছোট্ট আয়তনের নাটিকাগুলির দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। আবার অষ্টাদশ শতকে ফার্স-জাতীয় রচনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির সূচনা হয়। উনবিংশ শতকে 'কার্টেন রেইজার' নামে ছোট নাটিকা সমাদৃত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকে অল্প কয়েকটি একাঙ্ক নাটিকা লেখা হয়েছে বটে, তবে প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকেই এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মোট কথা, বিশ শতকের পূর্বে একাঙ্ক নাটিকার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায় নি। বহু অঙ্কের নাটকে বৈচিত্র্য আনার জন্যে কোনো বড় নাটকের পূর্বে বা পরে ছোট্ট এক অঙ্কের নাটিকা বা ফার্স উনিশ শতকে বেশ চলেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে এদের অস্তিত্ব ছিল। সাম্প্রতিক কালে থিয়েটার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দিয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা ক'রে তিন অঙ্কের বা চার অঙ্কের নাটক এখন বেশী সমাদৃত। তবে সন-তারিখের কথা মনে রেখে বলতে হয় অষ্টাদশ শতকের জার্মান নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্ববিদ্ লেসিঙ্-এর লেখা 'Die Juden'-ই সর্বপ্রথম একাঙ্ক নাটিকা। উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডে 'কার্টেন রেইজার' বা পূর্বরঙ্গ-নাটিকাগুলি মূল নাটক আরম্ভের পূর্বে অভিনীত হত। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জেকবের কাহিনী অবলম্বনে লুইস এন পার্কারের নাট্যরূপ দেওয়া একাঙ্ক নাটিকাটি 'The monkeys paw' লণ্ডনের

ওয়েস্ট এণ্ড থিয়েটারে খুব সাফল্য লাভ করে—প্রচুর দর্শক-সমাগম হয় ও মূল নাটকের অভিনয়-সময়ে আসর প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এই সংবাদটি একাঙ্ক নাটিকার ইতিহাসে স্মরণীয় হলেও এর পূর্ণ-প্রতিষ্ঠালাভের সময় তখনো আসে নি। বিভিন্ন শৌখীন নাট্যগোষ্ঠী অগ্রসর হয়ে এই একাঙ্ক নাটিকার অভিনয়ে অংশ-গ্রহণ না করা পর্যন্ত এর সমৃদ্ধি ঘটতে পারে নি। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকে ধীরে ধীরে অনেক শৌখীন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে।

দর্শকদের ক্রমবর্ধমান দাবীকে আর উপেক্ষা করা গেল না। নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-থিয়েটার ও কম্যুনিটি থিয়েটারে একাঙ্কিকার অভিনয় তো চলত। ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্বাধীন নাট্যগোষ্ঠী বিশ শতকে গড়ে উঠল। এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একাঙ্ক নাটিকা প্রতিষ্ঠিত হবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। তাছাড়া ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত 'Village Drama Society' প্রতিবছর একাঙ্ক নাটিকা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করত। এরও পরে 'British Drama League' নাট্য-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত করে। স্বাধীন নাট্যগোষ্ঠীরা হল সব আদর্শবাদী ও মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রেরণায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে একাঙ্কিকা রচনায় মনোযোগী হলেন। দিকে দিকে এ শ্রেণীর নাটক-রচনার জোয়ার এল। রেডিও-টেলিভিশনের কল্যাণে এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাঙলা নাটক ঊনবিংশ শতকে সৃষ্ট হলেও এবং একাঙ্কের ফার্স বাঙলা নাটকের আদিপর্বের নাট্যকার রামনারায়ণের হাতে পাওয়া গেলেও ঠিক তাকে একাঙ্কিকা বলা চলে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলালের কিছু কিছু রচনা একাঙ্কের হলেও যাকে আমরা বিশিষ্ট অর্থে একাঙ্ক বলছি তা সেগুলি নয়। তথাপি এগুলিতে যথার্থ একাঙ্ক নাটিকার পূর্বাভাস মেলে; অথবা কোনো কোনোটিতে এর অনেক লক্ষণও আছে। বাঙলা একাঙ্ক নাটিকার যথার্থ সৃষ্টি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'-এ। বিশ শতকের বাঙলা একাঙ্কিকা হিসেবে এটির স্থান সর্বপ্রথম। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গভীর জীবনবোধময় শিল্পসমৃদ্ধ একাঙ্কিকা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। আধুনিক জীবনযন্ত্রণার পরিচয় না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ' এবং 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'-কে সার্থক একাঙ্ক নাটিকা বলা চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম'ও সার্থক সৃষ্টি। মন্মথ রায় নতুন ভাবে নাটকের এই শ্রেণীটিকে পুষ্ট করেছেন এবং এ শ্রেণীর বহু নাটিকা লিখেছেন। 'একাঙ্কিকা' নামটি তাঁরই দেওয়া এবং সচেতনভাবে নাটকের এই শাখাটির সমৃদ্ধির জন্যে তাঁর মতো পূর্বে কেউ প্রয়াস করেন নি। তাঁর 'একাঙ্কিকা' গ্রন্থটি (১৯৩১) আটটি নাটিকার সংকলন। এটি পরে একুশটি নাটিকার বৃহত্তর সঙ্কলন গ্রন্থ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর 'নব একাঙ্ক' (১৮৫৮) 'ফকিরের পাথর' (১৯৫৯) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর বহু প্রথম শ্রেণীর একাঙ্কিকার সাক্ষাৎ মেলে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ নাট্যকারগণও অনেক একাঙ্ক

লিখেছেন। গণনাট্যে-নবনাট্যের লেখকগণও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নন। তুলসী লাহিড়ী দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, গিরিশঙ্কর, গঙ্গাপদ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নানা নাট্যকার এ ধারায় নাট্য-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[১]

চরিতনাটক বা জীবনীনাটক :

আধুনিক কালে চরিতনাটক বা জীবনীনাটকও কিছু কিছু লিখিত হচ্ছে। এই সমস্ত নাটকে সাধারণতঃ সমাজের কোনো একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীকে আশ্রয় করে তাকে বস্তুতান্ত্রিক পথে যতদূর সম্ভব অলৌকিকতাকে বর্জন করে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বা পুরাণপ্রসিদ্ধ তাঁর জীবনকে যদি অলৌকিকতামুক্ত বস্তুতান্ত্রিক পথে উপস্থাপনের প্রয়াস হয়, তাহলেও তাকে চরিত নাটক বলা উচিত। চরিতনাটকে একজন ব্যক্তির জীবনের নানা ঘটনা উপস্থাপিত হয় এবং এ সকলের মধ্য দিয়ে নানা ব্যক্তিত্বময় ব্যক্তিটিকে অঙ্কিত করার চেষ্টা হয়। চরিতনাটকে নায়করূপে ব্যক্তি একজনই থাকেন, কিন্তু তাঁর কার্য বা ঘটনা হয় বহু। এখানে ব্যক্তির যে কার্য বা ঘটনাসমূহ তাদের মধ্যে পরস্পর কোনো সম্পর্ক থাকে না—অ্যারিস্টটলের কথায় এখানে ঘটনা-ঐক্য থাকে না—থাকে নায়ক-ঐক্য। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন "Unity of Plot does not, as some persons think, consist in the unity of the hero. For infinitely various are the incidents in one man's life which cannot be reduced to unity". মোট কথা, অ্যারিস্টটল নাটকের ঘটনা-ঐক্য বা বৃত্ত-ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন একটি মানুষ সমগ্র জীবনে যে বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের কাজ করে সেগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে যুক্ত করা যায় না। অথচ জীবনী নাটক লিখতে গেলে এই সব পরস্পর-বিরোধী বা অসংলগ্ন ঘটনা নিয়েই ব্যক্তির বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে হয়। জীবনী-নাটকে কোনো একটি ভাব তাই শেষ পর্যন্ত রস-পরিণাম লাভ করে না—এখানে ব্যক্তির জীবন ও তার পরিণাম এবং তার ব্যক্তিত্বের রূপটিকে চিনে নিতে হয়। চরিতনাটক সম্পর্কে এ উক্তি খুবই সত্য। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে ঐতিহাসিক নাটকে যেখানে মূল কাহিনী বা বৃত্তের পাশে নানা উপবৃত্ত থাকে, সেখানে যেমন এক ধরনের জটিল ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তেমনি জীবনীনাটকেও ব্যক্তির বহুবিধ কার্যকে অনেক সময় একটি মূল প্রেরণা বা ভাবের সঙ্গে অন্বিত করার প্রয়াস হয়। এক্ষেত্রে সুদৃঢ় ঘটনা-ঐক্য না থাকলেও এক ধরনের ঐক্য অনুভূত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

১। বিশ শতকের সাতের-দশক পর্যন্ত কালেও একাঙ্ক নাটিকা রচনায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের সকলের পরিচয় এবং নাটকের এই বিশেষ রূপকল্পটি সম্পর্কে সূক্ষ্ম-গভীর আলোচনা করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক ডঃ সনাতন গোস্বামী তাঁর "বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার" গ্রন্থে।

বলা যায় যে, একজন মানুষ সমগ্র জীবনে পড়াশোনা, বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসালয়-স্থাপন, দরিদ্রসেবা, সমাজকল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি বহু কার্য করে থাকতে পারেন; কিন্তু তাঁর সকল কর্মের মূলেই যে মানব-প্রেম ও মানব-কল্যাণের সদিচ্ছা—এই মূল ভাবকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর সকল কর্মকে দেখতে পারলে নাট্যকার অন্য সব ঘটনাকে একটি ভাব-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। এইভাবে জীবনী-নাটকেও এক ধরনের জটিল ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব।

আর এক ধরনের জীবনী নাটক লেখা যেতে পারে। কোনো একজন ব্যক্তির বহু কর্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্মকে বা ঘটনাকে নানা ঘটনা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলোকিত করে তোলার চেষ্টা। এক্ষেত্রে নাট্যকার ব্যক্তির সমগ্র জীবনের মধ্যে সেই সব ঘটনাগুলিকেই মাত্র নির্বাচন করবেন যেগুলি সেই মূল ঘটনার পরিপোষক। এ শ্রেণীর জীবনী নাটকে নায়ক-ঐক্যের চেয়ে ঘটনা-ঐক্যই প্রধান হয়ে ওঠে। বনফুলের লেখা 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪২) চরিত নাটকটি এ শ্রেণীর অন্তর্গত। এতে বিদ্যাসাগরের জীবনের বহু-বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে শুধু তাঁর বিধবা-বিবাহ-রূপ ঘটনাটিকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি ইতিহাস বা পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী আশ্রয় করেও চরিত নাটক লেখা সম্ভব। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনীকে নাট্যরূপ দিতে গেলে অলৌকিকতাকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা সম্ভব নয়। অবশ্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক চরিত নাটকে অলৌকিকতার স্থান নেই। তাই এগুলিকে পৌরাণিক চরিত নাটক, ঐতিহাসিক চরিত নাটক ও সামাজিক চরিত নাটক এইভাবে শ্রেণী বিভক্ত করে নেওয়া উচিত। আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হয়। সামাজিক কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যদি চরিত্র-মহিমায় দেবত্বে উন্নীত হন এবং জনমানসে তাঁর দেবরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তাহলে তেমন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে জীবনী নাটক লিখলে তাঁর বাস্তব কর্মময় জীবন অপেক্ষা ভাবময় দিব্যজীবনই মুখ্য স্থান লাভ করবে। এগুলি দেবচরিত বা দেবকল্প চরিতমূলক নাটকরূপে আখ্যাত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, সাধক রামপ্রসাদ বা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আশ্রয়ে লিখিত নাটক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃত চরিত নাটক বলতে সর্বপ্রকার অলৌকিকতাশূন্য খ্যাতনামা সামাজিক মানুষের বহুমুখী কর্মধারার এমন এক নাট্যরূপকে বুঝি, যাতে তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা হয়। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মধারার মধ্যে যেমন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, তেমনি একটি সুগ্রথিত বৃত্ত রচনা করে তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সঞ্চার করাও শক্ত। তাই সার্থক জীবনী নাটক লেখা বেশ শক্ত। আর এই কারণে আমাদের পূর্ব-বর্ণিত পথে নাট্যকারগণ একটি প্রধান কর্মের সঙ্গে ব্যক্তির অন্যান্য ঘটনাকে যথাসম্ভব যুক্ত করে কখনো জটিল-ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন, কখনো-বা একটি প্রধান কর্মকেই নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আবার কখনো ব্যক্তির জীবন-পরিণামী রসের অনুকূল করে তাঁর জীবনের

যাবতীয় ঘটনাকে তাঁরা বয়নের চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) নাটকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে নাট্যকার নিদারুণ বেদনা ও হাহাকারে ভরা মধুসূদনের জীবনের অন্তিম ট্রাজিডির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকের সমস্ত ঘটনাকে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। সর্বত্র তাঁর প্রয়াস যে সফল হয়েছে, তা বলা যায় না। কিন্তু এই চেষ্টার ফলে নাটকটিতে মধুসূদনের বহুবিধ কার্যের মধ্যেও একটা জটিলতর ঐক্য-সৃষ্টির প্রয়াস প্রশংসনীয় হয়েছে বলা যেতে পারে। বনফুল ছাড়া অজয়কুমার চক্রবর্তীও মধুসূদনের জীবনী নিয়ে 'মহাকবি' নামক চরিত নাটক লিখেছেন। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' (১৯৫৪) শৈলেশ বিশীর লেখা 'নেতাজী' (১৯৪৬) উমানাথ ভট্টাচার্যের এন্টনী ফিরিঙ্গীর জীবন নিয়ে 'ফিরিঙ্গী', পরেশ ধরের 'বিবেকানন্দ' ইত্যাদি এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

লিট্যারজিকাল নাটক (Liturgical Drama) :

লিট্যারজি শব্দের মূল অর্থ হল গির্জায় জনসাধারণের জন্যে প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যে নাটক তা লিট্যারজিকাল। লিট্যারজি থেকে নাটকের বিবর্তন-ইতিহাস পণ্ডিতেরা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও এখনো তার কিছু অংশ অজ্ঞাত থেকে গেছে। অধ্যাপক নিকল তাঁর World Drama গ্রন্থে এর বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় দশম শতকে ঈস্টার উৎসবে একটি ছোট্ট চার লাইনের নাটিকা অনুপ্রবিষ্ট হত, (a tinny, four-line Playlet inserted in the Easter Service)। এর উৎস ছিল বাইবেলের একটি বিশেষ অংশ। বাইবেলে আছে—"সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করে তারা ডানদিকে উপবিষ্ট সাদা পোষাক-পরিহিত একজন তরুণকে দেখতে পেল। তারা ভয় পেল। এবং সেই তরুণ তাদের বললেন—ভয় করোনা; ন্যাজারেথের ক্রুশবিদ্ধ যিশুর অনুসন্ধান কর; তিনি উঠে গেছেন; এখানে তিনি নেই; তারা তাঁকে যেখানে শায়িত রেখেছিল সেখানে দেখো। তোমরা চলে যাও, তাঁর শিষ্যদের ও পেটারকে গিয়ে বল যে তোমাদের গ্যালিলী যাবার আগেই তিনি সেখানে পৌছে গেছেন। সেখানেই তোমরা দেখতে পাবে—তিনি তাই বলেছেন।"

বাইবেলের এই অংশটিই লিট্যারজিক্যাল নাটকের প্লট বা বৃত্ত। এই বৃত্ত কিভাবে রূপ নিল, দেখা যাক;—"সাদা পোষাক-পরিহিত একজন পুরোহিত সমাধি-মন্দিরের নিকটে বসে আছে। সেখানে একটি ক্রুশের ওপর একটি সাদা-কাপড় বিছানো রয়েছে; আরও তিনজন পুরোহিত ঐ পুরোহিতটির দিকে এগিয়ে গেলেন; তখন পূর্বের পুরোহিত প্রশ্ন করলেন—"তোমরা কাকে এই সমাধিতে খুঁজছ?" তখন তিনজনে একসঙ্গে উত্তর দিলেন, "ন্যাজারেথের যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে।" আবৃত কাপড়টিকে তুলে প্রথম পুরোহিত উত্তর করলেন—"তিনি এখানে নেই, তিনি উঠে গেছেন—যাও গিয়ে প্রচার কর যে তিনি সমাধি থেকে উঠে গেছেন।" এখানে

তিনজন পুরোহিত প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টান মহিলা। এই ছোট্ট নাটকীয় বৃত্তই লিটার্যারজিকাল নাটকের প্রাথমিক রূপ। সংলাপ ও কতকটা গতি অবশ্য এতে আছে। এর পরে অনুকৃতিমূলক নাট্যক্রিয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ ও প্রাসঙ্গিক নানা ঘটনা যুক্ত করে সরল বৃত্তটির বিস্তার ধীরে ধীরে হয়েছে। তখন চার লাইনের জিনিস জটিল বৃত্তে পরিণত হয়েছে ও-এর নিজস্ব অভিনয়-প্রথাও প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথমত এক বিশেষ ধরনের গীর্জার মধ্যেই এর অনুষ্ঠান হত; তারপর একটি বাগান ও মসলা বিক্রেতার দোকানও তাতে দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

মধ্যযুগে ধর্মমূলক নাটকের দুটি শ্রেণী ছিল। ক. মিষ্ট্রি সাইকেলস্ ও খ. মিরাকল প্লে। 'মিষ্ট্রি' শব্দটি এসেছে Ministerium থেকে যার অর্থ হল service, office; মূল অর্থ থেকেই বোঝা যায় ধর্মানুষ্ঠান থেকেই এর উদ্ভব। এতে অভিনেতা হলেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নগরবাসী ও মিস্ত্রীরা। কিন্তু এদের কণ্ঠস্বর, ভাষা ও উচ্চারণ মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সের একটি অঞ্চলে 'মিষ্ট্রি প্লে' হওয়ার যে নথি পাওয়া গেছে, তাতে অভিনেতা-দের সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, 'No sense do they have of the meaning of what they say'. 'লিটার্যারজিকাল' নাটকের অভিনয়-আদর্শ মোটামুটিভাবে এতেও অনুসৃত হত। জগতের উৎপত্তি থেকে শেষ বিচারের কথা সংবলিত বাইবেলের কাহিনীকেই নানাভাবে এতে রূপ দেওয়া হত। ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড—প্রভৃতি নানা স্থানেই এই 'মিষ্ট্রি প্লে' অনুষ্ঠিত হত। বাইবেলের কাহিনী এর মূল উপজীব্য বলে এক হিসেবে এ ঐতিহাসিক নাটক আবার চরিত্র ও ঘটনাকে একটা রূপকের আবরণেও এতে উপস্থাপিত করা হত। মিষ্ট্রি প্লে প্রচারমূলকও বটে—'designed to instruct men to avoid vice and cling to virtue'. Form বা রূপের দিক থেকে পরবর্তী নাটকে এর কোনো প্রভাব নেই—তবে এর প্রশ্নহীন বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাস্যকরতার পার্থক্য বোঝাতে অভিনেতা-দের স্বরবৈচিত্র্য, সীমাহীন ভূচিত্র—প্রভৃতি 'reached' in culmination in Shakespeare'.

মিরাকল প্লে :—এই মিষ্ট্রি প্লের পাশাপাশি আর এক ধরনের নাটক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথম দিকে এর বিকাশ তেমন হয় নি। সেন্ট ক্যাথারিনকে অবলম্বন করে দ্বাদশ শতকে যে এর অভিনয় হয়েছিল তার নথি পাওয়া গেছে ইংল্যাণ্ডে। এই নাটকের নাম মিরাকল প্লে। ধর্মপ্রাণ সাধুসন্ত বা শহিদদের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বন করেই এ রচিত হত। ফ্রান্সে মিরাকল প্লের অনেক দৃষ্টান্ত মিলেছে। 'The Miracle of Theophilus'-এ এমন একজন ব্যক্তির কাহিনী আছে যে শয়তানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, শেষে অনুতপ্ত হয়ে যিশু-জননী কুমারী মেরীর কাছে প্রার্থনা করে উদ্ধার লাভ করেন। মিরাকলের কাহিনীতে নানা বৈচিত্র্য থাকত; মিষ্ট্রি সাইকেলে কাহিনী সংক্ষিপ্ত—'merely a collection of individual dramas'[১]

১. World Drama : A Nicoll pp. 16.

কিন্তু মিরাক্‌লের কাহিনীর দুটি অংশ—প্রথম অংশে নায়কের পাপ—দ্বিতীয় অংশে অতিপ্রাকৃতের ক্রিয়া—নায়কের অনুতাপ ও পরিত্রাণের ব্যাপার। কাহিনীর বেশীর ভাগ অংশ ধর্মসংক্রান্ত নয় এবং তাতে কমিক উপাদানেরও মিশ্রণ থাকে। চতুর্দশ শতকের ইংল্যাণ্ডের একটি মিরাক্‌ল প্লে র সন্ধান মিলেছে যাতে ধর্মীয় প্রভাব কাহিনীর বহুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় না। এর নাম 'Duke Morand.' এতে দেখি এই ডিউক নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত। তাঁর স্ত্রী সেটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখানোতে কন্যা মাতাকে হত্যা করে। পিতা-কন্যার অবৈধ সংস্পর্শে একটি সন্তান জন্মে—কিন্তু ডিউকের আদেশে সন্তানটিকে হত্যা করা হয়। ডিউক ও তার কন্যা এখন বেশ খুশী কারণ আর তাদের কিছু বাইরে প্রকাশ পাবার ভয় নেই। কিন্তু গির্জায় গিয়ে ডিউক নিজ পাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়—ও যিশুখ্রীষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। মিস্ট্রি প্লে যদি গাম্ভীর্য ও পরিকল্পনার বিরাটত্বের প্রেরণা দিয়ে থাকে পরবর্তী নাট্যকারদের, তাহলে পারিবারিক দৃশ্যগুলিকে এবং দুঃসাহসিক অভিযানকে কিভাবে নাটকীয় রূপ দেওয়া যায় তার ইঙ্গিত দিয়েছে মিরাক্‌ল প্লে। মিরাক্‌ল প্লে-ই পরবর্তীকালে রোমান্টিক নাটকে দ্রুত রূপান্তরিত হয়েছে।

মরালিটি প্লে :—মিস্ট্রি প্লে থেকেই মধ্যযুগে আর এক ধরনের ধর্মমূলক নাটক উদ্ভূত হয়েছিল—এর নাম 'মরালিটি প্লে'। 'মরালিটি' নাটকের সমস্ত চরিত্রই রূপকধর্মী; প্রধানত পাপ বা পুণ্যেরই তারা প্রতীক। সাধারণত এতে একজন নায়ক চরিত্র থাকে যে হল Mankind বা Humanum Genus—1। এর প্রলোভন, পতন ও পুনরায় পরিত্রাণ—এই কাহিনীই এতে দেখানো হয়। নীতিশিক্ষার দিকটি কোথাও প্রবল আবার কোথাও তাকে কতকটা প্রচ্ছন্ন রেখে উৎকণ্ঠা-সৃষ্টির প্রয়াস। নানা মরালিটি প্লের যে সব দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশে মিলেছে, তা থেকে এমন অনুমান করা যায়। সমস্ত মরালিটির মধ্যে Everyman-ই হল শ্রেষ্ঠ। মরালিটি প্লে-তে কখনো কখনো রূপক আরোপের প্রয়াস হয় নি, যেমন ফরাসীদেশের একটি নাটকে নীতি-প্রচার থাকলেও বাস্তব জীবনকথা উপেক্ষিত হয় নি। এতে গ্রামের একটি সুন্দরী মেয়েকে যখন রাজ্যের অধিপতি বিয়ে করতে চাইল, তখন সে দৃঢ়ভাবে তার প্রতিবাদ করেছে এবং আত্মহত্যা না করে পিতার হাতে তলোয়ার তুলে দিয়েছে তাকে হত্যার জন্যে। অধিপতি এটা জানতে পেরে তাকে রক্ষা করে এবং বিয়ে না করে তার পিতাকে ও তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেন।

ইন্টারলুড : 'ইন্টারলুড' এমন একটি শব্দ যাকে সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো খুব সহজ নয়। ব্যাপক অর্থে যে-কোনো ধরনের ছোট নাটককে ইন্টারলুড বলা হত বিশেষ করে যা অভিনয়যোগ্য। সংকীর্ণ অর্থে সম্পূর্ণরূপে ধর্মমূলকতা-বর্জিত কাহিনীবিশিষ্ট ছোট নাটকই ইন্টারলুড। এতে স্পষ্টভাবে কোনো 'ethical, moral and usually farcical tone' থাকত না। 'মরালিটি প্লে'-গুলো ধীরে ধীরে তাদের নৈতিক আচ্ছাদন পরিত্যাগ করে নিছক আনন্দদানের জন্য যে-রূপে এসে দাঁড়িয়েছে, তারই নাম ইন্টারলুড—'Lusty Juventus'-কে ইন্টারলুডের দৃষ্টান্ত বলা হয়। মধ্যযুগের শেষদিকে এবং রেনেশাঁস যুগের গোড়ার দিকে এগুলির উদ্ভব হয়েছিল।

অপেরা ঃ

ষোড়শ শতকে ইতালীতে সর্বপ্রথম অপেরার উদ্ভব হয়। ফ্লোরেনটাইনের একজন অভিজাত ব্যক্তি গিওভান্নি বার্ডি ও তাঁর দলের প্রেরণা থেকেই অপেরার উৎপত্তি হয়েছিল। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের আহ্বান করে ক্লাসিক বিদ্যার উন্নতিকল্পে গিওভান্নি এক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান করেন। এতে স্থির হয় যে, গ্রীক নাটকের কোরাস বা সমবেত সঙ্গীত এতকাল উপেক্ষিত হয়েছে—কিন্তু তার সাঙ্গীতিক আবেদনকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। সুতরাং সঙ্গীতময় নাটকই সৃষ্টি করতে হবে। এইজন্য —গিওভান্নির দলের একজন কবি ওজারিও রিনুক্কিণী 'কথা' ও অপর একজন পেরি 'গান' যুক্ত করে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'Dafne' অপেরার প্রথম রূপ দিলেন। তারপর আরও দুটি অপেরা রচিত হওয়ার পর অপেরার স্থান সুনির্দিষ্ট হল। কবিতা ও সঙ্গীতের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন বার্ডি-দল। কিন্তু কবিতার চেয়ে সঙ্গীতের আকর্ষণই ছিল জনমানসে অধিক। কয়েক বছরের মধ্যে ক্রডিও মন্টিভার্ডি প্রমাণ করে দিলেন যে, কবিতা ও সঙ্গীত দুয়ের সমন্বয়ের কোনো অর্থ হয় না—অপেরা মূলত সঙ্গীতজ্ঞদের একাকা। ১৬০৭ ও ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে তিনি তাঁর বক্তব্যের নিদর্শনস্বরূপ Orfeo ও Arianna লিখলেন। আর তারপর থেকেই ইতালীর বুদ্ধিজীবী মানুষেরা নাটকের এই নূতন রূপটিকে বরণ করে নিলেন। ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম 'Opera House' তৈরি হল—তারপর ক্রমশ অপেরার প্রভাব অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সেও ছড়িয়ে পড়ল। দৃশ্যপটের জাঁকজমকে ও সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে 'কথা' গৌণ হয়ে পড়ল। সমগ্র সপ্তদশ শতক জুড়ে ইতালীর নাট্যক্ষেত্রে এই 'অপেরা' ছাড়া আর কিছুই দেবার ছিল না—অপেরার সেখানে হল অচলা প্রতিষ্ঠা। ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতকে অপেরার জন্ম হয়। উইলিয়াম ডি এভেন্যাণ্টই অপেরাকে যেখানে জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর The Siege of Rhodes (1656), The Cruelty of the Spaniards in Peru (1658), The History of Sir Francis Drake (1658) এগুলিই হল ইতালীয়ান আদর্শে লেখা সঙ্গীতময় আনন্দানুষ্ঠান। অর্কেস্ট্রার সহযোগে মধুর আবহ সৃষ্টি করে এগুলি দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পরে ইংলণ্ডে মৌলিক অপেরাও সৃষ্ট হল। ড্রাইডেনের Albion and Albanius (1685), King Arthur অথবা The British Worthy (1691) এগুলি পুরোপুরি ইংরেজি আদর্শে লেখা। এগুলিকে "ড্রামাটিক অপেরা" বলা হয়। এগুলি দৃশ্য নাটক এবং এর সমস্ত সংলাপ মুখে বলা হত, গান ও বাজনা যথেষ্ট থাকত। কিন্তু ইতালীয় অপেরাগুলি মূলত গানের জন্যই পরিকল্পিত, মৌখিক সংলাপ ছিল সেখানে নিষিদ্ধ—দু একটি দৃশ্যে কমিক-চরিত্রে ছাড়া। রেস্টোরেশন যুগে ইংলণ্ডে 'ড্রামাটিক অপেরা' পার্শেল নামক এক নাট্যকারের সহায়তায় কিছুকাল আধিপত্য করেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ইতালীয় অপেরার আদর্শই জয়ী হল। অপেরার আর একটি রূপ আছে, তার নাম 'কমিক অপেরা'—ইতালীর নেপল্‌সেই এর জন্ম; বাস্তব জগতের কৃষকদের কাহিনী নিয়ে কার্সের উপাদান সহযোগে সঙ্গীতময় রচনাই হল কমিক অপেরা।

এই অপেরা ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়। তবে একটু ভিন্নরূপে ইংলণ্ডে হাল্কা ধরনের শত শত ব্যালাড অপেরা সৃষ্ট হল। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে জন গে-র লেখা The Beggar's Opera (1728) সমস্ত ইংলণ্ডে একটা আলোড়ন তুলল। এর কয়েক বছরের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাসমন্বিত হাস্যোদ্রেককর বারলেস্ক জাতীয় রচনার মতো প্রচুর ব্যালাড অপেরা লিখিত হল। জন গে-ই হলেন ইংলণ্ডে ব্যালাড অপেরার জনক। তাঁর 'Achilles'-এ ব্যালাড অপেরা ও বারলেস্কের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এঁর পরে হেনরি ফিল্ডিংও ব্যালাড অপেরা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

যাত্রা-নাট্য ঃ

যাত্রা বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বুঝতে গেলে যাত্রার আলোচনা আবশ্যিক। বাংলা নাটকের উদ্ভবের পশ্চাতে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাট্যের প্রভাব ছাড়া যাত্রার প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। উনিশ শতকে বাংলা নাটক সৃষ্টির পূর্বেও যাত্রার ধারা বহমান ছিল। এই শতকের গোড়ার দিকে যাত্রার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, তখন তার নাম হল 'সখের যাত্রা'। প্রাচীন যাত্রা নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ও কিছু কিছু রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে সখের যাত্রায় পরিণত হয়। বিশ শতকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে আবার স্বদেশী-যাত্রার উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিক যাত্রানাটক এরই পরিণাম। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকে যাত্রার বিষয়বস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল। সামাজিক বিষয়কে মূল উপজীব্য করে লেখা হতে লাগল সামাজিক যাত্রা-নাট্য। মঞ্চ-নাটকের খুব কাছাকাছি এসে পড়ল তখন যাত্রা। তারও পরে জীবনের নানাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা, পরহিতব্রতী সমাজসেবী, মানবদরদী মহাপুরুষ, সংগ্রামী বীর প্রভৃতির চরিত্রকে বিষয় করে যাত্রা নাটক অভিনীত হতে শুরু করেছে। বাঙলার এই এক অতি পুরাতন ঐতিহ্যের যাত্রা নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নব কলেবরে আজ মঞ্চ-নাটকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলছে। তাই যাত্রার ধারা কখনো প্রবল কখনো ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হয়ে এলেও কখনো যে শুকিয়ে যায় নি, একথা খুবই সত্য।

প্রাচীনতম যাত্রার নিদর্শন কি তা বলা কঠিন। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে প্রাচীন যাত্রার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। তারও পূর্বে চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের যে সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, তাই আমাদের প্রাচীনযাত্রার নিদর্শন। এই ধারা সখের যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনেকখানি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ষোড়শ শতককেই তাই যাত্রার উদ্ভব-কাল বলে গণ্য করা উচিত। শিশুরাম, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মধুসূদন কান প্রভৃতি ঐ প্রাচীন যাত্রার অনেকখানি ধারক ও বাহক। এ যাত্রার বিষয় ছিল ধর্মমূলক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, চৈতন্যের জীবনলীলা অথবা পৌরাণিক দেবদেবীদের লীলা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে দর্শক ও শ্রোতাদের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করাই ছিল যাত্রার উদ্দেশ্য। যাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গান। তাই যাত্রাকে যাত্রাগানও

বলা হয়। শুধু গান নয়, বাদ্যও যাত্রাগানের আনুষঙ্গিক উপাদান। প্রাচীনতম যাত্রায় সংলাপের প্রাধান্য ছিল না, পরে ধীরে ধীরে তার মধ্যে সংলাপ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। পাশ্চাত্য অপেরার সঙ্গে প্রাচীন যাত্রার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। গ্রীক পুরাণ বা নানা দূরদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাস বা অজ্ঞাত নানাবিষয় নিয়ে 'অপেরা' লিখিত হয়েছে। যাত্রার মতো 'অপেরা'তেও সঙ্গীতের ছিল একাধিপত্য। পরে তাতে কাহিনী ও সংলাপ বিশেষত ইংলণ্ডের ড্রামাটিক অপেরায় লক্ষ্য করা গেছে। যাত্রা ও অপেরা উভয়ক্ষেত্রে সমবেত সঙ্গীত, দ্বৈতসঙ্গীত ও একক সঙ্গীতের প্রয়োগ ছিল। যাত্রাগানে বিবেক উপস্থিত থেকে যেমন কোনো জটিল বিষয় বা সমস্যার ব্যাখ্যা করে, অপেরাতে তা ঠিক দেখা যায় না, তবে এখানেও কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে চারজন দু' দলে বিভক্ত হয়ে গানের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে—একে বলে 'এনসেম্বল্' (Ensemble)। তবে একথাও ঠিক যাত্রায় বিবেকের যে গুরুত্ব এবং তা যেমন যাত্রার আত্মা—অপেরায় 'এনসেম্বলে'র সে ভূমিকা নেই।

যাত্রায় সঙ্গীতের বাহুল্য থাকলেও অপেরার অবিরাম সঙ্গীতের স্রোতোধারা সেখানে লক্ষণীয় নয়। তাছাড়া যাত্রায় দর্শকমনোরঞ্জনের জন্যে আর এক ধরনের সঙ্গীত থাকে। কোনো দৃশ্যের শুরুতে বা দৃশ্যের শেষে বালকদের কণ্ঠে সমবেত এই সমস্ত সঙ্গীত দেওয়া হয়। একে যাত্রার 'জুড়িগান' বলে। এ জিনিসও অপেরাতে নেই। আরও দুটি বিষয়ে প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে অপেরার পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। যাত্রা উন্মুক্ত স্থানে অথবা কারো গৃহে আসরে অভিনীত হত, কিন্তু অপেরা তার নিজস্ব গৃহে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অপেরার বিবর্তনে দেখা যায়, ক্রমশঃ কমিক উপাদানকে সে গ্রহণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তা ব্যালাড-কার্সে রূপ নিয়েছে। যাত্রার বিবর্তন ঘটলেও তার গম্ভীর রূপের কোনো পরিবর্তন হয়নি। লোকশিল্পের অঙ্গ হিসাবে একদা প্রাচীন যাত্রায় বক্তব্যের যে সারল্য ও সব কিছু উপস্থাপনার মধ্যে যে স্থূলতা ছিল আধুনিককালের যাত্রায় সেখানে অনেক সূক্ষ্মতা ও দার্শনিকতা আনার চেষ্টা হয়েছে। বিবর্তিত রূপে যাত্রা যতখানি জীবনের কাছাকাছি এসেছে অপেরা তা পারে নি। ইতালীয় অপেরায় সংলাপ নিষিদ্ধ, কিন্তু যাত্রায় তা নয়।

কিন্তু যাত্রা ছাড়াও আমাদের গীতিনাট্য আছে। এগুলির সঙ্গে অপেরার যে খুব সাদৃশ্য আছে, তা বলা যায় না। এগুলিও আসরে অভিনীত হয় না—অপেরার মতো রঙ্গমঞ্চেই অভিনেয়। যাত্রার মধ্যে ধর্মাদর্শই প্রধান। সুগ্রথিত ঘটনার পরিণামমুখী অগ্রগতি, দ্বন্দ্বময় বৃত্ত এবং সংলাপের প্রাণময়তা যাত্রায় তেমন লক্ষণীয় নয়। গীতিনাট্য ঠিক যাত্রা নয়। নাটক ও যাত্রার মাঝামাঝিতেই এর প্রকৃত স্থান। সঙ্গীতের বাহুল্য থাকলেও যাত্রার (অবশ্য প্রাচীন যাত্রা) তুলনায় এতে সংলাপের কিছু অধিক মূল্য। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় বলে অপেরার সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে। আর অপেরাতে নৃত্য থাকে না—আমাদের কিছু কিছু গীতিনাট্যে নৃত্যের সঙ্গেও যোগ লক্ষণীয়। প্রাচীন যাত্রার থেকে আধুনিক গীতিনাট্যগুলির নাটমূল্য কিছু অধিক'।

জনরুচির দিকে চেয়ে যাত্রার পালাকারগণ যেমন প্রাচীন যাত্রার আদর্শ থেকে সরে এসেছিলেন, তেমনি আরো কয়েকটি কারণেও এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছিল। যাত্রার বক্তৃতাধর্মী দীর্ঘ সংলাপ-উচ্চারণে অভিনেতৃগণের কষ্ট হচ্ছিল। তাই সংলাপ সংক্ষিপ্ত হল, কায়িক-অভিনয়ে থিয়েটারি ঢঙ প্রাধান্য-লাভ করল, নিরন্তর আবৃত্তির সুরেলা ভঙ্গির বদলে কথা-বলার সহজ-পদ্ধতি গৃহীত হল, বিবেকের গানের বাহুল্য হ্রাস পেল, সখীদের কোরাস নাচ-গান হ্রাস পেল, অশ্লীল ভাঁড়ামির স্থলেও হাস্যরসকে উন্নত করা হল। সাজ-সজ্জারও সরলীকরণ লক্ষ্য করা গেল—এইভাবে যাত্রা আধুনিকতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

প্রাচীন যাত্রার ভাড়ামি থেকে যাত্রাকে মুক্ত করে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ, গোপাল ভড়, মতিলাল রায়, লোকনাথ দাস প্রমুখ পালাকার, পরিচালক ও যাত্রা অভিনেতা। সমাজকল্যাণমুখী নীতিশিক্ষা যুক্ত করে তার মধ্যে দেশপ্রীতির সুর আনেন মতিলাল—মুকুন্দদাসের হাতে যার চূড়ান্ত পরিণতি। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যাত্রাকে ইতিহাসাশ্রয়ী করলেন। পরে ভোলানাথ, রাজেন্দ্রকুমার ফণিভূষণ প্রভৃতির হাতে যাত্রা আধুনিকতার পথে নেমে এল।

সে যাই হোক আমাদের দেশীয় যাত্রা বিবর্তনের ফলে আজ যেখানে এসেছে, তা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। দেবলীলা ও পৌরাণিক পালার মধ্যেই যাত্রা আর সীমিত নয়। ভক্তিরসের বাহনও নয় এখন যাত্রা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নানা পৌরাণিক আখ্যান, মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত নানা কাহিনী ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে যাত্রা-পালা রচিত হত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে স্বদেশী যাত্রায় দেশপ্রীতির উদ্বোধন লক্ষ্য করা গেল। ঐতিহাসিক যাত্রানাট্য প্রচুর লেখা হল। আরও পরে যাত্রার অভিনয়ে স্থূলত্ব হ্রাস পেল, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁক পড়ল ; মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা রচনায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তারপর সমাজ সমস্যাকে রূপ দিতে অগ্রসর হল যাত্রা। লেখা হল 'মা মাটি মানুষ' 'অচল পয়সা' 'তুরুপের তাস'। জনজাগরণের হাতিয়ার হয়ে যাত্রার জগতে এল 'লেলিন', 'হিটলার', 'আমি সুভাষ', 'রামমোহন'। রোমের ক্রীতদাসদের মুক্তিসংগ্রামের চিত্রকেও তুলে ধরা হল গণনাট্য সংঘের 'স্পার্টাকাস' এ। ধনী নির্ধনের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সমাজ বিরোধীদের ক্রিয়াকলাপ, মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের স্বরূপ, শোষিত মানুষের সংগ্রাম—আধুনিক যাত্রায় স্থান পাচ্ছে। আধুনিক থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তার কিছু কিছু লক্ষণকে গ্রহণ করে একালের যাত্রা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে খুব। তবু সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে প্রাচীন যাত্রা-শিল্পের সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গৌরব এ যাত্রায় নেই। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ নটগুরু অহীন্দ্র চৌধুরীর উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যাত্রার যতই আধুনিকীকরণ করা হোক, যতটাই নূতনত্ব এতে আনা যাক, বা মাইক্রোফোন ব্যবহার, আলোকসম্পাত এবং বসার ব্যবস্থার যতটাই উন্নতি সাধন করা হোক না কেন, পুরাতন যাত্রার কলাকৌশল আধুনিক যাত্রার চেয়ে অনেক

ভাল।···কাজেই এটা পরিষ্কার যে যাত্রা দুর্দিনের মধ্যে এসে পড়েছে। চতুর্দিকে একটা আর্থিক সঙ্কটের দরুণ সখের যাত্রাদলের সংখ্যাও খুব কমে যাচ্ছে। উপর উপর কিছু উন্নতি দেখা গেলেও একথা বলতেই হবে যে যাত্রা তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।··· আধুনিক যাত্রা থিয়েটারেরই আর একটা দিক এবং গ্রাম্য লোকশিল্প হিসেবে এর যা বৈশিষ্ট্য তা আজ একেবারেই বিলুপ্ত।[১]

লোক নাট্য : (Folk Drama)

ইংরেজি Folk শব্দটির প্রতিশব্দরূপে বাংলায় 'লোক' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লোক-নাট্যের অন্তর্গত 'লোক' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। এর অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে লোকনাট্যকেও ঠিক বোঝা যাবে না। একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ যে মানবগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে জাতিগত একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, সেই মানবগোষ্ঠীই হল 'লোক'-গোষ্ঠী। লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারকালে লোক শব্দের এই অর্থই স্মরণে রাখা হয়। লোক-সম্প্রদায় নাগরিক পরিবেশ ও নাগরিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। যে অঞ্চলে এই লোক-সম্প্রদায় বাস করে, সেখানকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা সে বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাদের চিন্তা-ভাবনা, আশা-বিশ্বাস সংস্কার, প্রথা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভাষা ব্যবহারে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকেই। আদিমযুগে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি এইভাবে একটি অঞ্চল-বিশেষকে অবলম্বন করে গ্রামীণ রূপ নিয়েছিল। পরে যখন নগর-সৃষ্টি হল, তখন ঐ সংস্কৃতিই উন্নততর রূপ লাভ করে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে। কিন্তু ঐ নাগরিক সভ্যতার পাশাপাশি ঐ গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাও ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। এই গ্রামীণ সংস্কৃতি যা নাগরিক সভ্যতার আঘাতেও বিলুপ্ত হয়নি, তাই হল লোক-সংস্কৃতি।

এই লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকনাট্যের কথাই আমাদের আলোচ্য। গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবনকে আশ্রয় করে মুখে মুখে রচিত রচনা যখন নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং যা আসরে নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে অভিনীত হয় তাই লোকনাট্য। লোকনাট্যের বিষয় এবং আঙ্গিক যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে পারে—কোনো একটি স্থির আদর্শকে বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখা লোকনাট্যের ধর্ম নয়। একথা সত্য যে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনাকে ইঙ্গিত-ইশারা বা অস্ফুট ধ্বনির মধ্য দিয়ে একেবারে গোড়ার দিকে প্রকাশ করেছে। তারপর আশ্রয় করেছে নৃত্যকে। অঙ্গবিক্ষেপ ও নৃত্যের পরই অস্ফুট ধ্বনি গানে পরিণতি লাভ করেছে; আর তখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে বাদ্য। অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত অসভ্য ও আদিম মানুষের সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিতে গিয়ে নানা ধরনের নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামী যুদ্ধে গমন করলে স্ত্রী শত্রুহননের নানা রকম

১. (বাঙালীর নাট্যচর্চা : যাত্রা—পৃঃ ৮৫)

অনুকরণমূলক অভিনয়ে মেতে উঠত। নৃত্যের মধ্য দিয়ে আদিম জাতি আকাশ থেকে বৃষ্টিকে আহ্বান করত। মোটকথা মনের নানা ভাব-প্রকাশের বাহন ছিল এই নৃত্য। কোনো একটি ভাব বা ঘটনাকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে রূপ দেবার এই প্রাচীন প্রথা থেকেই ধীরে ধীরে নাটকের জন্ম হয়েছে। অবশ্য নৃত্যের সঙ্গে বাদ্যও ছিল এবং পরে তাতে সঙ্গীতও যুক্ত হয়েছে। এই নৃত্য, গীত ও বাদ্যই সম্মিলিতভাবে নাট্যসৃষ্টির পথ কেটে দিয়েছে। আদিম মানুষ শিকার করত ও লড়াই করত, তারপর আরও পরে কৃষিকর্মও শিখেছিল। তারা তুকতাক ও নানা যাদুকর্মে বিশ্বাস করত। তাদের জীবনেও এই সমস্ত বিষয় সংলাপহীন মূকাভিনয়ে এবং নৃত্যাভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অনুমান করে নেওয়া চলে যে পরে ঐ অভিনয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যবহুলতার স্থানে সংলাপযুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রাধান্য পায় এবং নৃত্যের দিকটি সংক্ষিপ্ত হয়ে অভিনয়ের দিকটি গুরুত্ব পায়। তাই লোকসঙ্গীত ও লোক-নৃত্যই লোকনাট্যের গোড়ার কথা। লোকনাট্যের আসর সাধারণতঃ দু'রকমের—স্থির ও চলমান। স্থির আসর হল কোনো গাছতলা বা খোলা জায়গা কিংবা কোনো দেবমন্দির বা নাটমন্দির। আর চলমান আসর দেখা যায় নানা শোভাযাত্রায় নৃত্য-গীতাভিনয়ে। নৃত্যগীত ও বাদ্যের এই লোকনাট্যে কোনো একটি ঘটনাকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে চরিত্র। সঙ্গীতের স্থানে অর্থময় আবৃত্তি, একাধিক চরিত্রের আবির্ভাব, উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রচলন এবং ঘটনার কাহিনীতে উত্তরণ—এইভাবে বিবর্তনের পথে জন্ম নিয়েছে লোকনাট্য। লোকনাট্যের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।[১] এগুলি সূত্রকারে এইভাবে উল্লেখ করা চলে।

ক. গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যেই লোকনাট্যের উদ্ভব হয় এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তা পরিবেষণ করা হয়। কোনো জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কোনো কাহিনীকে এতে আশ্রয় করা হয়। কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানব-সম্প্রদায়ের বীরত্ব ও কীর্তিকথাকে সাধারণত ঐ কাহিনীতে যুক্ত করা হয়। কালের বিবর্তনে উন্নত ও সভ্যসমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রভাব ঐ কাহিনীতে পড়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এতে আদিম মানব-সম্প্রদায়ের চিন্তা, প্রথা ও সংস্কারই প্রাধান্য লাভ করে। এ নাটকে ঐ অঞ্চল-বিশেষের প্রাকৃতিক চিত্র ও সেখানকার মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা ও প্রাণস্পন্দন ধরা পড়ে। কালপরম্পরাগত কাহিনীকে অঞ্চলবিশেষের মানুষ ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে এর বৃত্ত বা কাহিনী গড়ে ওঠে।

খ. লোকনাট্যের মধ্যে গীত, নৃত্য ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়।

---

১. লোকনাট্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা করেছেন লোকসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে, নাট্যসাহিত্যের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা' গ্রন্থে. ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব' প্রবন্ধে ও ডঃ ভূবার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলার লোকনাট্য যৌথস্মৃতি ও সজীব সামর্থ্য' প্রবন্ধে (চতুষ্কোণ, বিশেষ নাটক সংখ্যা ১৩৬৪ বৈশাখ)

তবে মূলত গীতিপ্রধান মৌখিক রচনা বলে একে গীতিনাট্য বললেও অন্যায় হয় না। অবশ্য শিষ্টসমাজের যে গীতিনাট্য তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনুসন্ধান সমীচীন হবে না। তবে এর মধ্যে প্রাচীন আদিম সমাজের নৃত্যের বৈশিষ্ট্য কিছু থাকেই। আর এর যে গীত, তাতে থাকে সুরের একটানা প্রবাহ—সুরের কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। এর যে বাদ্য তার মধ্যে চর্মবাদ্যই প্রধান, তবে বাঁশি ও শিঙাও থাকে।

গ. লোকনাট্য আয়তনের দিক থেকে দীর্ঘ নয়। মুখে মুখে লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এর প্রচার। মৌখিক প্রচারের ফলে একই বিষয়ের বহু পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটি একটি পরিবর্তনশীল শিল্প—এর আকার ও আয়তন ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়।

ঘ. লোকনাট্য সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকই লোকনাট্যের অভিনয় দেখে, অভিনয় করে এবং নাট্যরচনা করে; লোকায়ত স্তরের সমস্ত মানুষ—দর্শক ও শিল্পীগোষ্ঠী এর সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঙ. লোকনাট্যের বিষয়বস্তু সাধারণ লোকায়ত স্তরের মানব-জীবন আশ্রয়ী হওয়া দরকার। ধর্মীয় বিষয় থাকলেও তার মধ্যে ভক্তির সুর প্রধান হয়ে উঠবে না। উচ্চকোটির হিন্দুদের পৌরাণিক আদর্শের প্রভাবে পৌরাণিক বিষয়কে আশ্রয় করে লোকনাট্য রচিত হওয়া উচিত নয়।[১] কারণ পৌরাণিক চরিত্র ও তাদের নিয়ে রচিত কাহিনী সম্পর্কে আমাদের মনে একটা অবিচল সংস্কার আছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন[২] যে লোকনাট্যের প্রধান উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। তাই এখানে ধর্মমূলক বিষয়ই প্রাধান্যলাভ করে। এখানে তাই পাপের শাস্তি, পুণ্যের জয়, ধর্মের মহিমা ও নীতির জয়গান গাওয়া হয়।

চ. লোকনাট্যেও সংলাপ থাকে; তবে তা আবৃত্তিধর্মী ও গীতিময়। এর ভাষার আঞ্চলিকতা অবশ্যই থাকবে। অঞ্চল বিশেষের শব্দ ও বাক্‌রীতি এর প্রাণ। এ সংলাপে অলংকার বা কবিত্ব একরূপ নেই বললেই চলে।

ছ. খোলা আসরে লোকনাট্যের অভিনয় হয় বলে এখানে অভিনেতার জোরালো কণ্ঠস্বর থাকা সমীচীন। এর দর্শক অশিক্ষিত বলে অভিনেতৃবর্গের অঙ্গভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও আবেগের প্রাবল্য তারা বেশি পছন্দ করে। এ অভিনয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মুখোশেরও ব্যবহার হয়।

জ. লোকনাট্যের কাহিনী দেবমহিমাজ্ঞাপক একটানা পাঁচালীর মতো নয়; এর মধ্যে কাহিনীর ক্রমবিকাশ, ঘটনার কতকটা ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্রেরও বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে। তাই একে নাটক বলতেই হবে।

পৃথিবীর অপরাপর দেশের মতো বঙ্গদেশেও নৃত্যকলার মধ্যে লোকনাট্যের আদিম

১. এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না।' (উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য প্রবন্ধ পৃঃ ১৩১ চতুষ্কোণ বৈশাখ ১৩৬৩) ২. নাটকের কথা 'লোকনাট্য' প্রবন্ধ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

রূপের ইঙ্গিত মিলে। বাঙলার লোকসমাজে গাজনের নাচ, অনুচরসহ শিব-গৌরীর নাচ, মড়াখেলা-গৃধিনী-বিশাল নাচ, কালীনাচ, পাইকের যুদ্ধাভিনয়, ভাজো-ব্রতর কপট যুদ্ধাভিনয় নৃত্য ইত্যাদিতে লোকনাট্যের উপাদান আছে। লোকনৃত্যের মধ্যে ছৌ-নাচের নাটকীয়তা সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। এই নাচে বিভিন্ন চরিত্র মুখোশ পরে নাচের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনীকে রূপ দেয়। মুখোশের মধ্যে মুখভঙ্গি দেখা না গেলেও প্রবেশ-প্রস্থান এবং দেহবিক্ষেপের মধ্যে ছৌ-নাচে অভিনয়কলা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

লোকসঙ্গীতের মধ্যে কীর্তন, কথকতা, পাঁচালীগান, কবিগান, আখড়াই, ধামালী, ঝুমুর প্রভৃতিতে লোকনাট্যের নানা লক্ষণ বর্তমান। এগুলির মধ্যে অঙ্গভঙ্গী, ব্যাখ্যার জন্যে সংলাপ, উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে গীতিসংলাপ দেখা যায়। প্রশ্নোত্তরযুক্ত ধুয়াগান, সখীগান, আড়ম্বরের রঙ-তামাসা, গাজীর বাঁশের অনুষ্ঠানে 'নাড়াচেলা'র প্রশ্নোত্তরমূলক নাচ-গান প্রভৃতিও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। তাছাড়া বাঙলার নানা ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যেও লোকনাট্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রচলিত পালাগানগুলি যেমন বোলান, আলকাপ বিষহরি, চোরচুন্নী গম্ভীরানুষ্ঠান, ঝুমুর পাঁচালী, ভাসান গান, সোনাবিবির পালা, মুকুটরায়ের পালাগান প্রভৃতিতে লোকনাট্যের উপাদান যথেষ্ট বর্তমান। গম্ভীরা ও গাজন উৎসবে রঙ-তামাসার মধ্যে নাচ-গানের অভিনয় হয়। গম্ভীরায় ব্যাঘ্রচর্ম পরে ভস্মাচ্ছাদিত শিব ত্রিশূল নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হন, আর গায়কেরা সংলাপে, গানে অভিনয়ে জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে।

বোলানেরও নানা রূপ, দাঁড়-বোলান, পোড়ো-বোলান, ছল-বোলান প্রভৃতি। দাঁড়-বোলানর মধ্যে লোকনাট্যের রূপ অনেকটা যাত্রার মতো। আবার আলকাপও নানা রকমের। কথোপকথন আলকাপ, ডুয়েট আলকাপ ও খ্যামটা আলকাপ। এই তিন রকম আলকাপেই বিভিন্ন চরিত্রের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের সংলাপে, গানে ও বোল কাটাকাটিতে লোকনাট্যের রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পালাগানগুলির মধ্যে সাধারণত একটা কাহিনী থাকে। তাছাড়া বাদ্যযন্ত্র ও সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে আসরে নাচ-গানের সাহায্যে ঐ কাহিনী পরিবেশিত হয়।

আমাদের দেশে লোকাভিনয়ে সঙেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এ দেশের বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সঙ বের হত। পথঘোরানো সঙ ও আসর ঘোরানো সঙ—এই দুই রূপ ছিল এর। মানুষ এবং মাটির মূর্তি দুই-ই সঙের বাহন। ছড়া ও নাচ-গানের মধ্য দিয়ে লোকসমাজের অভাব অভিযোগ ও সুখ-দুঃখ প্রকাশিত হত।

বাঙলার পুতুলনাচ লোকনাট্যের অন্তর্গত। দণ্ডপুতুল, হস্তপুতুল ও সূত্রপুতুল—এই তিন রকম পুতুল নাচে পুতুলগুলি সহজভাবে কৌশলে নাড়াচাড়া করে এবং নেপথ্য থেকে কথক ও গায়কের সংলাপ ও গান চমৎকার অভিনয়জগৎ সৃষ্টি করে।

এগুলি ছাড়া বাংলার লোকনাট্যের বড় পরিচয় যাত্রার মধ্যেও আছে। কারো

কারো ধারণা বাঙলার লোকসমাজের অন্তর্গত লৌকিক নাটকের ধারাটিই মধ্যযুগে নাটগীত নামে পরিচিত হয়েছিল এবং আরও পরে তা যাত্রা নামে আখ্যাত হয়েছে। যাত্রায় গান ও অভিনয় প্রাধান্য পাওয়ায় ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তা গীতাভিনয় নামে পরিচিত হতে থাকে—পাশ্চাত্যের প্রভাবে। নৃত্যসম্বলিত লোকনাট্যই হল নাটগীত। এই নাটগীতেরই গীত অংশ হ্রাস পেয়েও অভিনয় অংশ প্রাধান্য পেয়ে হয় গীতাভিনয়। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে লোকনাট্যের অনেক লক্ষণ আছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রাচীন নাটগীতের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। নৃত্য ও গীত সহযোগে বুদ্ধের কাহিনী নিয়ে তখন যে বুদ্ধ নাটক হত তার কথা চর্যাগীতিকায় আছে। 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মধ্যে যে নাট্যলক্ষণ দেখা যায় তা হয়তো লোকনাট্যেরই কিছু উন্নততর রূপ।

লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন এখনকার অধিকাংশ লোকসঙ্গীতে, বা পালাগানে ব্রতানুষ্ঠানে লোকনাট্যের লক্ষণ পুরোপুরি মেলে না। তবে উত্তরবঙ্গের তিন শ্রেণীর গ্রামীণ অনুষ্ঠানে এখনো লোকনাট্যের রূপ অবিকৃত আছে। তিনি নিজে সেই সব অনুষ্ঠান দেখে এসে মন্তব্য করেছেন, "উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন শ্রেণীর গ্রামীণ অনুষ্ঠান এখনো দেখা যায়, যাদের প্রকৃত গ্রামীণ লোকনাট্য বলা যায়, তা পশ্চিম দিনাজপুরের খন বা খনের গান, মালদহ অঞ্চলের পালাটি এবং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের রঙ পাঁচাল।" এগুলির নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নরনারীর প্রতিনিধি, গ্রামের জীবনভিত্তিক ঘটনা এগুলির বিষয়, উপস্থাপনায় এগুলিতে কৃত্রিমতা নেই।[১]

বারলেস্ক (Burlesque) :

পাশ্চাত্যে বারলেস্ক-শ্রেণীর নাটক মধ্যযুগের পরবর্তীকাল থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শ, সপ্তদশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত এর ধারা অল্পবিস্তর প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ইতালীয় শব্দ 'Burla' থেকে এসেছে Burlesque, এর মূল অর্থ ridicule বা বিদ্রূপ। এই মূল অর্থের ইঙ্গিত বারলেস্কের মধ্যে বরাবর রক্ষিত হয়ে আসছে। Richmond P. Bond. এর যা সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে দেখি "Burlesque consists in the use or imitation of serious matter or manner, made amusing by the creation of an incongruity between style and subject."[২] কোনো একটি গুরুগম্ভীর বিষয় বা ভঙ্গীর এ এমনই অনুকরণ যাতে বিষয় ও রীতির মধ্যে বৈষম্যজনিত হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। একে নিম্নস্তরের বারলেস্ক ও উচ্চস্তরের বারলেস্ক এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। অতিরিক্ত তুচ্ছ বিষয়কে যেখানে হাস্যকরভাবে উচ্চস্তরে তোলা হয়—সেখানে উচ্চস্তরের (high) বারলেস্ক আর যেখানে গুরুত্বপূর্ণ

১. উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য : চতুষ্কোণ (১৩৮৩ বৈশাখ) পৃ: ১৩৪-৩৫

২. *Burlesque* : John D. Jump গ্রন্থে এর উদ্ধৃত p. 1

বিষয়কে হাস্যকরতার সঙ্গে হেয় করা হয়, সেখানে নিম্নস্তরের (Low) বারলেস্ক। এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করলে বারলেস্কের চারটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়—ক. Travesty. খ. Hudibrastic. গ. Parody ও ঘ. The Mock Epic. এর মধ্যে প্রথম দুটি Low Burlesque ও শেষের দুটি high Burlesque. মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতকে ও রেস্টোরেশন যুগে Low বারলেস্ক ও অষ্টাদশ শতকে high Burlesque বেশী লিখিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় Francis Beaumont ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকীয় বারলেস্ক লেখেন—এর নাম Knight of the Burning Pestle. নাটকীয় বারলেস্ক (Dramatic Burlesque) মূলত বিদ্রূপাত্মক এবং নানাধরনের ব্যঙ্গাত্মক-কবিতারই যেন এ এক সমাহার। রেস্টোরেশন যুগের জর্জ ভিলিএরসের (George Villiers)-এর লেখা The Rehersal (1671)-এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকালীন প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে লিখিত 'হিরোয়িক নাটক'কে বিদ্রূপ করা হয়েছে এতে। অষ্টাদশ শতকে 'বারলেস্ক'-এর সঙ্গে গান যুক্ত করে অভিনয় করার রেওয়াজ ইংলণ্ডে দেখা দেয়। ব্যক্তি, ব্যক্তির আচার-আচরণ, গ্রন্থ সব কিছুর বিকৃত রূপ দেখিয়ে বিষয় ও উপস্থাপনার মধ্যে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস-সৃষ্টি করা, বিদ্রূপ করা, সংশোধন করা এর উদ্দেশ্য।

বিশ শতকেও জর্জ বার্ণার্ড শ The Admirable Bashville (১৯০১)তে এলিজাবেথীয় যুগের Blank verse-কে কৌতুকের সঙ্গে আক্রমণ করেছেন। একেও বারলেস্ক বলতে হবে। একজন সমালোচকের কথায় "Burlesque is mockery, it is joking, it is fun."[১] বারলেস্ক অনেক লিখিত হলেও এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমনই যে একে সার্থক শিল্প বলা যায় না। বাঙলা ব্যঙ্গাত্মক অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের অনেক ফার্সকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়।

এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা (Extravaganza):

বারলেস্ক রচনার রীতি আর এক ধরনের নাট্যরচনার সূত্রপাত করেছিল। এই নূতন শ্রেণীর রচনা একান্তই যুগোচিত ব্যাপার। এর নাম এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা। এতে বারলেস্কের মতোই অসঙ্গতির হাস্যরস থাকে; বিদ্রূপ বা সমালোচনা এতেও থাকতে পারে। কিন্তু বারলেস্কের সঙ্গে এর পার্থক্য হল প্রধানত ঘটনার উদ্ভটত্বে ও উৎকেন্দ্রিক কল্পনায়। আর বারলেস্কে যেমন বিদ্রূপ বা আক্রমণ অপরিহার্য, এখানে কিন্তু তা নয়; এখানে বিদ্রূপ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। উদ্ভট-ঘটনা উপস্থাপিত করে হাস্য সৃষ্টি করার দিকেই এর ঝোঁকটা বেশী। উনিশ শতকের ইংলণ্ডে জে, আর প্ল্যানচী (J. R. planche') একে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাছাড়া গিলবার্ট এবং রবার্ট ব্রাওও অনেকগুলি Extravaganza লিখেছিলেন। প্ল্যানচীর King of Little Britain, Babil and Bijou প্রভৃতি এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা প্রসিদ্ধ। শব্দশ্লেষের আধিক্য ও

১. *Burlesque :* John D. Jump

ভাবগত দুর্বলতা থাকলেও তাঁর প্রশংসা করে অধ্যাপক নিকল বলেছেন—"He showed how the romantic love of the wonderful could be turned from an impossible orientalism and from a mediaeval atmosphere of ridiculous proportions to a sphere of genuine creativeness."[১]

মাস্ক (Masque) মুখোস নাটক :

মাস্ক বা মুখোস প'রে অভিনয় করার রীতি প্রতীচ্যে বহু পুরাতন। মেগারীয় ফার্সে, গ্রীক নাটকের অভিনয়ে, ইতালীয় 'কমেডিয়া ডেল-আর্টে'এ মুখোস ব্যবহার করতেন অভিনেতারা। কিন্তু এই মুখোস ব্যবহার ইংলণ্ডে একটি নূতন রূপ নিল-এলিজাবেথের মৃত্যুর পর যখন ষষ্ঠ জেমস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ষোড়শ শতকে এই সম্রাট অভিনয়ে দৃশ্যপটকে উন্নততর করে তোলার জন্যে প্রচুর ব্যয় করতে চাইলেন। মাস্ক বা মুখোসের স্থান অভিনয়ে খুব প্রাধান্য পেল। নয়নানন্দকর বস্তু হিসেবে মাস্কের চল হল। অবশ্য বেন জনসন ও মিল্টন মাস্কের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে কবিত্বের আবেদনকে খর্ব করতে চান নি। যাই হোক, এখন থেকে মাস্ক আর শুধু মাত্র মুখোসকেই বোঝাল না—এক ধরনের অভিনয়কে বোঝাতে লাগল। এতে লিরিক উপাদান, গান, সূক্ষ্ম উৎকল্পনা তো ছিলই, তাছাড়া মুখোসপরা ব্যক্তিরা নানা ধরনের নৃত্যও প্রদর্শন করত। জনসনের Masque of Blackness (1605), মিল্টনের Comus ও স্যার উইলিয়াম ডি অ্যাভেন্যাণ্টের Salmacida Spoila (1639-40)-এর উদাহরণ। এগুলির মধ্যে মিল্টনের কোমাসই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের বাঙলা লোকনাট্যে এবং সঙে নানারকম মুখোস পরে নৃত্যের ব্যবস্থা আছে। 'মুখোস' সঙের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাটকেও আহার্য অভিনয়ে সাজসজ্জার ব্যাপারে মুখোস ব্যবহার প্রয়োজন হলে হত, যেমন দৈত্য বা রাক্ষসাদির ভূমিকায় অভিনয়ের সময়। আমাদের 'ছৌ-নাচ' কি এই শ্রেণীতে পড়ে না?

প্যাণ্টোমাইম (Pantomime) বা মূকাভিনয় ও ব্যালে (Ballet)

মূকাভিনয় আমাদের কাছে কোনো অপরিচিত ব্যাপার নয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এবং ভারতবর্ষে মূকাভিনয়ের প্রচলন ছিল। অবশ্য এক হিসেবে যে-কোনো ধরনের অভিনয়ে অভিনেতাকে যে আঙ্গিক ভাবভঙ্গী করতে হয়, তা মূকাভিনয়ের নামান্তর। কিন্তু এখানে আগাগোড়া সংলাপ-বিহীন যে অভিনয় তাকেই মূকাভিনয় বলে বুঝতে হবে। রোমে প্রাচীনকালে যে মূকাভিনয় হত, তাতে যন্ত্রসঙ্গীত ও সমবেত সঙ্গীত থাকত—অভিনেতা মুখোসও ব্যবহার করতেন এবং নৃত্যের মধ্য দিয়ে কোনো একটি কাহিনীকে নানা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে রূপ দেওয়া হত। গুরুগম্ভীর বিষয় প্রথম দিকে গ্রীসে ও রোমের মূকাভিনয়ের উপজীব্য ছিল—কিন্তু পরে তা হাস্যোদ্রেককর অভিনয়ে

১. *British Drama* A. Nicoll

রূপান্তরিত হয়। এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডে এবং রেস্টোরেশন যুগে নৃত্য অভিনয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে প্যারিস থেকে নৃত্যশিক্ষক আনানো হত ইংলণ্ডে। ক্রমশঃ সেখানে মূকাভিনয়ের চাহিদা দেখা দিল। ধীরে ধীরে মূকাভিনয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হল। ফরাসী ও ইতালীয় অভিনেতা-দলের কাছেও এঁদের ঋণ কম নয়। ইতালীতে 'কমেডিয়া ডেল আর্ট'এ অঙ্গভঙ্গী ও ক্রিয়ার ওপর অনেক পূর্বেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর গান, নাচ, নির্বাক ক্রিয়া, কমিক উপাদান, জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য প্রভৃতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—নিকলের কথায় "Thus the typical English Pantomime came into being, delighting the public."[১] নাচ ও গানের সহযোগে যদি মূকাভিনয় হয়, তাহলে ব্যালের সঙ্গে (Ballet) তার কোনো পার্থক্য থাকে না বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কারণ 'ব্যালে'তেও একটি কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়—গান, নৃত্য ও নির্বাক আঙ্গিক অভিনয়ের সাহায্যে। 'ব্যালে' শব্দের মূল অর্থ ছন্দোময় অঙ্গভঙ্গী। কিন্তু ব্যালেতে জোর দেওয়া হয় গানের কথার ওপর। মূকাভিনয়ে অঙ্গভঙ্গীর ওপর। থিয়োডর কোমিসারজেভস্কির কথায় নাটকের সঙ্গে ব্যালের পার্থক্য হল—"The only difference between these...forms of theatrical art is that in the first the emphasis is laid on the spoken dialogue, in the second on dialogue which is sung"[২] পাশ্চাত্যের এই ব্যালেকে কিন্তু আমাদের নৃত্যাভিনয় বলা সঙ্গত হবে না। কারণ এর সাহিত্যিক মূল্য বলতে কিছু নেই। অঙ্গভঙ্গী, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যের দ্বারা দর্শক-মনোরঞ্জনের চেষ্টা এতে থাকলেও, কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে প্রতিটি অঙ্গ-বিক্ষেপের ছন্দোময় সৌকর্য, অর্থাৎ নৃত্যের তালের সঙ্গে সঙ্গীতের অপরূপ সম্মিলনের মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্যলোক-সৃষ্টি তা এখানে হয় না। সেইজন্য ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ব্যালেকে নৃত্যনাট্যের পরিবর্তে নৃত্ত-নাট্য নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন, কারণ কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে এখানে থাকে নির্বাক নৃত্য। এ হল 'Drama without words ; the art of narrative through dancing, pantomime and music."[৩]

বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট (•Bertolt Brecht)

দীর্ঘকাল-প্রচলিত অ্যারিস্টটলের নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রধান সূত্রগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নূতন নাটক লিখে ও অভিনয় করে বিদ্রোহী জার্মান নাট্যকার বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নাটকের এক নূতন আদর্শ ও রূপ সম্পর্কে নিঃসংশয়

১. *British Drama :* A. Nicoll, p. 174.

২. *The Theatre and a Changing Civilization :* Theodore Komisarjevsky pp. 50.

৩. নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৯৭৮ সং। পৃঃ ১৫৪ তে উদ্ধৃত।

হলেন। নাটকের অভিনয় বিশেষত দর্শকদের ওপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন। তাঁর নাট্যাভিনয় 'এপিক-থিয়েটার' নামে আখ্যাত, একে Non-Aristotelian Theatreও বলা হল। কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে তিনি নাট্যকলার গভীরতর তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হলেন। বলিষ্ঠ দেহ-মন, ও জীবন সম্পর্কে বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং ঐ মার্কসীয় চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে অসীম আত্মপ্রত্যয় এনে দিল। আটত্রিশ বছরের নাট্য-জীবনে প্রচুর নাটক লিখে ও নানাদেশে তার অভিনয় দেখিয়ে নিজের উপলব্ধ অভিনব নাট্যাদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন। আজ বিশ্বের সকল নাট্যরসিকের কাছে ব্রেশটের নাম পরিচিত এবং জনচেতনাকে জাগ্রত করার হাতিয়াররূপে ব্রেশ্‌টীয় পদ্ধতিতে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ধারাটিকে বহন করার আগ্রহও অনেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাঙলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও ব্রেশ্‌টের তত্ত্ব-চিন্তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এবং কলকাতার দর্শক সমাজের একাংশে এই প্রগতিমূলক নাট্যের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় বেরটোল্ট ব্রেশটের কথা কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর আউসবার্গে ব্রেশটের জন্ম। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রকৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করেও তিনি পড়া ছেড়ে দেন ও সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। যন্ত্রণাকাতর বহু মানুষের সেবা-শুশ্রূষা করার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি সামরিক হাসপাতালে। এই সময়ে ১৯১৮-তে তাঁর প্রথম নাটক 'Baal' বের হল এবং পরের বছর তিনি আবার মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিত্যক্ত পড়াশোনা নতুনভাবে করতে থাকেন। ১৯২২-এর মধ্যে তাঁর Im Dickicht, Man Equals Man নাটকেরও অভিনয় হয়ে গেল। তারপর Three Penny Opera (১৯২৮), Rise and Fall of the City of Mahugonny (১৯৩০)এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু বার্লিনের এক শ্রমিক-পরিবারের আর্থিক দুর্গতি ও বেকারদের বেদনাদায়ক কথা সম্বলিত তাঁর একটি নাটকের চলচ্চিত্ররূপ 'Kuhle wampe' নিষিদ্ধ হল। তিনি জার্মানী ত্যাগ করলেন ও সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থান ঘুরে শেষে স্থায়িভাবে ডেনমার্কে বাস করতে লাগলেন। সেখানে থেকে স্টকহলম্ ফিনল্যাণ্ড, কালিফোর্নিয়া আমেরিকা হয়ে শেষে জুরিখে ফিরে আসেন। আমেরিকায় 'Un-American Activities' কমিটির কাছে তাঁকে নিজের বক্তব্য ও নাটক সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এই কালের মধ্যে তাঁর বহু নাটক বিভিন্ন দেশে অভিনীত হল—The Mother, Round heads and the Peakheads, Senora Carrar's Rifle, Mother Courage, The Good Person of Setzuman, The Life of Galliet, The Private Life of Master প্রভৃতি। ১৯৫৫এ তিনি লাভ করলেন স্তালিন পুরস্কার। আর এর এক বছর পরেই এই বিদ্রোহী নাট্যকারের কর্মময় জীবনের অবসান। আমরা নাট্যকার ব্রেশটের কথাই বলছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে কবি হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট,

অভাব, তার ওপর পীড়ন, লাঞ্ছনার বেদনায় কাতর ব্রেশটকে কবিতা রচনা করতেও দেখা যায়। কাব্য ও নাট্য—উভয় রচনার পশ্চাতে মানুষের বেদনাই সক্রিয়।

যাই হোক, ব্রেশট তাঁর নাটকের মধ্যে যে তত্ত্বটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন এবং যেটির ওপর ভিত্তি করে তাঁর নাটক দাঁড়িয়ে আছে তা হল বিচ্ছিন্নতাবাদ (Alienation). একে বুঝতে না পারলে তাঁর নাট্যতত্ত্ব বোঝা যাবে না। সুখের বিষয়, তিনি নানা প্রসঙ্গে বিষয়টিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে মনে রেখে আমরা বিষয়টির আলোচনা করছি। ব্রেশট বলেন, যে তাঁর এই নূতন তত্ত্বটিকে বুঝতে গেলে অ্যারিস্টটলের Mimesis বা অনুকরণ-তত্ত্বের আলোকে অভিনীয়মান ট্রাজিডি নাটকের চরিত্রগুলোকে সহানুভূতিযোগে দর্শকের উপলব্ধি করার বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে হবে। অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুযায়ী নাট্য-চরিত্রকে সহানুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয়। ট্রাজিডি নাটকের কোনো একটি চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা একাত্ম হয় গভীর সহানুভূতির সাহায্যে। চরিত্রটিকে অনুকরণ করে অভিনেতা চরিত্রেরই ভাব-চিন্তার জগতে বিচরণ করে ও চরিত্রটির সঙ্গে প্রায়-অভিন্ন হয়ে পড়ে। আবার দর্শক অভিনয় দেখতে দেখতে অভিনেতার সঙ্গে প্রায়-একাত্ম হয়ে পড়ে। মোটকথা অভিনেতা এমনভাবে অভিনয় করেন, যাতে দর্শক তাঁকে অনুকরণ করে মূল নাটকের চরিত্রটির অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সহানুভূতিমূলক এই ধরনের নাট্যোপলব্ধি অ্যারিস্টটলের কথায় দর্শকের চিত্তে ভীতি ও করুণা জাগ্রত ক'রে—এই দুই ভাবের আতিশয্য থেকে তাঁকে মুক্ত করে ও তাঁর ভাব-বিমোক্ষণ বা চিত্তশুদ্ধি ঘটায়। কিন্তু ব্রেশ্‌ট অ্যারিস্টটলের নাট্যোপলব্ধির এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী—ঐতিহাসিক চিন্তায় আস্থাশীল। ব্রেশট জানালেন নাটক দর্শনকালে দর্শক অভিনেতার মাধ্যমে চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাবে না—চরিত্র থেকে দূরে থাকতে হবে মনের দিক থেকে। চরিত্র বা ঘটনাকে অর্থাৎ বস্তুকে বস্তু হিসেবেই দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিকের 'নিরাসক্ত কৌতূহল' নিয়েই দর্শককে বিস্ময়ের সঙ্গে অভিনয় দেখতে হবে। প্রসিদ্ধ মার্কিন নাট্যসমালোচক এরিক বেন্টলি বলেন আপেল ফল যে মাটিতেই পড়ে, একথা সবাই জানে, কিন্তু আইজাক নিউটনকে এ ঘটনা বিস্মিত করল। ব্রেশটের নাটকেও "The Playwright is to be an Isaac Newton, and make Isaac Newtons of his audience."[১] ব্রেশ্‌ট মনে করেন নাটকে আমরা যে ঘটনা দেখি তা অতীতেরই ঘটনাবলী—সেই ঘটনার মধ্যে দর্শক যদি অভিনয়-কৌশলে তন্ময় হয়ে যান, তাহলে নাটকের মূল লক্ষ্যই মাটি হয়ে গেল। অভিনেতাকে তাই নাট্যচরিত্র থেকে পৃথক হয়ে দর্শককে নাটকের ঘটনাগুলি বোঝাতে হবে; যে অবিচার যে অন্যায় একদিন ঘটত, আজও তা ঘটে চলেছে; কিংবা যে ঘটনা একদা ঘটেছিল আজও তার উপযোগিতা আছে কিনা? দর্শককে ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করা নয়—তাকে ভাবানোই হবে

১. *Perspectives on Drama*: গ্রন্থে সংকলিত Eric Bentleyর প্রবন্ধ Enactment. p. 433.

নাটকের কাজ। দর্শক বুদ্ধিবৃত্তিকে সদাজাগ্রত রেখে ঘটনাগুলিকে জানুক এবং বাস্তব-জীবনে তার ভূমিকাকে স্থির করে নিক। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে দর্শকদের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে না পারলে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না। আর এ বিচ্ছিন্নতাই হল ব্রেশটের 'Alienation'—তিনি অবশ্য ইংরেজি এই শব্দটির পরিবর্তে 'Verfremdung' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন। প্রচলিত নাটকের Illusion বা মায়াবাদ কিংবা পূর্বে বর্ণিত দর্শকদের নাট্যচরিত্রের সঙ্গে অভিন্নতা—এরই মূলে কুঠারঘাত করে তার তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা; আর এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রচলিত নাট্যরীতি বা অ্যারিস্টটলের প্রসঙ্গ তাঁকে বারবার আনতে হয়েছে। তুলনামূলকভাবেও তাঁকে তাঁর নাট্যরীতির সঙ্গে অ্যারিস্টটলের রীতির পার্থক্য বোঝাতে হয়েছে। আমরা সে কথায় আসছি। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে বোঝাতে গিয়ে তিনি আরও যে-সব কথা বলেছেন ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাও বেশ চিন্তাপূর্ণ। শেক্সপীয়রের 'কিংলীয়র' নাটকের রাজা লীয়র তাঁর দুই কন্যা গনেরিল ও রিগ্যান-এর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের আচরণে। লীয়রের ক্রোধ তাঁর বিশ্বস্ত চাকর কেন্টের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এই কন্যাদের চাকর লীয়রের একটি আদেশ অমান্য করায় তাকে কেন্ট প্রহারও করেছিল। এখন এই দৃশ্য অ্যারিস্টটলীয় পন্থায় অভিনীত হলে লীয়রের ক্রোধ অভিনেতার মধ্য দিয়ে দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। দর্শকও ক্রোধ ছাড়া কোনো বিস্ময় বা অস্বস্তি অনুভব করবে না। কিন্তু লীয়রের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল কিনা এবং এর ফলে ঘটনাধারা কোন্ পরিণতি লাভ করবে—দর্শক এ সব ভাববার কোনও অবকাশই পায় না। ক্রোধের বিষয়টি দর্শকের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। নাটকের ঘটনাগুলোকে দর্শক যদি বিচার করবার সুযোগ না পায়, তাহলে মনে করবে সামাজিক সব কিছুই চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, অনৈতিহাসিক ও অনালোচনার বিষয়। ব্রেশ্‌ট প্রশ্ন তুলেছেন একালের দর্শক কি লীয়রের ক্রোধে নিজেও আত্মহারা হয়ে ক্রোধকে সমর্থন জানাবে? কিংবা লীয়রের চাকরের ক্রোধকে অনুমোদন করবে? তাঁর বক্তব্য একালের মানুষ এমন অভিনয় দেখতে ইচ্ছুক নয়। তাহলে 'কিং লীয়র' নাটকের ঐ দৃশ্য যদি ব্রেশট পরিবেষণ করেন, তাহলে তা কিভাবে হবে? তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদের আলোকে এই দৃশ্য দেখাতে গেলে অভিনেতা এমনভাবে লীয়রের ক্রোধকে উপস্থাপিত করবেন যাতে দর্শকেরা প্রথমত বিস্মিত হবে—আর তার ফলে লীয়র ও তার ক্রোধ থেকে আরও কিছু অন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কথা দর্শক চিন্তা করতে পারবে। লীয়রের মনোভাবটিকে আলাদা করে নিয়ে এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে মনে হয় ঐ ক্রোধ একান্তভাবে সেই অবস্থায় লীয়রেরই। সবকালের মানুষের মনে লীয়রের অভিজ্ঞতা ক্রোধ সঞ্চার করতে পারে না। ক্রোধ মানুষের স্থায়ী ভাব হলেও লীয়রের যে ক্রোধ যা একটা বিশেষ অবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে তা ক্ষণজীবী ব্যাপার। সুতরাং "The process of alienation, then, is the process of historifying, of presenting events and persons as historical"[১]

১. Bertolt Brecht-এর On the Experimental Theatre (*Perspective on Drama* গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রবন্ধ p. 273)

ব্রেশ্‌টীয় রীতিতে নাটকের চরিত্রগুলোকে দেখলে মনে হবে তারা অপরিবর্তনীয়, পরিবেশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা ভাগ্যের হাতে অসহায় বলি নয়। বিশেষ পরিবেশে তারা একরকম আচরণ করেছে বলে তাদের সব কিছুই চিরন্তন বিষয় নয়। যে বাস্তব জগতে বসে তার চারপাশের মানুষকে দর্শক যে-ভাবে দেখে এদেরও সেই দৃষ্টি নিয়ে সে বিচার করবে। সমাজসংস্কারক হিসেবেই দর্শককে অভিনয় দেখতে হবে। "The theatre no longer seeks to intoxicate him, supply him with illusions, make him forget the world, to reconcile him to his fate. The theatre now spreads the world in front of him to take hold of and use for his own good."[১]

ব্রেশ্‌টের থিয়েটার 'এপিক থিয়েটার' নামেও পরিচিত। একে মহাকাব্যিক থিয়েটার বলার কারণ—ক. এখানে মহাকাব্যিক বর্ণনামূলক রীতিতে অভিনেতা সব কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন এবং খ. এপিক রীতির শিল্পসম্মত কৌশল ও সহজ সুন্দর সারল্য এতে থাকে। অতীতে সংঘটিত ঘটনা মহাকাব্যের কবি বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা যেমন স্পষ্ট করেন[২], ব্রেশটের নাটকের অভিনেতাও তেমনি নাটকীয় চরিত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনেকখানি বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা দর্শকদের চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করেন। ব্রেশট সমকালীন বিখ্যাত নাট্যকার পিসকাটারের (Piscator) কাছ থেকে এই নামটি পেয়েছিলেন। এপিক রীতিতে নাটক অভিনীত হলেও সমস্ত রকম পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। এতে কোরাসের প্রয়োগ, মুখোশের ব্যবহার এবং প্রয়োজনস্থলে সঙ্গীতের প্রয়োগও হয়ে থাকে। তাঁর নিজের কথায়, "Today when human characters must be understood as the totality of social condition, the epic form is the only one that can comprehend all the processes"[৩] নাটকের কোনো দৃশ্যে কিছু জীবন্ত চিত্র, কোনোটিতে নিছক আলোচনা বা বর্ণনা, কিংবা কোথাও দৃশ্যের বদলে শুধুই গান বা আবৃত্তি—সব মিলিয়ে একটা Total effect সৃষ্টি এপিক থিয়েটারের লক্ষ্য।[৪]

ব্রেশ্‌টের নাটকে সঙ্গীতের একটি বিশেষ মূল্য আছে। সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। শুধু লোকসঙ্গীত বা গণসঙ্গীতই নয়, জনপ্রিয় সঙ্গীত তাঁর কাছে খুব প্রিয় ছিল। অবশ্য কয়েক শ্রেণীর প্রথাগত গানের তিনি ছিলেন বিরোধী। তিনি Music শব্দটির বদলে 'Misuc' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন প্রথাগত গান থেকে তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতবোধকে জানানোর জন্যে। তাঁর নাটকে সঙ্গীত বেশীর

১. ব্রেশটের একই লেখা থেকে ও পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ থেকে পৃ: ২৭৩

২. *Poetics* : Aristotle : tr By water p. 40.

৩. ব্রেশটের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ৪. Its qualities of clear description and reporting and its use of choruses and projections as a means of commentory earned it the name to 'epic' (The Street Scene Bertolt Brecht, The *Theory of the Modern Stage.* Ibid by Eric Bentley.

ভাগ ক্ষেত্রেই এক ধরনের বিরাটের ব্যঞ্জনাবহ তবুও সমাজের সাধারণ মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে তাঁর সঙ্গীত। তাঁর সঙ্গীত মূল বক্তব্যের পরিপোষক, সংক্রামক ও একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে এপিক নাট্যরীতির পার্থক্য একটি ছকের সাহায্যে ব্রেশট প্রকাশ করেছেন। আমরা এখানে শুধু ব্রেশটের নাট্যরীতির মূল কথাগুলি সূত্রাকারে বলছি;

ক. এপিক থিয়েটার হবে বর্ণনামূলক (Narrative)। সংলাপ ও অঙ্গাভিনয়ের মধ্যে এ সীমাবদ্ধ থাকবে না, নাটকে এর অভিনেতৃগণ একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করবেন —গল্প বলে, কবিতা আবৃত্তি করে গান গেয়ে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের মতো তাঁরা একটি কাহিনী বিবৃত করবেন। তাই বর্ণনামূলক এ থিয়েটারের নাম এপিক। খ. দর্শকদের এ পর্যবেক্ষককে পরিণত করে, তাঁদের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে এবং জগৎ-সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করে। গ. দর্শকদের যুক্তি বা তর্ক করতে শেখায় ঘ. এতে দর্শকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ঙ. মানুষ অনুসন্ধানের বিষয়—সে পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তন করারও শক্তি রাখে। চ. প্রত্যেকটি দৃশ্য এর স্বতন্ত্র। ছ. এর বৃত্তের বিকাশ সরল পথে নয়, বক্র পথে (in curves), জ. দর্শকের বুদ্ধি এখানে থাকবে সদাজাগ্রত। ঝ. উদ্দেশ্যমূলক এপিক থিয়েটার মার্কস্‌বাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলে যে বস্তুজগতের পরিবর্তনই তার লক্ষ্য। ঞ. ব্রেশটের থিয়েটারে মঞ্চের পশ্চাৎপট নাট্য বিষয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং অভিনেতা নাট্যচরিত্রের মধ্যে লীন হয়ে যান না—নাট্যচরিত্র সম্বন্ধে বিচারবোধ দর্শকদের মধ্যে জাগ্রত করেন। ট. নাট্যঘটনা থেকে দর্শক বিচ্ছিন্ন থাকে বলে দর্শক এখানে বিচারের সুযোগ পান। এ বিচ্ছিন্নতা আসলে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিরই সহায়ক। ঠ. ব্রেশটের নাটকে জীবনের সব রকম সমস্যাই স্থান পেতে পারে—একটা কৃত্রিম ও অবাস্তব বৃত্তের মধ্য দিয়ে জটিল জীবনের ব্যাখ্যান এবং তার মূল শক্তিগুলির মধ্যে বিরোধ ও তার সমন্বয়ের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত এর অভিপ্রায়। ড. ব্রেশটের থিয়েটার অনেকখানি Fable এর লক্ষণাক্রান্ত—পশুপাখী এর নায়ক-নায়িকা। তাদের কাহিনীর মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার প্রয়োজন আছে জীবনে।

সমালোচনা :

ব্রেশট যে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলেছেন, এক হিসেবে তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমাদের কাছে অপরিচিত ব্যাপার নয়। প্রচলিত নাট্যরীতিতে আমরা রোমান্টিক কমেডি ছাড়া অন্যান্য কমেডিগুলিতে ও ফার্সের বিষয়বস্তু অভিনয়ের মাধ্যমে যে-ভাবে উপভোগ করে থাকি, সেখানে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই সজাগ থাকে—নাটকীয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে সেখানে আমাদের কোনো ভাবগত (emotional) যোগ থাকে না। ফরাসী সমালোচক বেগর্স এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই জানিয়েছিলেন যে 'Insensibility on the part of the audience'ই হাস্যোদ্রেককর নাটক উপভোগের এক অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং ব্রেশট যে Sympathetic Understanding-এর বিরোধিতা করেছেন—তা অন্তত আমাদের কয়েক ধরনের কমেডি সম্পর্কে খাটে না—কারণ এখানে তো Sympathetic উপলব্ধি নেই। আমাদের সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেও হাস্যরসকে

অন্যান্য রসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নে স্থান দেওয়া হয়েছে—হাস্যরসাত্মক প্রহসনে নাটকীয় চরিত্রগুলির মধ্যে একজন অপরজনকে আলম্বনবিভাব রূপে গ্রহণের আশ্রয় পায় না; দর্শককেই প্রহসনের মূল চরিত্রটিকে আলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে হয়—এই একটি পাত্রের বা পাত্রীর অভাবে আবেদন ঠিক হৃদগত হতে পারে না। কমেডিগুলিতে এই বিচ্ছিন্নতার একটা ব্যাপার ছিল বলেই এরিক বেন্টলি বলেছেন—"There was no need to go outside the drama for such an aim. Corneille would have understood it well, and something of the sort is implied in most comedy." একালের ব্রেশ্‌ট-ভক্ত আধুনিক বাঙালী নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে যাত্রাতে এই বিচ্ছিন্নতার ব্যাপার আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত—তিনি বলেছেন—"বিবেকের গান কিংবা যাত্রার অভিনয়ের ধরণের মধ্যে·····চরিত্রটা এবং মানুষটা আলাদা হয়ে চট্ করে, ঘটনাটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চরিত্রটাকে আলাদা করে ধরে নেওয়া, কথা হঠাৎ audience-এর সঙ্গে বলতে বলতে audience সঙ্গে audience-এর কথাটাকে বলে তাতে একটা অন্য ধরনের Comment করা যেটা situationটার থেকেই work out করেছি—এই বিচ্ছিন্নতাগুলো যাত্রায় বহুদিন ধরেই ছিল"। কিন্তু ব্রেশ্‌ট একে গুরুত্ব দিয়ে দর্শকদের সবচেয়ে সম্মান দিয়ে যে-ভাবে একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে তাঁর কৃতিত্ব আছে।

ব্রেশ্‌টের নাটকের তত্ত্ব ও তাঁর প্রয়োগ-ব্যাপার আমাদের বাঙালী নাট্যকারদেরও কাউকে কাউকে খুব প্রভাবিত করছে। ব্রেশ্‌টের নাটক বঙ্গানুবাদ করে তার অভিনয় তো অনেকদিন পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। কিংবা অন্য কারো প্রসিদ্ধ নাটককে ব্রেশ্‌টীয় পদ্ধতিতে অভিনয়ের প্রবণতাও দেখা গেছে। ১৯৬১ সালে 'মাস থিয়েটার্স' ব্রেশ্‌টের রীতিতে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' প্রায় ৫৩ রাত্রি অভিনয় করেন। ১৯৬৯-এর ১৪ই ডিসেম্বর ব্রেশটের Three penny Opera-র অনুসরণে 'তিন পয়সার পালা' নান্দীকার মঞ্চস্থ করে। তাছাড়া নান্দীকার প্রযোজিত 'ভালোমানুষ', চেতনা প্রযোজিত 'ভালো মানুষের পালা'। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন আঙ্গিকে লেখা 'মারীচ-সংবাদ' ব্রেশ্‌টীয় রীতিতে অভিনীত হলেও এতে যাত্রা, কীর্তন, বাউল, পুরাণ, লোকনৃত্যের সমন্বয় ঘটেছে। একালের অসামান্য শক্তিমান প্রগতিশীল নাট্যকার উৎপল দত্ত ব্রেশ্‌টীয় রীতিতে অভিনয়ে খুবই আস্থাশীল। তাঁর 'কল্লোল' 'ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি এই রীতিতেই অভিনীত হয়। এই সব নাটক দর্শনকালে নাট্যচরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিনীত বিষয় সম্পর্কে দর্শকদের চিন্তাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং সেই সঙ্গে নাটক থেকে শিক্ষা ও আনন্দদান এদের আসল লক্ষ্য।

ব্রেশ্‌টীয় নাটকের বৃত্ত জীবনের অনুকরণ নয়। জটিল জীবনে সমাজ-উদ্ভূত মৌল শক্তিগুলির মধ্যে চলেছে নিরন্তর সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রয়াস। এরই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয় এ-নাটকে। ব্রেশ্‌টের কাহিনীতে উপকথার লক্ষণ আছে। তাঁর নাটকে রূপক-সাংকেতিক রীতিকেও বহুলাংশে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্রেশটের 'Mother courage and his sons'-এর অনুসরণে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন 'হিম্মৎবাঈ' (১৯৭৫)। সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দু-মুসলমান রাজশক্তির সংঘর্ষের কথাকে এতে প্রেক্ষাপটে রাখা হয়েছে। হিম্মৎবাঈ-এর জীবন-সংগ্রামের কথা এতে রূপায়িত। ব্রেশটের The good person of St. Jhone-এর অনুবাদ হয়েছে 'ভাল মানুষ' 'ভাল মানুষের পালা' নাম দিয়ে একথা আগেই বলেছি। তাঁর 'দি ককেশিয়ান চক সার্কল' হল বিখ্যাত নাটক। এর অনুসরণে বাঙলায় 'খড়ির গণ্ডি' বা 'খড়ি মাটির গণ্ডি' লেখা হয়েছে। নাটকের সূচনায় কোনো জিনিসের ওপর মালিকানার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তারপর একটি লোকগাথাকে আশ্রয় করে দেখানো হল যে এক রানী তার ছেলেকে বিপদের মুখে ফেলে চলে গেলেন। তখন পরিচারিকা তাকে মানুষ করল। পরে ঐ রানী যখন তার ছেলেকে দাবি করল তখন বিচারের ভার পড়ল কাজীর ওপর। কাজী রায় দিলেন পরিচারিকাই আসল মা। মা সম্পর্কে চিরকালের ধারণাকে ব্রেশ্‌ট পাল্টে দিয়েছেন এখানে।

ব্রেশ্‌টের পদ্ধতিতে নাটক লিখে কিন্তু সকলেই সাফল্য লাভ করেছেন, একথা বলা যায় না। অনেকেই অন্ধভাবে তাঁকে অনুকরণ করেছেন আবার কেউ বা তাঁর আদর্শের সঙ্গে অন্য রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এর ফলে এঁদের প্রচেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয়েছে বা হচ্ছে এ ধারণা ঠিক নয়।

অ্যাবসার্ড বা কিমেডি নাটক :

সাম্প্রতিক কালে 'অ্যাবসার্ড নাটক' নামে এক শ্রেণীর অভিনব নাটক বিশ্বের সকল নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের ফসল এই অ্যাবসার্ড নাটক। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই এই ধরনের নাটক লেখার সূচনা হয়; তবে তারও পূর্বে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও দার্শনিক জীবনে যে গভীরতর পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে এবং তার ফলে মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়—তা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে ঘনীভূত হয়ে এই শ্রেণীর নাটকের জন্ম দিয়েছে। উদ্ভবের কাল থেকে এ নাটক দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে প্রচুর নিন্দা ও প্রশংসা পেয়ে আসছে। ইউজিন আয়োনেস্কো (Eugene Ionesco) স্যামুয়েল বেকেট (Samuel Beckett) আর্থার অ্যাডামভ (Arthur Adamov), জাঁ জেনে Jean Genet—প্রমুখ নাট্যকারদের অ্যাবসার্ড নাটক ফ্রান্স, জার্মানী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশে প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে এ সব নাটকের অধিকাংশ দর্শক নাটক দেখে কৌতুক বোধ করে, প্রশংসাও করে কিন্তু নাটকের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য যে কি তা বোঝে না। একথা ঠিক যে এ ধরনের নাটক দেখে দর্শক প্রথমত হতভম্ব হয়—আপাত-অর্থ হীন, অযৌক্তিক বক্তব্যে। বহুকাল ধরে চলে আসা নাটকগুলির মধ্যে যে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা, ঘটনা; চরিত্র ও সংলাপের যে একটা বিশেষ ছাঁদ—পরিকল্পনার সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের যে একটা নিগূঢ় যোগ তা এই

শ্রেণীর নাটক উৎকটভাবে লঙ্ঘন করছে। এ শ্রেণীর নাটকে সুপরিকল্পিত মানবিক চরিত্র দুর্লভ; কোনো অনিবার্য পরিণাম নেই—নাটকীয় চরিত্র-প্রকাশক শাণিত সংলাপ এখানে অর্থহীন বুদ্‌বুদ মাত্র। নাট্যবৃত্তের পঞ্চসন্ধিযুক্ত যে একটা নিয়ম-নির্দিষ্ট গঠন, তা এখানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত—তাই যে-কোনো স্থান থেকেই এর নাট্যবৃত্তের আকস্মিক সূচনা ও উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন উপসংহার। চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব-লক্ষণ বিরলক্ষেত্রেই দৃষ্ট—তাদের নামও আশ্বাসজনক নয়; নাট্যঘটনা বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পর চরিত্রগুলোর প্রকৃতিও অস্বাভাবিকভাবে অনেক সময় পরিবর্তিত। বেকেটের Waiting for Godot-এর পোজো ও লাকি নামে দুই ব্যক্তি যথাক্রমে প্রভু ও ভৃত্যরূপে আমাদের সামনে প্রথমত দেখা দেয়, কিন্তু পরেই তারা হয়ে যায় যথাক্রমে ভৃত্য ও প্রভু। আয়োনেস্কোর 'জ্যাক' (Jack) বা 'সাবমিশন' (Submission)-এ দেখি দুটি বা তিনটি নাসা-বিশিষ্ট তরুণীদের আবির্ভাব। The Bald Sopransoতে সূচনাতেই দেখি ঘড়িতে বাজছে ১৭টা। মোটকথা উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের এ এক রাজ্য। নাটক দেখে সন্তুষ্টচিত্তে তৃপ্তিজনক সমাধান নিয়ে এখানে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কোনো আশা নেই। আয়ানেস্কো নিজেই তাঁর নাটকের প্রসঙ্গে বলেছেন 'অ-নাটক' (Antidrama) এবং তাঁর নায়ক 'অ-নায়ক' (Anti-hero). 'অ্যাবসার্ড' কথাটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন (কাগজে লেখা একটি Note এ)—"Absurd is that which has no purpose or goal or objective."[১]

এই শ্রেণীর নাটকের যে সাধারণ পরিচয় দেওয়া হল, তাতে বোঝা যায় প্রচলিত নাট্যাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এর আদর্শ। সমালোচকেরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন একে আদৌ নাটক বলা চলবে কিনা—এই চিন্তায়। কোনো কোনো সমালোচক যেমন আমেরিকার চ্যাপমান, ইংলণ্ডের প্রীস্টলী ও ল্যাম্বার্ট প্রভৃতি এঁদের নাট্যকারের সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত। কিন্তু ভেবে দেখতে হয় এঁরা যে উদ্ভট-জীবন দর্শনের অধিকারী, তার মূল কোথায়, কিভাবে তাঁরা এ ধরনের মানসিকতায় এসে পৌঁছলেন। সমাজের অগ্রগতির যে স্বপ্ন মানুষ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকেই দেখে আসছিল—যুদ্ধান্তে সে স্বপ্ন ঘুচে গেল। কার্ল মার্কসের আমূল সমাজ বিপ্লবের ভবিষ্যৎবাণী স্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে রূপকে সোভিয়েট রাশিয়ায় তুলে ধরল, তাতে মানুষ আশ্বস্ত হল না। হিটলারের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে বর্বরতা, নির্বিচার হত্যা এবং লুণ্ঠনের বন্যা বয়ে গেল সমগ্র ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে। যুদ্ধোত্তর কালে বাহ্যত সমৃদ্ধিশীল পশ্চিমী ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে অধ্যাত্মক্ষেত্রে শূন্যতাবোধ দেখা দিল। শুভ ও সুন্দর-চেতনা একরূপ নির্বাসিত হল। শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও ঔদাসীন্যের জগতে দ্বীপান্তর দণ্ডলাভ করে বুদ্ধিজীবী ও অনুভূতিশীল মানুষ জীবনের কোনো অর্থই খুঁজে পেল না। এই হতাশা, শূন্যতা, মানবিক মূল্যের বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের নৈরাজ্যই জন্ম দিয়েছে অ্যাবসার্ড

১. **The Theatre of the Absurd**: Martin Esslin (*Perspectives on Drama* গ্রন্থে সংকলিত p. 188.

নাটকের। এ রাজ্য যুক্তিহীন, অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, উদ্ভট জগৎ—এতে কোনো সন্দেহ নেই। বৃহত্তর সমাজমানসের এই রূপ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহলে সেখানেও দেখব জীবন অর্থহীন, মানুষের ভাষা দুর্বোধ্য, চরিত্রগুলোর আচরণ অযৌক্তিক। অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা বলেন পরিবর্তিত জগতে বাস্তব সংসারে আগাগোড়া সঙ্গতিপূর্ণ ক'জন চরিত্র মেলে? বাস্তবজীবনে মানুষ যতই নিজেকে মুক্ত মনে করুক, সে প্রকৃতপক্ষে কতখানি স্বাধীন? সমবেত কয়েকজন মানুষের কথাবার্তায় সব সময় সংবাদ-বিনিময় ছাড়া কি উদ্দেশ্য বা যুক্তি থাকে? সুতরাং "The Theatre of the Absurd is the true theatre of the time."[১]

অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের বক্তব্যের সঙ্গে হেল্‌ডেগার (Heldeggar) সার্তে (Sartre) ও কামুর (Camus) দর্শনের অনেকখানি মিল আছে। অ্যাবসার্ডের ধারণাটি তাঁরাই প্রথম দিয়েছিলেন। মানুষের অবস্থার উদ্ভটত্ব, চিন্তার অসারত্ব এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের স্বরূপ ব্যাখ্যা দিতে সার্তে ও কামুও চেয়েছেন। যে সমাজ-পরিস্থিতি থেকে তাঁদের দর্শনের উৎপত্তি, সেই একই পরিস্থিতি অ্যাবসার্ড নাট্যকারদেরও সৃষ্টির উৎস।

আবার এঁদের ওপর ডাডাইস্ট ও সুর-রিয়ালিস্টদের প্রভাবের কথাও অনেকে ইঙ্গিত করেছেন। আলফ্রেড জারি (Alfred Jarry—1873—1907) ও অ্যাপোলিনেয়ার (Apollinaire, 1880—1918)—সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সে ডাডাইজমের অগ্রদূত। অ্যাণ্টোনিন আরতাউদ (Antonin Artaud, 1886—1948) ও রোগার ভিট্রাক (Roger Vitrac, 1899—1952)—এঁরা সুর-রিয়ালিজমের পাণ্ডা। জারির লেখা 'উবু রয়'ই (Ubu Roy) প্রথম অ্যাবসার্ড নাটক। ব্রেশটের প্রথম দিকের নাটকগুলিতে ডাডাইজমের প্রভাব থাকায় সেগুলিকে অ্যাবসার্ড নাটক রূপে কেউ কেউ গণ্য করতে চান।

অ্যাবসার্ড নাটককে বাহ্যত যতই বিদ্রোহাত্মক ও অভিনব বলে মনে হোক, পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গেও এর একটা যোগ আছে। নানা প্রাচীন উৎস থেকে এ নাটক উপাদান ও কলাকৌশল গ্রহণ করে পুষ্ট হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য ও নাটকের নানা ঐতিহ্য, গ্রীস ও রোমের ভাঁড়ামিপূর্ণ মাইম, রেনেশাঁসযুগের 'ইতালীয় কমেডিয়া ডেল আর্ট, মূকাভিনয় (Pantomime), কিংবা প্রাচীন নানা হেঁয়ালিপূর্ণ কবিতা, স্বপ্ন বা বিকট নিশাস্বপ্ন (গ্রীক ও রোমানদের), মধ্যযুগের মরালিটি নাটকের রূপক-সংকেত, স্পেনের Auto-Sacrament, প্রচলিত নাটকের নির্বোধ হাস্যরসিক বা উদ্ভটদের দৃশ্য—বা প্রাচীন নাটকের ধর্মানুষ্ঠান—প্রভৃতি থেকে নানাভাবে অ্যাবসার্ড নাটক পুষ্ট হয়েছে।

আয়োনেস্কোর লেখা 'ল রাইনোসেরাস' বা 'গণ্ডার' নাটকটির একটু পরিচয় দেওয়া যাক। এর সবচেয়ে প্রধান চরিত্র বেরেঞ্জা। সে এক সাধারণ স্তরের বয়স্ক মানুষ—কিন্তু মদের নেশা আছে। যে অফিসে সে কাজ করে, সেখানে একটি মেয়ের

১. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পৃঃ ১৮৯.

প্রতি তার দুর্বলতা জন্মেছে—অবস্থা একটু সচ্ছল হলেই তাকে বিয়ে করার তার সাধ। এই লোকটির জীবনে একদিন রবিবার সকালে যখন সে দোকানে মদ খাচ্ছে, তখন রাজপথ দিয়ে একটা গণ্ডার ছুটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে গণ্ডার পথের বেড়ালটিকে পিষ্ট করে আবার ছুটে গেল। আগের গণ্ডার ও পরের গণ্ডার দুটোই এক কিনা এ নিয়ে তর্ক বাধল। তারপর দেখা গেল সবাই একে একে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। বেরেঞ্জারের অফিসের কর্তা থেকে শুরু করে আশাবাদী-নৈরাশ্যবাদী কেউ বাদ রইল না—সবাই গণ্ডার—এমনকি বেরেঞ্জারের প্রেমিকাও। বেরেঞ্জার একাই মানুষের প্রতীক হয়ে রইল। তখন তার মনে হতে থাকল সেই বুঝি অস্বাভাবিক ও চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম। এই অবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হল তাকে। এবং পরে সে নিজের অধিকার রক্ষার সংকল্প নিল। আয়োনেস্কোর আর একটি নাটক 'এমীডী'তে (Ame'de'e') দেখি মধ্যবয়সের স্বামী-স্ত্রী একটি ফ্ল্যাটে বহুদিন ধরে বাস করছে। স্ত্রী একটি টেলিফোন অফিসে যুক্ত থেকে কিছু আয় করে, স্বামী একটা নাটকের কয়েকটা লাইন লিখেছে কিন্তু তার পর আর লেখা অগ্রসর হচ্ছে না।

একটি ঘরে একটি আবৃত মৃতদেহ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বহু বছর থেকে এটা সেখানে আছে। মৃতদেহটি স্ত্রীর প্রণয়ী হয়তো ছিল—তাদের দুজনকে একসঙ্গে আলাপরত দেখে স্বামী তাকে মেরে ফেলেছে—কিংবা তা নাও হতে পারে। হয়তো মৃতদেহটি একটি সিঁধেল চোর বা অতিথিও হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মৃতদেহটি বাড়তে বাড়তে এমনই হল যে তার একটি পা অন্য ঘরে গিয়ে পড়ল—এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই বিরাট এক ব্যবধান রচনা করল। বিষয়বস্তুর যে পরিচয় দেওয়া হল তাতে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না যে এ ধরনের নাটক উদ্ভট ছাড়া আর কি?

কিন্তু তবু মনে হয় অ্যাবসার্ড নাটক বাহ্যত যতই অস্বাভাবিক হোক, এর গভীরে সত্য আছে। স্বপ্নে অনেক সময় মানুষ এ রকম উদ্ভট অসংলগ্ন জিনিস দেখে থাকে, এ তথ্য মিথ্যা নয়। বস্তুত একটি স্বপ্নময় পরিস্থিতির যেন এখানে সৃষ্টি। স্বপ্নের ঘটনা তো সংলগ্ন নয়—সেখানে সব কিছুই অযৌক্তিক। ভাবানুষঙ্গই সেখানে বড় কথা। স্বপ্নে কোনো ধারণার সুস্পষ্ট সঞ্চার হয় না। এখানে যা হয়, তা হল একটা চিত্রকল্পের আভাস। মোটকথা একটা 'ইমেজ' এখানে যাবতীয় বিশৃঙ্খল ঘটনা ও অস্বাভাবিক বিষয়কে একটি ক্ষীণ ঐক্যসূত্রে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। Surface reality নয়, inner realityকেই এখানে বুঝতে হবে। আয়োনেস্কোর 'গণ্ডার' নাটকে সকলেই যে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে—এতে বোঝানো হচ্ছে যে ফ্যাসিজিমের উদগ্র ভয়ঙ্কর শক্তি মানুষকে ক্রমশঃ পশুতে পরিণত করছে; আর এ পশু মোটা চামড়ার ক্ষীণদৃষ্টি, বদরাগী, খড়্গ-নাসা গণ্ডার। এই গণ্ডারের 'ইমেজ' দিয়ে সমস্ত নাটকের অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। প্রথম নাটকটিতে মৃতদেহও একটি ভাবের ইমেজ। অতীতে মানুষ যদি কোনো অন্যায় বা পাপ করে, তাহলে তা ধীরে ধীরে তার মনের

অবচেতনে থেকে বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার সচেতন জীবনযাত্রা ও স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে। একটি কাব্যিক ইমেজ বা জটিল ইমেজকে মাঝখানে রেখেই সাধারণত এ ধরনের নাটক বিকশিত হতে থাকে। এ নাটকের পরিস্থিতিটি স্থির হলেও ঐ ইমেজের যে রহস্য-উদ্ঘাটন বা তার গ্রন্থি-উন্মোচন তার মধ্য দিয়ে তার একটা গতি লক্ষণীয়। একের পর এক গণ্ডারের সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা মৃতদেহটির দ্রুত ক্রমবর্ধমানতা ঐ গতিরই সূচক।

ব্রেশটের নাটকের মূল সূত্রের সঙ্গেও অ্যাবসার্ড নাটকের যোগ লক্ষ্য করা যায়। এ নাটকে দর্শক সম্পূর্ণ বাইরে থেকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকটি দেখে—অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝেও। এর ফলে নাটকের চরিত্রগুলোর সঙ্গে দর্শকদের আন্তরিক যোগ স্থাপিত হতে পারে না অভিনয় দর্শনকালে। ব্রেশটের বিচ্ছিন্নতাবাদ (alienation effect) এর সঙ্গে এর এইখানেই মিল। আবার চরিত্রগুলোর সঙ্গে ভাবগত যোগের পরিবর্তে বিভ্রান্ত বিচারশীল একটা মনোভাবে দর্শক এখানে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রত্যেক দর্শককে এ নাটক যে একরকম ভাবেই চিন্তাশীল করবে, তা ঠিক নয়। তবে এটা যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিদীপ্ত থিয়েটার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কৌতুক, অতিরঞ্জন ও ভাঁড়ামির এতে ব্যবস্থা চূড়ান্ত থাকতে পারে, কিন্তু একটি সমস্যা তাদের চিন্তান্বিত করবেই—সমাধানযোগ্য এ সমস্যা নয় জেনেও সমাধানের প্রয়াস দর্শক করতে থাকবে। আয়োনেস্কো নিজেই বলেছেন—"Theatre is for me the outward projections into the stage of an inner world". বস্তুতপক্ষে এই গভীরতর বাস্তবতার সন্ধানেই চলবে দর্শকের সমস্যা সমাধানের আগ্রহ।

কিমেডি বা অ্যাবসার্ড নাটকের মূল বিষয় ঘটনার মধ্যেই, বিশেষত ঐ ইমেজের মধ্যেই নিহিত। ভাষার ভূমিকা এখানে অনেকখানি গৌণ। বেকেটের Act Without Words বা আয়োনেস্কোর The New Tenant এ ভাষা কতো নীরব। 'দি নিউ টেনান্টে' চেয়ারের পর চেয়ার এমনভাবে এসেছে যে শেষ পর্যন্ত বাড়ীর বাসিন্দারা জিনিসের মধ্যেই ডুবে গেছে। জিনিসগুলোর নড়াচড়াই এর নাট্যক্রিয়া। কিন্তু তবু ঐ 'চেয়ার' একটি বিশেষ বক্তব্যের প্রতীক; তা-ই একে সাহিত্যিক চরিত্র দিয়েছে।

এখানে অসংলগ্ন ঘটনা অজ্ঞাত বিন্দু থেকে অজ্ঞাত পরিণামের দিকে চলেছে। দর্শকদের উৎকণ্ঠা একটি ঘটনার পরবর্তী ঘটনা কি হতে পারে তা নিয়ে নয়, উৎকণ্ঠা নাটকটির অর্থ কি হতে পারে এ নিয়ে—শেষ যবনিকা-পাতের পরেও এই প্রশ্ন জেগে থাকে তার মনে।

তাহলে অ্যাবসার্ড নাটকের চরম কথাটি কি? জীবনের সকল দুর্জ্ঞেয়তা ও উদ্ভটত্ব সত্ত্বেও জীবনকে গ্রহণ করার কথা আছে এতে। নিরাসক্ত ভাবে নয়, সম্মানের সঙ্গে, বীরত্বের সঙ্গে দায়িত্বসচেতন ভাবেই জীবনকে বরণ করতে হবে—কারণ অস্তিত্বের যে রহস্য তার কোনো সহজ সমাধান নেই। অর্থহীন জগতে মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিঃসঙ্গ। এই চূড়ান্ত সত্যকে জানতে পারলে মানুষ আর কোনো বিষয়েই বিব্রত হবে না।

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মার্টিন এস্‌লিনের (Martin Esslin)-এর কথায়—"In the last resort the Theatre of the Absurd does not provoke tears of despair but the laughter of liberation."[১]

অ্যাবসার্ড নাটকের মূল উৎসস্থান হল প্যারিস। নাট্যকার জঁা জেনে-এর The Maids, আয়োনেস্কোর Bald Primadonna, বেকেটের Waiting for Godot-এগুলির প্রথম অভিনয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২-এর মধ্যে প্যারিসে হয়েছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ নাট্যকার অন্যদেশ থেকে এসে প্যারিসে বাস করেছিলেন। আয়োনেস্কোর জন্ম ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রুমানিয়ার 'স্লাতিনা'তে; আর্থার অ্যাডামভের জন্ম রাশিয়ায় ১৯০৮-এ। ফার্নাণ্ডো অ্যারাবেলের (Fernando Arrabal) জন্ম স্পেনে ১৯৩২-এ আর এডওয়ার্ড এলবীর (Edward Albee) জন্ম ইউনাইটেড স্টেটস্-এ ১৯২৮-এ। এঁরা ছাড়াও আরও অনেকে অ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন বা লিখছেন। জঁা জেনে গোডো (জন্ম ১৯১০) জঁা টারডিউ (Jean Tardieu-জন্ম ১৯০৩) ও বোরিস ভিয়ান (Boris Vian-জন্ম ১৯২০—মৃত্যু ১৯৫৯) এঁরা তিনজনেই ফরাসী নাট্যকার। ডিনো বুজ্জাতি (Dino Bujjati), এজিও ডি এরিকো (Ejio d' Errico) এঁরা দুজন ইতালীর, গুন্টার গ্রাস (Gunter Grass), উলফ্‌গ্যাং (Wolfgang), হাইলডেসিমার (Hildesheimer)—এঁরা তিনজন জার্মানীর অ্যাবসার্ড নাট্যকার। এই সব নাট্যকারেরা অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাটিকে সঞ্জীবিত করে তুললেও প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীগত বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য যথেষ্ট আছে। বেকেটের পর্যবেক্ষণশক্তির গভীরতা ও অসামান্য কবিপ্রতিভা সচকিত করে, কিন্তু তাঁর নাটকে যে উদ্ভটত্বের সঙ্গে পরিচিত হই, তা নিরর্থকতার রঙে বিষাদময়। নিরন্তর নৈরাশ্য আর ব্যর্থকাজনিত আশাভঙ্গ থেকে তাঁর ঐরূপ মানসিকতা। অ্যাডামভ তাঁর থেকে আরও বেশী সক্রিয়, আক্রমণোৎপর এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চড়াসুরে তাঁর বক্তব্য অনুরঞ্জিত। আয়োনেস্কোর জগতে হাল্কা হাসিও ভাঁড়ামির অন্তরালে বেদনার অস্তিত্ব, মানুষের বিচ্ছিন্নতার কথা ও সংশোধন অযোগ্য মানব চরিত্রের ভিড়।

সমালোচনা ঃ এই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাব আমাদের বাঙালী নাট্যকারদের ওপরও পড়েছে। ১৯৬৪ সালে 'বঙ্গীয় নাট্যসংসদ কর্তৃক' আয়োনেস্কোর Rhinoceros নাটকটির বঙ্গানুবাদ করে মঞ্চস্থ করা হল প্রথম নিউ-এম্পায়ারে—অনুবাদক হলেন সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী। তারপর থেকে এই ধরনের মৌলিক বাঙলা নাটক লেখারও প্রয়াস হল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, বাণিক রায় প্রমুখ নাট্যকাররা এই শ্রেণীর নাটক লিখে চলেছেন। আমাদের রূপকথা, মহাকাব্য, পুরাণ ও দেব-চরিত্রের পরিকল্পনায় অনেক উদ্ভটত্ব আছে সেখানকার রসে-পুষ্ট করে যদি আধুনিক জীবনের যথার্থ রূপ বাঙালী নাট্যকারগণ তুলে ধরতে পারেন, তাহলে পাশ্চাত্যের এই অভিনব নাট্যরীতি স্বাঙ্গীকৃত হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে দর্শকদের কথা। এঁদের নাটক চিন্তার দিক থেকে অতিশয়

১. *Absurd Drama* (Penguin Books) গ্রন্থে Martin Esslinএর Introduction p. 23

সতর্ক ও বুদ্ধিজীবী দর্শক ছাড়া সাধারণ দর্শক বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া হতাশা ও জীবন-নিরর্থকতার গানই যথেষ্ট নয়। সমস্ত উদ্ভটত্ব থাকা সত্ত্বেও জীবনকে মানুষ সহাস্যে বরণ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে কিনা তারই ওপর নির্ভর করছে এদের নাটকের সার্থকতা।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় Absurd নাটক লিখে বাঙলা ভাষায় সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান। তিনি এই বিশেষ শ্রেণীর নাটকের নাম দিয়েছেন "কিমিভি"। তাঁর 'মৃত্যুসংবাদ', 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' 'রাজরক্ত' প্রভৃতি এবং বাদল সরকারের লেখা 'এবং ইন্দ্রজিৎ'—উল্লেখযোগ্য নাটক। শেষোক্ত নাটকটির একটুখানি পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। এখানে অমল, বিমল, লেখক, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ ও মানসী এই রকম বহু মানুষের সংখ্যা। এরা পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, ধীরে ধীরে লেখাপড়া শিখে বড় হচ্ছে ও শেষে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়ছে। একটা মহাশূন্যতার মাঝখানে এইভাবে হাজারো মানুষ লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে পৃথিবীতে আসছে বিদায় নিচ্ছে। এখানে স্থান ও কালের মধ্যে কোনো যামঞ্জস্য নেই। চরিত্রগুলোর বক্তব্যও অসংলগ্ন—শুধু একটা হতাশা ও ক্লান্তির সুর এদের কথায় ও চিন্তায়। কিন্তু এই সমস্ত নাট্যকারগণ দাবি করেন যে তাঁদের বক্তব্যের বাহ্য অসঙ্গতি ও অর্থহীনতার অন্তরালে জীবনের সত্যরূপের ইঙ্গিত আছে। আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পরে এ ধরনের নাটক লেখা শুরু হয়েছে। স্বাধীনতালাভের কয়েক বছর পরেও যখন অর্থনৈতিক দুর্গতি মানুষকে শোচনীয় অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে গেছে, যখন পুরাতন চিন্তা ও মূল্যবোধ অবসিত অথচ নূতন কোনো আশার আশ্রয় নেই তখন এই শ্রেণীর নাটক লেখার উপযুক্ত সময় হয়তো এসেছিল, কিন্তু এ দেশে এ নাটকের ধারা জনগণ কর্তৃক খুব অভিনন্দিত হয়েছে বা হচ্ছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এর আবেদন বিশেষ এক শ্রেণীর অতিশয় মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী দর্শকের কাছে। বিশাল জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন এমন সীমিত দর্শকদের ওপর নির্ভরশীল নাট্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার কথা নয়।

গণনাট্য ও নবনাট্য :

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালের বাঙলা নাটকের আলোচনার কথায় গণনাট্য ও নবনাট্য শব্দ দুটি বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত বিকাশের ইতিবৃত্ত জানতে গেলে গণনাট্য ও নবনাট্যকে না বুঝলে চলে না। এই দুই জাতের নাটক রচনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো আদর্শ কাজ করেছে এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এ দুই শ্রেণীর নাটক লিখিত হতে শুরু করেছিল এবং আজও তাদের ধারা বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে বহমান। তাই এদের প্রকৃত স্বরূপ, এদের উৎপত্তির কারণ ও বিকাশ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

'নবনাট্য' শব্দটি আমাদের খুব পরিচিত হলেও শব্দটি ঠিক কবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তা বলা কঠিন। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র কর্তৃক 'বহুরূপী'

নাট্য-সংস্থার সৃষ্টিকাল থেকেই শব্দটির উদ্ভব ও প্রয়োগ।[১] শ্রীশম্ভু মিত্র নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন, 'গতযুদ্ধের সময় থেকে শিল্পক্ষেত্রে একটা আলোড়ন এসেছে নতুন পথে চলে নতুন চরিতার্থতায় পৌছবার।.....এবং নবনাট্য আন্দোলনের সুরু তখন থেকেই।"[২] কিন্তু কেউ কেউ এই কালকে আরও পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান। এঁদের মতে বাঙলা নাটকে সেদিন থেকেই প্রকৃত নূতনত্ব এসেছে যেদিন থেকে নতুন ধরনের নাটক লেখা হয়েছে বা নতুনভাবে সেগুলি উপস্থাপিত হয়েছে আভিনয়িক দক্ষতায়। এঁদের আরো বক্তব্য হল উনিশ শতকের শেষ দুই শতক থেকে বাঙলা রঙ্গালয়ে স্বর্ণযুগ চললেও এবং তারও কিছু পূর্ব থেকে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাট্যরচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে জোয়ার এলেও ধীরে ধীরে তা কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। জাতির জাতীয় চেতনা উন্মেষের সহায়ক হলেও সেই পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ধারার মধ্যেই তা সীমিত ছিল। বিশ শতকের আরো দুই দশক এমনিভাবেই কেটে গেছে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে আমাদের দেশেও ক্রমশ তার একটা পরোক্ষ-প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। অর্থনৈতিক সংকটে, সামাজিক পরিবর্তনে, পুরাতন মূল্যবোধের বিপর্যয়ে, সংশয়ে-হতাশায় ও নানা নূতন প্রশ্নের জাগরণে তার রূপ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় ধরা পড়তে থাকে। ১৯৩০-এর পর থেকে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকার লেখকেরা রবীন্দ্রীয় শিল্প-দর্শন থেকে সরে এসে মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আদর্শে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাহিত্যে আধুনিকতার পত্তন করতে চেয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক ঐ ১৯৩০ সাল থেকে এমন কোনো উদ্যম লক্ষ্য করা যায় নি। কারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে নাটকের যোগ আত্মিক। রঙ্গালয়ের মালিক ব্যবসায়িক বুদ্ধির দ্বারা চালিত। সুতরাং সহসা খুব বড় রকমের পরিবর্তন-মুখ্য নাটক বা যুগোচিত সঠিক জীবন-রূপায়ণ নাটকে প্রতিফলিত হওয়ার পথে বাধাও ছিল। তবুও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সকল বাধা-বিঘ্নকে অনেকখানি তুচ্ছ করে কোনো কোনো শক্তিশালী নাট্যকার বা অভিনেতা নূতনত্ব আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো এ পরিবর্তন বা নূতনত্ব ততো দৃষ্টি-আকর্ষণকারী না হলেও একে কেউ কেউ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের ধারণা, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই নবনাট্যের সূচনা। এই বছরেই স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটক

১. আধুনিক বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ধারা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিশেষ নাটক সংখ্যা চতুষ্কোণ বৈশাখ ১৩৮৩। আবার চিন্তাশীল নাট্যকার কিরণ মৈত্র বলেন, 'গণনাট্য যখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন নাম হল 'নবনাট্য'। নামটা বোধ হয় দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া। 'বহুরূপী' 'সংনাট্য' কথাটা ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। এর পরই এল 'গ্রুপ থিয়েটার' কথাটা। কে সুল জানি না, কিন্তু থিয়েটার যে একটা টোটাল ব্যাপার এই বোধটা যতটা দানা বাঁধতে লাগলো গ্রুপ থিয়েটার কথাটা ততটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারলো।" 'সাম্প্রতিক নাট্যচিন্তা' দৈনিক বসুমতী, ১৭ই নভেম্বর ১৩৮৩।

২. অভিনয়, নাটক, মঞ্চ—শম্ভু মিত্র।

'মুক্তির ডাক' এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নবনাট্য অভিযানের প্রথম সূচনা হয়। আর এই নবত্বকে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে যাঁরা সেদিন রূপ দিয়েছিলেন তাঁদের ছিল নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও নাট্যকলা সম্বন্ধে সুস্পষ্টবোধ। এই নটসম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং তাঁর প্রধান সহায়ক নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। আর সর্বান্তকরণে এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কঙ্কা, শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী সরযূবালা প্রমুখ নটনটীগণ। বাঙলার প্রধান ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস বলতে গিয়ে বলেছেন, "নবনাট্য আন্দোলন বাঙলায় আজও হচ্ছে এবং বছর চল্লিশ আগেও হয়েছে।.....১৯২৩ থেকে ১৯৪৩ আধুনিক যুগের বিশিষ্ট এই কুড়ি বৎসর অন্তে ১৯৪৪ সালে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হল অতি আধুনিক যুগ অথবা সাম্প্রতিক যুগ যে যুগে নাটক ও নাট্যরীতির মোড় ঘুরে গেল। গণনাট্য দিয়ে শুরু হয়ে পরিণত হল তা আবার এক নবনাট্য আন্দোলনে, যা আজও চলছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল এই একচল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমরা দুটি নাট্যযুগ পাচ্ছি—প্রথমটি ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৪৩ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৪।' দুইটি নবনাট্য আন্দোলন, তবে প্রথমটির ভিত্তি ছিল কৃত্রিমতা-বর্জিত রোমান্টিক নাটক ও নাট্যরীতি; দ্বিতীয়টির ভিত্তি রিয়ালিষ্টিক বা জীবননিষ্ঠ নাটক ও নাট্যরীতি। প্রথম আন্দোলনে আমরা পেয়েছি কৃত্রিমতা-বর্জিত কল্পলোক, দ্বিতীয় আন্দোলনে আমরা পাচ্ছি সত্যনিষ্ঠ সমাজ চেতনা।"[১] শ্রদ্ধেয় নাট্যকার তাঁর এই সুচিন্তিত উক্তিতে নবনাট্য-আন্দোলনের পরিচয় দিতে যতখানি উৎসাহবোধ করেছেন, গণনাট্য সম্পর্কে যে ততখানিই উদাসীন তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

নাট্যকার মন্মথ রায় প্রথম-পর্বের কৃত্রিমতাহীন রোমান্টিক নাটক ও নাট্যরীতিকে যে নবনাট্যের অন্তর্গত করতে চেয়েছেন, তা কি ঠিক? শিশির ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো অভিনেতা প্রতি দেশেই দুর্লভ একথা স্বীকার করি। এঁরা, বিশেষ করে শিশির ভাদুড়ী তাঁর অসামান্য অভিনয়ের দ্বারা নাটকের ক্ষেত্রে দেশে একটা আলোড়ন এনেছিলেন এবং অভিনয়-জগতের দিকে অনেকেরই সাগ্রহ-দৃষ্টি পড়েছিল একথা সত্য। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তুতে নবত্ব এবং সমকালীন জীবন-সমস্যার চিত্র সেখানে কোথায়? শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আভিনয়িক দক্ষতার সাহায্যে যে নূতনত্ব তাকে যদি নবনাট্য আন্দোলনের অন্তর্গত করতে হয়, তাহলে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াজাত বিষয় ও উপস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন-মুখ্য ১৯৪২-৪৮-এর আন্দোলনকে কী বলা হবে? ১৯২৩-২৪ সালে নাট্যকার ও শিল্পীগণ 'নবনাট্য' কথাটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কি? রঙ্গালয়াশ্রয়ী

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, নবনাট্য আন্দোলন পৃঃ ৫৪,৫৭

নাট্য বিবর্তনের ধারায় আভিনয়িক উৎকর্ষ ও একাঙ্ক নাটক-অভিনয়ের নূতনত্বের কথা মনে রাখলে এর সূচনাকাল খুব সূক্ষ্মভাবে হয়তো মন্মথ রায়ের উক্তিকেই সমর্থন করবে। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালে দেশের নাট্য-শিল্পীরা যে উৎসাহ, যে প্রেরণা ও যে সুদৃঢ় আদর্শ নিয়ে নাটক-রচনা ও নাট্যাভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার সঙ্গে এই সূচনাকালের লক্ষ্য ও আদর্শ তুলনীয় হতে পারে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে বা তৎ-পরবর্তী-কালে যে নাট্যান্দোলন তাই প্রকৃতপক্ষে নবনাট্য-আন্দোলন—কারণ এ আন্দোলনের পিছনের ইতিহাস গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর ফলে নাট্যক্ষেত্রে যে রূপান্তর তা বৈপ্লবিক। কিন্তু এই দ্বিতীয়-পর্যায়ের আন্দোলনের প্রাণমূলে শক্তিসঞ্চার করছে যে আদর্শ ও ঐতিহ্য তার কথা ভুললে চলবে না। আর সে-আদর্শ ও ঐতিহ্য এসেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে। অবশ্য একথা ঠিক যে ১৯৪২-৪৮ সালের নাট্যান্দোলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন সকলেই যে মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তা নয়। সহজ মানবিক প্রেরণায় যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এবং তৎকালীন বাঙলা নাট্যজগতের অবক্ষয়-ভাবনায় বেদনার্ত হয়ে অনেক শিল্পী সেদিন এই আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। গণনাট্য-আন্দোলন -প্রয়াসী শিল্পীদের সঙ্গে এঁরা যে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন তাও বলা যায় না। আর গণনাট্যের শিল্পীরা তাঁদের ইস্তাহার প্রচারিত আদর্শ যে সবটাই রূপায়িত করতে পেরেছিলেন সেদিন—তা বলা যায় না। তবে তাঁদের চেষ্টার অভাব ছিল না। তবু এঁদের প্রভাবই সেদিন নাট্যান্দোলনে যে মুখ্য ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[১] I. P. T. A.-তে গোড়া থেকেই বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায় প্রমুখদের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের দলের সংঘাত অবশ্যই ছিল। কিন্তু গণনাট্যের প্রভাবের প্রাধান্যের জন্যে আমরা এই আন্দোলনকে নবনাট্য না বলে গণনাট্য-আন্দোলন' বলতে চাই। আর শম্ভুবাবুর দল আর্টের মর্যাদা রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখলেও গণনাট্যের আদর্শকে বহুলাংশে সেদিন মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ মতপার্থক্যই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে এবং যে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংস্কাররূপে গণনাট্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও পরিচালনায় দ্বিধাও দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া স্বাধীনতা-উত্তরকালেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই গণনাট্যদল সহজ স্বাধীনতায় কাজ করতে পারেন নি। তাই ১৯৪৮-এর ১লা মে 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার কাল থেকে (শম্ভু মিত্রের) প্রকৃত নবনাট্য-আন্দোলনের শুভ দিন। এখন থেকেই নবনাট্য-আন্দোলন স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের মত ও আদর্শ প্রচারের সুযোগ পেয়েছে এবং ১৯৫৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র আশ্চর্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

---

১. "ঐতিহাসিক দিক থেকে বেখলে প্রগতি লেখক সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলনে ১৯৪২-৪৮ কালপর্বে জোয়ার ছিল, তার মানে এই নয় যে, তখন কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু তবু আন্দোলন ছিল জোয়ালো।" 'বাংলার প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য' আন্দোলন কেন ব্যর্থ হল ? প্রবন্ধে চিন্মোহন সেহানবীশের বক্তব্য, শিলাদিত্য, ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।

গণনাট্য :

একথা ঠিক যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই সাধারণ নাট্যশালায় আবার অবক্ষয় ও অবসন্নতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিল। খ্যাতিমান অভিনেতাদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটেছে বা তাঁরা কেউ কেউ অবসর গ্রহণ করেছেন। তাই দর্শকদের সিনেমার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অথচ সেদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর নানাদেশে নূতন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল। সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা চিন্তা, নানা দ্বন্দ্ব প্রবেশ করছিল। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির লোলুপ হস্তপ্রসারণে গণতন্ত্রপ্রেমিক মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন। আমাদের দেশেও তার তরঙ্গ উঠেছিল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সে-অবস্থার চিত্র তুলে ধরার কোনো চেষ্টা হয় নি। জীবন ও তার দাবি, বাস্তব সমাজের রূপ ও তার স্পন্দন, দেশের প্রকৃত অবস্থা ও তার চিত্র অভিনয়ের দর্পণে দেখবার জন্যে মানুষ উৎকণ্ঠিত হচ্ছিল। বাঙলা নাট্যজগতের ঠিক এই রকম অবস্থায় গণনাট্য সংঘের জন্ম। কিন্তু সব জন্মেরই একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। গণনাট্যেরও আছে। কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সাময়িক খেয়াল চরিতার্থতার জন্যে এ কোনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়—একথা মনে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে 'গণনাট্য' কথাটির উদ্ভব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা চলে। ইংরেজি Folk কথাটি থেকে 'লোক' কথাটির উদ্ভব এবং পরে ঐ লোক শব্দটি কতকগুলি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেমন সৃষ্টি করেছে লোক-সঙ্গীত, লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য—প্রভৃতি, তেমনি ইংরেজি 'people' শব্দটি থেকে 'গণ' শব্দটির উদ্ভব এবং পরে অনুরূপ শব্দগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরী করেছে গণ-সঙ্গীত, গণনাট্য গণ-সাহিত্য প্রভৃতি। এখানে 'গণ' বললে অবশ্যই 'জন' বা 'মানুষ' কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ—সমাজের যারা সবচেয়ে বড় অংশ অধিকার করে আছে অথচ যারা নানাদিক দিয়ে বঞ্চিত, শোষিত এবং নিপীড়িত। এই মানুষ কৃষক-শ্রমিক এবং সর্বহারার দল। আর এ মানুষ ইতিহাসের ধারায় স্থির বা স্থাণু নয়—এরা সংগ্রাম-উন্মুখ—এরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। এই সংগ্রামী মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবন-কথা নিয়ে লেখা নাটকই হল গণনাট্য। ফ্রান্সে রমাঁ রোঁলার 'The People's Theatre'-এর আদর্শ অনেকখানিই গৃহীত হয়েছে গণনাট্যের আদর্শ রচনায়। চীনের বা স্পেনের 'পিপলস থিয়েটার'-এর প্রভাবও কিছু কম নয়। 'গণনাট্য' তাই এক হিসেবে বিশ্বজোড়া যে একটা সংগ্রামী আন্দোলন তারই অংশ-বিশেষ।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই কলকাতায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়েছিল। ১৯৪২-এর ২৮শে মার্চ কলকাতায় 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' গঠিত হল। আর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (Indian People's Theatre Association, I.P.T.A.) প্রতিষ্ঠিত হল। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দাবি সম্পর্কে মানুষকে সংগ্রাম-সচেতন করে তোলা। ১৯৩৫-এ ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারে যা বলা হয়েছিল তা গণনাট্য-শিল্পীদেরও ছিল

অন্তরের কথা। "We believe that the new literature of India must deal with the basic problems of hunger and poverty, social backwardness and political subjection." অর্থাৎ ভারতের নবীন সাহিত্যকে বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাদ্‌মুখতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।" তাছাড়া আরো বলা হল, 'যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি।'[১]

'গণনাট্য সংঘ'-এর বাঙলা-শাখা যখন কাজ আরম্ভ করেছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় নি। গান্ধীজীর আগষ্ট আন্দোলন তখন চলছে এবং বৃটিশের দমননীতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে। ওদিকে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পাশবিক মূর্তি উন্মোচিত হয়ে পড়েছে, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিক ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যের সংগ্রাম, আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবী, চীনের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদির কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। এই প্রতিবেশে ছোট ছোট নাটিকার সাহায্যে ও গণসঙ্গীতের সাহায্যে আন্দোলনকে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। পার্কে, ঘরের বারান্দায় চট টাঙিয়ে এ অভিনয় প্রথম দিকে হয়েছে—পরে তা গ্রামে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিনয় রায়ের 'ম্যয় ভূখা হুঁ স্কোয়ার্ড', বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান', মনোরঞ্জন-এর 'হোমিওপ্যাথি', ইত্যাদি বহু নাটিকা লিখিত ও অভিনীত হল। গণনাট্য মানুষের জীবন-সংগ্রামের সহচর। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার আদায় সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এর লক্ষ্য। সূত্রাকারে গণনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ক. গণনাট্য কোন বিশেষ শক্তিধর শিল্পীর সর্বাত্মক প্রাধান্যকে স্বীকার করে না। এ হল যৌথ-প্রযোজনা। তাই এর সর্বাঙ্গে বহুজনের সযত্ন স্পর্শ। কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতিভাকে সে অশ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আর সকলের ভূমিকাকে কখনোই সে গৌণ হতে দেয় না।

খ. সাধারণ দর্শক—বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক সর্বহারা খেটে-খাওয়া মানুষের মনোরঞ্জন করবে এঁদের নাটক[২], আবার তারই মধ্য দিয়ে তাদের চেতনার জাগরণ প্রয়োজন।

---

১. It is a movement which seeks to make our arts the expression and organism of our people's struggle for freedom, economic justice and a democratic culture. I. P. T. A. Bulletin No. 1, 1943.

২. রমাঁ রোলেঁ। (Romain Rolland) The People's Theatre এর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। The first requiste of the people's theatre is that it must be a recreation. The theatre ought to be a source of energy, this is the second requisite, The theatre ought to be a guiding light to the intelligence. এই তিনটিকে যে ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে গণ-নাট্যের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে, পুরোপুরি নয়।

গ. অবশ্যই এ থিয়েটার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত-শিক্ষামূলক। এর কাজ হল, "যেমনি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।"[১]

ঘ. জীবনের বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরে নতুন জীবন-ভাবনা জাগ্রত করে চলবে এ নাটক দর্শকদের মধ্যে। এ-সব সমস্যার প্রতিফলন দেখে তারা বুঝবে সমস্যার স্বরূপই বা কি আর তা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি?

ঙ. গণনাট্য প্রথাবদ্ধ এতকালের নাটকের নায়ক-মহিমাকে স্বীকৃতি দিল না—এখানে গোষ্ঠীর মূল্য স্বীকৃত হল কিংবা ব্যক্তিকে শ্রেণী প্রতিনিধি-রূপে দাঁড় করানো হল।

চ. এতে গণ-সঙ্গীতেরও স্থান রইল—তাই এখানে গীতিকার ও সুরকারেরও বিশিষ্ট ভূমিকা।

ছ. ব্যয়বহুল মঞ্চব্যবস্থার দিকে তাঁদের নজর নেই। সাধারণ জমি থেকে একটু উঁচুতে হবে এর মঞ্চ—যাতে বহুলোক দেখার সুযোগ পায়। উঁচু মঞ্চের পিছনে মাত্র একটা পর্দা থাকলেই যথেষ্ট। ইচ্ছে মতো যেখানে-সেখানে অল্প খরচে এ অভিনয় সম্পন্ন হতে পারবে। তাঁদের কথা, 'Our production should be simple and direct.'

জ. জমকালো না হলেও নট-নটীর পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, যন্ত্র এবং আলোকের সাহায্য তাঁরা প্রয়োজনমতো নিতে ইচ্ছুক।

কিন্তু তাঁদের সব বৈশিষ্ট্য 'নবান্ন'-এর মতো নাটকেও প্রতিফলিত হতে পারে নি। তবু এ সব বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা অনুমোদন করেছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এক প্রবল উত্তেজনা ও সাড়া পড়ে গেল। বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় শ্রীরঙ্গমে বর্তমান নেতাজী ইন্‌স্টিটিউটে সাতদিন এর অভিনয় চলেছিল। অভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুফী প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, মণিকা ভট্টাচার্য, মণিকুন্তলা সেন প্রভৃতি অনেকেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং নাট্যকার নাটকটির কথায় বলেছেন, 'ঘরে যেদিন অন্ন ছিল না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি 'নবান্ন' লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুদয় আগষ্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে'। জাতীয় আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, বন্যা আর মহামারী কবলিত গ্রাম-বাঙলার প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকের জন্ম। নিরন্ন মানুষের ভুখা মিছিল আর দুঃখ-কষ্ট-হতাশার কথাতেই নাটক শেষ হয় নি—আগামী দিনের শপথ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে এখানে দয়াল মণ্ডলের কথায়—গতবারের মতো আকাল আর তার সর্বনাশ করতে পারবে না—"একটা ব্যবস্থার ওলোট-পালোট করে দিতে হবে····জোর জোর প্রতিবাদ।" মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে একটি গ্রাম্য কৃষক-পরিবারের দুঃখ-দৈন্য ও সংগ্রামের চিত্র এতে

১. 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয় কালে স্মারক পত্রিকায় উল্লিখিত মন্তব্য।

উপস্থাপিত। এর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত বাস্তব, বলিষ্ঠ এবং নূতন। এর অভিনয় ও প্রযোজনা অপেশাদারী অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের আন্তরিকতায় প্রাণ-স্পর্শে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নিরন্ন কৃষকের জীবন-উপস্থাপনের জন্যে নয়ন-মনোহর দৃশ্যপট, রঙীন পোষাক বা উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতের দরকার হল না। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তাধারা'য় যে সরল মঞ্চাঙ্গিকের নির্দেশ দিয়েছেন তার কথা মনে রেখে এ নাটকেরও পশ্চাৎপটে কালো পর্দা, খড়ের চাল, চটের আবরণ বা গাছের ডাল রাখা হয়েছিল। 'নবান্নে'র পূর্বেই ১৯৪৩-এর মে মাসে 'নাট্যভারতী'তে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' তাঁরই পরিচালনায় অভিনীত হয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী-দের দ্বারা। রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এতে ঠাঁই পেয়েছে। যুদ্ধকালীন নানা সমস্যায় তারা পীড়িত। কিন্তু দেখা গেল তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঁচতে চায়। ঐক্যবদ্ধ না হলে বাঁচার আর কোনো পথ নেই। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি'ও ১৯৪৩ এর মে মাসে প্রথম অভিনীত হয়েছিল 'নাট্যভারতী'তে। ল্যাবরেটরীর মধ্যে নিভৃতে বৈজ্ঞানিকের সাধনা আর নয়, নতুন যুগে বৃহত্তর মানুষের জীবনের মাঝখানেই যে তার ল্যাবরেটরি—এ কথাটিই এখানে বলা হয়েছে। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিককে মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সৈনিক হতে হবে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' স্টার থিয়েটারে ১৯৪৪এর ৩রা জানুয়ারী অভিনীত হয়। এটি একটিমাত্র দৃশ্য-সম্বলিত একাঙ্ক নাটক। যুদ্ধকালীন সেই জাপানী বোমার আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির চিত্র এতে উপস্থাপিত। জাপানী বোমা পড়ার শব্দে তারা সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে কি রকম ঐক্যবদ্ধ হতে শিখল তারও কথা আছে এতে। সত্য কথা বলতে কি গণনাট্যগুলিতে সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি রক্ষিত হচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, "একদিকে সামাজিক অবিচার, অসাম্য, কালোবাজারী, যথেচ্ছ মুনাফা-লুণ্ঠন, অপরদিকে আকাল, দুর্ভিক্ষ মহামারী, জনগণের ক্ষুধার ও জীবিকার যন্ত্রণা যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ—গণনাট্যের নাটকে তা সোচ্চার হয়েছে।"[১] এইভাবে স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের নাট্য-আন্দোলন অগ্রসর হয়েছিল।

নবনাট্য :

কিন্তু যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে গণনাট্য-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার বেশ ১৯৪৭ এ মন্দীভূত হয়ে গেল। এ আন্দোলনে ভাঙন ধরল। গণনাট্য-মঞ্চ থেকে অনেক শিল্পী সরে গেলেন। তাঁরা গণ-নাট্যের শিল্পী-দের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে মেনে নিতে পারলেন না। তাঁদের নিজস্ব আদর্শবাদের কথা বলে তাঁরা এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইলেন। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিনেতা শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছেড়ে দিয়ে নতুন পথের দিশারী হলেন। 'নবনাট্য' আবার এল—অথবা নবনাট্যের প্রকৃত জন্ম হল।

১. চিত্তরঞ্জন দাস—আধুনিক বাংলা নাট্য আন্দোলনের গতিধারা—পৃঃ ১৪৮ চতুষ্কোণ ১৩৮৩বৈশাখ।

গণনাট্যের শিল্পরূপ ও তার বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী নাট্যভাবনার সঙ্গে তিনি একাত্মবোধ করলেন না। নবনাট্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরমেন লাহিড়ী জানালেন, "নাট্যকার কোনো বিশেষ মতবাদের দাস নন। তাঁর মূল লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবেই তিনি গড়ে তোলেন নিজস্ব দার্শনিক মতামত ও মতবাদগত বিশ্বাস।"[১] এঁদের নাটকে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, চোর-ডাকাত-ধনী-দরিদ্র—সব শ্রেণীর মানুষই আসতে পারে—সমকালীন ঘটনাও স্থান পাবে—কিন্তু গণ-জাগরণ ও গণ-শিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। নবনাট্য কোনো একটি স্থির দর্শনের ছায়াতলে রচিত হবে না। কিরণ মৈত্র বললেন, 'এ নাটকের বিষয়বস্তু আর এক নাটকের বিষয়বস্তু হবে না। হলেও বিচার-বিশ্লেষণে, বক্তব্যে সে ভিন্ন হবে। চরিত্র-সৃষ্টিতে গঠন পদ্ধতিতে সে একক হবে।....নবনাট্য আমি তাকেই বলি যা আমাকে বিস্মিত করে, চমকিত করে, সম্মোহিত করে—যা আমাকে এমন একটা আনন্দ দেয় যে আনন্দ আমি আগে পাইনি।....এ অনুভূতি যে নাটকই এনে দিক না কেন, তাকেই আমি 'নবনাট্য' বলে মানবো।'[২] কিন্তু এ বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। নবনাট্যের স্বরূপ এ উক্তি থেকে উদ্ধার করা শক্ত। নবনাট্যের অন্যতম উদ্গাতার বক্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছেন, "সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক। এবং এই রকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ-সচেতন শিল্পীর সত্য ও রিয়ালিটির যে অন্বেষা তাকেই বলতে পারি নাট্য-আন্দোলন।"[৩] যাই হোক গণনাট্য আন্দোলন যে এইকালে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা উত্তর দেশের শাসকশ্রেণীর চোখে গণনাট্য অভ্যর্থিত হয় নি। গণজীবনের বাস্তবচিত্র নিয়ে রচিত এদের সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য গ্রামে-গঞ্জে, পথে-প্রান্তরে সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টাকে পুলিশ সর্বত্র সহ্য করে নি। অনেক স্থানেই তারা বাধা পেয়েছেন। ফলে গণনাট্য শিল্পীরা তাঁদের মনোবল হারিয়ে ফেলেন। অনেকেই রাজনীতি-প্রভাবিত এই নাট্যসংঘ থেকে দূরে সরে যান। তাছাড়া ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ বলে দেশে ঘোষিত হয়—পার্টির ওপর নানা অত্যাচার চলতে থাকে। এ-অবস্থায় এই রাজনৈতিক দলে নিবেদিত-প্রাণ শিল্পী-রা ছাড়া অধিকাংশই চলে যাবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি বিজন ভট্টাচার্যও বললেন—"গণনাট্য সংঘের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথা স্বতঃই এসে পড়ে। কেননা, রাজনীতি বিবর্জিত শিল্পকর্মের কথা কী সংগীতে, কী নাট্যচিন্তায়, ভাবনায় অন্ততঃ গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা যায় না। তাই বলে নিছক রাজনীতি-প্রভাবিত কোনও শিল্পকর্মই কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে ওৎরাবে না।"[৪]

১. নাটক ঃ মনস্তত্ত্ব : দর্শন—রমেন লাহিড়ী
২. নবনাট্য—কিরণ মৈত্র।
৩. নাট্যআন্দোলনে পেশাদারী মনোভাব, গঙ্গাপদ বসু।
৪. গণনাট্য আন্দোলনের সেকাল ও একাল, শারদীয় কালান্তর, ১৩৪৪,

যাই হোক, নবনাট্যের জন্ম হল গণনাট্যের দল থেকে সরে আসার কিছুদিন পরে। শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপীর প্রতিষ্ঠাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'বহুরূপী' গোড়ার দিকে তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', 'ছেঁড়া তার' শম্ভু মিত্রের 'বিভাব' অভিনয় করেন। "এরপর ১৯৫৪ সালে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাঙলা নাট্যান্দোলনের ক্ষেত্রে "বহুরূপী" এক নূতন সুরের প্রবর্তন করলেন। এখান থেকেই নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৪৪ সাল যেমন গণনাট্য আন্দোলনের তেমনি ১৯৫৪ সাল নবনাট্য-আন্দোলনের দিক-চিহ্ন সূচিত।"[১] 'বহুরূপীর' নাট্যপ্রযোজনা অতিশয় উন্নতমানের। অপেশাদার, পেশাদার সব নাট্য সংস্থা তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী মহলে তার প্রভাব গভীর। উৎপল দত্তের মতো নাট্যকার 'রক্তকরবী'র প্রযোজনায় মুগ্ধ হয়ে লেখেন, "আসলে শম্ভুবাবুর সূক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রয়োগ-কৌশলের অভিনবত্ব এমন এক নাট্য সৃষ্টি করেছে যা বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যকে ধরে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।.....শম্ভু মিত্র এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম।"[২]

নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে গণনাট্য যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইল এই নবনাট্য আন্দোলন। নাটকের মধ্য দিয়ে অবক্ষয়ী ও মরণোন্মুখ সমাজের মানুষের সামনে নব-জীবনের উজ্জ্বল আশার আলো তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। শ্রমিক-মালিক, জমিদার-প্রজা, সবল-দুর্বলের সংগ্রামকে তাঁরা বর্জন করলেন না। কিন্তু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অধীনে থেকে শুধুমাত্র জন-জাগরণের চিত্র তাঁরা উপস্থাপিত করতে চাইলেন না। শ্রেণী-সংঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বাত্মক রূপটি প্রতিবিম্বিত হয় বলে তাঁরা মনে করলেন না। তাই তাঁরা গণনাট্য-আন্দোলনকে অসম্পূর্ণ বললেন। তাঁদের মতে, 'জীবন আরও ব্যাপক; আরও গভীর, আরও জটিল।...নবনাট্য আমাদের আরও উদার, গভীর ও গণতন্ত্র-সম্মত। এখানে স্বাধীনতা আরো বেশি। কল্পনার ঐশ্বর্য এখানে দীপ্তি প্রকাশের সুযোগ পায়।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিকে নতুনভাবে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে তাঁর শিল্পাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা নবনাট্য-আন্দোলনের একটি প্রধান কর্মসূচী হল। তাছাড়া অতীতকালের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা ঐতিহ্যের সঙ্গে যেমন যোগ রক্ষা করতে চাইলেন, তেমনি প্রয়োগশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা যুগোপযোগী মনোভাবের পরিচয় দিলেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনয়-উৎকর্ষে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারপর 'লিটল থিয়েটার', 'শৌভনিক', 'অনুশীলন নাট্যসংস্থা'ও এই পথে অগ্রসর হলেন। দেশের মধ্যে নাট্যপ্রিয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দিল। শ্রীগিরিশংকরের নেতৃত্বে 'লোক ও নাটক'

১. বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার, ডঃ সনাতন গোস্বামী।
২. বহুরূপী ও রক্তকরবী, পাদপ্রদীপ চৈত্র, ১৩৭১।
৩. চতুষ্কোণ, ১৩৮৩, চিররঞ্জন দাসের প্রবন্ধে, গন্ধর্ব, শারদীয়া/১৩৭১ থেকে উদ্ধৃত।

সংস্থা 'আজকের নাটক' পর্যায়ে একাঙ্ক নাট্যোৎসব শুরু করলেন ১৯৫১ সাল থেকে। আবার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রয়াসে নাট্যকারদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে 'নাট্যকার সংঘের' প্রতিষ্ঠা হল। ১৯৫৫ সাল থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর উদ্যোগে 'থিয়েটার সেন্টার' একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। ১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপা নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় নায়ক ও মঞ্চের উন্নতির জন্যে 'বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি' গঠনও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পেশাদার রঙ্গালয়গুলি অভিনয়ের জন্যে অপেশাদারদের ডাক দিলেন। এদের দশ-দফা কর্মসূচীতে নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়কে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হল।[১] ক. গিরিশ গ্রন্থাগার, খ. গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতা (পূর্ণাঙ্গনাট্য) গ. গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতা (একাঙ্ক), ঘ. গিরিশ নাট্যোৎসব, ঙ. শিশুনাট্যশাখা চ. বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন, ছ. আন্তঃকলেজ নাট্যপ্রতিযোগিতা, জ. বিশ্বরূপা পত্রিকা; ঝ. গিরিশ নাটক সেমিনার, ঞ. গিরিশ নাটক প্রতিযোগিতা। সম্মেলন, আলোচনা অভিনয়-প্রতিযোগিতা গ্রন্থাগারের সুযোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাট্য-আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করল। এখন সূত্রাকারে এই নবনাট্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

ক. নবনাট্যের অভিনয় দর্শকদের মনোরঞ্জন করবে, তবে এর দর্শক বলতে প্রধানত শ্রমিক-কৃষক নয়—সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে অভিনয়-রস-রসিক বিশেষ একটি শ্রেণী।

খ. মহাযুদ্ধোত্তর দেশে জীবনের বাস্তব-সমস্যাও যেমন তেমনি জীবনের আরো নানা দিক তাদের নাটকে স্থান পাবে।

গ. গণ-জাগরণই তাঁদের নাটকের মূল উদ্দেশ্য নয়—কোনো রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার তাঁরা করবেন না। সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধ এবং বলিষ্ঠ জীবন গঠনের প্রয়াস তাঁদের নাটকে প্রতিফলিত হবে। জটিল, গভীর ও ব্যাপক জীবনের নানাদিকের চিত্র উপস্থাপনে তাঁরা কল্পনার ঐশ্বর্য ও দীপ্তি প্রকাশের সুযোগ পাবেন।

ঘ. নাটকের সব চরিত্রের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি থাকবে—প্রত্যেকটি চরিত্রের আন্তরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তাঁরা নাট্যরসকে ব্যঞ্জিত করতে চান।

ঙ. নাটককে সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্যে এবং জন-সংযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে এঁরা নাটকের মধ্যে জনতার দৃশ্যকে উপেক্ষা করলেন না।

চ. স্মারকের (Promter) সাহায্য না দিয়ে ভালোভাবে অভিনেতৃগণ নিজেদের অভিনেয় অংশ মুখস্থ করবেন এবং বহুদিন মহড়া দেওয়ার পর অভিনয় করবেন।

ছ. প্রথাবদ্ধ নাটকের নায়কের মহিমা এতে থাকবে না—সমষ্টির বা গোষ্ঠীর দিকেই এঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

---

১. বিশদ আলোচনা বাংলা নাটকের ধারা, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

জ. নাট্যমায়া-সৃষ্টির জন্যে এরা আলোক-সম্পাতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে চান। রঙ্গমঞ্চে সাদা পর্দার ওপরে আলোর বিচিত্র খেলা দেখাতে তাঁরা উৎসাহী।

ঝ. দৃশ্যসজ্জায় বৈচিত্র্য আনার ব্যাপারে এবং কণ্ঠস্বরকে উচ্চতায় তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের ব্যবহারে এঁরা আগ্রহী।

ঞ. সর্বোপরি বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা দুয়েতেই এঁদের অভিনবত্ব আনার চেষ্টা থাকবে।

ট. অভিনয় ও বাচনভঙ্গীতে থাকবে অভিনবত্ব—যা কতকটা স্টাইলাইজড্ এবং ভাবধর্মী। পরে এঁদের প্রয়োগরীতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী ও প্রতীকী হয়ে উঠেছে।

ঠ. পাশ্চাত্যের প্রয়োগবিদ্‌দের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হলেও এঁরা দেশীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নি। দেশীয় রীতি ও ভাররূপকে এঁরা যুগোপযোগী করে সমৃদ্ধ করতে চান। এখানে গণনাট্যের কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য নেই।

নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নূতন তরঙ্গ উঠল। 'বহুরূপী' তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' ও 'ছেঁড়া তার' নাটক অভিনয় করে নাট্যামোদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১] পরে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'[২] 'ডাকঘর'[৩] 'চার অধ্যায়', 'মুক্তধারা', 'রাজা', সফোক্লিসের 'অয়দিপাউস', ইবসেনের 'পুতুলখেলা', বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' প্রভৃতি বহু নাটকের অভিনব অভিনয় করে 'বহুরূপী' এক অতুলনীয় সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত হল। অন্নদাশঙ্কর রায় একদা বহুরূপী সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'বহুরূপী পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।···কিন্তু সব থেকে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে জনসাধারণের রুচির ওপর প্রভাব। তার ফলে পেশাদার রঙ্গমঞ্চও আজকাল বদলে গেছে।···দলটি কোন এক মতবাদের সঙ্গে বাঁধা নয়।"[৪] শেক্সপীয়রের নাট্য-পরিবেশনায় অপেশাদার নাট্যসম্প্রদায় 'লিটল থিয়েটারের'ও যথেষ্ট সুনাম। এই সংস্থা 'ওথেলো', 'জুলিয়াস সীজার' প্রভৃতি অভিনয় করে তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। 'ওথেলো'তে উৎপল দত্ত, প্রতাপ রায় ও অমর গাঙ্গুলির অভিনয় স্মরণীয় হয়েছিল। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'কালের বিচার', উমানাথ ভট্টাচার্যের 'নীচের মহল'[৫] (গোর্কির লোয়ার

---

১. 'ছেঁড়া তার' এর অভিনয় দেখে অতুল গুপ্ত বলেছিলেন, 'এ-অভিনয় যিনি দেখবেন, তিনিই বুঝতে পারবেন বাংলা নাটক-অভিনয়ে এঁরা নবীনত্ব এনেছেন। আড়ম্বরের নবীনত্ব নয়, ভঙ্গী দিয়ে চমকে দেবার নবীনত্ব নয়; সহজ স্বাভাবিকতার মনোহারী নবীনত্ব। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে পৌষ, শুক্রবার ১৩৫৭. ২. রক্তকরবীর অভিনয় দেখে বিমুগ্ধ উৎপল দত্তের কথা, 'কল্পলোকের যক্ষপুরী ছেড়ে শম্ভুবাবু আমাদের নিয়ে এলেন স্মৃতি পরিচিত জগতে; ভ্রমিককে পরালেন শ্রমিকের পোষাক; আবৃত্তি না করে তারা কথা কইল সেই ভাষায়, যে ভাষায় আমরা কথা কই।" সুনীল দত্তের 'জীবনধর্মী নাট্যপ্রযোজনার রূপ ও রেখা' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৬. ৩. ডাকঘরের অসামান্য প্রযোজনার কথা উল্লেখ করে আনন্দবাজারের নাট্যসমালোচক লিখেছিলেন, 'নাটকের বাচ্যাংশে এবং বিন্যাসে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি. রসের দিক থেকে সে প্রার্থিত লক্ষ্যে উপনীত।" ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৮০. ৪. বহুরূপী জয়ন্তী সংখ্যা। ৫. অরুণ রায় ৩১.৭.৬০-এ 'স্বাধীনতা'য় বলেছিলেন, 'তিনি (উমানাথ) গোর্কির মূল সুরটিই শুধু ধরতে সক্ষম হয়েছেন তা নয়, বাংলার 'পুরানো' বস্তি-জীবনের মানুষকেও তিনি বুঝতে পেরেছেন।'

ডেপ্‌থ অবলম্বনে)। উৎপল দত্তের 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'তীর' ইত্যাদির অভিনয়েও তাঁরা যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'অঙ্গার' এবং 'নীচের মহল' এ অনতার চিত্র এসেছে। কৌতুক-রস প্রধান 'অলীকবাবু' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মতো ফার্স অভিনয়েও তাঁদের উৎসাহ প্রশংসনীয়। আর একটি স্মরণীয় সংস্থা 'নান্দীকার'। অনুবাদিত বিদেশী নাটকের অভিনয়ের দিকেই তাঁদের প্রবণতা বেশি। ব্রেশটের Three Penny Opera অবলম্বনে 'তিন পয়সার পালা', Good Soul of Setzuan অবলম্বনে 'ভালো মানুষ', সফোক্লিসের 'অ্যান্তিগোনে', বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', চেকভের নাটক অবলম্বনে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' ইত্যাদি অনেক নাটক এঁদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে এ নাট্যসংস্থা এত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ব্রেশট, চেকভ, পিরাণদেল্লো, ওয়েদেকাঁদ—এঁদের নাটক অভিনয়ের দিকে এ সংস্থার ঝোঁক থাকলেও এর 'নটী বিনোদিনী'-এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বাঙলা নাট্যজগতের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর জীবন এর বিষয়। দৃশ্যসজ্জা, উপস্থাপনা ও আলোক-সম্পাতের অভিনবত্বে এবং নামভূমিকার মঞ্জু ভট্টাচার্যের অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রেশটের অনুসরণে 'চেতনা'র 'মারীচ-সংবাদ' ও 'জগন্নাথ' এর অভিনয়ও বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'জগন্নাথ' এ অভিনয়ের গতানুগতিক রীতি বর্জিত হয়েছে—এখানে নূতন ধরনের পরীক্ষায় ব্যস্ত পরিচালক নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়। জগন্নাথ একালের মূক জনগণের প্রতিনিধি—সে নিজের বিধান নিজেই তৈরী করে। মূকাভিনয়ও আছে এতে। সব রকম নাটক নিয়েই এঁরা পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। "তবে সর্ত একটাই—সেটি ঠিক নাটক হওয়া চাই—এবং আমাদের দেশের মানুষের কাজে লাগা চাই।"[১]

অপেশাদার নাট্যসংস্থারূপে 'শৌভনিক'-এর অবদানের কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে এঁরাও বহু নাটকের অভিনয় করে চলেছেন। দক্ষিণ কলকাতায় এঁদের স্থায়ী মুক্তাঙ্গন রয়েছে। গোর্কীর 'মা' ও ইবসেনের 'দি গোস্টস্',-এর অভিনয় করে এ সংস্থার শিল্পী-রা খুব খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'তাসের দেশ', 'শেষরক্ষা', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতির অভিনয়েও এঁদের দক্ষতা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া 'থিয়েটার ইউনিট'-এর শিল্পীরা শরৎচন্দ্রের নাটক ও দেশি-বিদেশী ক্লাসিক নাটকের অভিনয় করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। 'চতুরঙ্গ' এর 'ডাউন ট্রেন', বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর', 'গন্ধর্ব নাট্যসংস্থা'র উদ্যোগে 'থানা-থেকে আসছি', 'মোরগের ডাক', 'দলিল' প্রভৃতি 'বৈশাখী'র 'দুই মহল', 'অভ্যুদয়' এর 'বারো ঘণ্টা', 'চার্বাক সম্প্রদায়ে'র 'কর্তার ভূত', 'রঙ্গরূপার' 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'শিল্পীমহল'-এর '১৪ই জুলাই' প্রভৃতি বহু সংস্থা এখন

১. থিয়েটার বুলেটিন প্রথম সংখ্যায় 'চেতনা'র এক মুখপাত্রের উক্তি।

বিভিন্ন রকম নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। অতিশয় দক্ষ ও খ্যাতিমান শিল্পী-রাও এই সব সংস্থার মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা আছেন। এঁদের প্রতিভা-স্পর্শে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নবত্বের সৃষ্টি অবশ্যই হয়েছে—সংলাপও বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। জটিল মনের ছাপও নাটকে বহুস্থলে পড়েছে। 'অদ্ভুত নাটক' বা 'কিমিতি' নাটক এবং বাদল-সরকারের থার্ড থিয়েটারও নবনাট্য আন্দোলনেরই ফল।

নবনাট্য-আন্দোলনের ধারাটি বিভিন্ন সংস্থার নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উদ্ভব-কালে এ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা যে আদর্শ ও প্রত্যয় নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল নানা সংস্থার প্রযোজনায় সেই আদর্শ ঠিক অক্ষুণ্ণ থাকছে না। তখন 'বহুরূপী'র মতো এঁদের অনেকেই ক্লাসিক্যাল 'সৎ' নাটকের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তাই বলে নবনাট্য-আন্দোলন সৎ-নাটক বা ভদ্র-নাটক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে ভেঙে গেছে মনে করা ঠিক নয়। 'সৎ মানুষের নূতন জীবনবোধ'কে এঁদের অভিনীত নাটকে তুলে ধরার কথা গঙ্গাপদ বসু অনেক আগেই বলেছিলেন। তাছাড়া সূচনা থেকেই তো এঁরা ক্লাসিক্যাল নাটক বা রবীন্দ্র-নাটককে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই 'সৎ' নাটকের কথা নূতন কিছু নয়। তবে নবনাট্য আন্দোলনের নামে যে নূতনত্ব বিভিন্ন সংস্থাকে পেয়ে বসেছে এবং নানা সংস্থা যে-ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। এ আন্দোলনের ধারা অবশ্য ক্ষুণ্ণ হয় নি ঠিক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এঁদের অভিনয় শহরের সীমিত পরিশীলিতরুচি মানুষের কাছেই আদৃত। কিন্তু বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে এ নাটক ক্রমশঃ যোগ হারাতে বসেছে। যে ব্যঞ্জনা ও শিল্পমূল্য এঁদের নাটকের—তার বোদ্ধা কতজন? এঁদের উদ্ভট নাটক কি সকল বিদগ্ধ ব্যক্তিদের কাছেও প্রশংসিত হচ্ছে? নূতনত্বের মোহ থেকে সরে এসে বর্তমান জীবন-সমস্যাকেন্দ্রিক এবং বৃহত্তর জনরঞ্জনমুখী নাটকের কথাই তাঁদের ভাবতে হবে।

গণনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

১৯৫০ থেকে ১৯৬২-এর মধ্যে গণনাট্যের শিল্পী-রা স্বাধীনভাবে নাট্যাভিনয় করতে পারেন নি।[১] তাঁদের মধ্যেও নানা মতভেদ ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ১৯৬২তে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে মার্কসবাদী দলেই পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘ যুক্ত থাকে। ১৯৬৭-এর তৃতীয় রাজ্যসম্মেলনে এই সংঘ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা পায়। এর পর থেকে সংঘ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়ে চলে।

'সীমান্তিক'—'পশ্চিম স্বর্গ' ও 'সন্ত্রাস' নাটক নিয়ে গণনাট্যে তাঁদের অস্তিত্ব ঘোষণা

১. "৪৭-এর পরে কোনো কিছুই যেন আর সহজ রইল না। পথ বেছে নেওয়া দুরূহ হয়ে উঠলো ক্রমেই, মত ঠিক করতে তর্কে নামতে হল সবাইকেই। ফলে নানা যুক্তিতর্কের হাটে, নানা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিড়ে দেশের আবহাওয়া জটিল হয়ে উঠলো।...গণনাট্য সংঘেও ফাটল ধরলো।" গণনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে, চারণপত্র ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭২, মৃণাল সেন।

করলেন। 'গণনাট্য পত্রিকা'র আশ্রয়ে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এবারের গণনাট্যসংঘ ঘোষণা করল—"শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীই একমাত্র সঠিক পথ।"[১] ১৯৬২-এর পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘও প্রচুর নাটকের অভিনয় করেন। 'কিমলিস', 'মে দিবস,' 'ভিয়েতনাম' 'দেশেদেশে', 'পালাবদল,' 'অক্টোবর বিপ্লব', 'অগ্নিকো'ণ, 'ভিয়েতনামের চিঠি' 'বিবসনা বৃহন্নলা', 'তুমি আমি সবাই' ইত্যাদি কয়েকটির নামমাত্র উল্লেখ করা হল।

গণনাট্য সংঘের বাইরেও যারা মার্কসবাদে বিশ্বাসী তারাও কেউ কেউ নতুন নাট্যসংস্থা গঠন করে গণনাট্যের ধারাকে পুষ্ট করতে থাকেন। ১৯৬০—উত্তর গণনাট্যগুলির মূল্যায়ণ করতে গিয়ে চিররঞ্জন দাস যা বলেছেন তা অত্যন্ত সারগর্ভ। "গণনাট্য সংঘ এবং তার বাইরের এই গণনাট্য আন্দোলন উত্তর ষাট দশকের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক চিন্তা তুলে ধরেছে।···চীন-ভারত সম্পর্ক, ভিয়েতনামের ও কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, আমেরিকার নিগ্রো নির্যাতন থেকে শুরু করে খনি শ্রমিকদের সংগ্রাম, বোম্বাইএর নৌবিদ্রোহ, কৃষক সংগ্রাম, শ্রেণী শোষণ ও সংগ্রাম, খাদ্যসমস্যা, জোতদারী, শ্রমিক আন্দোলন···সব কিছুই এই দশকের নাটকে প্রতিফলিত।"[২]

আজকের আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে এই গণনাট্য ও নবনাট্যের প্রবাহ প্রচণ্ড গতিবেগে বয়ে চলেছে। দুই ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন দর্শন নিয়ে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে অগ্রসর। তবু মনে হয় শিল্পমূল্যের দিকে আরো একটু যত্নবান হলে গণনাট্যেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জনগণের অনেক নিকটে আসতে পারছেন তাঁরা।

গ্রুপ থিয়েটার-এর কথা এই প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। ১৯৪৭এ দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে নাট্য-কর্মী-দের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দিল। তাছাড়া আরও নানা কারণে নিজেদের মধ্যেও বিভেদ মাথা তুলতে চাইল। আর তখন থেকে বেশ কিছু সংখ্যক নাট্যকর্মী নিজেদের একক বা যৌথ ব্যক্তিত্বের উদ্যোগে যে-সব নাট্য-দল গড়ে তুলতে থাকলেন সেগুলিই হল 'গ্রুপ্ থিয়েটার'। গণনাট্য ও নবনাট্য দুই আদর্শের নাট্যকর্মী-বৃন্দ নানা 'গ্রুপ্ থিয়েটার' ধীরে ধীরে গড়ে তুললেন। একেবারে হাল আমলের অর্থাৎ ১৯৮৪ পর্যন্ত এই থিয়েটারের বিবর্তন লক্ষ্য করলে একে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। ক. গণনাট্য সংঘের অন্তর্গত কিছু কিছু গ্রুপ্ থিয়েটার খ. আর এক শ্রেণীর 'গ্রুপ্ থিয়েটার' যেখানে সুস্পষ্ট সমাজবোধ বা সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির একান্তই অভাব, গ. তৃতীয় এক শ্রেণী যা নব-নাট্যের সৎ আদর্শের কথা মনে রেখে মুষ্টিমেয় দর্শকদের কাছে নানাভাবে বিষয়ের উপস্থাপনে ও অভিনয়ে নবত্ব আনার

১. গণনাট্য সংঘের তৃতীয় রাজ্যসম্মেলনের ঘোষণাপত্র

২. আধুনিক বাংলা নাট্য-আন্দোলনের গতিধারা পৃঃ ১৩২ চতুষ্কোণ, ১৯৮৩ বৈশাখ.

ব্যাপারে প্রয়াসী। তবে একথা সত্য যে সব দলই আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর। তাই এরা সকলেই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছেন।

থার্ড থিয়েটার :

সাম্প্রতিকালে 'থার্ড থিয়েটার' নামে এক নূতন ধরনের থিয়েটার আমাদের দেশে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যে অবশ্য আরো অনেক আগেই এর এক ধরনের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এই বিশেষ ধরনের নাট্যরীতিকে 'তৃতীয় মঞ্চ' বা 'অন্য থিয়েটার' নামেও অভিহিত করা হচ্ছে। আধুনিক কালের শক্তিমান নাট্যকার বাদল সরকার এই অভিনব নাট্যধারার প্রবর্তক।

তিনি 'থার্ড থিয়েটার' শব্দটি গ্রহণ করেছেন মার্কিনী নাট্য-সমালোচক ব্রুস্টাইন-এর একখানি গ্রন্থের নাম থেকে। কিন্তু ব্রুস্টাইন যে অর্থে এ-কথাটি বলেছেন বাদল সরকার ঠিক সেই অর্থে এর প্রয়োগ করেন নি।[১] তিনি এ-দেশের নাট্যাভিনয়ের ধারাটিকে মনে রেখে একটি বিশেষ অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের থার্ড-থিয়েটারের সংস্কার তাঁর মনে না থাকলে তিনি এতখানি উৎসাহের সঙ্গে এ ধারার প্রবক্তা হতেন কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, এটা যদি হয় থার্ড বা তৃতীয় থিয়েটার, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটার কোন্‌গুলি? আমাদের দেশে পুরাতন লোকনাট্য, যাত্রা; সঙ প্রভৃতিকে বাদল সরকার বলেছেন প্রথম বা ফার্স্ট থিয়েটার। দ্বিতীয় বা সেকেণ্ড থিয়েটার কিন্তু দেশীয় আদর্শে গড়ে ওঠে নি। বিদেশী আদর্শে উনিশ শতকে যে থিয়েটার গড়ে উঠেছে এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ বহু নাট্যকারদের নাটকের পেশাদারী মঞ্চে যে-ভাবে এতকাল অভিনয় হয়েছে তাই হল দ্বিতীয় থিয়েটার। এই দ্বিতীয় থিয়েটারকে আমরা প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটার বলে থাকি। এ অভিনয়-কালীন দর্শকদের সঙ্গে নট-নটীদের অবস্থানগত ব্যবধান যথেষ্ট থাকে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের থেকে দূরে থেকে দর্শকেরা এই অভিনয়ে অনেকখানি নিষ্ক্রিয়-ভূমিকা নিয়ে থাকেন। আর এ দুয়ের বাইরে হল যা—তাই থার্ড থিয়েটার বা তৃতীয় মঞ্চ। এখানে অভিনয়ের সময় নট-নটীদের 'মেকআপ' নেই, বেশভূষা নেই, আলো নেই, দৃশ্য সজ্জাও নেই, মঞ্চও নেই। তাহলে কি আছে? আছে শুধু তাদের অভিনয়। ১৯৭১ সালে ২৪শে অক্টোবর শতাব্দীর একটি নাটক দিয়ে এর শুভযাত্রা শুরু হয় এ. বি. টি. এ. হলে।[২] তারপর আর কোনো হলে নয়—এ নাটক চলে এল মাঠে-ময়দানে। প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। দুটোতেই ব্যবসায়িক দিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতে ব্যবসায়িক দিকটি গৌণ।

প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটারে দৃশ্যপট, আলোক, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নট-নটীদের

১. তথ্যটি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী 'উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক' গ্রন্থে।

২. থার্ড থিয়েটার কলকাতার কড়চা. ৩/৬/৭০.

পোষাক-পরিচ্ছদ-এর গুরুত্ব অনেকখানি। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা এই মঞ্চেরই সহযোগিতায় নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। অমন যে আলোড়ন-কারী 'নবান্ন' নাটক তাও প্রসেনিয়াম মঞ্চেই প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই ধরনের মঞ্চের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে প্রসন্ন ছিলেন না তা জানি।[১]

যাত্রা বা প্রথম থিয়েটারের সঙ্গে প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটারের পার্থক্যটি সহজেই চোখে পড়ে। যাত্রায় দেখা যায় নট-নটীদের ঘিরে গোল করে দর্শকেরা বসেন। উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্য দিয়েই অভিনেতৃবর্গ যাতায়াত করেন এবং অভিনয়-শেষে তাঁরা দর্শকদের মাঝখানে গিয়েই বসেন। কিন্তু দ্বিতীয় থিয়েটারে দর্শকদের সঙ্গে নট-নটীদের ব্যবধান অনেক বেশী। দূরে বসে তাঁরা অভিনয় দেখে হাততালি দিতে পারেন, নিন্দাসূচক কোনো মন্তব্যও করতে পারেন। এই ভাবে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। সেইজন্য অনেক নাট্যপরিচালক, দর্শক ও নট-নটীদের এই ব্যবধান দূর করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। ব্রেশ্‌ট প্রসেনিয়াম মঞ্চকেও দর্শকের অনেকখানি কাছে আনতে পেরেছেন। তাঁর নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনেক সময় দর্শকের ভেতর দিয়ে মঞ্চে উঠে আসেন বা দর্শকদের মধ্যে নেমে যান। তাঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য -এমনই যে দর্শকদের দূরে থাকলে চলে না। পোলাণ্ডের গ্রোটাস্কি প্রসেনিয়াম মঞ্চকে বাতিল করে দিয়ে মুক্তাঙ্গন-মঞ্চের পত্তন করেছিলেন। এঁর নাটকেও দর্শক ও অভিনেতার পার্থক্য রাখা হয় না। তাই অভিনয়কালীন নট-নটীদের গতিবিধি, যাওয়া-আসা থেকে দর্শক ও অভিনেতার পার্থক্য নিরূপণ কঠিন হয়ে পড়ে। উৎপল দত্তও মিনার্ভায় অভিনয়-কালে মঞ্চের খানিকটা অংশকে দর্শকদের প্যাসেজের মধ্যে প্রসারিত করে নিতেন। এই ভাবে ওদেশের চিন্তা এদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। এই সমস্ত কথা মনে রেখেই বাদল সরকার 'থার্ড থিয়েটার' প্রবর্তন করেছেন বলেই মনে হয়।

চার-দেয়ালের সীমিত স্থানের মধ্যে থিয়েটারকে ধরে রাখা আর গেল না। সে চলে এল খোলা জায়গায় মুক্ত অঙ্গনে। ওদেশে যদি এ প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে, এদেশেই বা পাবে না কেন? তাই কেউ কেউ এর পক্ষে ওকালতি করেছেন এবং এখনো করছেন। কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে আকাশবাণীতে এই থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই বক্তৃতা করেছেন। সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নাটক পৌঁছে দেওয়াই এর অভিপ্রায়। মধ্যবিত্ত দর্শকদের কারো কারো এ থিয়েটার খুব প্রিয় হলেও সকলেই কিন্তু এর প্রতি প্রসন্ন নন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কিরণ মৈত্র এ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশাবাদী নন। তবু তিনি এর বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এ "থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে বদ্ধতায়, কৃত্রিম আলোয়, সাজ-পোষাকের বাহুল্যে, রূপসজ্জার চাক-চিক্যে ভারাক্রান্ত হবে না।

১. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিলাতের নকলে যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ।...তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। রঙ্গমঞ্চ।

নেহাৎ দরকারী আলোয়, চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা এবং / অথবা দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকের মাঝখানে হবে এর থিয়েটার। আবহ শব্দ ব্যবহারের জন্যে টেপরেকর্ডার ব্যবহৃত হবে না, মুখে শব্দ করে অভিনেতারাই শব্দ-বাহকের কাজ করবে। নার্সী কোরিওগ্রাফির সৌন্দর্যে, সংলাপের ধারে, শব্দ ব্যবহারের অনিবার্যতায়—এ নাটক রসাপ্লুত করবে দর্শকদের—নাট্যপ্রযোজনার যা মোক্ষ।"

এখন আমরা সূত্রাকারে এ থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারি।

ক. গ্রোটাস্কির চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্যে এ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়ে এ থিয়েটারের পত্তন।

খ. যাত্রার থেকেও এ থিয়েটার আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হল। যাত্রায় অভিনেতা-দের পোষাক-পরিচ্ছদ, বাদ্য-যন্ত্র সহকারে গান এবং আধুনিককালে আলোকও বর্জন করা হয় না। কিন্তু এতে এ সবের কোনো বালাই নেই।

গ. যাত্রার মতো এতে সঙ্গীত আবশ্যিক, তবে তা ধ্রুপদী বা পল্লীসঙ্গীত নয়। শুধুমাত্র কণ্ঠ-সঙ্গীতই এর অঙ্গ, কিন্তু তার জন্যে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের প্রয়োজন নেই।

ঘ. বৃত্তাকারে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান দর্শকদের সামনেই চলবে এর অভিনয়, এখানে দর্শকদের সঙ্গে নট-নটীদের ব্যবধান থাকবে না।

ঙ. এ থিয়েটারে খরচ খুবই কম। নাট্যকার বাদল সরকারের মতে এতে একশত থেকে একশত পঁচিশ টাকায় মধ্যে একটি নাটকের অভিনয় হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, 'এক কোণে রাখা বাক্স বা কোনো কর্মীর হাতে সাধ্যমতো দক্ষিণা দিলেই হল।'[১]

বাদল সরকারের 'মিছিল', 'ভোমা', বীরসেনের 'মুক্তি-আশ্রম' প্রভৃতি এ রীতিতে অভিনীত হয়েছে। শতাব্দী, লিভিং থিয়েটার, ঋতম্ প্রভৃতি অনেক সংস্থা এ থিয়েটার করে চলেছে।

---

১. থার্ড থিয়েটার, কলকাতার কড়চা ৩/৬।৭০ জীবনধর্মী নাট্যপ্রযোজনার রূপ ও রেখা গ্রন্থে উদ্ধৃত, সুনীল দত্ত। কিরণ মৈত্রের বক্তব্য একটুখানি উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছেন, "অধুনা আবার থার্ড থিয়েটার নামে কায়দা-নর্বস্ব একটা ব্যাপার ঘটছে। ৫০/৬০টা দর্শক বসতে পারে এমন হলে আমরা নাটকের নামে নানারকম জিম্ন্যাষ্টিক, এ্যাক্রোবেটিক কায়দা দেখাচ্ছি। দেখতে মজা লাগে, যদিও শিল্পীরা গলদঘর্ম হয়ে দু ঘণ্টা ধরে কসরৎ করে। কিন্তু ফল লাভ হয় না।" দৈনিক বসুমতী, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮২ —'সাম্প্রতিক নাট্যচিন্তা'।

নির্ঘণ্ট

[অ]

অক্টোবর বিপ্লব ২৯৯
'অগ্নিকোণ' ২৯৯
অঙ্ক ৩
'অঙ্গার' ১৭৩, ২৩৩, ২৯৫, ২৯৭
'অচল পয়সা' ২৬৪
অচলায়তন ৪৮, ২২৮
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ২৫৫
অজয়কুমার চক্রবর্তী ২৫৮
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৭, ৩০১
অডেন ২২৯, ২৩২
অতুলকৃষ্ণ মিত্র ২৩৮
অন্নদাশংকর রায় ২৫১, ২৯৬
'অনুকরণ', ২৩
'অনুকরণতত্ত্ব' ২৭৪
'অনুশীলন নাট্যসংস্থা' ২৯৪
অপরেশ মুখোপাধ্যায় ২২৩, ২৫০, ২৮৬
'অপেরা, ৯৩
'অবসন্ন প্রজাপতি', ১৪৩
'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ৮৪, ১২৮, ২৪২
'অভিযান', ২৯০
অভ্যুদয়, ২৯৭
অমর গাঙ্গুলী ২৯৬
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩৮
অমরেন্দ্রনাথ রায় ১৫২
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ২৬৩
অমৃতমন্থন ১১১
অমৃতলাল বসু ১৪, ৫০, ৮১, ১২০, ১২৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৫
'অরণ্যদিপাউস' ২৯৬
অরস্কান্ত বক্সী ২৫৫
('দি') অরফান' ১৭৪
অরিষ্টিস ৯, ১৭১, ১৭৩
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২৭৮, ২৯৭
'অলীকবাবু' ১৩৮, ১৫১, ২৯৭
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৩৩
'অশোক' ২৫০
'অশ্রুমতী' ২২৯, ২৫০
অস্কার ওয়াইল্ড ২২৯
অহীন্দ্র চৌধুরী ২৬৪, ২৮৭, ২৮৮

[আ]

আকস্মিকতা ও নাট্যদ্বেষ, ১৫-১৭
আগষ্ট আন্দোলন ২৯০
'আগুন' ২৯০, ২৯২
আচাভুয়ার বোয়াচাক ১৫২
'আনন্দবিদায়' ১৫২
'আন্তিগোনে' (নাটক) ১৬৫, ১৭৪, ২৯৭
'আবুহোসেন' ১৫২
আব্রাহাম লিঙ্কন ১৭৬, ২৪৯
'আমি সুভাষ' ২৬৪
আয়ানেস্কো ২৮২, ২৮৩
আর্চিবল্ড ম্যাকলীশ ২৩২
আর্থার জোনস (হেনরি), ৫-৮, ৭০
আর্থার সাইমন্স ২২৬
'আরব্ধ' ৪৭
আলফিরেরি ২৬
আলমগীর ২৫০
আলেকজাণ্ডার ডুমা ২২২, ২৩৫
আশ্চর্যজনকতা (অপ্রত্যাশা, আকস্মিকতা ও চমক) ২০
(ডঃ) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ২৬৯
আঁদ্রে জোসেট ২৪৯
অ্যাডিসন ১৩১, ১৩৮
'অ্যাক্টনি' ৬২
অ্যাণ্টানিও ম্যাচাডো ২৪৯
অ্যাবসার্ড নাটক ৮২, ২৭৯-৮৬
অ্যারিষ্টটল ৩-৬, ৭, ১৫, ১৮, ৩২, ৫৫, ৬৪, ৭৭, ৯১, ১০৮, ১১৩-৪, ১২৯, ১৭৭, ১৯১, ২৪৬, ২৫৬, ২৭৪
অ্যারিষ্টটল (ট্রাজিডি) ১৬৩
অ্যারিষ্টটল (দৃশ্য) ৮৬-৮৭
অ্যারিষ্টটল পরবর্তী চিন্তা ৬১
অ্যারিষ্টটল (সঙ্গীত) ৮২
অ্যারিষ্টোফেনিস ১০৭, ১০৯, ১১৫, ১২০, ১৩৯, ১৪৪, ১৫৩
অ্যালফ্রেড হ্যাস্টার ২৪৯

[ই]

ইউজীন ২৩৭
ইউরিপিদিস ৩০, ৪৪, ৯২, ১৫৩, ১৭১, ১৯১, ১৯৮
ইডিপাস ৯, ১৫২, ১৭১, ১৮১

'ইতিবৃত্ত' ৩৭
ইন্‌গ্রাম বাইওয়াটার ৭-৮৬
ইন্টারলুড ১১৩, ২৬০
ইবসেন ১৫, ২৬, ৩০, ৪৮, ৫৪, ৭৭, ৮২, ১২১, ১৪১, ১৫৮, ১৬৮, ১৬৯, ২২৯-৩০, ২৪৪, ২৪৯, ২৯৬, ২৯৭
ইম্প্রেসেনিজ্‌ম ২৩৬
'ইরাণের রাণী' ২২৯
ইলেক্‌ট্রা ১৬

[ঈ]

ঈহামৃগ, ৪৮, ৭৬, ১০০

[উ]

উইট, ১৩১, ১৩৭
'উইনটারস টেল' ১৫, ১১২
'উইভার্স' ২০৯
উইলিয়াম ডি এভেন্যাণ্ট ২৬১, ২৭১
উইলিয়াম হেনরি হাডসন ৭০
উৎপল দত্ত ১৭৯, ২৩৩, ২৪৫, ২৫৩, ২৭৮, ২৭৯, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭, ৩০১

[ঊ]

ঊৎসৃষ্টিকায় ১৮
ঊর্ধ্বমুখী বৃত্ত ৬৩
ঊপেন্দ্রনাথ দাস ১৬৪, ১৭২
'ঊষর সংকট' ১৩৮, ১৫০, ২৪৪, ২৪১
ঊমানাথ ভট্টাচার্য ২৫৮, ২৯৬
ঊমেশচন্দ্র মিত্র ৪৯, ২৪৪

[ঋ]

'ঋণং কৃত্বা', ১৪৩
ঋতম, ৩০২

[এ]

একপোডাস ৪০
'একাকার' ১৫১
'একাঙ্কিকা' (নাট্যগ্রন্থ), ২৫৫
'একষ্টাভাগাঞ্জা' ১৪৫, ২৭০
'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ১৯০, ১৩৭, ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ২৪৪
একোক্তি ৯৮
এডওয়ার্ড র‍্যান্ডেনসকরফ ১৪৯
এডমণ্ড রসটাণ্ড ২৫৭
এডিসন ১৯১
এডুয়ার্ডো মারকুইনার ২৩২
এথিক্যাল ট্রাজিডি ১৯৩
এথিয়ীজ ১৪১
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২৪৭
এপিক থিয়েটার ৮২-৮৩, ২১২, ২১৩, ২৭৬
এপিকারমুস (কবি) ১০৮
এপিটাসিস ৪১
এপিসোড ৪০
এবং ইন্দ্রজিৎ, ২৮৫
'এ. বি. টি. এ.' ৩০০
'এমন কর্ম আর করব না' ১৪১
'এমীডী' ২৮২
এরিক বেন্টলি ৭৩
এলিয়ট, টি. এস. ২০, ৬২, ৭২, ৭৭২
এসকাইলাস ২৬, ৮৩, ৯২, ১৭১, ১৭৩, ১৯৫
এ. সি. ব্রাডলি ৪১

[ঐ]

'ঐতিহাসিক নাটক' ২৪৫

[ও]

ওজারিও রিমুক্কিনী ২৬১
ওথেলো ৯, ১৩, ৪৩, ৬২, ১৭৯, ২৯৯
ওয়ালটার পেটার, ২২১
ওয়ালটার হাসেনক্লেভার ২৩৭
ওয়েচার্লি ১১৫, ১৪১
(জন) ওয়েবস্টার ২০৪
'ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটার' ২৫৫

[ক]

'ককেসিয়ান চক সার্কল (দি)' ২৭৯
(শ্রীমতী) কক্কা ২৮৭
কনকাবতী মাধব ১০১
কনগ্রীভ ১১৫, ১৪১
কন্দর্পকেলি ৯৯
কমপ্লেক্স ট্রাজিডি ১৯৩
কমলেকামিনী ১৬, ৮২, ১৩৪, ১৪২, ২২৩